ইতিহাস অভিধান

(ভারত)

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

ইতিহাস অভিধান

(ভারত)

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক : শমিত সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ ১৯৮২
তৃতীয় সংস্করণ : জুলাই ১৯৯০

মূল্য : পঁয়তাল্লিশ টাকা

মুদ্রক : প্রিন্টোগ্রাফ
৯/সি, ভবানী দত্ত লেন
কলিকাতা-৭৩

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় ইতিহাসের কোন অভিধান এতদিন ছিল না কেন জানি না, তবে নিজের কথা বলতে পারি, ছাত্রজীবনের প্রায় সূচনা থেকে ইতিহাসের স্নাতকোত্তর পাঠ পর্যন্ত এমন একটি আভিধানিক গ্রন্থের প্রয়োজন বারবার অনুভব করেছি যাতে ইতিহাসের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণানুক্রমে লিখিত থাকার সুযোগে সহজেই জানা সম্ভব হয়। তাছাড়া অনেক সময় অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে সন্দেহ নিরসনের জন্য ও অনেক বিতর্কের নিষ্পত্তির জন্যও এই জাতীয় একটি আকর গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব করেছি।

বছর-কয়েক আগে যখন এই গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হই তখন অনেক শুভানুধ্যায়ী ও ইতিহাসের অনুরাগী পাঠক আমাকে এ কাজে উৎসাহ দেন ও এই গ্রন্থের সার্থকতা সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি প্রত্যয় প্রকাশ করেন। কিন্তু লেখার কাজ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারি যে, মহাসাগরের মত বিশাল ভারতের ইতিহাসকে একটি গ্রন্থে বর্ণানুক্রমে ঢেলে সাজানো ও প্রতিটি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা সাধ্যের অতীত না হলেও বিশাল ঐ গ্রন্থের প্রকাশ, মুখ্যত অর্থনৈতিক কারণে, প্রায় অসম্ভব কাজ। তাই নিরুপায় হয়েই বিষয়বস্তু নির্বাচনে কয়েকটি সূত্র অনুসরণ করেছি এবং গুরুত্ব অনুসারে বিষয়বস্তুর আলোচনা সীমিত রেখেছি।

সিন্ধু সভ্যতা থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ভারতের ভৌগোলিক আয়তন নানা আকার ধারণ করেছে। কখনো উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান, কখনো বা পূর্বে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত ভারতের সীমানা বিস্তৃত হয়েছে। নেপাল ও ভারতের মধ্যেও দীর্ঘকাল কোন সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় সীমানা ছিল না। কিন্তু এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের এক্তিয়ার ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে সৃষ্ট ভারতের সীমানায় সীমিত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যা সম্পূর্ণরূপে আফগানিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির নিজস্ব ব্যাপার তা এই গ্রন্থে স্থান পায়নি। তবে সিন্ধু সভ্যতা এই নীতির উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম, কারণ সিন্ধুসভ্যতার পীঠভূমি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাকে বাদ দিয়ে ভারতের ইতিহাস শুরু করা যায় না। একই কারণে সিন্ধুতে আরব অভিযানও এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। তারপর আফগান যুদ্ধ, ব্রহ্ম যুদ্ধ, নেপাল যুদ্ধ প্রভৃতিও এই গ্রন্থের বিষয়, কারণ

ভারত ইতিহাসের পরম্পরায় তারা অপরিহার্য। ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে ভারতের অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়, সে কারণে পাকিস্তান এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় আর সে আলোচনার শেষে অনিবার্যভাবে এসেছে বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠার কাহিনী। বঙ্গ প্রসঙ্গেও বাংলাদেশ এসেছে। বর্তমানে যা বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সেই অঞ্চলের বহু ব্যক্তি ও সংগঠনের ভারতের মুক্তি সংগ্রামে যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল তারও যতদূর সম্ভব উল্লেখ করেছি।

দেশে-বিদেশে অগণিত ভারত-তত্ত্ববিদ তাঁদের আলোচনা ও গবেষণার দ্বারা ভারতের ইতিহাস সমৃদ্ধ করেছেন। ভারত ইতিহাস অভিধানে তাঁরা সকলেই স্মরণীয়। কিন্তু এই গ্রন্থে শুধু সেইসব ভারত-তত্ত্ববিদ স্থান পেয়েছেন যাঁরা ভারতে এসে ভারত ইতিহাসের রহস্য উদ্‌ঘাটনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন।

স্থান সম্বন্ধেও একই নীতি অনুসৃত হয়েছে। সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধু প্রদেশ অথবা করাচি, পেশোয়ার, ঢাকার ভারতের ইতিহাসে একদা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় শুধু বঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, যুক্ত প্রদেশ অথবা কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতীয় প্রদেশ ও শহরগুলি।

বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, অর্থশাস্ত্র, আইন-ই-আকবরি প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেছি এবং রাষ্ট্র রাজনীতির বাইরে থেকেও যাঁরা ইতিহাস পুরুষ সেই সুপ্রাচীন কালের গ্রন্থকার, শাস্ত্রকার ও ধর্মগুরুদেরও যতটা সম্ভব স্থান-সঙ্কুলানের চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

নানা প্রতিবন্ধকতায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিলম্ব হল। তবু আশা রাখি, যাঁরা প্রতীক্ষায় ছিলেন তাঁরা বইটি হাতে পেয়ে খুশীই হবেন। কারণ এবারের বিষয়বস্তু অনেক ব্যাপক। প্রথম সংস্করণের কালসীমা ছিল সিন্ধু সভ্যতা থেকে স্বাধীনতা। এবার তা দীর্ঘায়িত হয়েছে প্রস্তর যুগ থেকে পাক-ভারত যুদ্ধ পর্যন্ত। তাই পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ নিয়ে এই উপমহাদেশের যাবতীয় ঐতিহাসিক তথ্যই এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তবু অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নজরে যদি কোন বিচ্যুতি ধরা পড়ে তা জানালে বাধিত হব। পাঠকদের সহযোগিতাতেই এই অভিধান ক্রমশ নির্ভুল ও সম্পূর্ণ হতে পারে। ইতি। ১৫ মার্চ, ১৯৮২

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ইতিহাস অভিধান তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। এতে বোধহয় বইয়ের গুণাগুণের চেয়েও ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের হাতের কাছে এই ধরনের একটি সহায়ক বই থাকার প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ বেশি মিলছে। বইটির সীমাবদ্ধতার কথা আমি জানি। যাঁরা ভারতের ইতিহাসের অনুপুঙ্খ খবর রাখেন তাঁরাও তা জানেন। কিন্তু বইটিকে আরও তথ্যভিত্তিক ও বিস্তারিত করতে হ'লে অনিবার্যভাবে বইটির দাম অনেক বেশি বাড়াতে হ'ত। গ্রন্থনার কিছু ত্রুটিও এই সংস্করণে থেকে গেল।

—লেখক

ইতিহাস অভিধান
(ভারত)

অকল্যাণ্ড, লর্ড (১৭৮৪—১৮৪৯): লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৬খৃ ভারতে ইংরেজ সরকারের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন এবং ১৮৪২ খৃ পর্যন্ত সে পদে বহাল থাকেন। এদেশে শিক্ষাবিস্তারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি প্রভৃতি ভাষা শিক্ষায় উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া তীর্থকর প্রত্যাহার করে ও কৃষির জন্য সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করে তিনি জনপ্রিয় হন।

অযোধ্যার নবাব নাসিরুদ্দিন হায়দারকে ১৮৩৭ খৃ রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করে তিনি নবাবের কাছ থেকে কোম্পানির বাৎসরিক পাওনা টাকা বাড়াতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কোম্পানির ডাইরেক্টর সভা তাঁর সে প্রস্তাব বাতিল করেন। দাক্ষিণাত্যের সাতারা রাজ্যের রাজাকে পর্তুগীজদের সঙ্গে ইংরেজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে তিনি পদচ্যুত করেন এবং রাজ্যটি বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। উত্তর ভারতে রুশ আক্রমণের আশঙ্কায় লর্ড অকল্যাণ্ড আফগানিস্তানের আমির দোস্ত মহম্মদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে উদ্যোগী হন। কিন্তু দোস্ত মহম্মদ মিত্রতার শর্ত হিসাবে মহারাজ রণজিৎ সিংহের দখল থেকে পেশোয়ার প্রত্যর্পণের দাবি জানান। কিন্তু লর্ড অকল্যাণ্ডের পক্ষে সে প্রস্তাবে সম্মত হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ রণজিৎ সিংহ ইংরেজদের অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য মিত্র ছিলেন। ফলে দোস্ত মহম্মদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ বাধে এবং দোস্ত মহম্মদকে অপসারিত করে লর্ড অকল্যাণ্ড ইংরেজ সরকারের আশ্রিত শাহ সুজাকে আফগানিস্তানের সিংহাসনে বসাতে উদ্যোগী হন। আফগানিস্তানে অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে লর্ড অকল্যাণ্ড ঐ রাজ্য আক্রমণ করেন। সামান্য প্রতিরোধের পরেই দোস্ত মহম্মদ আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁকে বন্দী করে কলকাতায় আনা হয়। শাহ সুজা নামেমাত্র আফগানিস্তানের আমির হন। আফগানরা শীঘ্রই ঐ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং বৃটিশ কর্মচারী ক্যাপ্টেন বার্নেস, বৃটিশ রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌নাটেন প্রভৃতিকে হত্যা করে। সন্ত্রস্ত বৃটিশ অফিসাররা সব অস্ত্রশস্ত্র আফগানদের হাতে অর্পণ করে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু বিদ্রোহী আফগানরা ঐ পলায়নপর বৃটিশ অফিসারদের প্রায় সকলকেই পথে হত্যা করে। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ শেষ হয়।

লর্ড অকল্যাণ্ডের কার্যকলাপে বৃটিশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় ১৮৪২খৃ তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

অক্টারলোনি (১৭৫৮-১৮২৫) — ডেভিড অক্টারলোনি মাত্র উনিশ বছর বয়সে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্য-বাহিনীতে যোগ দিয়ে ভারতে আসেন ও বিভিন্ন যুদ্ধে পারদর্শিতা দেখিয়ে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। দিল্লির রেসিডেন্ট পদে থাকাকালে তিনি যশোবন্ত রাও হোলকারের আক্রমণ থেকে ১৮০৪ খৃ ঐ নগরী রক্ষা করেন। পিণ্ডারী দস্যুদের দমনে তাঁর বড় ভূমিকা ছিল। ১৮০৯ সালে মহারাজা রণজিৎ সিংহকে বৃটিশ ভারতের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হওয়ার জন্য চাপা দিতে অক্টারলোনির নেতৃত্বে এক সৈন্যদল পাঞ্জাবে প্রেরিত হয় এবং তারপরেই বিখ্যাত অমৃতসর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৮১৪-১৬ খৃ নেপালকে যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন। নেপাল যুদ্ধে ইংরেজের সাফল্যের স্মারকরূপে কলকাতায় ১৮১৮ খৃ যে মিনার নির্মিত হয় তার নাম দেওয়া হয় অক্টারলোনি মনুমেণ্ট। ১৯৬৯ সালের ৯ আগস্ট ঐ মিনারের নাম পরিবর্তিত করে শহিদ মিনার রাখা হয়।

ভরতপুর রাজ্যের উত্তরাধিকারী নিয়ে বিরোধের মীমাংসায় অনুসৃত নীতি নিয়ে গভর্নর-জেনারেল লর্ড অ্যামহার্স্টের সঙ্গে মতভেদ ঘটলে স্যার ডেভিড অক্টারলোনি পদত্যাগ করেন।

অগস্ত্য : পুরাণে উল্লেখিত মুনি, সম্ভবত ঐতিহাসিক ব্যক্তি। রামায়ণের নানা অধ্যায়ে এবং মহাভারতেও (সমুদ্র পান কাহিনী) অগস্ত্য মুনির উল্লেখ আছে। বিন্ধ্য পর্বতমালার দক্ষিণে উত্তর ভারতীয় আর্যসভ্যতা বিস্তারের জন্য পরিব্রাজকরূপে তিনি গমন করেন। সম্ভবত তাঁর সাফল্য আশানুরূপ না হওয়ায় তিনি আর উত্তর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেননি। তাঁর প্রচারদৌত্য ফলপ্রসূ না হওয়াতেই শ্রীরামচন্দ্র অস্ত্রবলে দাক্ষিণাত্য জয়ে অগ্রসর হন বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। শ্রীরামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যে অগস্ত্য মুনির আশ্রমে যান এবং রাবণের বিরুদ্ধে তাঁর সহায়তা গ্রহণ করেন। তবে দক্ষিণ ভারতেও অগস্ত্য মুনি বিশেষ পূজিত এবং তামিল ভাষার প্রবর্তকরূপে আখ্যায়িত।

অগ্নিমিত্র : মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর শুঙ্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন পুষ্যমিত্র শুঙ্গ (১৮৫—১৪৮খৃ পূ)। অগ্নিমিত্র পুষ্যমিত্রের পুত্র, এবং পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু আট বছর পরে স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেন। তিনি মহাকবি কালিদাস বিরচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের নায়ক।

অঙ্গ (১) **:** খৃ-পূ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতব্দীতে বর্তমান বিহারের ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা নিয়ে গঠিত অঙ্গরাজ্য ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম ছিল। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যে এবং অথর্ব বেদে অঙ্গরাজ্যের বারবার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধের সমকালে অঙ্গরাজ্য মগধের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং নৃপতি বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু যুব-রাজ অবস্থায় তখন অঙ্গের শাসক ছিলেন। আধুনিক ভাগলপুরের সন্নি-

কটবর্তী চম্পা ছিল অঙ্গের রাজধানী। চম্পা প্রাচীন ভারতের অন্যতম শিল্প--সমৃদ্ধ ও বাণিজ্যপ্রধান নগরী ছিল।

অঙ্গ (২): জৈনদের ধর্মগ্রন্থ। প্রাচীন ভারতের বহু ঐতিহাসিক তথ্য এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

অঙ্গদ: নানকদেবের পরবর্তী শিখ ধর্মগুরু। ১৫৩৮-৫২ খৃ গুরুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গুরুমুখি লিপির প্রবর্তকরূপে খ্যাত।

অজন্টা: বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্গত প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের শিল্পকলার নিদর্শন সম্বলিত কয়েকটি গুহা। চীনা পরিব্রাজক হিউ এন সাং-এর ভ্রমণ-লিপিতে অজন্টার শিল্পকলার উল্লেখ আছে। কিন্তু খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ঐ অপূর্বসুন্দর চিত্রকলা ঘন অরণ্যের আড়ালে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অবস্থায় পড়ে ছিল। খাড়া পাহাড়ের গায়ে মোট ত্রিশটি গুহায় অজন্টার শিল্পকলা খৃষ্ট—পূর্বকাল থেকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত অঙ্কিত হয়। অজন্টার এই গুহাচিত্রগুলি দুই সহস্রাব্দ পূর্বের ভারতের চরম শিল্পোৎকর্ষের নিদর্শন।

অজয়রাজ: শাকম্ভরীর (অধুনারাজস্থানের আজমির ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল) চৌহান বংশীয় রাজা; রাজত্বকাল আনুমানিক ১১১০-৩৩ খৃ। পিতা প্রথম পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর রাজা হন এবং রাজ্যবিস্তারে সাফল্য লাভ করেন। তাঁর রাজ্য উজ্জয়িনী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অজয়রাজ আজমির (অজয় মেরু) নগরীর প্রতিষ্ঠাতা।

অজাতশত্রু: বিম্বিসারের পুত্র, হর্যঙ্ক বংশীয় রাজা। আনুমানিক খৃ-পূ পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মগধের রাজা ছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসারে তিনি পিতৃহন্তা ও প্রথমে অত্যন্ত নিষ্ঠুর শাসক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পোষক ছিলেন। পরে অনুতপ্ত হন ও ভগবান বুদ্ধের শরণ লাভ করেন। জৈনদের মতে তিনি জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। অজাতশত্রু পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। কোশলরাজ প্রোসেনজিতের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয় এবং প্রোসেনজিৎ স্বীয় কন্যার সঙ্গে অজাতশত্রুর বিবাহ দিয়ে ও যৌতুকস্বরূপ কাশী দান করে সন্ধি স্থাপন করেন। অজাতশত্রুর পরাক্রমে মগধ সাম্রাজ্য বিশাল আকার ধারণ করে।

অজিতসিংহ (রাঠোর): যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহের ১৬৭৮ খৃ অকস্মাৎ মৃত্যু হলে মোগলসম্রাট ঔরংজেব তাঁর রাজ্য জয় করে নেন এবং ছত্রিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে যশোবন্ত সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রসিংহকে যোধপুরের রাজা রূপে স্বীকৃতি দেন। কিন্তু যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে তাঁর পুত্র অজিত সিংহের জন্ম হলে যোধপুরবাসীরা অজিত সিংহকে যোধপুরের রাণা বলে স্বীকৃতি দানের জন্য ঔরংজেবের কাছে দাবি জানান। কিন্তু ঔরংজেব বলেন যে, অজিত সিংহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তবে তিনি তাঁদের দাবি স্বীকার করবেন। ঐ প্রস্তাবে অজিত সিংহের রাঠোর সমর্থক-গণ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে এবং দুর্গাদাসের নেতৃত্বে অস্ত্রবলে যোধপুর জয়ের জন্য মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মেবারের রাণা রাজ-

সিংহও ঐ যুদ্ধে দুর্গাদাসের সঙ্গে যোগ দেন। ঔরংজেবের জীবদ্দশায় ঐ যুদ্ধের মীমাংসা হয় না। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম বাহাদুর শাহ অজিত সিংহকে যোধপুরের রাজা-রূপে স্বীকৃতি দেন। ১৭১৪ খৃ অজিত সিংহের কন্যার সঙ্গে মোগল সম্রাটের বিবাহ হয়। তিনি তাঁর পুত্র ভক্ত সিংহের হাতে নিহত হন।

অণহিল পাটক : বর্তমান গুজরাত রাজ্যের অন্তর্গত, আমেদাবাদ শহরের অদূরে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর। বর্তমান নাম পাটন। ৭৪৫ খৃ চবোৎকট চোপড়া জাতির রাজা বনরাজ নগরী-টির পত্তন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত নগরীটি গুজরাত প্রদেশের প্রধান নগরী ও রাজধানী ছিল। ১২৯৭ খৃ আলাউদ্দিন খলজি বাঘেল বংশীয় রাজা কর্ণকে পরাজিত করে অণহিল পাটক অধিকার করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনায় অণহিল পাটক দিল্লীর শাসন-মুক্ত হয় ও মুজাফফর শাহ স্বাধীন সুলতানরূপে ঐ নগরী ও তৎসংলগ্ন রাজ্য শাসন করেন। তাঁর মৃত্যু হলে (১৪০৮) পুত্র প্রথম আহমেদ ১৪১২ খৃ সাবরমতী তীরে তাঁর নামানুসারে আহমেদাবাদ শহরের পত্তন করেন ও অণহিল পাটক থেকে সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

অতীশ দীপঙ্কর : তিব্বতী আখ্যান অনুসারে অতীশ দীপঙ্কর বিক্রমণিপুর-রাজ কল্যাণশ্রীর পুত্র। বিক্রমণিপুর সম্ভবত পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি ভারতের বিভিন্ন বিহার ও ভারতের বাইরে সিংহল, সুবর্ণদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণ করেন। পরে তিব্বতরাজ জ্ঞানপ্রভর আমন্ত্রণে ১০৪০ খৃ তিনি তিব্বতে যান। তিব্বতে অতীশ দীপঙ্কর ভগবান বুদ্ধের অবতার রূপে পূজিত হন। তিব্বতী ভাষায় লিখিত অথবা অনূদিত তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের লিপি পাওয়া গেছে। তিনি গেলুক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

অথর্ববেদ : চার বেদের শেষ খণ্ড। অথর্ব ঋষির নামানুসারে এর নাম অথর্ববেদ, কারণ তিনি এই বেদখণ্ডের প্রধান সঙ্কলয়িতা। অপর দুই সঙ্ক-লয়িতা অঙ্গিরা ও ভৃগুর নামেও এই বেদ অথর্বাঙ্গিরস বেদ এবং ভৃগ্বঙ্গিরো বেদ নামে অভিহিত হয়। অথর্ববেদের সূক্তগুলি পদ্য, গদ্য ও গীতি এই ত্রিবিধ ছাঁদে লিখিত হয়েছে। অথর্ববেদ ব্রহ্মবেদ নামেও পরিচিত। দৈনন্দিন জীবনে অথর্ববেদের মন্ত্রগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নানা রোগের চিকিৎসা, শত্রুবিনাশ, পররাষ্ট্রের উৎসাদন, মারণ, উচাটন, বশীকরণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে মন্ত্র অথর্ববেদে সংকলিত আছে। আধ্যাত্মিক মন্ত্রের সংখ্যাও অথর্ববেদে কম নয়।

অথর্ববেদে ঋগ্‌বেদের বহু মন্ত্র আছে। অনেকের মতে বেদ তিন খণ্ডে বিভক্ত এবং অথর্ববেদ তার অন্ত-র্ভুক্ত নয়। পাণিনি এই মতের সমর্থক এবং সে কারণে তিনি বেদকে বলেন 'ত্রয়ী' (বেদ-দ্রষ্টব্য)।

অধীনতামূলক মিত্রতা : ভারতে ইংরেজ শাসনকালে গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি প্রবর্তিত নীতি। ঐ নীতিতে বলা হয় যে, যে সকল রাজ্য

ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হবে, সেই সকল রাজ্যকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণ থেকে ইংরেজ সরকার রক্ষা করবে। তবে ঐ রাজ্যগুলির নিজস্ব কোন পররাষ্ট্র নীতি থাকতে পারবে না এবং ইংরেজ সরকার-নির্দিষ্ট কতকগুলি বিধিনিষেধ তাদের মেনে চলতে হবে। ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে ঐ রাজ্যগুলিতে একজন করে রেসিডেন্ট থাকবেন এবং রাজ্যরক্ষার জন্য ইংরেজ সরকারের যে সৈন্যবাহিনী ঐসব রাজ্যে থাকবে তার ব্যয়ভারও রাজ্যগুলিকে বহন করতে হবে। হায়দরাবাদের নিজাম সর্বপ্রথম অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করেন (লর্ড ওয়েলেসলি-দ্র)।

অনন্তবর্ম-চোড়গঙ্গ : উৎকলদেশজয়ী পূর্বগঙ্গ বংশীয় নৃপতি। প্রায় সত্তর বছর (আনুমানিক ১০৭৬-১১৪৮ খৃ) রাজত্ব করেন ও চোল, চালুক্য ও পালবংশীয় রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিশাল রাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁর রাজত্বকালে পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনশন : রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে অনশন একটি দীর্ঘানুসৃত রীতি। বিপ্লবী যতীন দাস রাজবন্দীদের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে ১৯২৯ খৃ লাহোর সেন্ট্রাল জেলে অনশন সুরু করেন ও ৬৫ দিন অনশনের পর মৃত্যু বরণ করেন। মহাত্মা গান্ধী বিভিন্ন সময়ে নানা রাজনৈতিক অন্যায়ের প্রতিবাদে অনশন করেন। অনশন প্রকৃতপক্ষে নৈতিক প্রতিবাদ এবং প্রতিপক্ষের মনুষ্যত্ববোধের কাছেই তার আবেদন।

অনার্য : একটি নেতিবাচক শব্দ, যার অর্থ আর্য নয়। ভারতে আর্যদের আসার আগে যাদের বাস ছিল, তাদেরই শ্রেণী-জাতি নির্বিশেষে সমষ্টিগত ভাবে অনার্য বলা হয়। সুতরাং অনার্য বলতে বিশেষ কোন জাতিকে বোঝায় না এবং প্রাক-আর্য যুগের অনার্যদের সভ্যতার মানও একই ছিল না। আর্যদের ভারতে আসার আগে মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানে যে সব সভ্যতা গড়ে ওঠে তা পৃথিবীর যে কোন প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে তুলনীয়। আবার সাঁওতাল, কোল, ভীল, মুণ্ডা, খাসি, নাগা প্রভৃতি প্রাক আর্য ভারতীয় খণ্ড-জাতিগুলি আর্যদের ভারত আগমনের অনেক পরেও সভ্যতার প্রায় প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থিত ছিল।

প্রাচীন প্রস্তরযুগে, নব্যপ্রস্তর যুগে যারা ভারতে বাস করত তাদের জীবন যাত্রার কিছুটা পরিচয় মেলে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন কালের গুহাচিত্র থেকে। তারা পাথরের তৈরী অস্ত্র দিয়ে পশু হত্যা করত ও কাঁচা মাংস খেতো; আগুনের ব্যবহার, কৃষি, গৃহনির্মাণ, ধাতুর ব্যবহার তাদের অজানা ছিল। ক্রমে ঐ সব জাতি সভ্য হয়ে ওঠে ও সিন্ধু নদীর উপত্যকায়, দাক্ষিণাত্যে ও অন্যান্য বহু স্থানে উন্নত জনপদ গড়ে তোলে।

আর্যরা অনার্যদের পরাজিত করে ও অনার্য সভ্যতা ধ্বংস করে। যে সব অনার্য জাতি আর্যদের বশ্যতা স্বীকার

করে তারা আর্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পরবর্তীকালে শূদ্র নামে পরিচিত হয়। অনেক অনার্য জাতি আত্মরক্ষার জন্য পর্বতে আশ্রয় নেয় ও সেই থেকে তারা হয় পার্বত্য উপজাতি; বৈদিক সাহিত্যে অনার্যরা দাস, দস্যু, নিষাদ, বানর, শূদ্র, কিরাত প্রভৃতি নামে উল্লেখিত। আর্যদের প্রচারের জন্যই পরবর্তীকালের মানুষ অনার্যদের অসভ্য বলে জানে। কিন্তু তা যে সত্য নয়, সিন্ধু ও দ্রাবিড় সভ্যতা তার প্রমাণ। উত্তরভারতে অনার্যরা আর্যদের সভ্যতা, ভাষা, ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় জাতি মোটামুটিভাবে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখে। দক্ষিণ ভারতের ভাষাগুলি মূলত অনার্য ভাষা, তবে বহু পরিমাণে আর্য প্রভাবিত। অনুরূপভাবে বহু অনার্য শব্দও আর্যভাষায় মিশে গেছে।

অনুশীলন সমিতি: বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠন; ১৯০২ খৃ কলকাতায় গঠিত হয়। দল গঠনের প্রধান উদ্যোগীদের মধ্যে ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু, শশিভূষণ রায়চৌধুরী ব্যারিষ্টার পি মিত্র যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (নিরালম্ব স্বামী) প্রভৃতি। নিরালম্ব স্বামী বরদায় গিয়ে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। পূর্ববঙ্গে সমিতির কার্যকলাপ বিস্তারের জন্য ১৯০৫ খৃ পুলিন দাসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। ঐ একই সময়ে কলকাতায় আত্ম উন্নয়ন সমিতি, বরিশালে বান্ধব সমিতি, ময়মনসিংহে সুহৃদ ও সাধনা সমিতি, খুলনা ও ফরিদপুরে ব্রতী সমিতি নামে যে সংগঠনগুলি গড়ে ওঠে সেগুলির দৈনন্দিন কাজকর্ম শরীর চর্চা, লাঠি খেলা, অসিচালনা শিক্ষা হলেও বৈপ্লবিক আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতিই তাদের মূল লক্ষ্য ছিল। ঐ সংস্থাগুলির সংগে অনুশীলন সমিতির নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ঐ সময় বাঙলায় বিভিন্ন স্থানে একই উদ্দেশ্যে আনন্দমঠের অনুকরণে অনেকগুলি আশ্রম গড়ে ওঠে এবং সকলেরই লক্ষ্য ছিল অস্ত্রের আঘাতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানো। অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বে বাঙলায় বিভিন্ন স্থানে বহু বৈপ্লবিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।

অন্ধকূপ হত্যা: ১৭৫৬ খৃ ২০ জুন সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ আক্রমণ করলে ইংরেজরা কিছুক্ষণ বাধা দেওয়ার পর সে দুর্গ ত্যাগ করে ফলতায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। ঐ সময় আহত ইংরেজ সৈন্যদের দুর্গের একটি কক্ষে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। রাত্রে আহতদের কয়েকজন মারা গেলে হলওয়েল নামে একজন ইংরেজ রাজকর্মচারী অন্ধকূপ হত্যার কল্পিত কাহিনী প্রচার করেন। বলা হয় যে, ঐ রাত্রে ১৪৬ জন আহত ইংরেজকে ৮ ফুট × ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি আয়তনের একটি ঘরে বন্দী রাখা হয়। ফলে ঐ রাত্রেই ১২৩জন আহত বন্দীর শ্বাসরোধে মৃত্যু হয়।

নবাব সিরাজের কুৎসা প্রচারের জন্যই ঐ কাহিনীর সৃষ্টি করা হয়। আধুনিককালের ঐতিহাসিকরা এবিষয়ে একমত যে ঐ আটক রাখার ব্যাপারে সিরাজ কিছুই জানতেন না। আর আহতদের মৃত্যুর সংখ্যাও অত বেশি

ছিল না। আর সবচেয়ে বড় কথা, হলওয়েল প্রচারিত কাহিনীতে ঘরের যে আয়তন বলা হয়েছে তাতে কোন ভাবেই ১৪৬ জনের স্থান সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব নয়।

নিহত ব্যক্তিদের স্মৃতিস্তম্ভরূপে কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারে একটি ছোট মিনার ছিল। তার নাম ছিল হলওয়েল মনুমেন্ট। ১৯৪০ খৃ সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের ফলে ঐ মনুমেন্ট অপসারিত হয়।

অন্ধ্র প্রদেশ: সম্রাট অশোকের একটি লিপিতে মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জাতিগুলির মধ্যে অন্ধ্রজাতির উল্লেখ আছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের অধিবাসীরা 'অন্ধ্র নামে পরিচিত। অন্ধ্রজাতির ভাষা তেলুগু, সে কারণে তারা তেলুগু, তিলিঙ্গা, তেলেঙ্গি প্রভৃতি নামেও পরিচিত। ১৫৩৭ খৃ এক তাম্রশাসনে লেখা আছে মহারাষ্ট্রের পূর্বে, কাণাকুব্জের দক্ষিণে কলিঙ্গের পশ্চিমে ও পাণ্ড্য দেশের উত্তরে তিলিঙ্গদেশ অবস্থিত।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত অন্ধ্র দেশ হিন্দুরাজাদের শাসনাধীন ছিল। ঐ সময় যেসব হিন্দু রাজবংশ অন্ধ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে রাজত্ব করে তার মধ্যে সাতবাহন, পল্লব শালঙ্কায়ন, চালুক্য, চোল, কাকতীয় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ১৩২৩ খৃ অন্ধ্রদেশের কাকতীয় রাজ্য দিল্লীর তোগলক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে দিল্লীর সুলতানশাহির দুর্বলতার সুযোগে অন্ধ্র দেশে আবার কয়েকটি হিন্দুরাজ্য প্রবল হয়ে ওঠে। চতুর্দশ শতাব্দীতে বেল্লারি জেলার বিজয়নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক বিজয়নগর রাজ্য। কর্ণাটক ও অন্ধ্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৫৬৫ খৃ দাক্ষিণাত্যের চারটি মুস্লিম রাজ্যের সম্মিলিত অভ্যুত্থানে বিজয়নগর রাজ্যের পতন হয়। উত্তর অন্ধ্র দেশে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন আলাউদ্দিন বহমান শাহ।

১৭০০ খৃ আসফজাহ্ নামে এক ব্যক্তি মোগল সম্রাট ঔরংজেব কর্তৃক বিজয়পুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সম্রাট ঔরংজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বজনিত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ১৭২৪ খৃ তিনি স্বাধীন হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর তখন উপাধি হয় নিজাম। ঐ নিজাম রাজ্যের একটি বড় অংশ ছিল তেলুগুভাষী এবং সে অংশটির নাম ছিল তেলেঙ্গানা।

১৯৪৭ খৃ ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন তেলুগুভাষী বৃহত্তর অঞ্চল ছিল তৎকালের মাদ্রাজ প্রদেশের অভ্যন্তরে। অনতিবিলম্বে ভাষার ভিত্তিতে অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্গঠনের দাবি ওঠে এবং সেই দাবি মতো ১৯৫৩ সালের ১ অক্টোবর মাদ্রাজের তেলুগুভাষী জেলাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন করা হয়। তারপর ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির সুপারিশ অনুসারে হায়দরাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চল অন্ধ্রপ্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করে বিশাল

অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন করা হয়। হায়দারাবাদ শহর হয় অন্ধ্র প্রদেশের নতুন রাজধানী। বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশের আয়তন ২, ৭৬, ৮১৪ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা সাড়ে চার কোটি। এটি ভারতের পঞ্চম বৃহত্তম রাজ্য।

অপরান্ত : দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে, বর্তমান গোয়ার একটি প্রাচীন জাতি ও জনপদের নাম। পুরাণ, রঘুবংশ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে অপরান্ত জাতি ও সভ্যতার উল্লেখ আছে।

অবন্তি : প্রাচীন ভারতের একটি সুসভ্য জাতি ও তার বাসভূমির নাম। সিপ্রা নদীর তীরবর্তী ঐ রাজ্যের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। অবন্তি রাজ্যটি সপ্তম শতাব্দীর পর মালব নামে পরিচিত হয়। অবন্তি ষোড়শ মহাজনপদের একটি।

অবন্তীপুর : কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক স্থান। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উৎপলবংশীয় রাজা অবন্তীবর্মা (রাজত্বকাল ৮৫৫-৮৩) খৃ) তাঁর নামানুসারে এই নগরীর পত্তন করে সেখানে রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। অবন্তীপুর সে সময় বাণিজ্যকেন্দ্র রূপেও প্রসিদ্ধ ছিল। অবন্তীপুরে খননকার্যের ফলে অবন্তীবর্মার রাজত্বকালে নির্মিত অবন্তীশ্বর শিবমন্দির ও অবন্তীস্বামী বিষ্ণুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।

অব্দ : খৃষ্টযুগের আগে ভারতে সুনির্দিষ্ট সন তারিখ ব্যবহারের রীতি সুপ্রচলিত ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা তাঁদের রাজত্বকালে যে সব 'অব্দ' প্রচলিত করেন তা কোন সময়েই সমগ্র ভারতে যুগপৎ স্বীকৃতি লাভ করেনি। প্রকৃতপক্ষে সন তারিখ সম্পর্কে প্রাচীন ভারতের উদাসীনতার জন্য আজও বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঠিক কাল নির্ধারণ সম্ভব হয় নি। যেমন, ভগবান বুদ্ধের জন্মক্ষণ, সম্রাট অশোক, সম্রাট কণিষ্ক প্রমুখ বিশিষ্ট নৃপতিদের সিংহাসনারোহণ কাল, গুপ্তযুগের সূচনা, মহাকবি কালিদাসের যুগ প্রভৃতি বিষয়েও ভারত তত্ত্ববিদরা একমত নন।

বিভিন্ন কালে ভারতে যে সব অব্দ প্রচলিত হয় তার কয়েকটির ইতিহাস ও সম্ভাব্য প্রবর্তনকাল নিম্নে উল্লেখিত হল।

বিক্রমাব্দ (৫৮ খৃ·পূ) : প্রচলিত কাহিনী অনুসারে এই অব্দ প্রবর্তন করেন শকারি বিক্রমাদিত্য, যিনি শক বিতাড়নের ঐতিহাসিক ঘটনা চিরস্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে তৎকাল থেকে বিক্রমাব্দ প্রবর্তিত করেন। কিন্তু এই তথ্য অনৈতিহাসিক। কারণ,শকআক্রমণ প্রতিহত করেন গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যিনি 'শকারি' ও 'বিক্রমাদিত্য' নামেও খ্যাত। কিন্তু তাঁর শাসনকাল প্রচলিত বিক্রমাব্দের প্রায় চার শতাব্দী পরের ঘটনা। বিক্রমাব্দ উত্তর ভারতে প্রচলিত। প্রাচীন কালে বিক্রমাব্দ শুরু হত কার্তিক মাসে, কিন্তু মধ্যযুগে তা পরিবর্তিত হয়ে হয় চৈত্র মাস।

শকাব্দ (৭৮ খৃ) : সম্ভবত সম্রাট কণিষ্কের সিংহাসনারোহণ কাল থেকে

শকাব্দ প্রবর্তিত হয়। কিন্তু তার কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই। সম্রাট কণিষ্ক আরও কয়েক দশক পরে সিংহাসন লাভ করেন বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। মালব ও গুজরাত অঞ্চলে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে শকাব্দ প্রচলিত থাকার প্রমাণ মেলে। পরে দাক্ষিণাত্যেও শকাব্দ প্রচলিত হয় এবং দাক্ষিণাত্য থেকে যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়।

কলচুরি অব্দ (২৪৮ খৃ): মুস্লিম আক্রমণকাল পর্যন্ত মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে এই অব্দ প্রচলিত ছিল।

গুপ্তাব্দ (৩২০ খৃ): সম্ভবত গুপ্ত বংশীয় সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তাব্দের প্রবর্তক। গুপ্ত সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হওয়ার কয়েক শতাব্দী পরও গুপ্তাব্দ উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ছিল।

হর্ষাব্দ (৬০৬ খৃ): সম্রাট হর্ষবর্ধন প্রবর্তিত এই অব্দ তাঁর মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পরও উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল।

বঙ্গাব্দ (১৫৫৬ খৃ): বঙ্গদেশে মুস্লিম শাসনকালে হিজিরা অব্দ প্রবর্তিত হয়। হিজিরা অব্দ গণনা সুরু হয় ৬২২ খৃ ১৬ জুলাই, হজরৎ মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়ার স্মারক রূপে। কিন্তু মুস্লিম বর্ষ গণনা হয় চান্দ্র মাস অনুসারে তাই তা পূর্ণ হয় ৩৫৪ দিনে। তাতে যে কোন সময় বছর শুরু হয়। তাতে রাজকার্যে অসুবিধা ঘটতে থাকায় সম্রাট আকবর ১৫৫৬ খৃ ৩৬৫ দিনের সৌর বছর প্রবর্তন করেন এবং ৯৬৩ হিজিরা বর্ষ থেকেই তার গণনা শুরু হয়। পরবর্তীকালে ভারতের অন্যান্য স্থানে ঐ বর্ষ গণনা অপ্রচলিত হলেও বঙ্গদেশে তা বঙ্গাব্দ নামে প্রচলিত থাকে।

এছাড়া বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন কালে আরও বহু অব্দ প্রচলিত ছিল। যেমন বঙ্গদেশে ছিল লক্ষ্মণাব্দ (১১১৯ খৃ), মধ্যযুগে কাশ্মীরে ছিল সপ্তর্ষি বা লৌকিক অব্দ, কেরালে কোল্লম অব্দ (৮২৫ খৃ) প্রভৃতি।

অভিনব গুপ্ত: নানা শাস্ত্রে পারদর্শী কাশ্মীরী পণ্ডিত। অভিনব গুপ্তর জন্ম হয় খৃষ্টীয় ৯৫০-৬০ সালের মধ্যে। তাঁর সর্বাধিক খ্যাতি অলংকার শাস্ত্রবিদ রূপে। আনন্দবর্ধন প্রচারিত রসতত্ত্বকে তিনি একটি সুনির্দিষ্ট দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

অভিনব ভারত সোসাইটি: মহারাষ্ট্রে গঠিত ভারতের প্রথম সন্ত্রাসবাদী দল। ঐ দলের নেতা ছিলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর ও তাঁর ভাই গণেশ দামোদর সাভারকর। বোম্বাই নাসিক, গোয়ালিয়র, সাতারা প্রভৃতি স্থানে দলের শাখা ছিল। ১৯০৯ সালে বিনায়ক সাভারকর লণ্ডন থেকে তাঁর ভাই গণেশ সাভারকরের কাছে কুড়িটি স্বয়ংক্রিয় ব্রাউনিং পিস্তল পাঠান। কিন্তু ঐ পিস্তলের পার্সেল পৌঁছানোর আগেই গণেশ সাভারকর ধরা পড়েন। গণেশ সাভারকরের গ্রেপ্তারকারী, নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসন ১৯০৯ সালের ২১ ডিসেম্বর অভিনব ভারত সোসাইটির বিপ্লবী সদস্যদের হাতে নিহত হন। ঐ হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে ৩৮ জনকে

গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারে তিনজনের ফাঁসি ও ২৭ জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড হয়। ঐ হত্যাকাণ্ডের মামলা নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। রাজদ্রোহিতার অভিযোগে গণেশ সাভারকরের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

অমরদাস (১৫০৯-৭৪) : শিখজাতির তৃতীয় ধর্মগুরু।

অমর সিংহ : মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৫৯৭ খৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৯৯ খৃ মোগল সেনাপতি মানসিংহের কাছে পরাজিত হন। কিন্তু ১৬১৫ খৃ পর্যন্ত দিল্লীর মোগল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেন না। সম্রাট জাহাঙ্গিরের সেনাবাহিনী উল্লেখিত বর্ষে মেবার অবরোধ করে অমর সিংহকে আত্ম সমর্পণে বাধ্য করে। অমরসিংহ পিতার মতোই স্বাধীনচেতা ছিলেন।

অমরাবতী : অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলায় কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। প্রাচীন নাম ধান্যকটক, বর্তমানে ধরণিকোট। এখানে খননকার্যের ফলে খৃ পূ তৃতীয়-দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ ও ও হিন্দু সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানকার মূল বৌদ্ধ স্তূপটি খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত হয়।

অমৃতসর : বর্তমান পাঞ্জাব রাজ্যের একটি জেলা ও জেলা সদর এবং শিখদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। চতুর্থ শিখগুরু রামদাসকে সম্রাট আকবর প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ১৫৭৭ খৃ যে পুষ্করিণীসহ একখণ্ড জমি দান করেন, সেখানেই অমৃতসর শহরের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ পুষ্করিণী থেকেই 'অমৃতসর' (অমৃত সরোবর) নামের সৃষ্টি। গুরু রামদাসের পুত্র, পঞ্চম শিখগুরু অর্জুনদেব অমৃত সরোবরের মধ্যস্থলে ইতিহাসখ্যাত হরি মন্দির নির্মাণ করেন। হরিমন্দিরকে কেন্দ্র করেই অমৃতসর শহরের সৃষ্টি।

শিখ তীর্থক্ষেত্র অমৃতসর ও তার হরিমন্দির পরবর্তীকালে নাদির শাহ, আহমেদশাহ আবদালি ও তাঁর পুত্র কর্তৃক বারবার আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়। ১৭৬২ খৃ আহমেদ শাহ আবদালি তোপের আঘাতে মন্দিরটি বিধ্বস্ত করেন, পুকুরটি ভরাট করে দেন এবং গোহত্যা করে স্থানটিকে কলুষিত করেন। কিন্তু পরের বছরেই শিখরা আবার ঐ স্থানে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে ও একই স্থানে মন্দিরটি পুনর্নির্মিত হয়। অমৃতসর ১৮০৫ খৃ রণজিৎ সিংহের অধিকারে ও ১৮৪৯ খৃ ইংরেজ অধিকারে যায়। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে অমৃতসরের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অমৃতসর হরিমন্দিরের অদূরে জালিয়ানওয়ালাবাগে ১৯১৯ খৃ একটি সভায় ইংরেজ সরকার গুলি চালিয়ে যে কয়েকশত নরনারীকে হত্যা করে ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে সেইটিই সর্বাধিক নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক ঘটনা।

অমৃতসরের সন্ধি : ইংরেজ সরকার ও পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের মধ্যে ১৮০৯ খৃ ২৪ এপ্রিল স্বাক্ষরিত সন্ধি। ঐ সন্ধিতে রণজিৎ সিংহ শতদ্রু নদীর

পুর্বপারে শিখ সাম্রাজ্য বিস্তার না করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

অমোঘবর্ষ : দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটবংশীয় তিনজন রাজা 'অমোঘবর্ষ' নামে অভিহিত হন। তাঁদের মধ্যে রাষ্ট্রকূটের রাজা তৃতীয় গোবিন্দর পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ (আনুমানিক ৮১৪-৭৮ খৃ) সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ধর্মানুরাগী রাজা ছিলেন এবং জৈন, হিন্দু উভয় ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সুলেখকরূপে অমোঘবর্ষ খ্যাত ছিলেন। 'কবিরাজমার্গ' সম্ভবত তাঁরই রচনা। আরব পরিব্রাজক সুলেমান অমোঘবর্ষকে বিশ্বের চারজন শ্রেষ্ঠ নৃপতির একজন বলে উল্লেখ করেছেন।

অম্বর : জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। দ্বাদশ শতাব্দীর সূচনা থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অম্বর জয়পুর রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৭২৮ খৃ জয়পুর শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। রাজপুত শিল্প ও চিত্রকলার জন্য অম্বরের রাজপ্রসাদ প্রসিদ্ধ।

অম্বর, মালিক (১৫৪৯-১৬২০): হাবসি বংশীয় ক্রীতদাস, স্বীয় প্রতিভা ও শৌর্যবলে আহমেদনগর অঞ্চলে বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৬০০ খৃ মোগল সম্রাট আকবর আহম্মদনগর অধিকার করলে মালিক অম্বর সামরিকভাবে পরাজয় স্বীকার করেন, কিন্তু অল্পকাল পরেই আবার তিনি আহম্মদনগর জয় করেন এবং দ্বিতীয় মুরতাজা-নিজাম শাহকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের প্রকৃত শাসকরূপে শাসনকার্য চালাতে থাকেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী ছিল সুশৃঙ্খল ও বিশেষ রণপটু।

মালিক অম্বর যেমন যুদ্ধে পারদর্শিতা দেখান, শাসন কার্যেও তেমনই যোগ্যতার পরিচয় দেন। ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন উদার দৃষ্টিসম্পন্ন এবং প্রজাকল্যাণ ছিল তাঁর শাসনের মূল লক্ষ্য। আহম্মদনগরকে তিনি একটি সুরম্য নগরীরূপে গড়ে তোলেন।

অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১-১৯২২): জাতীয়তাবাদী নেতা। ১৯০৫ খৃ লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কলকাতা টাউন হলে প্রথম যে সভা হয় তাতে পৌরোহিত্য করেন। ১৮৯৯ ও ১৯১০ খৃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মলনে সভাপতি হন। ১৯১৭ খৃ লখ্‌নৌ শহরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

অম্ভি : সম্রাট আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে (৩২৬ খৃ-পূ) উত্তর ভারতে তক্ষশিলা রাজ্যের রাজা ছিলেন। আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তিনি আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেন। উপরন্তু আলেকজাণ্ডার পুরুর রাজ্য আক্রমণ করলে তিনি পুরুর বিরুদ্ধে আলেকজাণ্ডারকে সব রকমে সাহায্য করেন। আলেকজাণ্ডার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে তাঁর ভারতে অধিকৃত রাজ্যের একাংশের শাসন দায়িত্ব অম্ভির উপর ন্যস্ত করেন।

অযোধ্যা : বর্তমান উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় শহর।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, অথর্ববেদ, রামায়ণ ও আরও অনেক পুরাণগ্রন্থে অযোধ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। অযোধ্য একটি প্রাচীন রাজ্যেরও নাম, যা কোশল নামেও পরিচিত ছিল। গুপ্ত বংশীয় সম্রাটদের শাসনকালে অযোধ্যা একটি বিখ্যাত শহর ছিল। পরে অযোধ্যা যখন হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউ এন সাং ঐ শহর পরিদর্শন করেন। হিউ এন সাং-এর বিবরণী অনুসারে সে সময় অযোধ্য ছিল বৌদ্ধ প্রধান শহর। ১১৯৩ খৃ গাড়োয়াল বংশীয় রাজা জয়চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হলে অযোধ্যা প্রথম মুস্লিম অধিকারে আসে। তখন থেকে অযোধ্যা অবধ নামে অধিক পরিচিত হয়। ১৮৫৬ খৃ লর্ড ডালহৌসি অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি শাহকে রাজ্যচ্যুত করে অযোধ্যাকে ইংরেজ শাসনাধীনে আনেন: তখন অযোধ্যার নাম হয় 'আউধ'। ১৮৫৭ খৃ সিপাহি বিদ্রোহে অযোধ্যার ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অযোধ্যায় রামায়ণ কাহিনীর ঐতিহ্যবাহী অনেক মন্দির আছে।

ইংরেজ শাসনকালে উত্তর প্রদেশের নাম ছিল যুক্তপ্রদেশ। সে যুক্তপ্রদেশ গঠিত ছিল আগ্রা ও অযোধ্যা —এই দুই প্রদেশ নিয়ে। অযোধ্যা হিন্দু, বৌদ্ধ জৈন, মুস্লিম, শিখ সকল ধর্মাবলম্বীর তীর্থক্ষেত্র।

অযোধ্যায় নবাব শাসন: অযোধ্যার নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা সাদাৎ খাঁ ছিলেন পারস্যের অন্তর্গত নিশাপুরের অধিবাসী। ভারতে ভাগ্যান্বেষণে আসেন এবং স্বীয় যোগ্যতাবলে মোগল রাজদরবারে উচ্চ পদ লাভ করেন। ১৭২০ খৃ হিন্দাউন ও বায়ানার ফৌজদার নিযুক্ত হন; তারপর আগ্রার শাসন দায়িত্ব লাভ করেন এবং অযোধ্যারও ভারপ্রাপ্ত হন। তখন তাঁর উপাধি হয় বারহান-উল-মুলক। সে সময় দিল্লীর মোগল বাদশাহ ছিলেন মহম্মদ শাহ। মহম্মদ শাহের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সাদাৎ খাঁ কার্যত স্বাধীন নবাবরূপে অযোধ্যার শাসনকার্য চালাতে থাকেন। অযোধ্যার নবাব বংশের এই প্রতিষ্ঠাতার শাসনকাল ১৭২২—৩৯ খৃ। সাদাৎ খাঁ কর্ণালের যুদ্ধে নাদির শাহের হাতে বন্দী হন এবং বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে আত্মহত্যা করেন।

সাদাৎ খাঁর পর অযোধ্যার নবাব হন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আবদুল মনসুর খাঁ, যিনি সফদর জং নামে অধিক পরিচিত। তাঁর শাসনকাল ১৭৩৯-৫৪ খৃ। নাদির শাহকে প্রায় দু কোটি টাকা ভেট দিয়ে সফদর জং অব্যাহতি পান। তিনি অযোধ্যা থেকে ফৈজাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এলাহাবাদ ও রোহিলাখণ্ড তাঁর সময়ে অযোধ্যা সুবার অন্তর্গত হয়।

সফদর জং-এর উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র সুজাউদ্দৌল্লা। তাঁর শাসন কাল ১৭৫৪-৭৫ খৃ। তাঁর শাসন কালে আহমেদ শাহ আবদালি ভারত আক্রমণ করেন এবং পানিপথের প্রান্তরে আহমেদ শাহ আবদালির সঙ্গে মারাঠাদের যে ঐতিহাসিক যুদ্ধ

হয় তাতে সুজাউদ্দৌলা আহমেদশাহ আবদালির পক্ষ নেন। মোগলসম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজয়ের পর সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় নেন। বাঙলার নবাব মির-কাশিমও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজয়ের পর সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় নেন। পরে ঐ তিনজনের সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে ইংরেজদের ১৭৬৪ খৃ যে বক্সারের যুদ্ধ হয় তাতে ঐ ত্রয়ীশক্তি চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। কিন্তু ইংরেজ সরকার সুজাউদ্দৌল্লাকে কারা ও এলাহাবাদ বাদে অযোধ্যার নবাব বলে স্বীকার করে নেন।

সুজাউদ্দৌলার পর অযোধ্যার নবাব হন তাঁর পুত্র আসফুদ্দৌলা। তাঁর শাসনকাল ১৭৭৫-৯৭ খৃ। তিনি ফৈজাবাদ থেকে লখনৌতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৭৭৫ খৃ এক চুক্তিবলে ইংরেজ সরকার আসফুদ্দৌলা-কে তাঁর প্রাপ্য রাজস্বের একটি বড় অংশ থেকে বঞ্চিত করেন। ইংরেজ সরকারের গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস আসফুদ্দৌলার কাছ থেকে যখন তখন চাপ দিয়ে টাকা আদায় করতেন। যার জন্য নিরুপায় আসফু-দ্দৌলা হেষ্টিংসের প্ররোচনায় মাতা ও পিতামহীর কাছ থেকে তাঁদের সঞ্চিত ত্রিশ লক্ষ টাকা আদায় করে কোম্পা-নিকে দেন।

আসফুদ্দৌলার পর অযোধ্যার নবাব হন তাঁর পুত্র ওয়াজির আলি। কিন্তু তৎকালীন গভর্নর জেনারেল স্যার জন শোর তাঁকে অযোধ্যার নবাব বলে স্বীকার না করে আসফুদ্দৌলার ভাই সাদাৎ আলিকে নবাব বলে ঘোষণা করেন। সে কারণে ওয়াজির আলি মসনদে বসার এক বছরের মধ্যেই পদত্যাগে বাধ্য হন (১৭৯৮)। সাদাৎ আলি ইংরেজ সরকারকে সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ এলাহাবাদ দান করেন। সাদাৎ আলির শাসনকাল ১৭৯৮-১৮১৪ খৃ।

তারপর আযোধ্যার নবাব হন যথাক্রমে গাজিউদ্দিন হায়দার (১৮১৪-২৭), নাসিরুদ্দিন হায়দার (১৮২৭-৩৭), আলি শাহ (১৮৩৭-৪২), আমজাদ আলি শাহ (১৮৪২-৪৭) ও ওয়াজির আলি শাহ (১৮৪৭-৫৬)।

দিনে দিনে অযোধ্যার শাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠায় অযোধ্যায় অবস্থানকারী বৃটিশ রেসিডেন্ট কর্নেল স্লিম্যান ও আউটরামের সুপারিশক্রমে গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি নবাব ওয়াজির আলি শাহকে পদচ্যুত করেন ও অযোধ্যা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ওয়াজির আলি শাহকে বছরে বারো লাখ টাকা ভাতা দিয়ে কলকা-তায় নজরবন্দী করে রাখা হয়।

অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০): সাত বছর বয়সে বাবা মা'র সঙ্গে ইংলণ্ডে যান এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যাল-য়ের 'ট্রাইপস' হয়ে ১৮৯৩ খৃ দেশে ফিরে বরদা রাজ্যে চাকরি নেন। সেইখানেই বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা হয় ও ১৯০২ খৃ বাঙলায় বিপ্লবী দল সংগঠনের জন্য ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে পাঠান। তারপর বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে ১৯০৬ সালে নিজেই বাঙলায় চলে আসেন এবং

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সহযোগিতায় 'বন্দে মাতরম' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৭ খৃ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। শেষে কিন্তু সে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পান। তারপর ১৯০৮ সালে তাঁকে আলিপুর বোমার মামলায় জড়িত করা হয়। তাঁর সঙ্গে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন। কিন্তু প্রমাণাভাবে এক বছর বাদে মুক্তি পান। মুক্তিলাভের পর ১৯০৯ খৃ 'কর্মযোগীন্' নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই পত্রিকায় মর্লি-মিন্টো' শাসনসংস্কার না গ্রহণের জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানানো হয়। ঐ আবেদন জানাতে তিনি 'An open letter to my countrymen' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধ লেখার জন্য আবার তাঁকে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হবে, এইরকম একটি সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় তিনি ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগরে পলায়ন করেন। তারপর সেখান থেকে যান অপর ফরাসি উপনিবেশ পণ্ডিচেরিতে। অরবিন্দ ঘোষের রাজনৈতিক জীবনের সেইখানেই পরিসমাপ্তি।

পরবর্তীকালে অধ্যাত্ম চিন্তার জন্য তিনি জগৎখ্যাত হন এবং শ্রীঅরবিন্দ নামে পরিচিতি লাভ করেন।

অরুণাচল প্রদেশ : ভারতের উত্তর পূব সীমান্তে অবস্থিত কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল। আয়তন ৮৩,৫৭৮ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ। ঘন অরণ্য ও পর্বতময় এই অঞ্চলটি পূর্বে নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি (নেফা) নামে পরিচিত ছিল। নেফার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত পলিটিকাল এজেন্ট। ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি নেফাকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রূপান্তরিত করা হয় ও তখনই তার নাম দেওয়া হয় অরুণাচল প্রদেশ।

অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগর। বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ৩০, সকলেই নির্বাচিত। মন্ত্রিসভা বিধানসভার কাছে দায়ী।

অর্জনমল : শিখদের পঞ্চম গুরু এবং 'গ্রন্থসাহেব'-এর সঙ্কলয়িতা। বিদ্রোহী শাহজাদা খসরুকে সমর্থন করার অভিযোগে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গির গুরু অর্জনমলকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অর্জুন : সম্রাট হর্ষবর্ধনের মন্ত্রী। সম্রাটের মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করেন। অপর নাম অরুণাশ্ব। তাঁর রাজত্বকালে তিব্বত ও নেপালের সহায়তায় চীন ভারত আক্রমণ করে, এরূপ একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

অর্জুন : সুলতান মামুদের কনৌজ আক্রমণকালে সেই অঞ্চলের কচ্ছপঘাত বংশীয় রাজপুত রাজা ছিলেন।

অর্থশাস্ত্র : রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে একটি সুপ্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য (তিনি বিষ্ণুগুপ্ত ও কৌটিল্য নামেও অভিহিত) ঐ গ্রন্থের রচয়িতা বলে মনে করা হয়। কিন্তু গ্রন্থটির ভাষা, আলোচিত বিষয়বস্তু ও বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক অবতারণা

সর্বক্ষেত্রে মৌর্যযুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সে কারণে গ্রন্থটির লেখক ও রচনাকাল সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিক-গণ সন্দেহ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটিতে চীনা রেশমের উল্লেখ আছে, কিন্তু মৌর্য যুগে ভারতের সঙ্গে চীনের কোনরূপ যোগাযোগের কথা জানা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা, গ্রন্থটির কোথাও চন্দ্রগুপ্ত বা তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্রের উল্লেখ নেই। তদুপরি গ্রন্থটিতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকেই আদর্শ রাষ্ট্র বলা হয়েছে যদিও চাণক্য ছিলেন বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের মুখ্য মন্ত্রণাদাতা। এইসব কারণে ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে কৌটিল্যের নামে প্রচারিত বিভিন্ন সূত্র ও উপদেশাবলী খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর কোনো এক সময় সঙ্কলিত হয়ে 'অর্থশাস্ত্র নামে প্রকাশিত হয়।

অর্থশাস্ত্র ১৫টি ভাগে (অধিকরণ) বিভক্ত এবং তার মোট শ্লোকসংখ্যা ছয় হাজার। রাজ্যশাসন পদ্ধতি, শত্রুদমন, রাজস্বনীতি, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন, পৌর প্রশাসন প্রভৃতি বিষয় এক একটি অধিকরণে আলোচিত হয়েছে।

অর্থশাস্ত্রের আলোচনা স্পষ্ট, পরস্পর বিরোধিতা নেই বললেই হয়। বিশুদ্ধ রাজতন্ত্রকেই অর্থশাস্ত্রে আদর্শ শাসন ব্যবস্থা বলা হয়েছে এবং জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। প্রশাসন দুর্নীতিমুক্ত রাখার জন্য রাজকর্মচারী নিয়োগকালে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদের ভাল বীজ সার প্রভৃতি সরবরাহের কথা বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, একমাত্র যে জমি চাষ করে শুধু সেই জমি পাবার অধিকারী। কৌটিল্য নারীর বিশেষ অধিকার স্বীকার করেছেন এবং বিবাহ বিচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতির বিধানও অর্থশাস্ত্রে আছে। ব্রাহ্মণের কোন বিশেষ অধিকার অর্থশাস্ত্রে স্বীকৃত হয়নি। অপরাধ অনুসারে ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডের বিধানও ঐ গ্রন্থে আছে।

রাজার রাজ্য শাসন বিষয়ে যে সব বিধি নির্দেশ কৌটিল্য দিয়েছেন তা, আধুনিক কূটনীতির জনক, পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালীয় রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ মেকিয়াভেলির চিন্তাধারার সঙ্গে তুলনীয়।

অর্নোরাজ : চাহমনবংশীয় নৃপতি অজয়রাজের পুত্র অর্নোরাজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আজমিরের শাসক ছিলেন; সাহসী যোদ্ধারূপে খ্যাত।

অল ইণ্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশন : ১৯১৮ খৃ ভারতসচিব মণ্টেগু ও ভারতের বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড যে শাসন সংস্কারের প্রস্তাব করেন তা গ্রহণের প্রশ্ন নিয়ে কংগ্রেসের উদারপন্থী ও চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এ ব্যাপারে নীতি স্থির করার জন্য ১৯১৮ খৃ ২৯ আগষ্ট বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়। নরমপন্থীরা ঐ সম্মেলনে

যোগ দেন না এবং ঐ বছরেই তাঁরা 'অল ইণ্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশন' নামে নতুন একটি দল গঠন করেন। ঐ উদারপন্থীদলের নেতা হন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অলপ্‌তগিন: জাতিতে তুর্কী, ক্রীতদাসরূপে জীবনের সূচনা; পরে গজনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ৯৩৩ খৃ গজনি অধিকার করেন। ৯৬৩ খৃ অলপ্‌তগিনের মৃত্যু হয়। সুলতান মামুদ ঐ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নৃপতি।

অলবিরুনি (৯৭৩-১০৪৮): মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তানে জন্ম, জাতিতে পারশিক এবং তুর্কি-প্রভাবিত ফার্সি ছিল তাঁর মাতৃভাষা। গজনির সুলতান মামুদের কাছে প্রথমে বন্দীরূপে নীত হন, পরে গুণগ্রাহী সম্রাটের অনুগ্রহে ভারতে আসেন এবং এ দেশের নানা ভাষা, শাস্ত্র বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর আরবি ভাষায় লেখা ভারতের ইতিহাস 'তারিখ-উল-হিন্দ' একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। অলবিরুনি ছিলেন মুক্ত মনের এক মহাপণ্ডিত ও ভারত-তত্ত্ববিদ। দশম ও একাদশ শতাব্দীর ভারতের হিন্দুদের দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞানচিন্তা, আইন ভাবনা, সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্ম পূজা পার্বণাদি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন তিনি তাঁর ৭৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত বিশাল গ্রন্থটিতে। হিন্দুদের মধ্যে তখনই যেসব কুসংস্কার প্রবেশ করে তারও কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন অলবিরুনি। মুস্লিম যুগের সূচনাকালে ভারতের ইতিহাস জানতে অলবিরুনির ভারত বৃত্তান্ত পাঠ অপরিহার্য।

অশোক (৩০২-২৩২ খৃ-পূ): মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র, নৃপতি বিন্দুসারের পুত্র অশোক মৌর্যবংশীয় তৃতীয় সম্রাট। পিতার জীবিতকালে তিনি তক্ষশিলা ও উজ্জয়িনীর শাসকরূপে যথেষ্ট প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ২৭৩ খৃ-পূ বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ শুরু হওয়ায় সম্রাট অশোকের সিংহাসনা-রোহণের প্রায় চার বছর পরে তাঁর অভিষেক হয়। বৌদ্ধ কাহিনী অনুসারে সম্রাট অশোক নাকি তাঁর সিংহাসন নিরাপদ করার জন্য নিরানব্বুই জন ভাইকে হত্যা করেছিলেন, এবং সেই নিষ্ঠুর কার্যকলাপের জন্য অশোক তখন চণ্ডাশোক নামে অভিহিত হন। তবে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ ভি. এ. স্মিথ ঐ কাহিনী সত্য বলে মনে করেন না।

সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সম্রাট অশোক ২৬১ খৃ-পূ কলিঙ্গ রাজ্য জয়ে অগ্রসর হন। কলিঙ্গ সেনাবাহিনী সম্রাট অশোকের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে দারুণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে পরাজয় বরণ করে। সম্রাট অশোকের সমকালীন এক শিলালিপিতে লিখিত আছে যে ঐ যুদ্ধে দেড় লক্ষ সৈন্য বন্দী হয়, এক লক্ষ সৈন্য রণক্ষেত্রে নিহত হয় এবং তারও কয়েক গুণ মানুষ অন্যান্য কারণে মারা যায়। ঐ হত্যাকাণ্ড, রক্তস্রোত ও কলিঙ্গবাসীদের দুর্দশা সম্রাট অশোকের হৃদয়কে গভীর দুঃখ, বেদনা

ও অনুশোচনায় পূর্ণ করে, আর তারই ফলে তাঁর চরিত্রে আসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে পরিণত হন ও চিরকালের জন্য অস্ত্র ত্যাগ করেন। তিনি হৃদয়বলে সারা ভারতের তথা বহির্বিশ্বের সকলকে আপন করার সঙ্কল্প নেন। অস্ত্রবলে দিগ্‌বিজয় ত্যাগ করে তিনি গ্রহণ করেন ধর্মবিজয়ের পথ। কলিঙ্গ অভিযানের পূর্বে সম্রাট অশোক ছিলেন শিবভক্ত, এবার তিনি নিলেন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা।

শিকার, বিলাসভ্রমণ, জলসা প্রভৃতি সব ত্যাগ করে সম্রাট অশোক সন্ন্যাসীরূপে জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করলেন। সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রশাসনের মূল মন্ত্র হল—হৃদয়হীন শাসন নয়, সেবা —আক্রমণে নয়, ভালবাসায় অন্যের হৃদয় জয়। পথঘাট নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, সেবানিকেতন প্রতিষ্ঠা, পশুপক্ষীর কষ্টলাঘব প্রভৃতি মানবিক সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন সম্রাট অশোক ও তাঁর সমগ্র প্রশাসন।

অস্ত্রের বদলে সেবা ও ভালবাসা দিয়ে ভগবান বুদ্ধের অহিংসা ও প্রেমের মন্ত্র প্রচার করে সম্রাট অশোক দেশবিদেশের বিভিন্ন জাতির হৃদয় জয় করেন বলে অনতিবিলম্বে সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদী থেকে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। কাবুল, হেরাট, কান্দাহার এবং কাশ্মীর ও নেপালের কিছু অংশ সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সিংহল, সুবর্ণদীপ প্রভৃতি দূরদেশেও সম্রাট অশোক ভগবান বুদ্ধের বাণীর প্রচার করতে দূত প্রেরণ করেন।

সম্ভবত চল্লিশ/একচল্লিশ বছর রাজত্ব করার পর সম্রাট অশোক খৃ-পূ ২৩২ অব্দে দেহত্যাগ করেন। অশোক বিশ্ববন্দিত সম্রাট, কারণ শাসক-শাসিতের সম্পর্কের সর্বকালীন আদর্শ দৃষ্টান্ত তিনি জগৎ সমক্ষে স্থাপন করে গেছেন। সব মানুষ আমার সন্তান"—মুক্তকণ্ঠে এমন কথা কোন উদারহৃদয় রাজা ঘোষণা করেননি, বা সে ঘোষণা অক্ষরে অক্ষরে পালনের জন্য এমন কল্পনাতীত, মহৎ দৃষ্টান্তও কোন রাজা স্থাপন করেননি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার যে নীতি তিনি বাস্তবে রূপায়িত করেন, যুদ্ধক্লান্ত আজকের পৃথিবী তার সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারছে।

সম্রাট অশোকের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং তার জন্য বহু ঐতিহাসিক অশোকের যুদ্ধ-বর্জিত শান্তি নীতিকেই দায়ী করে থাকেন। কিন্তু এ মন্তব্য অনৈতিহাসিক এবং এতে সত্যের পরিমাণ অণুমাত্র। কারণ কোন পরাক্রমশালী নৃপতির রাজ্যই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, সম্রাট অশোক পরাক্রমশালী হলেও ইতিহাসের এই চিরন্তন নীতির কোন ব্যতিক্রম ঘটত না। হয়ত তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ফেলে যাওয়া সাম্রাজ্যের আয়ু আরও কয়েক দশক বৃদ্ধি পেত, কিন্তু রাজ্যশাসন ও পররাষ্ট্রনীতির যে মহান আদর্শ তিনি দু'হাজার বছর আগে স্থাপন করে গেছেন তা থেকে বিশ্ববাসী বঞ্চিত হত।

সম্রাট অশোকের আর এক অবিনশ্বর কীর্তি, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান বৌদ্ধধর্মকে স্থানীয় ধর্ম থেকে বিশ্বধর্মে রূপান্তরিত করা। বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও অসঙ্গতি দূর করার জন্য সম্রাট অশোকের শাসনকালে পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি (মহাসম্মেলন) আহূত হয়।

অশ্বঘোষ: সম্রাট কণিষ্কের সমকালীন সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত। সম্ভবত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনায় অযোধ্যার নিকটবর্তী সাকেত নামক স্থানে তাঁর জন্ম। তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মান, পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর কাব্য, নাটক ও অন্যান্য গ্রন্থ তৎকালীন সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ নির্ধারণ করে। 'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্য অশ্বঘোষের শ্রেষ্ঠ রচনা।

অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩): বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা। ১৯০৫ খৃ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৩ সালে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। জাতীয় আন্দোলনে যোগদানের জন্য বারবার ইংরেজ সরকারের পীড়ন ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হন। বহু গ্রন্থের প্রণেতা এবং শিক্ষাব্রতী, আদর্শনিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরূপে খ্যাত।

অসহযোগ আন্দোলন: মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম সর্বভারতীয় মুক্তি আন্দোলন। রাউলাট আইন (১৯১৯ খৃ ১৩ মার্চ), জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড (১৯১৯ খৃ ১৩ এপ্রিল) ও পাঞ্জাবে ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতির প্রতিবাদে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে (১৯২০ খৃ ৮ সেপ্টেম্বর) ও নাগপুরে সাধারণ অধিবেশনে (১৯২০ খৃ ৩০ ডিসেম্বর) অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঐ আন্দোলনের কর্মসূচী ছিল—ঘরে ঘরে চরকায় সুতা কাটা ও খদ্দর পরিধান, মাদকদ্রব্য বর্জন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রচার; সেই সঙ্গে বিদেশি পণ্য বর্জন, বিদেশি খেতাব বর্জন, বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ এবং একই সঙ্গে সকল ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করে সকল বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া। ঐ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ এদেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। চরকাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হয় এবং আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানত্যাগী এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে আসায় এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি হয়।

প্রথমদিকে অসহযোগ আন্দোলন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ছিল এবং সারা ভারতে প্রায় ত্রিশ হাজার নরনারী অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য কারারুদ্ধ হন। অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন এক সঙ্গে চলতে থাকায় দেশে হিন্দু-মুস্লিম সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু ১৯২২ খৃ ৫ ফেব্রুয়ারী এক ক্রুদ্ধ জনতা উত্তরপ্রদেশে গোরখপুর জেলায় চৌরিচৌরা থানা আক্রমণ করে কয়েকজন পুলিশকে গৃহে অবরুদ্ধ অবস্থায় পুড়িয়ে হত্যা

করায় আন্দোলনের হঠাৎ রূপান্তর ঘটে এবং ঐ হিংসা যাতে আরও ব্যাপ্ত হতে না পারে তার জন্য গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সঙ্কল্প নেন। বারদৌলিতে কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় আন্দোলন স্থগিত রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে আরও কয়েকটি স্থানীয় আন্দোলন শক্তিশালী হয়। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেদিনীপুর জেলার ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলন, পাঞ্জাবের গুরুদ্বার সংস্কার আন্দোলন প্রভৃতি। সামগ্রিকভাবে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলেও ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য আন্দোলন ১৯২৪ খৃ পর্যন্ত চলতে থাকে।

অশ্মক : খৃ-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে যে ষোলটি মহাজনপদের (রাজ্য) অস্তিত্ব ছিল অশ্মক তার অন্যতম। অশ্মক রাজ্য গঠিত ছিল বর্তমান হায়দরাবাদের সমীপবর্তী অঞ্চল নিয়ে।

অহল্যাবাঈ : ইন্দোরের হোলকার মলহর রাওর পুত্রবধূ। তিনি স্বাধীনভাবে ১৭৬৭-৯৫ খৃ ইন্দোরে রাজত্ব করেন। সুদক্ষ শাসন, স্বাধীন চিন্তাধারা ও প্রজামঙ্গলের জন্য অহল্যাবাঈর শাসনকাল ভারত ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়।

অহিচ্ছত্রনগর : বর্তমান উত্তর প্রদেশের বেরিলি জেলার অন্তর্গত প্রাচীন পাঞ্চাল রাজ্যের রাজধানী। ১৯৪০-৪৪ সালে ঐ এলাকায় খনন কার্য চালিয়ে বিভিন্ন কালের বহু সভ্যতার জীর্ণোদ্ধার করা হয়। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আছে বহু ঘর বাড়ি, ইটের মন্দির ও কৃষ্ণ মসৃণ মাটির পাত্র। ঐ মৃৎপাত্রগুলির কাল-নির্ণয় সম্ভব হয়নি; সেগুলি সম্ভবত খৃষ্ট-পূর্ব যুগের।

আইন অমান্য আন্দোলন : মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতের অন্যতম জাতীয় আন্দোলন। ১৯২৯ খৃ ৩১ ডিসেম্বর জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৩০ খৃ ২৬ জানুয়ারী দেশের সর্বত্র স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করা হয়। তারপর থেকে স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি ভারতে স্বাধীনতা দিবসরূপে পালিত হয় এবং ১৯৫০ খৃ ঐ পুণ্যদিনে সাধারণতন্ত্রী ভারতের নতুন সংবিধান বলবৎ হয়।

পূর্ণ স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের কয়েকটি জাতীয় দাবি বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলে গান্ধিজি আইন অমান্যের সঙ্কল্প নেন। লবণ আইন ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে ১৯৩০ খৃ ১২ মার্চ ৭৯ জন সত্যাগ্রহী নিয়ে তিনি সাবরমতী আশ্রম থেকে সমুদ্রতীরবর্তী ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা করেন। ২৪১ মাইল পথ অতিক্রম করে ১৯৩০ খৃ ৫ এপ্রিল গান্ধিজি ডাণ্ডিতে পৌঁছান ও পরদিন ভোরে সমুদ্র উপকূলে একমুঠা লবণ সংগ্রহ করে আবগারি আইন লঙ্ঘন করেন। সেইদিন থেকে (১৯৩০ খৃ ৬ এপ্রিল) সারা ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়।

লবণ আইন ভঙ্গ করে আন্দোলনের সূচনা হয় বলে '৩০

সালের জাতীয় আন্দোলন 'লবণ সত্যাগ্রহ' এবং চলিত ভাষায় 'নুনমারা আন্দোলন' নামেও অভিহিত। ইংরেজিতে ঐ জাতীয় আন্দোলনকে 'সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স মুভমেন্ট,' সংক্ষেপে 'সি ডি মুভমেন্ট' এবং 'সল্ট ক্যাম্পেন' বলা হয়। লবণ আইন ভঙ্গ করে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা হলেও পরবর্তী কালে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা আরও অনেক আইন ভঙ্গ করেন। নিষিদ্ধ রাজনৈতিক পত্র-পত্রিকা প্রচার, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, বিলাতি কাপড় ও মাদক দ্রব্য বর্জন প্রভৃতি কর্মসূচীও আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। আন্দোলন দমনের জন্য ইংরেজ সরকার ভারতের নানা স্থানে আন্দোলনকারী জনতার উপর লাঠি-চালনা ও গুলীবর্ষণ করে; লক্ষাধিক সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে কারান্তরাল পাঠায়। সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফুর খানের নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন দমনে বৃটিশ সরকার সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করে। সৈন্যদের গুলীতে প্রায় তিনশ পাঠান সত্যাগ্রহী নিহত হন।

১৯৩১ খৃ ৫ মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত থাকে। ঐ বছরের শেষে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে গান্ধিজি লণ্ডনে যান, কিন্তু আলোচনার ফলাফলে তিনি নিরাশ হন ও স্বদেশে ফিরে এসে ১৯৩২ খৃ জানুয়ারী মাসে আবার ব্যাপকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন; গান্ধিজি গ্রেপ্তার হন। ইতিমধ্যে বৃটিশ সরকার হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করলে হিন্দু সমাজকে অস্পৃশ্যতা বর্জন করে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে গান্ধিজি বন্দী অবস্থায় ১৯৩২ খৃ ২০ সেপ্টেম্বর অনশন শুরু করেন। তখন হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতা সমবেতভাবে গান্ধিজির কাছে ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রতিশ্রুতি দিলে গান্ধিজি অনশন ভঙ্গ করেন এবং বৃটিশ সরকারের বিভেদমূলক নীতিও সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়। গান্ধিজি মুক্তিলাভের পর হরিজন কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৪ খৃ ১৯ মে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়।

আইন-ই-আকবরি: মোগল সম্রাট আকবরের মুখ্য সচিব আবুল ফজলের লেখা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত ঐ গ্রন্থে সম্রাট আকবরের সমকালীন মোগল শাসন-ব্যবস্থা এবং ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। সে সময়ের খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ, খাদ্য, সামাজিক উৎসব, ধর্মীয় আচরণ, শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদির বিবরণও ঐ গ্রন্থে মেলে।

আউটরাম: (১৮০৩-৬৩) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য সৈনিকরূপে ভারতে আসেন, পরে যোগ্যতাবলে প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত হন। আফগানিস্তান আক্রমণে, অযোধ্যা জয়ে ও সিপাহি বিদ্রোহ দমনে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ১৮৬০ সালে তিনি ভারত ত্যাগ করেন।

আকবর : ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পৌত্র ও হুমায়ুনের পুত্র আকবর মোগল বংশীয় তৃতীয় স্রাট। পিতা হুমায়ুন যখন রাজ্যহারা অবস্থায় সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত অমরকোট নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন সেই সময় (১৫৪২ খৃ ১৫ অক্টোবর হামিদাবানুর গর্ভে আকবরের জন্ম হয়। ১৫৫৬ খৃ হুমায়ুনের মৃত্যু হলে আকবর মাত্র ১৪ বছর বয়সে মোগল সিংহাসনে বসেন। সেই সময় তাঁকে রাজ্যশাসন কার্যে সহায়তা করতেন অভিভাবক বৈরাম খাঁ।

১৫৫৬ খৃ দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে শেরশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র আদিলশাহের সেনাপতি হিমুকে পরাজিত করে বৈরাম খাঁ দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করেন ও তার ফলে সম্রাট আকবরের সিংহাসন নিরাপদ হয়। বৈরাম খাঁর চার বছর অভিভাবকতার শেষে সম্রাট আকবর যখন স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন তখন মোগল সাম্রাজ্যের সীমানা লাহোর, দিল্লী, আগ্রা ও তার সমীপবর্তী অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর শাসনকালে সম্রাট আকবর বাহুবলে ও বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষুদ্র নৃপতিদের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করে উত্তর ভারতের প্রায় সমগ্র ও দক্ষিণ ভারতের একাংশ নিয়ে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। উত্তরে কাবুল-কাশ্মীর, পশ্চিমে সিন্ধু-বালুচিস্তান পূর্বে বঙ্গদেশ-ওড়িশা ও দক্ষিণে আমেদনগর পর্যন্ত সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। আকবরের ধর্মনিরপেক্ষ উদার নীতি, শাসক-শাসিতের মধুর সম্পর্ক ও সুশাসন ভারতের ইতিহাসে নব অধ্যায়ের সূচনা করে। মহান অশোকের মতো মহান আকবর উপলব্ধি করেন যে শাসিতের হৃদয় জয় করা যায় ভালবাসা দিয়ে, ভয় দেখিয়ে নয়। হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক তীর্থকর, জিজিয়া কর প্রভৃতি আকবর কর্তৃক সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হয়। রাজপুতদের মধ্যে একমাত্র মেবারের রানা প্রতাপ সম্রাট আকবরের কাছে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করেন নি।

আকবরের ধর্মমত ছিল উদার। তিনি সুন্নি পিতার সন্তান, কিন্তু তাঁর মা ছিলেন সিয়া সম্প্রদায়ের। তাছাড়া শৈশবেই তিনি সুফিদের সংস্পর্শে আসেন এবং পরে হিন্দু শাস্ত্রকারদের সঙ্গে ধর্মবিষয়ক নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। বৌদ্ধ, ইহুদি, খৃষ্টান, জৈন, পার্শি সম্প্রদায়ের যাজকরাও তাঁর ধর্মসভাগৃহ ইবাদৎখানায় সমাদৃত হতেন। তাঁদের সকলেরই চিন্তাধারা সম্রাট আকবরের ধর্মধারণাকে প্রভাবিত করে এবং সেই প্রভাব অনুপ্রেরণাতেই তিনি ১৮৫২ খৃ দিন-ই-ইলাহি ধর্মমত প্রচার করেন। সংস্কারবশত কোন সম্প্রদায়ই সম্রাট আকবরের সে ধর্মমত গ্রহণ করেনি। কিন্তু ঐ ব্যর্থতার মধ্যেই সম্রাট আকবরের মহান হৃদয় ও উদার চিন্তাধারার পরিচয় মেলে।

সম্রাট আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে যে ভাবে সুবা (প্রদেশ), জেলা, পরগনা ও গ্রাম পঞ্চায়েতে ভাগ করেন তা প্রায় ইংরেজ শাসনকালেও অপরিবর্তিত ছিল। প্রায় চারশ বছর আগে সুসংহত

সৈন্যদল গঠনে, অসামরিক প্রশাসন নিয়ন্ত্রণে, ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে আকবর যে দক্ষতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেন তা পরবর্তীকালে বিশ্বের সকল দেশের ঐতিহাসিকদের চমৎকৃত করে। ১৬০৫ খৃ সম্রাট আকবরের মৃত্যু হয়।

শেষ জীবনে সম্রাট আকবরকে দুঃখ ও মানসিক অশান্তি ভোগ করতে হয়। পুত্র সেলিম (পরে সম্রাট জাহাঙ্গির) পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন, সে বিদ্রোহ দমনের পর পিতা পুত্রকে ক্ষমা করেন। দুই পুত্র মুরাদ ও দানিয়েলের অকালমৃত্যুও সম্রাটকে শোকাভিভূত করে। তাছাড়া পরম সুহৃদ ও অমাত্য আবুল ফজলের হত্যা ও কবিবন্ধু ফৈজির মৃত্যু বৃদ্ধ বয়সে সম্রাটের পক্ষে বিশেষ দুঃখের কারণ হয়।

সাম্রাজ্য বিস্তার : বৈরাম খাঁর অভিভাবকতাকালে দিল্লী, আগ্রা, আজমির, গোয়ালিয়র ও জৌনপুর মোগল সাম্রাজ্যর অন্তর্ভুক্ত হয়। বৈরাম খাঁর মৃত্যুর পর আকবরের ধাত্রীমাতা মহম অনগার পুত্র ও আকবরের শুভানুধ্যায়ী আদম খাঁর তৎপরতায় মালব জয় (১৫৬১) হয়। মালবের সুলতান বজবাহাদুর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৫৬৪ খৃ গণ্ডোয়ানা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় ; রাজ্যরক্ষার চেষ্টায় রানী দুর্গাবতী ও তাঁর পুত্র নারায়ণ বীরের মৃত্যু বরণ করেন। তারপর আকবর রাজপুতানার দিকে দৃষ্টি দেন। প্রথমে অম্বরের (জয়পুর) রাজা বিহারীমল্ল কন্যার সঙ্গে সম্রাটের বিবাহ দেন। বিহারীমল্লের পৌত্র মানসিংহ আকবরের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। রনথম্বোর, কালিঞ্জর, বিকানীর, জয়সলমীর প্রভৃতি রাজপুত রাজ্যগুলিও একে একে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। একমাত্র চিতোররাজ উদয়সিংহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন না ; কিন্তু মোগল আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে উদয়সিংহ রাজ্য ত্যাগ করেন। তাঁর দুই বীর সেনাপতি জয়মল্ল ও পত্ত যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু বরণ করেন। উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর বীর পুত্র রানা প্রতাপ চিতোর উদ্ধারের জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংগ্রাম করেন।

রাজপুতানা অধীনে আসার পর সম্রাট আকবর ১৫৭২ খৃ গুজরাত প্রদেশ জয় করেন, পরের বছর সুরাট অধিকৃত হয়। ১৫৭৫ খৃ বঙ্গদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরপর কয়টি যুদ্ধে পরাজয়ের পর বঙ্গদেশ ও ওড়িশার একাংশের শাসক আফগান বংশীয় সুলেমান কররানি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন। সমগ্র ওড়িশা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৫৯২ খৃ। বঙ্গদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও বার ভুঁইয়া নামে খ্যাত চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, ইশা খাঁ প্রমুখ কয়েকজন প্রভাবশালী ভূস্বামী মোগল প্রভুত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালান।

১৫৮১ খৃ বৈমাত্রেয় ভাই মির্জা মহম্মদ হাকিম কাবুলে বিদ্রোহী হলে সম্রাট আকবর তাঁকে পরাজিত করে কাবুলে কর্তৃত্ব বিস্তার করেন। ১৫৮৫ খৃ কাবুল মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত

হয়। তারপর সিন্ধু, বালুচিস্তান, কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্যগুলি মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উত্তর ভারত জয়ের শেষে সম্রাট আকবর দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হন। আহমদনগর রাজ্য আক্রান্ত হলে ঐ রাজ্যের নাবালক সুলতান বাহাদুরের অভিভাবিকা চাঁদবিবি প্রবল বিক্রমে সংগ্রাম করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও নিহত হন। ১৬০০ খৃ আহমদনগর মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৬০১ খৃ খান্দেশ অধিকৃত হয়। ঐ বছরেই দক্ষিণ ভারতে অধিকৃতস্থানগুলির শাসন দায়িত্ব পুত্র দানিয়েলকে দিয়ে সম্রাট আকবর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। চার বছর পরে সম্রাটের জীবনাবসান ঘটে।

আকবর, দ্বিতীয় (১৮০৬-৩৭): মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইংরেজ সরকারের কাছে বাদশাহরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন ও ইংরেজ সরকারের বৃত্তি ভোগ করেন। নামে মাত্র বাদশাহ ছিলেন। ১৮৩৭ খৃদ্বিতীয় আকবরের মৃত্যু হয়।

আকবরনামা: মোগল সম্রাট আকবরের মুখ্য সচিব আবুল ফজল বিরচিত সম্রাট আকবর পর্যন্ত মোগল সম্রাট ও তাঁদের পিতৃপুরুষদের ইতিহাস। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত।

আগষ্ট আন্দোলন: ১০৪২ খৃ ৭ আগষ্ট বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, বৃটিশ সরকার যে ফ্যাসিজ্‌ম-এর বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত, তার প্রমাণ তাদের দিতে হবে ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে। কংগ্রেস কমিটির সভায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি নিয়ে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে ও সে আলোচনা ফলপ্রসূ না হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলম্বন করতে গান্ধিজিকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়। গান্ধিজি জাতিকে সংগ্রামের মন্ত্র দেন—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে—হয় প্রতিজ্ঞা রাখব নয়ত জীবন দেবো।

বৃটিশ সরকার কিন্তু জাতীয় নেতা-দের কোন আলোচনার সুযোগ দেন না। কংগ্রেস অধিবেশন চলাকালেই ৮ আগষ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। সারা ভারত জুড়ে বৃটিশ সরকারের প্রচণ্ড নির্যাতন শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। 'ভারত ছাড়ো' ধ্বনিতে ভারতের সকল দিক মুখর হয়ে ওঠে। 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' মন্ত্রে দীক্ষিত সত্যাগ্রহীদের অকুতোভয় সংগ্রামে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও বাঙলায় আগষ্ট আন্দোলন প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে। বালিয়া, সাতারা ও মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহী জনতার উদ্যোগে পাল্টা সরকার গঠিত হয়। রেল লাইন অপসারিত করে, টেলিগ্রাফের তার কেটে, বিভিন্ন সরকারি অফিস বিধ্বস্ত-করে ও থানা প্রভৃতি দখল করে দেশ জুড়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি করা হয়। আগষ্ট আন্দোলনে সারা ভারতে প্রায় সত্তর

হাজার লোক গ্রেপ্তার হন, গুলীর আঘাতে প্রাণ হারান ৯৪০ জন ও আহত হন ১৬৩০ জন। কয়েক মাস পরে নেতৃত্বহীন গণ আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পায় কিন্তু মুক্তিসংগ্রামীদের মনোবল অটুট থাকে। অনতিবিলম্বে নেতাজি ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম কাহিনী সমগ্র ভারতে নব ভাব ও নব প্রেরণা সঞ্চারিত করে এবং জাতি শেষ স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়।

আগা খাঁ: হজরত মহম্মদের কন্যা ফতিমা ও জামাতা আলির বংশধর ও ইসমাইলি সম্প্রদায়ের নেতা। তৃতীয় আগা খাঁ মহম্মদ শাহ (১৮৭৭—১৯৫৭) ভারতীয় মুস্লিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯০৬ খৃ বড়লাট লর্ড মিণ্টোর কাছে মুস্লিম সম্প্রদায়ের জন্য অধিক সুযোগ সুবিধার আবেদন জানান। মুস্লিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। আলিগড় মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোগী। ১৯৩০-৩১খৃ লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন। ১৯৩৭ খৃ জেনিভায় 'লীগ অফ নেশনস'-এর এসেমব্লীর সভাপতি হন।

আগ্রা: দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদির শাসনকালে ক্ষুদ্র গ্রাম আগ্রা সমৃদ্ধ রাজকীয় নগরীরূপে গড়ে ওঠে। দিল্লীতে অত্যধিক গরমের জন্য সিকন্দর লোদি যমুনা নদীর তীরবর্তী আগ্রায় রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন।

লোদি শাসকদের প্রতিষ্ঠিত আগ্রা নগরী ছিল যমুনা নদীর বাম তীরে। সম্রাট আকবরের শাসনকালে যমুনার দক্ষিণ তীরবর্তী আগ্রা সমৃদ্ধ হয়। ১৫৬৬ খৃ আগ্রা দুর্গ নির্মিত হয়। কিন্তু সম্রাট আকবরের শাসনকালেই আগ্রার গুরুত্ব হ্রাস পায়। ফতেপুর সিক্রিতে সম্রাট রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। স্থাপত্য শিল্পে সমৃদ্ধ আগ্রার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ তাজমহল।

আজমগড়: বর্তমান উত্তর প্রদেশের একটি জেলা ও সুপ্রাচীন শহর। স্থানটির প্রত্নানিদর্শনে প্রমাণ হয় যে মৌর্য ও গুপ্তযুগেও শহরটির অস্তিত্ব ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে শহরটি দিল্লীর সুলতানদের দখলে আসে। সপ্তদশ শতাব্দীতে আজমগড় একটি স্বতন্ত্র রাজপুত রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ রাজবংশ পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন। ১৮০১ খৃ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুসারে আজমগড় বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক কুনোয়ার সিং বিদ্রোহকালে (১৮৫৭ খৃ) ইংরেজ সৈন্যদের বিতাড়িত করে সাময়িকভাবে আজমগড় দখল করেন।

আজমল খাঁ, হাকিম (১৮৬৩—১৯২৪): জাতীয়তাবাদী নেতা, হিন্দু-মুস্লিম ঐক্যের জন্য সারা জীবন সচেষ্ট ছিলেন। ১৯২১ খৃ আমেদাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হন।

আজমির: বর্তমান রাজস্থান রাজ্যের অন্তর্গত একটি জেলা ও সুপ্রাচীন শহর। চৌহান বংশীর নৃপতি অজয় রাজ আজমির (অজয়মেরু) শহরটির পত্তন করেন। ১১৯২ খৃ পৃথ্বীরাজ

চৌহানকে পরাজিত করে মহম্মদ ঘোরি আজমির জয় করেন। মেবারের রানা কুম্ভ পুনরায় আজমির রাজপুত শাসনাধীনে আনেন। সম্রাট আকবরের শাসনকালে আজমির মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মোগল সম্রাটেরা মাঝে মাঝে আজমীর দুর্গে এসে বাস করতেন এবং ১৬১৬ খৃ সম্রাট জাহাঙ্গির সেখানেই ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস-প্রেরিত দূত স্যার টমাস রোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১৭২১ খৃ মাড়োয়ারের অজিত সিংহ পুনরায় আজমির দখল করেন। পরে আজমির কিছুকালের জন্য মারাঠাদের অধিকারে যায়। পরিশেষে ১৮১৮ খৃ আজমির ইংরেজ শাসনাধীনে আসে।

আজাদ, চন্দ্রশেখর: বিশিষ্ট বিপ্লবী। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত হওয়ায় আত্মগোপন করেন। ১৯৩১ খৃ ২৭ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুলীর আঘাতে নিহত হন।

আজাদ, মৌলানা আবুল কালাম (১৮৮৮—১৯৫৮): মক্কায় জন্ম, কিন্তু শৈশবে কলকাতায় আসেন ও এখানে স্থায়ীভাবে বাস করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য ১৯১৬ খৃ রাঁচিতে অন্তরীণ হন ও ও তিন বছর সেখানে থাকেন। মুক্তির পর গান্ধিজির নেতৃত্ব ও আদর্শে আকৃষ্ট হন ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তারপর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দেশসেবায় নিযুক্ত ছিলেন। প্রথম কংগ্রেস সভাপতি হন ১৯২৩ খৃ। অত কম বয়সে কেউ কংগ্রেস সভাপতি হননি। পরে ১৯৪০ খৃ আবার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৬ খৃ পর্যন্ত সে পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ঐ সময় আগষ্ট আন্দোলনের জন্য তিনি কয়েক বছর কারারুদ্ধ ছিলেন। স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনায় মৌলানা আজাদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ১৯৪৬ খৃ অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রীরূপে যোগ দেন। স্বাধীন ভারতেরও তিনি প্রথম শিক্ষামন্ত্রী

আজাদ হিন্দ ফৌজ: ১৯৪১ ১৭ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু গোপনে কলকাতা ত্যাগ করেন এবং ইংরেজ সরকারের সতর্ক প্রহরা ভেদ করে আফগানিস্তানে পৌঁছান। তখনও সোভিয়েট ইউনিয়ন ও জার্মানির মৈত্রী-বন্ধন অটুট ছিল। সে কারণে সুভাষচন্দ্র সোভিয়েট ইউনিয়ন হয়ে জার্মানি যাওয়ার সুযোগ লাভ করেন। তারপর জার্মান সরকারের সহায়তায় বিভিন্ন রণাঙ্গনে জার্মান সৈন্যদের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে তিনি প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। ঐ সময় জার্মানির ভারতীয় সম্প্রদায় সুভাষ চন্দ্রকে প্রথম 'নেতাজি' নামে সম্বোধন করেন। সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ভারতে প্রবেশ করার। কিন্তু জার্মানি ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় নেতাজির সে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

ওদিকে জাপান ১৯৪১ খৃ ৭ ডিসেম্বর বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। জাপান অনতি বিলম্বে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দখল করে নিলে মালয়, সিঙ্গাপুর ও বর্মার ভারতীয়গণ ভারতকে বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত করতে সঙ্কল্পবদ্ধ হন। তাঁদের সেই সঙ্কল্পকে সফল রূপ দিতে এগিয়ে আসেন জাপান-প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। ১৮৪২ খৃ ২৮ মার্চ টোকিওতে প্রবাসী ভারতীয় সমাজের নেতৃবৃন্দের এক সভা হয়। ঐ সভায় সিদ্ধান্ত অনুসারে ঐবছর ১৫ জুন ব্যাঙ্ককে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ভারতীয় সামাজিক ও অসামরিক ব্যক্তিদের একটি বিরাট সভা হয়। ঐ সভায় ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ গঠিত হয় ও জাপানের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে গঠিত হয় আজাদ হিন্দ বাহিনী। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম সর্বাধিনায়ক হন জাপানের হাতে বন্দী ক্যাপ্টেন মোহন সিং। ১৯৪১ খৃ আগষ্ট মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য সংখ্যা হয় ৪০ হাজার।

নেতাজি আজাদ হিন্দ ফৌজের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং একটি জার্মান ডুবো জাহাজে আফ্রিকা ঘুরে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে আবার একটি জাপানি ডুবো জাহাজ তাঁকে টোকিও নিয়ে আসে ১৯৪৩ খৃ ১০ জুন। নেতাজির উপস্থিতিতে সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অভূত-পূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ৪ জুলাই, রাসবিহারী বসু পদত্যাগ করে নেতাজিকে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের প্রধানপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। নেতাজির 'দিল্লী চলো' ধ্বনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে উদ্দীপ্ত করে, সুরু হয় ভারত অভিযানের ব্যাপক প্রস্তুতি। ১৮৪৩ খৃ ২১ অক্টোবর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয়।

১৯৪৪ খৃ ১৯ মার্চ, আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রহ্মসীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে। ঐ সময় জাপান সরকার থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ভারতের যেসব অংশ থেকে বৃটিশ ফৌজ বিতাড়িত হবে সেগুলি আজাদ হিন্দ সরকারের শাসনাধীনে আসবে। বর্তমান নাগাভূমি রাজ্যের রাজধানী কোহিমাকে আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রথম মুক্ত করে। নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ভারতীয় সৈন্যরা ভারতের অভ্যন্তরে প্রায় ১৫০ মাইল প্রবেশ করে। কিন্তু ঐ সময় জাপান পূর্ব এশিয়ায় প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের সম্মুখীন হওয়ায় জাপানের পক্ষে আজাদ হিন্দ ফৌজকে বিশেষ সাহায্য করা সম্ভব হয়না। ফলে বৃটিশ সৈন্যদের প্রবল আক্রমণের মুখে প্রায় নিরস্ত্র আজাদ হিন্দ ফৌজকে পিছু হঠতে হয়। এর অল্পকাল পরে ব্রহ্মদেশ আবার বৃটিশ অধিকারে এলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর আত্মসমর্পণ ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না।

নেতাজির নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত মুক্তির প্রয়াস সফল না হলেও সেদিনের সেই দুঃসাহসিক অভিযান ভারতের জনগণ ও সৈন্য বাহিনীকে যে জলন্ত দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে তার মোকাবিলা করার ক্ষমতা রণক্লান্ত বৃটিশ সরকারের ছিল না। আজাদ হিন্দ ফৌজের আদর্শে ভারতের সর্বত্র সৈন্যবিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। সেই বিদ্রোহ ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানই শেষপর্যন্ত বৃটিশ সরকারকে ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে।

আজিম-উশ-শান: মোগল সম্রাট ঔরংজেবের পৌত্র ও মুয়াজ্জামের পুত্র। সম্রাট ঔরংজেব ১৬৯৭ খৃ তাঁকে বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। আজিমগঞ্জ শহরটি তাঁরই নামানুসারে হয় বলে ঐতিহাসিকদের অনুমান। তিনিই ১৬৯২ খৃ জব চার্নককে ষোল হাজার টাকার বিনিময়ে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটির পত্তনি দেন। ১৭১২ খৃ. আজিম-উশ-শান নিহত হন।

আড়াই দিন কা ঝোপড়া: আজমিরের চৌহানবংশীয় রাজা চতুর্থ বিগ্রহ রাজ (১১৪৩—৬৪ খৃ) ঐ প্রসিদ্ধ নগরীতে সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে ১১৯২ খৃ, পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করার পর মহম্মদ ঘোরি আজমিরের ঐ সংস্কৃত বিদ্যালয়টিকে একটি বিশাল মসজিদে রূপান্তরিত করেন। সেই মসজিদটিই আড়াই দিন কা ঝোপড়া নামে খ্যাত। অনুমান, মসজিদ নির্মাণের কাজ আড়াই দিনে শেষ হয়।

আত্মারাম পাণ্ডুরংতরখড় (১৮২৩-১৮৯৮)-মারাঠী সমাজ সংস্কারক, প্রার্থনা সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী।

আদিলশাহি বংশ: বিজাপুরের শাসনকর্তা ইউসুফ আদিল শাহ ১৪৯০ খৃ বিজাপুরকে একটি স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করেন। এইভাবে বিজাপুরে যে আদিল শাহি বংশের শাসন কায়েম হয়, ১৬৮৬ খৃ মোগলসম্রাট ঔরংজেব কর্তৃক বিজাপুর অধিকৃত হওয়া পর্যন্ত তা বহাল থাকে। আদিলশাহের মৃত্যুর পর আটজন আদিলশাহি বংশীয় নৃপতি বিজাপুরের সিংহাসনে বসেন। তাঁদের নাম ইসমাইল (১৫১০—৩৪), মল্লু (১৫৩৪), ইব্রাহিম (১৫৩৪—৫৮), আলি (১৫৫৮-৮০), দ্বিতীয় ইব্রাহিম (৫৮০—১৬২৭), মহম্মদ (১৬২৭—৫৭), দ্বিতীয় আলি (১৬৫৭—৭২) ও সুলতান সিকন্দর (১৬৭৭—৮৬)।

আদিলশাহি বংশের কয়েকজন সুলতান সুশাসনের জন্য খ্যাত। তাঁদের নীতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বহু উচ্চ রাজপদে তাঁরা হিন্দুদের নিযুক্ত করতেন।

আদিশূর: প্রাচীন গৌড়ের রাজারূপে খ্যাত। কিন্তু তিনি ঠিক কোন্ সময় রাজত্ব করতেন বা আদৌ ঐ নামে কোন রাজা কোনদিন গৌড়ের রাজা ছিলেন কিনা তা সুনিশ্চিত ভাবে জানা যায়না। বাঙলার নানা কুলশাস্ত্রে আদিশূরের নামে নানা

কাহিনী প্রচারিত আছে। যেমন, বাঙলাদেশে তৎকালে কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ না থাকায় আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনেন, এবং বাঙলাদেশের পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণরা প্রায় সকলেই তাঁদের বংশধর। আর ঐ ব্রাহ্মণদের যে পাঁচজন পরিচারক আসেন তাঁদের বংশধররাই হন কুলীন কায়স্থ। কিন্তু এসব কাহিনীর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

আনন্দ চালু : (১৮৪২—১৯০৮) উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা। ১৮৯১ খৃ নাগপুরে জাতীয় কংগ্রেসের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। মাদ্রাজ থেকে 'মহাজন সভা' ও People's Magazine নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

আনন্দপাল : পাঞ্জাবের হিন্দু শাহি বংশীয় নৃপতি, জয়পালের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১০০৬ খৃ সিংহাসনে বসেন এবং সুলতান মামুদের ভারত অভিযান প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে মুলতানের মুস্লিম শাসকসহ উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্যের রাজার সঙ্গে জোট বাঁধেন। কিন্তু ১০০৯ খৃ সুলতান মামুদ ঐ মিলিত বাহিনীকে সহজেই পারজিত করেন। তবু রাজ্যের হৃত অংশ উদ্ধারের জন্য আনন্দপাল আমৃত্যু সংগ্রাম করেন।

আনন্দ বর্ধন : অলঙ্কার শাস্ত্রের বিশিষ্ট পণ্ডিত 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের প্রণেতা। সম্ভবত খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাব্যে 'রস'কে সর্বাধিক প্রাধান্য দেন।

আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৭) **:** ব্যারিষ্টার, উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা, সমাজ সংস্কারক। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম গণিতে র‍্যাংলার হন। সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রথম সম্পাদক। ১৮৯৮ খৃ মাদ্রাজে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

আনসারি, মুক্তার মহম্মদ (১৮৮০-১৯৩৬) **:** বিশিষ্ট চিকিৎসক ও জাতীয়তাবাদী নেতা। ১৯১৭-১৮ খৃ 'হোমরুল' আন্দোলনে যোগ দেন। '২০ সালে মুস্লিম লীগের সভাপতি হন ও সে সময় খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৭ সালে মাদ্রাজে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৩ সালে গঠিত কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ডের প্রথম সভাপতি হন। জাতীয় আন্দোলনে যোগদানের জন্য বহুবার কারাবরণ করেন।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ-পুঞ্জ : বর্তমানে ভারতের একটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল। আন্দামান ছোট-বড় ২০৪টি ও নিকোবার ১৯টি দ্বীপের সমষ্টি। মার্কোপোলো থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের বহু পর্যটকের লেখায় ঐ দ্বীপপুঞ্জের উল্লেখ দেখা যায়। ১৮৫৩ খৃ দ্বীপপুঞ্জ ইংরেজ সরকারের শাসনাধীনে আসে ও ১৮৫৮ খৃ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রধান কার্যালয় পোর্ট ব্লেয়ারে একটি বন্দীশালা স্থাপিত হয়। ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৫ খৃ পর্যন্ত

আন্দামানে দীর্ঘমেয়াদি বন্দীদের চালান দেওয়া হত। দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক কর্মীদেরও আন্দামানে পাঠানো হত। ইংরেজ সরকারের গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়ো ১৮৭২ খৃ আন্দামান পরিদর্শনকালে একজন দীর্ঘমেয়াদি বন্দীর হাতে নিহত হন। ১৯৪২-৪৫ খৃ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ জাপানের অধিকারে ছিল, সেই সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সেখানে আজাদ হিন্দ সরকার কায়েম হয়। ১৯৪৫ খৃ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ আবার ইংরেজ সরকারের শাসনাধীনে আসে, কিন্তু সেটি আর বন্দী উপনিবেশ থাকে না।

আফজল খাঁ : শিবজির ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত বিজাপুরের সুলতান কৌশলে শিবজিকে ধরে আনার জন্য এবং প্রয়োজন হলে ঐ মারাঠাবীরকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর সেনাপতি আফজল খাঁকে পাঠান (১৬৫৯ খৃ)। শিবজি তখন আত্মরক্ষার্থে প্রতাপগড় দুর্গে আশ্রয় নেন। আফজল খাঁ তখন শিবজিকে বন্দী করার উদ্দেশ্যে সন্ধির প্রস্তাব করে প্রতাপগড় দুর্গে দূত পাঠান। শিবজি আফজল খাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে প্রস্তুত হয়েই আফজল খাঁর শিবিরে যান, এবং আফজল খাঁ আলিঙ্গনের অছিলায় তাঁকে আক্রমণে উদ্যত হলে শিবজি তখনই 'বাঘনখ' নামক ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে আফজল খাঁকে হত্যা করেন।

আবদুর রজ্জাক : পারস্য সম্রাটের দূতরূপে ১৪৪৩ খৃ বিজয়নগরে সংগম-বংশীয় নৃপতি দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজ-সভায় আসেন। ফারসি ভাষায় লেখা তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বিজয়নগরের তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের সুন্দর বর্ণনা মেলে।

আবদুর রহিম খান খানান : মোগল সম্রাট আকবরের শৈশব জীবনের অভিভাবক বৈরাম খাঁর পুত্র আবদুল রহিম সম্রাটের কাছে লালিত পালিত হন। ১৫৭৩ খৃ গুজরাতের সুবাদার নিযুক্ত হন ও মুজফ্ফর শাহের বিদ্রোহ দমনের পর সম্রাটের কাছ থেকে 'খান খানান' উপাধি পান। ১৬২৭ খৃ ৭১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দী এমনকি সংস্কৃত ভাষাতেও বুৎপত্তি লাভ করেন এবং বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

আবদুল কাদের বদাউনি : ১৫৪০ সালে জন্ম। ১৫৭৪ সালে আকবর তাঁকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার জন্য একদা তিনি সম্রাটের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে আবুল ফজল সম্রাটের প্রিয়পাত্র হওয়ায় বদাউনি রাজ দরবারে পিছনের সারিতে সরে যেতে বাধ্য হন। ফইজি ও আবুল ফজল ছিলেন সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং বদাউনি সুন্নি সম্প্র-দায়ের। সম্রাটের উপর দুজন সুন্নি মুল্লিমের অত্যধিক প্রভাব বদাউনির ভাল লাগেনা। ক্রমে সম্রাটের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বদাউনি 'মুন্তাখিব-উৎ-তারিখ' নামে যে গ্রন্থ লেখেন তাতে আকবরকে নানা ভাবে নিন্দা করা হয়। আকবরের চরিত্রের বিপরীত দিক ঐ

গ্রন্থ পাঠে জানা যায় বলে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কিন্তু ক্রুদ্ধ বদাউনি আকবর সম্বন্ধে যে সব কথা লেখেন ঐতিহাসিকরা তার সবটুকু সত্য বলে মনে করেন না। যেমন, সম্রাট গো হত্যা নিষিদ্ধ করেন, মক্কায় হজ্জ যাত্রা বন্ধ করেন, মসজিদে আজানের ডাক দেওয়া নিষিদ্ধ করেন, এমনকি অর্থের প্রয়োজনে মসজিদে সঞ্চিত সম্পদ লুণ্ঠন করেন বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে, অন্য কোন ঐতিহাসিক সূত্রে তার সমর্থন মেলে না।

আবুল ফজল: ১৫৫১ সালে জন্ম। অগ্রজ ফইজি কর্তৃক ১৫৭৫ সালে সম্রাট আকবরের দরবারে আনীত হন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে সম্রাটের প্রিয় পাত্র হন। তিনি ছিলেন একাধারে পণ্ডিত, রাষ্ট্রনীতিবিদ, কূটনীতিক ও সামরিক অধিনায়ক। সরকারিভাবে আবুল ফজল কোন সময় সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী হননি কিন্তু সম্রাট তাঁকে সেই ভাবেই দেখতেন। ১৫৭৯ সালে আবুল ফজলকে দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধে পাঠানো হয়। ফেরার পথে সম্রাটের পুত্র সেলিমের ষড়যন্ত্রে ১৬০২ সালে ঝাঁসির পথে নিহত হন।

আবুল ফজল রচিত আকবর নামা সম্রাট আকবরের শাসনকালের সর্বাধিক তথ্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস। আইন-ই-আকবরি' আবুল ফজলের আর এক ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

আমির আলি, সৈয়দ: (১৮৪৯-১৯২৮): চুঁচুড়ায় জন্ম। ব্যারিষ্টারি পাশের পর প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনের অধ্যাপনা করেন। ১৮৭৮-৮৩ খৃ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও ১৮৮৩-৮৫ খৃ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য হন। কলকাতা হাই-কোর্টের প্রথম মুস্লিম বিচারপতি (১৮৯০-১৯০৪), পরে ১৯০৯ খৃ প্রিভি কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সদস্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন সমর্থন করেন। পরে ভারত শাসনব্যবস্থায় মুস্লিম স্বার্থরক্ষার দাবি সমর্থন করেন। ১৯২৮ খৃ ইংলণ্ডে মৃত্যু হয়।

আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫): দিল্লীর সুলতান কায়কোবাদ, জালালুদ্দিন ও আলাউদ্দিন খলজি এবং গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের সভাকবি ছিলেন। লাচিন-তুর্কি পিতা ও ভারতীয় মাতার সন্তান এবং ভারতেই জন্ম। ফারসি ভাষায় কাব্য রচনা করেন। সঙ্গীতেও আমির খসরুর অবদান অসামান্য। পারসিক ও ভারতীয় সঙ্গীত রীতির সংমিশ্রণ তাঁর অনন্য কীর্তি।

আমির দাউদ: মোঙ্গল যোদ্ধা। ১২৯৭ খৃ প্রায় এক লক্ষ অনুগামী নিয়ে ভারত আক্রমণ করেন। আলাউদ্দিন খলজি তখন দিল্লীর সুলতান। মোঙ্গল আক্রমণকারীরা সেবার মুলতান, পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অংশ বিধ্বস্ত করে। অবশেষে আলাউদ্দিনের সেনাপতি উলুঘ খাঁ তাদের পরাজিত ও বিতাড়িত করেন।

আমেদাবাদ: সাবরমতী নদীর উভয় তীরে অবস্থিত সুপ্রাচীন শহর। অষ্টম শতাব্দীতে এক ভিল সর্দারের নামানুসারে ঐ শহরের নাম ছিল

আসোয়াল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে গুজরাতরে বিভিন্ন অঞ্চল মুস্লিম অধিকারে আসে। সে সময় গুজরাতের রাজধানী ছিল অণহিল পাটক। গুজরাতের স্বাধীন সুলতান প্রথম আহমেদ ১৪১২ খৃ অণহিল পাটক থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করে সাবরমতীর তীরে নির্মিত নতুন শহরে আনেন এবং সুলতানের নামানুসারে শহরটির নাম হয় আহমেদাবাদ।

আম্বালা : একটি সুপ্রাচীন রাজ্য, চীনা পরিব্রাজক হিউএন সাং—এর বিবরণীতে আম্বালর উল্লেখ আছে। তখন, অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে আম্বালা ছিল একটি সমৃদ্ধ রাজ্য এবং শ্রুঘ্ন ছিল তার রাজধানী। আধুনিক আম্বালার প্রতিষ্ঠাকাল চতুর্দশ শতাব্দী। ১৭৬৩ খৃ আম্বালা শহর শিখদের অধিকারে আসে। ১৮৪৩ খৃ আম্বালা বৃটিশ অধিকারভুক্ত হওয়ার পর সেখানে একটি ক্যাণ্টনমেণ্ট স্থাপিত হয়।

আম্বেদকর, ডঃ ভীমরাও রামজি (১৮৯৩-১৯৫৬) : হিন্দুসমাজের অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহের নেতারূপে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৩০-৩২ সালে লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য আইনসভায় পৃথক আসন দাবি করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডঃ আম্বেদকর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য গঠিত ড্রাফ্‌টিং কমিটির সভাপতিরূপে সংবিধাম রচনার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। ডঃ আম্বেদকর ছিলেন সুবক্তা, সুপণ্ডিত ও নির্যাতিত মানুষের নেতা।

আয়ার, সুব্রহ্মণ্য (১৮৫৬-১৯১৬) : শিক্ষাব্রতী, সংবাদিক ও দেশনেতা। মাদ্রাজের প্রখ্যাত 'হিন্দু' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৮৫ খৃ জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকে তার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন ও স্বদেশী আন্দোলনে কয়েকবার কারারুদ্ধ হন।

আয়ুধ : অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে কনৌজের রাজারূপে 'আয়ুধ' উপাধিধারী কয়েকজনের নাম মেলে। ঐ বংশের রাজা ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করেন বঙ্গদেশের রাজা ধর্মপাল। ধর্মপাল তাঁর অনুগত চক্রায়ুধকে সিংহসনে বসান। চক্রায়ুধ আবার গুর্জরপ্রতিহার রাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট কর্তৃক উৎখাত হন।

আরউইন, লর্ড : লর্ড আরউইন ১৯২৬—৩১ খৃ ভারতের ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল ছিলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর শাসনকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১৯২৭ খৃ সাইমন কমিশন ভারতে আসে। ১৯১৯ খৃ শাসন সংস্কার আইন (যা মণ্টেগু চেমসফোর্ড বা মণ্টফোর্ড শাসনসংস্কার নামে অভিহিত) ভারতে কতটা কার্যকর হয়েছে তা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ঐ কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু কমিশনে কোন ভারতীয় না থাকায় ভারতের জাতীয় নেতারা সাইমন কমিশনের সঙ্গে কোন সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নেন।

সাইমন কমিশন-বিরোধী বিক্ষোভে যোগদানের জন্য এদেশে ও ইংলণ্ডে বহু ভারতীয় কারাবরণ করেন। কিন্তু ভারতীয়দের বিরোধিতা সত্ত্বেও সাইমন কমিশনের কাজ বন্ধ হয় না। ১৯৩০ সালে, সমীক্ষার শেষে কমিশন বৃটিশ সরকারের কাছে যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাতে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব থাকে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে আইন সভা গঠন, ভোটাধিকার প্রসার, দায়িত্বশীল সরকার গঠন প্রভৃতিরও প্রস্তাব করা হয়।

ইতিমধ্যে ১৯২৯ খৃ কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু বৃটিশ সরকার সে প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ায় ১৯৩০ খৃ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারা ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়।

ওদিকে সাইমন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বৃটিশ সরকার লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক ডাকেন। তাতে ভারতের সব রাজনৈতিক দলের নেতাকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী বন্দী থাকায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা হয়। তখন বৃটিশ সরকার মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দেন এবং লর্ড আরউইন ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐ চুক্তি গান্ধী-আরউইন চুক্তি নামে অভিহিত। চুক্তির শর্ত অনুসারে আইন অমান্য আন্দোলনের সব বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। কংগ্রেস দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানে সম্মত হয় (১৯৩১ খৃ)। ঐ বছরেই লর্ড আরউইনের কার্যকাল শেষ।

আরকট: বর্তমান তামিলনাড়ু রাজ্যের দুই জেলা উত্তর ও দক্ষিণ আরকট সুপ্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। দক্ষিণ আরকটে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নানা নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। খৃষ্টাব্দের সূচনায় সেখানে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব ছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণ আরকটে চোল রাজাদের শাসন কায়েম হয়। তারপর পল্লবদের আগমন ঘটে এবং নবম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ আরকটে পল্লব রাজাদের শাসন চলে। পল্লব রাজাদের শাসনকালে আরকট অঞ্চলে দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করে।

আরব অভিযান, ভারতে: আরবরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর বিশ্বের দিকে দিকে ধর্ম প্রচার ও রাজ্য জয়ের উদ্দেশ্যে অভিযান সুরু করে।

ভারতের উপকূলে আরবদের প্রথম অভিযান হয় ৬৩৬-৩৭ খৃ, খলিফা ওমরের শাসনকালে। আরবরা বোম্বাই -এর নিকটবর্তী ঠানায় উপস্থিত হয় ও লুণ্ঠনাদির পর স্বদেশে ফিরে যায়। তারপর তৃতীয় খলিফা ওসমানের শাসনকালে ৬৪২-৪৩ খৃ, আরবদের দ্বিতীয় বৃহৎ অভিযান চালিত হয় কিরমান ও মাক্রামের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেবারেও লুণ্ঠনেই অভিযান শেষ হয়, ভারতের কোন অঞ্চলে আরব শাসনের পত্তন হয় না।

ভারতে আরবদের প্রথম ব্যাপক অভিযান পরিচালিত হয় ৭১২ খৃ। সিংহলের রাজা আরবের খলিফাকে যে আট জাহাজ বোঝাই উপঢৌকন পাঠান তা দেবলে (বর্তমান করাচি) জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। সে কারণে খলিফার প্রতিনিধি, ইরাকের শাসক হজ্জাজ, সিন্ধুর হিন্দু রাজা দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু দাহির জানান যে দেবল তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সে কারণে ঐ লুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর নয়। হজ্জাজ তখন দাহিরকে শাস্তি দিতে সৈন্য পাঠান। কিন্তু দাহিরের সৈন্যবাহিনী তাদের পরাস্ত করে ও আরব সেনাপতি যুদ্ধে নিহত হয়। ঐ ব্যর্থতার পর মহম্মদ-বিন-কাশিমের নেতৃত্বে একটি বিশাল আরব বাহিনী ৭১২ খৃ দেবলে প্রেরিত হয়। তার সঙ্গে যোগ দেয় হিন্দু রাজা দাহিরের প্রতি বিরূপ স্থানীয় জাঠ ও বৌদ্ধগণ। কাসিমের আক্রমণে দেবল বিধ্বস্ত হয় ও অগণিত মানুষের প্রাণহানি ঘটে। দেবল জয়ের পর কাসিম সিন্ধুনদী অতিক্রম করে দাহিরের রাজ্য আক্রমণ করেন। দাহির সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়ান কিন্তু শেষপর্যন্ত পরাজিত ও নিহত হন। তারপর প্রায় সমগ্র সিন্ধু প্রদেশ মহম্মদ বিন কাশিমের অধিকার ভুক্ত হয়।

কিন্তু কোন কারণে কাশিম খলিফার বিরাগভাজন হলে খলিফা তাঁকে হত্যার নির্দেশ দেন। খলিফা ওয়ালিদ-এর নির্দেশে ৭১৫ খৃ কাশিমকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

সিন্ধু প্রদেশে আরব শাসন প্রায় দু'শ বছর স্থায়ী ছিল। কিন্তু আরবদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ শুরু হওয়ায় আরব রাজ্য ভারতে আর বিস্তার লাভ করে না এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে মহম্মদ ঘুরির হাতে পরাজয়ের পর ভারতে আরব শাসনের অবসান ঘটে।

আরব আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফল ভারতে ইসলাম ধর্মের বিস্তার। ঐ সময়েই সিন্ধু ও পাঞ্জাবের অধিবাসীদের একটি বড় অংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তারপর সিন্ধু প্রদেশে আরব অভিযানের সাফল্য অন্যান্য পরাক্রমশালী প্রতিবেশীর কাছে ভারতের দুর্বলতা প্রকাশ করে। ফলে আত্মকলহে আরব দুর্বল হয়ে পড়লেও অন্যান্য শক্তির ভারত অভিযান শুরু হয়।

আর্য : ইউরেশিয়ার এক প্রাচীন সুসভ্য জাতি। তাদের আদি বাস ছিল রুশদেশের উরাল পর্বতের দক্ষিণস্থ শুষ্ক সমতল তৃণভূমি অঞ্চলে। ঐ শ্বেতকায়, দীর্ঘাকৃতি নীলনয়ন, উন্নতনাসা মানুষগুলি প্রায় পাঁচ হাজার বছর একই স্থানে বসবাসের পর নানা কারণে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে আর্যদের একটি শাখা প্রবেশ করে আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদে আর্যদের আর্য বা আর্‌য় নামে উল্লেখ আছে। অনুরূপভাবে ইরানের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ আবেস্তায় আর্যরা 'ঐরয়' নামে উল্লেখিত। সুদূর আয়ারল্যাণ্ডের 'আয়ার' কথাটিও আর্য হতে উদ্ভূত বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। আর্যদের

প্রাচীন ভাষা বৈদিক সংস্কৃত। যা গ্রীক. লাতিন, গথিক, আর্মানি প্রভৃতি ভাষার আদি জননীরূপে স্বীকৃত।

ঋগ্‌বেদের যুগে আর্যগণ আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও সমগ্র সিন্ধু উপত্যকায় নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে। পাঞ্জাব তখন আর্য সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল। যজুঃ ও অথর্ববেদের যুগে আর্য অধিকার পূর্ব-ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিকাংশ স্থানে বিস্তৃত হয়। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে সমগ্র ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তারলাভ করে।

আর্যদের যুগে সমাজে জাতিভেদ ছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে বৃত্তির ভিত্তিতে আর্য প্রভাবিত ভারতীয় সমাজ ব্রাহ্মণ. ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারভাগে বিভক্ত হয়। ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল পূজার্চনা অধ্যাপনা প্রভৃতি; ক্ষত্রিয়ের কাজ ছিল রাজ্যশাসন ও দেশরক্ষা; বৈশ্যদের বণিকবৃত্তি; আর শূদ্রদের কাজ ছিল চাষবাস ও অপর তিন শ্রেণীর সেবা। আর্যরা প্রথম তিন শ্রেণীভুক্ত ছিল এবং উপবীত তাদের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিত। আর আর্যদের বশ্যতা স্বীকারকারী অনার্যরা ছিল শূদ্র। সমাজের উচ্চ তিনশ্রেণীর মধ্যে কোন সামাজিক ব্যবধান ছিল না, পরস্পরের মধ্যে বিবাহেরও প্রচলন ছিল। এ ব্যাপারে সংকীর্ণতা আসে বৈদিক যুগের শেষে।

বৈদিকযুগে আর্যরা ছিল সৎ, ধর্মপরায়ণ ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নারী ছিল প্রকৃত অর্থে পুরুষের সহধর্মিনী। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুরুষের কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না। সমাজে নারীর যোগ্যতা ও প্রতিভার স্বীকৃতি ছিল। বৈদিকযুগে গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপলা, ঘোষা প্রমুখ বহু নারী বিভিন্ন শাস্ত্রে অশেষ পারদর্শিতা দেখান। নারীদের বেশি বয়সে বিবাহ হ'ত এবং বিবাহের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের বিবাহরীতি প্রচলিত হওয়ার পরেই বোধহয় আর্য-সমাজে স্ত্রীর অধিকার সঙ্কুচিত হতে থাকে, নারীর ধর্মগ্রন্থ পাঠের অধিকারও লোপ পায়।

আর্যরা ধর্মপ্রাণ জাতি ছিল এবং সূর্য চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করত। পূজার পদ্ধতি ছিল যাগযজ্ঞ, স্তোত্রপাঠ প্রভৃতি। কিন্তু মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। এ ব্যাপারে আর্যরা সম্ভবত অনার্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। পূজায় পশু বলিও সম্ভবত অনার্য প্রভাবিত।

আর্যদের অর্থনৈতিক জীবন ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। সেদিন যব, গম প্রভৃতি খাদ্য শস্যের চাষ হ'ত। তাঁত মৃৎশিল্প ধাতুশিল্প ও নানাবিধ সুচারু-শিল্পও বৈদিকযুগে আর্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মাছ, মাংস, দুধ, সবজি প্রভৃতিও আর্যদের খাদ্য ছিল। গরু ছিল সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ; অথর্ববেদে এক স্তোত্রে আছে—যার গোসম্পদ নেই সে হতভাগ্য। পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে আর্যরা ছিল অনাড়ম্বর। তবে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অলঙ্কারপ্রিয় ছিল।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে আর্যরা ভারতের বিভিন্নস্থানে বসতি গড়ে তোলে। ঐ দলগুলি 'জন' নামে পরিচিত ছিল এবং কয়েকটি 'জন' মিলে যে বসতি গড়ে তুলত তাকে বলা হত জনপদ। পরবর্তী কালে ঐ জনপদগুলি নানা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে ঐক্য-বদ্ধ হয়ে এক একটি মহাজনপদ গড়ে তোলে। ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব-কালে খৃ.-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীতে, বিভিন্ন গ্রন্থে ভারতে ১৬টি জনপদের উল্লেখ মেলে। জনপদ ও মহাজনপদগুলির প্রধান ছিলেন রাজা বা রাজন। বৈদিকযুগে কয়েকটি প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল। ঋগ বেদে নির্বাচিত রাজারও উল্লেখ আছে।

রাজা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন 'সভা' ও 'সমিতি' নামে দুটি প্রতিনিধি-সভার সহায়তায়। রাজ্যের প্রাচীন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হত 'সভা' এবং জন-প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হ'ত 'সমিতি'। গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল, 'গ্রামণী'র। মৌর্যযুগে কয়েকটি মহাজনপদ নিয়ে গ'ড়ে ওঠে এক একটি 'চতুরান্ত রাজ্য', যার মানে হল চার অন্তব্যাপী রাজ্য।

আর্যদের সমাজজীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট ছিল 'চতুরাশ্রম'। সমাজের উচ্চ তিন শ্রেণীর মানুষের জীবন চারটি আশ্রমে বিভক্ত ছিল। বাল্যে গুরুগৃহে শিক্ষাকাল ছিল 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম'। শিক্ষান্তে যৌবনে শুরু হ'ত 'গার্হস্থ্যাশ্রম'; বিবাহ ও সাংসারিক বিভিন্ন কর্তব্য সে সময় পালিত হত। গার্হস্থ্যাশ্রম ছিল সর্বাধিক দীর্ঘস্থায়ী ও দায়িত্বপূর্ণ কাল। গৃহস্থের উপর ব্রহ্মচারী আশ্রিতজন ভিক্ষাজীবী ও সন্ন্যাসীরা নির্ভরশীল ছিল। পৌত্র জন্মের পর সাধারণত গার্হস্থ্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটত প্রৌঢ়কালে, সাংসারিক দায়িত্ব মুক্তির পর শুরু হত বানপ্রস্থ আশ্রম। তখন গৃহী নিজ গৃহে অথবা নিকটবর্তী কোন বনে কুটির বেঁধে সহধর্মিনীকে নিয়ে অথবা একক-ভাবে পরমার্থিক চিন্তায় নিমগ্ন হতেন। বানপ্রস্থ আশ্রম ছিল পরবর্তী আশ্রম সন্ন্যাসের প্রস্তুতিকাল। চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস ছিল সম্পূর্ণরূপে সংসার ও পরিবারবন্ধনমুক্ত অরণ্যচারী জীবন।

আর্যদের বৈদিক সাহিত্য ও ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার। আর্যসৃষ্ট বেদ, পুরাণ ও মহাকাব্যগুলির কাহিনী ও মূল-চিন্তাধারার অনুসরণে রচিত হয়েছে পরবর্তীকালের মহান সংস্কৃত সাহিত্য আর ঐ সংস্কৃত সাহিত্যই বর্তমান ভারতের সকল ভাষার আদি জননী। বৈদিক ভারতকে না জেনে আজকের ভারতকে ঠিকমত জানা সম্ভব নয়।

আর্যভট : পঞ্চম শতাব্দীর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ। বাসস্থান ছিল কুসুমপুর, বর্তমান পাটনা শহর। অলবিরুনির বিভিন্ন রচনায় কুসুমপুরের আর্যভটের বারবার উল্লেখ আছে। গ্রীকদের রচনায় তিনি অদ্‌বেরিয়াস ও আরবদের রচনায় অর্জভর নামে উল্লেখিত। বহু গাণিতিক সূত্র ছাড়াও তিনি পৃথিবীর আহ্নিক গতি উদ্ভাবন করেন যা পরবর্তীকালে বরাহমিহির প্রমুখ ভারতীয় জ্যোতিবিদ-

দের দ্বারাই অস্বীকৃত হয়েছিল। আর্যভটই ভারতে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্যোতিষ শাস্ত্রের সূচনা করেন।

আর্য সমাজ : হিন্দু ধর্মের সংস্কার কল্পে দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৭৫ সালে আর্য সমাজ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। জাতিভেদ লোপ, অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন, বাল্য বিবাহ নিরোধ প্রভৃতি কাজে সমাজ আত্ম নিয়োগ করে। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আর্য সমাজের নিকট সম্পর্ক ছিল। অন্য ধর্মাবলম্বীদের হিন্দু ধর্মে দীক্ষা দেওয়া সমাজের অন্যতম কাজ ছিল। একদা ভারতের রাজনীতিতে আর্য সমাজের বিশেষ প্রভাব ছিল।

আর্যাবর্ত : আর্যসভ্যতা প্রভাবিত ও আর্যজাতি অধ্যুষিত ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আর্যাবর্ত নামে পরিচিত হয়। প্রায় পাঁচ শত খৃষ্ট-পূর্বাব্দে রচিত বৌধায়ন ধর্মসূত্রে আর্যাবর্ত নামের উল্লেখ আছে। তাতে আর্যাবর্তের সীমা উল্লেখিত হয়েছে পশ্চিমে অদর্শন (কুরুক্ষেত্র), পূর্বে কালকবন (উত্তর প্রদেশের মধ্যবর্তী কোন স্থান), উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে পরিষাত্র (বিন্ধ্য পর্বত)। খৃষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে সঙ্কলিত মনুস্মৃতিতে আর্যাবর্তের সীমানা আরও বর্ধিত হতে দেখা যায়। তাতে আছে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত, পূর্ব ও পশ্চিমে সাগর অর্থাৎ, বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর। মনুর যুগেই উত্তর ভারত আর্যাবর্ত এবং দক্ষিণ ভারত দাক্ষিণাত্য নামে পরিচিত হয়।

আরাম শাহ : দাসবংশীয় সুলতান-শাহির প্রতিষ্ঠাতা কুতবুদ্দিন আইবকের পুত্র, মতান্তরে দত্তক পুত্র। কুতবের মৃত্যুর পর লাহোরের তুর্কি আমির ওমরাহদের ইচ্ছায় দিল্লীর মসনদে বসেন, কিন্তু দিল্লীর তুর্কি অভিজাত মহল তাঁর বিরোধিতা করেন। তাঁরা কুতবের জামাতা ও বুদাউনের শাসক ইলতুৎমিসকে দিল্লীর মসনদ দখলের আমন্ত্রণ জানান। সেইমতো ইলতুৎমিস দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন এবং আরাম শাহকে পরাজিত ও বন্দী করে দিল্লীর মসনদ অধিকার করেন। ফলে মাত্র এক বছরের মধ্যে (১২১০-১১ খৃ) আরাম শাহর সুলতানির অবসান ঘটে।

আরাম শাহ ছিলেন অত্যন্ত মদ্যপ, অমিতব্যয়ী এবং শাসন কার্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

আরিকমেডু : দক্ষিণভারতে পণ্ডিচেরির নিকটবর্তী একটি ঐতিহাসিক স্থান। সেখানে খননকার্য চালিয়ে খৃষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের রোমান শাসকদের মুদ্রা পাওয়া যায় যাতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময় দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে রোমের বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল।

আলবুকার্ক (১৪৫৩—১৫১৫): ভারতে প্রথম পর্তুগীজ উপনিবেশের প্রতিষ্ঠাতা ও পর্তুগীজ ভারতের প্রথম গভর্নর। ১৫০৩ খৃ স্কোয়াড্রন অধিনায়করূপে আলবুকার্ক ভারতে আসেন। সে কাজে সাফল্য প্রদর্শন করায় ১৫০৯ খৃ ভারতে পর্তুগীজ বাণিজ্য কুঠিগুলির গভর্নর নিযুক্ত হন।

১৫১০ খৃ বিজাপুরের আদিলশাহি সুলতানের কাছ থেকে গোয়া দখল করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় পর্তুগীজরা পূর্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ নৌশক্তিতে পরিণত হয়। আলবুকার্ক কোচিনে যে দুর্গ নির্মাণ করেন সেটি ভারতে প্রথম ইউরোপীয় দুর্গ। ১৫১৫ খৃ আলবুকার্ক কর্মচ্যুত হন এবং সে বছরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আলমগির : ঔরঙ্গজেব দ্র

আলমগির দ্বিতীয় (১৭৫৪ ৫৯) : জাহান্দার শাহর পুত্র আজিজুদ্দিন ১৭৫৪ খৃ মোগল মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দ্বিতীয় আলমগির নাম গ্রহণ করেন। সিংহাসনারোহনকালে তাঁর বয়স ছিল ৫৫ বছর। তাঁর কোন প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ছিলনা এবং যুদ্ধ বিদ্যায়ও তিনি অপটু ছিলেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক ও বিদ্যানুরাগী। প্রশাসনিক পটুতা না থাকার জন্য তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রী (ওয়াজির) ইমাদুল মুল্‌কের হাতের পুতুলে পরিণত হন।

তাঁর শাসনকালে, ১৭৫৬ খৃ আহমেদ শাহ আবদালি চতুর্থবার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি দিল্লী জয় করে সেখানে একমাস থাকেন। আহমেদ শাহর অত্যাচার ও লুন্ঠনে দিল্লী তছনছ হয়। ঐ সময় তাঁর পুত্র তৈমুরের সঙ্গে দ্বিতীয় আলমগিরের কন্যার বিবাহ হয়। কয়েক কোটি টাকার সম্পদ লুঠ করে আহমেদ শাহ দিল্লী ত্যাগ করেন।

এদিকে দ্বিতীয় আলমগিরের সঙ্গে তাঁর ওয়াজির ইমাদুল মুল্‌কের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং ইমাদুল মুল্‌ক ষড়যন্ত্র করে দ্বিতীয় আলমগিরকে হত্যা করেন (১৭৫৯ খৃ)। তারপর ঔরংজেবের ভাই কাম বক্সের পৌত্র মুহি-উল মিল্লাতকে মোগল মসনদে বসানো হয় এবং তিনি তৃতীয় শাহজাহান নাম গ্রহণ করেন।

আলমগিরনামা : ঐতিহাসিক মির্জা মহম্মদ খাঁ বিরচিত সম্রাট ঔরংজেবের প্রথম দশ বছর শাসনকালের ইতিহাস। সম্রাটের উৎসাহে মির্জা মহম্মদ খাঁ ঐ গ্রন্থ রচনা করেন এবং ১৬৮৮ খৃ সম্রাটের শাসনকালের ৩২ তম বর্ষে, সম্রাটের হাতে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি অর্পণ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, সম্রাট গ্রন্থকারকে ঐ গ্রন্থের সঙ্গে আর কোন অধ্যায় সংযুক্ত করতে নিষেধ করেন। গ্রন্থটিতে সম্রাটের যে ভাবে কারণে অকারণে প্রশংসা করা হয় এবং সম্রাটের শত্রুদের অশালীন ভাষায় নিন্দা করা হয় সেটা সম্ভবত স্থির বুদ্ধি ঔরংজেবের ভাল লাগেনি। লেখকের রচনারীতিও নিম্ন মানের। তবে ইতিহাসের সূত্র হিসাবে গ্রন্থটির মূল্য আছে।

আলমগিরপুর : উত্তর প্রদেশে মিরাট জেলায় যমুনার উপনদী হিণ্ডনের তীরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। ১৯৫৮—৫৯ সালে এখানে উৎখননের ফলে হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। আলমগিরপুর হরপ্পা সভ্যতার পূর্ব সীমান্ত বলে মনে করা হয়।

আলাউদ্দিন আলম শাহ : দিল্লীর সৈয়দ বংশের শেষ সুলতান। শাসন-কাল ১৪৪৬-৫১ খৃ। দুর্বল অযোগ্য

শাসক। তাঁর শাসনকালে লাহোর ও সরহিন্দের শাসক বাহ্লোল লোদি বিদ্রোহী হন এবং ১৪৫১ খৃ দিল্লীর মসনদ অধিকার করে সৈয়দবংশের শাসনের অবসান ঘটান ও লোদিবংশীয় শাসনের সূচনা করেন।

আলাউদ্দিন খলজি: দিল্লীর খলজি সুলতানবংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালুদ্দিন খলজির ভ্রাতুষ্পুত্র, জামাতা ও পরবর্তী সুলতান। জালালুদ্দিনের শাসনকালেই আলাউদ্দিন রণদক্ষতার পরিচয় দেন এবং সেকারণে জালালুদ্দিন তাঁকে প্রথমে কারা এবং পরে অযোধ্যারও শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১২৯২ খৃ আলাউদ্দিন ভিলসা জয় করে প্রচুর ঐশ্বর্য হস্তগত করেন। ১২৯৬ খৃ দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রকে পরাজিত করে তাঁর কাছ থেকেও অনেক ধন-দৌলত আদায় করেন। দাক্ষিণাত্যে তিনিই প্রথম মুস্লিম অধিকার বিস্তার করেন। ১২৯৬খৃ পিতৃব্য জালালুদ্দিনকে হত্যা করে তিনি দিল্লীর মসনদ অধিকার করেন।

আলাউদ্দিন সিংহাসনে বসার অনেক আগে থেকেই ভারতে মোঙ্গলদের আক্রমণ বিশেষ বিপদের কারণ হয়। সুলতান আলাউদ্দিনের শাসনকালে মোঙ্গলরা মোট পাঁচবার ভারত আক্রমণ করে। কিন্তু প্রতিবারই আলাউদ্দিন অসম সাহসিকতার সঙ্গে সে আক্রমণ প্রতিহত করেন। মোঙ্গলদের সন্ত্রস্ত করতে আলাউদ্দিন চরম নিষ্ঠুরতার পথ নেন। তিনি দিল্লীর উপকণ্ঠে বসতি স্থাপনকারী সব মোঙ্গলদের হত্যা করেন। এমনকি নারী ও শিশুরাও সে ভয়ংকর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় না। দিল্লীর উপকণ্ঠে বসতি স্থাপনকারী মোঙ্গলরা মুস্লিম ধর্ম গ্রহণ করে। সে কারণে তারা নব মুসলমান নামে পরিচিত ছিল।

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন পাঁচ লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল শক্তিশালী বাহিনী গঠন করেন। কিন্তু মোঙ্গল আক্রমণ দফায় দফায় প্রতিহত করার পর সৈন্যদের যখন কোন কাজ থাকত না তখন তাদের বসিয়ে না রেখে রাজ্য বিস্তারের কাজে নিয়োগ করা হত। সুতরাং আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যবিস্তার মোঙ্গল নীতির পরিণতি বলা যায়। মাত্র দুই দশকের মধ্যে আলাউদ্দিন একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

তিনি উত্তর-ভারতে ১২৯৭-১৩০৫ খৃ মধ্যে গুজরাত, রনথম্ভোর, চিতোর, মালওয়া প্রভৃতি জয় করেন এবং তার ফলে কার্যত সমগ্র উত্তর-ভারতের উপর আলাউদ্দিদের কর্তৃত্ব কায়েম হয়। ১৩০৫-১১ খৃ মধ্যে তিনি অধিকার করেন দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি, ওয়ারা-ঙ্গল, দ্বারসমুদ্রের হোয়সল রাজ্য, মাদুরা প্রভৃতি। তবে দাক্ষিণাত্যে রাজ্যজয় অপেক্ষা লুণ্ঠনের দিকেই আলাউদ্দিনের বেশি ঝোঁক ছিল এবং সে কারণে সামরিক সাফল্য ও ঐশ্বর্যলুণ্ঠনের পর কয়েকটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেই আলাউদ্দিন দাক্ষিণাত্য অভিযান শেষ করেন। সেদিন দূরত্ব ও সংযোগব্যবস্থার অভাবের জন্য দিল্লী থেকে দাক্ষিণাত্যের উপর প্রত্যক্ষ শাসন কায়েম রাখা সম্ভব ছিল না, এটা উপলব্ধি করার মধ্যে

আলাউদ্দিনের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের রাজাদের আনুগত্য স্বীকারেই আলাউদ্দিন সন্তুষ্ট ছিলেন।

আলাউদ্দিন ছিলেন দক্ষ শাসক এবং শাসনব্যবস্থার উপর তিনি কোন সময় ধর্মযাজকদের (উলেমা) প্রভাব বিস্তার করতে দেননি। সমগ্র প্রশাসন ও পদস্থ রাজকর্মচারীদের উপর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। আমির ওমরাহদের ক্ষমতাহ্রাসের জন্য তিনি তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং সুলতানের বিনা অনুমতিতে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সামাজিক সম্মেলন অথবা নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হয়। রাজ্যে কোথাও কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে কিনা তার খবর রাখতে আলাউদ্দিন ব্যাপকভাবে গুপ্তচর নিয়োগ করেন। তিনি রাজ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ করেন এবং নিজেও মদ্যপান ত্যাগ করেন। আলাউদ্দিন শিল্পানুরাগী ছিলেন এবং ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরুনি, কবি হোসেন দেহলবি, কবি আমির খসরু প্রমুখ গুণীজন তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। আফ্রিকার প্রখ্যাত পর্যটক ইবন বাতুতা আলাউদ্দিনকে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে বর্ণনা করেছেন।

তবে আলাউদ্দিন অত্যন্ত হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন। হিন্দুদের জিজিয়া ছাড়াও অর্ধেক ফসল রাজস্ব দিতে হত কঠোর শাসনের জন্য মুস্লিম অমাত্যরাও তাঁর প্রতি বিরূপ হন। ফলে তাঁর জীবদ্দশাতেই বিদ্রোহ ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু হয়। শেষ জীবনে আলাউদ্দিন তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুরের ক্রীড়ণকে পরিণত হন। ১৩১৬ খৃ আলাউদ্দিনের মৃত্যু হয়।

আলাউদ্দিন শাহ বাহ্‌মনি: দাক্ষিণাত্যে দৌলতাবাদে (দেবগিরি) বাহমনিরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। শাসনকাল ১৩৪৭-৫৮ খৃ। পূর্বনাম হাসান গাঙ্গু। নিজেকে পারস্যের রাজা বাহমনের বংশধর বলে দাবি করতেন, সেকারণে সিংহাসনারোহণের পর আলাউদ্দিন হাসান শাহ বাহমনি নাম গ্রহণ করেন। দক্ষ শাসক ছিলেন এবং উত্তরে এলিচপুর থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী, পশ্চিমে আরব সাগর থেকে পূর্বে ভোঙ্গির পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য গড়ে তোলেন। শাসনের ব্যাপারে তাঁর নীতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রজাকল্যাণ।

আলাউদ্দিন হুশেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯): বাঙলার শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি বাঙলা থেকে হাবসিদের বিতাড়িত করেন। তাঁর শাসনকালে বাঙলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয়। হুসেনশাহ ছিলেন সাহিত্যানুরাগী এবং হিন্দু ও মুস্লিম পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক। হুসেন শাহর সেনাপতি পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পরমেশ্বর কর্তৃক মহাভারত অনূদিত হয়। হুসেনশাহের শাসনকালে বাঙলাদেশে মালাধর বসু, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস প্রমুখ লেখকদের আবির্ভাব ঘটে। সেই ধর্মীয় সৌহার্দ্যের যুগেই শ্রীচৈতন্য (১৪৮৫—১৫৩৩) প্রেমধর্ম প্রচার করেন। ১৫১৯ খৃ হুসেনশাহের মৃত্যু হয়।

আলাওল: মধ্যযুগে, সপ্তদশ

শতাব্দীর সূচনায়, আরাকানরাজের সভার অন্যতম কবি ছিলেন। তাঁর রচিত পদ্মাবতী ও অন্যান্য কাব্য বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ। তাঁর কাব্য রচনাকাল ১৬৪৫—৬০ খৃ।

আলি ইমাম (১৮৬৯—১৯৩২) **:** ব্যারিষ্টাররূপে কর্মজীবনের সূচনা, পরে পাটনা হাইকোর্টের জজ ও ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রথম মুস্লিম সদস্য। ১৯১০ খৃ অমৃতসরে মুস্লিম লীগের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, এবং মুস্লিম সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি সমর্থন করেন। পরবর্তী কালে তিনি সে মত পরিবর্তন করেন এবং কোন সম্প্রদায়ের জন্যই কোন আসন সংরক্ষিত থাকা উচিত নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

আলিগড় আন্দোলন : স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে ভারতের মুস্লিম সম্প্রদায়ের একাংশ এই আন্দোলন সংগঠিত করেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয় তাতে বহু জাতীয়তাবাদী মুস্লিম যোগ দেন এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তিই বৃটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত বাতিলে বাধ্য করে। ঐ জাতীয় ঐক্যে সন্ত্রস্ত বৃটিশ সরকার সেদিন যে বিভেদ-নীতি অনুসরণ করেন তারই ফলে আলিগড় আন্দোলনের উদ্ভব।

ইলবার্ট বিল্-এর সমর্থনে জাতীয় আন্দোলনকালে স্যার সৈয়দ আহমদ জাতীয়তাবাদী শক্তির সঙ্গে ছিলেন। তখন তিনি ভারতের হিন্দু মুসলমানকে ভারত মাতার দুই চক্ষু ব'লে বর্ণনা করেছিলেন্। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি ভিন্ন পথ ধরেন এবং পশ্চাদপদ মুস্লিমসমাজের উন্নতির ধ্বনি তুলে একটি স্বতন্ত্র বৃটিশ-অনুগত মুস্লিম আন্দোলন গড়ে তোলেন। আলিগড়ে স্যার সৈয়দ আহমদের উদ্যোগে একটি মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়টি পরবর্তীকালে মুস্লিম সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

আলিবর্দি খাঁ : আরবদেশীয় পূর্ব পুরুষের বংশধর নবাব আলিবর্দি খাঁর প্রকৃত নাম মির্জা মহম্মদ আলি। প্রথম জীবনে তিনি মোগল সম্রাট ঔরংজেবের পুত্র আজমশাহর গৃহে সামান্য পরিচারক ছিলেন। পরে ভাগ্যান্বেষণে নানা দেশ ঘুরে বাঙলায় আসেন। তখন বাঙলা-বিহার-ওড়িশার সুবাদার ছিলেন মুর্শিদ কুলি খাঁ। আলিবর্দি খাঁ তাঁর কাছে চাকরি চেয়ে নিরাশ হন। তখন তিনি কটক চলে যান ও নবাবের জামাতা ও ওড়িশার নায়েব সুবা সুজাউদ্দিন খাঁর দরবারে সামান্য কাজ পান। সেখানেই স্বীয় প্রতিভাবলে আলিবর্দি খাঁ রাজ্য পরিচালনার কাজে সুজাউদ্দিনের প্রধান পরামর্শদাতা পদে উন্নীত হন। পরে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু হলে সুজাউদ্দিন খাঁ আলিবর্দি খাঁর সহায়তায় বাঙলার মসনদ দখল করেন।

১৭৩৯ খৃ সুজাউদ্দিনের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ নবাব হন। সরফরাজ ছিলেন বিলাসী, অত্যাচারী, দুর্বলচিত্ত শাসক। তাঁর শাসনে বাঙলার লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে সেই অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে আলিবর্দি খাঁ

সরফরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। ১৭৪০ খৃ গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হলে আলিবর্দি খাঁ বাঙলায় মসনদ দখল করেন।

সুশাসক আলিবর্দি খাঁর শাসনকালে (১৭৪০-৫৬) বাঙলাদেশে শান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। বর্গি হাঙ্গামা দমন-নবাব আলিবর্দি খাঁর এক অনন্য কীর্তি। তিনি বর্গিদের সর্দার ভাস্করপণ্ডিতকে কৌশলে মুর্শিদাবাদে বন্দী করেন। ১৭৪৪ খৃ বহু অনুচরসহ ভাস্কর পণ্ডিত আলিবর্দি খাঁর সৈন্যদের হাতে নিহত হন।

বাঙলাদেশের আর্থিক উন্নতির আশায় আলিবর্দি খাঁ বিদেশি বণিকদের বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। তাঁর জীবদ্দশায় কোন বিদেশি বণিক সংস্থা বাঙলায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আলিবর্দি খাঁ বহু হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন এবং দক্ষ পক্ষপাতহীন শাসনের জন্য তিনি হিন্দু মুস্লিম সকল প্রজার শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

আলিবর্দি খাঁর কোন পুত্র ছিল না বলে তিনি তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র সিরাজুদ্দৌলাকে বাঙলার মসনদের উত্তরাধিকারী মনোনীত ক'রে যান।

আলেকজাণ্ডার: গ্রীসের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ম্যাসিডন রাজ্যের নৃপতি ফিলিপের পুত্র আলেকজাণ্ডার বিশবছর বয়সে, ৩৩৬ খৃ পূ পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। সিংহাসন লাভের পরেই তিনি বিশ্ববিজয়ের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। প্রথমে আলেকজাণ্ডার সমগ্র গ্রীসের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তারপর ৩৩০ খৃ.পূ থেকে মাত্র তিন বছরের মধ্যে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মিশর তুর্কিস্তান, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল, আফগানিস্তান ও ব্যাকট্রিয়া জয় করে, ৩২৭ খৃ-পূ হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন। সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরের ছোট ছোট রাজ্যগুলি প্রায় বিনা বাধায় আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করে, সিন্ধুর পূর্ব তীরে তক্ষশিলার রাজা অম্ভিও বিনা যুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু তার পার্শ্ববর্তী রাজা পুরু আত্মসমর্পণের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন ও বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সম্মুখীন হন। যুদ্ধে পুরুর বারো হাজার সৈন্য নিহত হয় এবং পুরু নিজে আহত অবস্থায় বন্দী হন। কিন্তু পুরুর বীরত্বে আলেকজাণ্ডার মুগ্ধ হন ও তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন। তারপর আলেকজাণ্ডার আরও অগ্রসর হয়ে চন্দ্রভাগানদী অতিক্রমকরে কয়েকটি রাজ্য দখল করেন। তারপর ইরাবতী নদী অতিক্রম করে তিনি সাঙ্গালা (বর্তমান শিয়ালকোট) রাজ্য প্রবল যুদ্ধের পর জয় করেন। ইরাবতী ও বিপাশার মধ্যবর্তী সৌভূতি, ভগলা প্রমুখ আরও কয়েকটি রাজ্য আলেকজাণ্ডারের হস্তগত হয়। তারপর আলেকজাণ্ডার বিপাসা নদী অতিক্রমের উদ্যোগ করলে দীর্ঘপ্রবাসী রণক্লান্ত গ্রীক সৈন্যরা তাতে আপত্তি জানায়। ফলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিশ্ববিজয়ের অভিযান স্থগিত রেখে আলেকজাণ্ডারকে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করতে হয়। ভারত ত্যাগের পূর্বে তিনি পুরুকে বিতস্তা ও বিপাসা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চ-

লের এবং অম্ভিকে বিতস্তার পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলের শাসন দায়িত্ব অর্পণ করে যান। প্রত্যাবর্তনের পথে ব্যাবিলনে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়।

আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ফলে ভারত সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে, ভারতে নতুন সাহিত্যরীতি ও শিল্পকলার সূচনা হয়। ভারতে কয়েকটি ক্ষুদ্র গ্রীক রাজ্যের সৃষ্টি হয় যা পরবর্তী ভারতের ইতিহাসকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। তখন থেকে ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হয়।

আলেকজাণ্ডার, কানিংহাম: ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় আলেকজাণ্ডার কানিংহামের অবদান সীমাহীন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সামরিক বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার। প্রত্নতত্ত্বে বিশেষ অনুরাগী এই মনীষী জেমস্ প্রিন্সেপের সহায়তায় প্রাচীন ভারতের বহু লুপ্ত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পুনরুদ্ধার করেন। চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন ও হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত অনুসরণ করে কানিংহাম ১৮৬১-৬৫ খৃ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় অনুসন্ধান চালান এবং বহু মুদ্রা, লেখ ও ভাস্কর্য কীর্তি উদ্ধার করেন। ১৮৭৭ খৃ তিনি অশোক লেখমালা প্রকাশ করেন। বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন নাম ও তার সঠিক অবস্থিতি নির্ধারণে কানিংহাম অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। তক্ষশিলা, শ্রাবস্তী, কৌশম্বী, বৈশালী প্রভৃতি প্রাচীন নগরীর অবস্থান ও নাম তিনিই উদ্ধার করেন। গুপ্তযুগের স্থাপত্যরীতির স্বরূপ নির্ণয় তাঁর অন্যতম কীর্তি। ১৮৫১-৮৫ খৃ পর্যন্ত কানিংহাম ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কার্যে লিপ্ত ছিলেন।

আসফ আলি (১৮৮৮-১৯৫২): জাতীয়তাবাদী নেতা, ব্যারিষ্টার। প্রথমে ১৯১৯ খৃ খিলাফৎ আন্দোলনে পরের বছর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে যোগদানের জন্য ১৯২১, ৩০ ও ৪২ সালে ধৃত ও দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৩৫-৪৬ খৃ কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতার পর প্রথমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। পরে বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত ও ভারতে রাজ্যপালের দায়িত্ব নির্বাহ করেন।

আসফুদ্দৌলা: অযোধ্যার চতুর্থ নবাব। পিতা সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর ১৭৭৫ খৃ সিংহাসন লাভ করেন। অযোধ্যা তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে স্বাক্ষরিত ফৈজাবাদ চুক্তি অনুসারে অযোধ্যায় অবস্থানকারী ইংরেজ সৈন্যদের খরচ বহনে বাধ্য ছিল। সেই দায়িত্ব বহন করতে ইংরেজ সরকারের কাছে অযোধ্যার প্রচুর ঋণ হয়। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস সেই ঋণ শোধের জন্য চাপ দিলে নবাব আসফুদ্দৌলা তাঁর মাতা ও পিতামহীর কাছে তাঁদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া প্রচুর ধনরত্ন বলপূর্বক আদায়ের জন্য ইংরেজ সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করেন। ইংরেজ সরকার অযোধ্যার বেগমদের রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও প্রভূত বিত্তের লোভে ওয়ারেন হেষ্টিংস সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে

নবাবকে বেগমদের কাছ থেকে বলপূর্বক ধনদৌলত আদায়ের অনুমতি দেন এবং নবাবকে সে কাজে সাহায্যের জন্য ইংরেজ সৈন্যও পাঠানো হয়। পরে বৃটিশ পার্লামেন্টে যখন ওয়ারেন হেস্টিংস -এর বিচার হয় তখন তাঁর বিরুদ্ধে অযোধ্যার বেগমদের ধনরত্ন বলপূর্বক লুণ্ঠনেরও অভিযোগ আনা হয়েছিল।

ব্যক্তিগতভাবে আসফুদ্দৌলা দাতা হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তিনি অযোধ্যার রাজধানী ফৈজাবাদ থেকে লখনৌতে স্থানান্তরিত করেন। ১৭৯৭ খৃ তাঁর মৃত্যু হয়।

আসাম: রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের যুগে আসাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও কামরূপ নামে পরিচিত ছিল। অমূর্তরায় ধর্মারণ্য প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কালিকা পুরাণে আসাম কামরূপ নামে বর্ণিত। হরিষেণ এলাহাবাদ প্রশস্তিতে কামরূপকে সমুদ্রগুপ্তের করদ রাজ্যরূপে উল্লেখ করেছেন। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমকালীন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আসাম স্থানীয় নৃপতিদের দ্বারা শাসিত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বখতিয়ার খলজি (১২০৫) কামরূপ আক্রমণ করে ব্যর্থ হন।

আসাম যখন মুস্লিম অভিযানে বিব্রত সেই সময় পূর্ব আসামে সুকাফার নেতৃত্বে আহোমদের আক্রমণ শুরু হয় এবং ১২৫৩ খৃ চরাইদেওতে আহোম আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই আহোম থেকেই 'আসাম' নামের উদ্ভব। অবশ্য পার্বত্য প্রদেশ আসাম-এর নাম 'অসম' শব্দ থেকে উদ্ভূত বলেও একটি মত আছে। পূর্বে আহোম ও পশ্চিমে মুস্লিম আক্রমণের মধ্যে আসামের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। ১৬৬১ খৃ আহোমদের ক্রমবর্ধমান শক্তি দমনের উদ্দেশ্যে বাঙলার সুবাদার মির জুমলা আহোমরাজ্য আক্রমণ করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আহোমরাজা জয়ধ্বজ আত্মসমর্পণ করেন ও সমগ্র আসামে সাময়িকভাবে মুস্লিম অধিকার কায়েম হয়। কিন্তু ১৬৬৩ খৃ ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে মিরজুমলার মৃত্যু হলে আহোমরা বিদ্রোহী হয় ও কামরূপ পুনরধিকার করে।

উনিশ শতকে ব্রহ্মরাজ বোদায়পয় আসামের দিকে দৃষ্টি দেন এবং বর্মী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আহোমদের ইতস্তত সংঘর্ষ শুরু হয়। তারপর ১৮২২ খৃ বর্মার সেনাবাহিনীর কাছে আহোমরাজ চন্দ্রকান্ত পরাস্ত হওয়ায় আসামে আহোম সর্বভৌমত্বের অবসান ঘটে। ওদিকে শ্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানে ইংরেজ অধিকার বিস্তৃত হতে থাকে। ফলে আসামে অধিকার বিস্তার নিয়ে বর্মা ও ইংরেজ সরকারের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়। কিন্তু বৃটিশ সরকারের অগ্রগতি প্রতিরোধের ক্ষমতা বর্মী সৈন্যবাহিনীর ছিল না; এবং ১৮২৬ খৃ প্রায় সমগ্র আসামের উপর বৃটিশ অধিকার কায়েম হয়।

১৮৫৩ খৃ চার্টার এক্ট অনুসারে পরের বছর বাঙলা, বিহার, ওড়িশা ও আসামের শাসন দায়িত্ব একজন লেঃ গভর্নরের উপর দেওয়া হয়। পরে ১৮৭৪ খৃ আসামকে স্বতন্ত্র করে একজন চিফ কমিশনারের শাসনাধীনে আনা

হয়। ১৯০৫ খ্রি বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত অনুসারে আসাম ও পূর্ব বঙ্গকে নিয়ে একটি প্রদেশ গঠন করা হয়। কিন্তু জনগণের বিরোধিতার জন্য সে ব্যবস্থা ১৯১২ সালে রদ করে আসামকে আবার চিফ কমিশনারের শাসনাধীন করা হয়। ১৯১৯ খ্রি আসাম গভর্নর শাসিত প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে এবং ১৯৩৫ খ্রি ভারত আইন অনুসারে ভারতের আর দশটি প্রদেশের সঙ্গে আসামে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তিত হয়।

১৯৪৭ খ্রি দেশবিভাগের পর শ্রীহট্ট জেলা পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। অবশিষ্ট আসাম ভারতের অন্যতম রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে।

১৯৫৭ সালে নাগা হিলস জেলাকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ও তার সঙ্গে 'নেফার' (বর্তমান-অরুণাচল প্রদেশ) টুয়েনসাংএলাকা যুক্ত করে নাগাল্যাণ্ড নামে ভারতের অঙ্গরাজ্যটি গঠিত হয়। এরপর ১৯৭০ সালে খাসি-জয়ন্তিয়া হিলস ডিস্ট্রিক্ট আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ও ঐ দুই জেলা নিয়ে গঠিত হয় মেঘালয় রাজ্য। ১৯৭২ সালে মিজো ডিস্ট্রিক্টও আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিজোরাম নামে পরিচিত হয়। এই-ভাবে কয়েকটি জেলা আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর —বর্তমান আসাম রাজ্যের আয়তন দাঁড়ায় ৭৮,৫২৩ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা হয় দেড় কোটি। শিলং মেঘালয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আসামের নতুন রাজধানীরূপে গড়ে তোলার জন্য গৌহাটির সমীপবর্তী দিসপুর নামক স্থানটি মনোনীত হয়।

আহমদিয়া সম্প্রদায়: মির্জা গোলাম আহ্‌মদ প্রচারিত ধর্মমতের অনুগামীরা কাদিয়ানি বা আহ্‌মদিয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত। পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় কাদিয়ান নামক স্থানে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মির্জা গোলাম আহমদের জন্ম হয়। আরবি ও ফার্সি ভাষায় বিশিষ্ট পণ্ডিত মির্জা গোলাম মুস্লিম ধর্ম সংস্কারে উদ্যোগী হন এবং ১৮৮০ খ্রি তিনি বরাহিনাই আহমদিয়া নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন তা সংস্কার-কামী মুস্লিম জনগণের মনে বিশেষ সাড়া জাগায়। তবে ১৮৯১ খ্রি তিনি নিজেকে মাহ্‌দি, পয়গম্বর এমন কি কৃষ্ণের অবতার বলে দাবি জানালে তাঁর বিরুদ্ধে গোঁড়া মুস্লিম সমাজে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাহলেও মির্জা গোলামের অনুগামীর সংখ্যা হ্রাস পায়না। নিজ মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে মির্জা গোলাম ১৮৯২ খ্রি কাদিয়ান থেকে Review of Religions নামে এক ইংরেজি ধর্ম প্রচার পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন। ক্রমে ভারতে এবং ভারতের বাইরে, বিশেষ করে আফ্রিকায়, মির্জা গোলাম আহমদের প্রচারিত ধর্মমত বিস্তার লাভ করে। তাঁর অনুগামীরা আহমদিয়া বা কাদিয়ানি সম্প্রদায় নামে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯০৮ খ্রি লাহোরে মির্জা গোলামের মৃত্যু হলে তাঁকে কাদিয়ান গ্রামে সমাহিত করা হয়। কাদিয়ান তাই আহমদিয়া সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ তীর্থ ক্ষেত্র।

কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের লোকেরা

সুশিক্ষিত, সুসংহত ও শিল্প ব্যবসায়ে বিশেষ উদ্যোগী। পাকিস্তানে তাদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তিকে পাকিস্তানের অন্যান্য মুস্লিম সম্প্রদায়ের লোকেরা ভাল চোখে দেখে না। কাদিয়ানিদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র কদিয়ান ভারতের অন্তভুক্ত হওয়ায়, কাদিয়ানিরা ভারতের অনুচর এমন প্রচারও তাদের বিরুদ্ধে হতে থাকে। তারা হজরত মহম্মদকে শেষ পয়গম্বর বলে স্বীকার করে না, একারণে তাদের অমুস্লিম একটি ভিন্ন সম্প্রদায় বলে ঘোষণা করা হোক এমন দাবি৭ গোঁড়া মুস্লিম সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে উঠতে থাকে। এইসব বিরোধ ও বাদানুবাদের ফলে ১৯০৪ সালে পাকিস্তানে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে অ ান্য মুস্লিম সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে সুন্নিদের তীব্র সংঘর্ষ হয়। অবশেষে পাকিস্তান সরকার জাতীয় অ্যাসেমব্লীতে অনুমোদিত আইন বলে আহমদিয়া বা কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে পাকিস্তানের অমুস্লিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে ঘোষণা করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে মহম্মদ আলি জিন্নার অন্যতম বিশিষ্ট অনুগামী ও পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রতিনিধিরূপে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতি স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট নেতা

আহমেদ নগর : মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত আহ্মেদ নগরে প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি আহমেদ নগর জয় করলে সেখানে প্রথম মুস্লিম শাসন কায়েম হয়। ৬৩৩ খৃ সম্রাট শাহ্জাহানের শাসনকালে আহমেদনগর মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৭০৭ খৃ সম্রাট ঔরংজেব আহমেদনগরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আহ্মেদ শাহ্ আবদালি : (১৭২৪-৭৩): পারস্যরাজ নাদির শাহের সেনাপতি। নাদির শাহের মৃত্যুর (১৭৪৭) পর আফগানিস্তানের স্বাধীন রাজারূপে রাজ্যশাসন শুরু করেন। তিনি তাঁর শাসনকালে সাতআটবার ভারত আক্রমণ করেন।

১৭৫৬ খৃ আহমদ শাহ চতুর্থবার ভারত আক্রমণকালে দিল্লী লুণ্ঠন করেন এবং পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু প্রভৃতির শাসন দায়িত্ব মোগল সম্রাটের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পুত্র তাইমুর শাহকে ঐ সব এলাকার শাসক ও রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যান। কিন্তু তাইমুরের শাসনকালে ঐ সব এলাকায় অরাজকতা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং সেই সুযোগে রঘুনাথ রাওর নেতৃত্বে বিরাট মারাঠাবাহিনী লাহোর অধিকার করে নিয়ে তাইমুরকে বিতাড়িত করে এবং জলন্ধরের শাসনকর্তা আদিনাবেগ খাঁকে লাহোরের শাসন দায়িত্ব অর্পণ করে। মারাঠাদের ঐ ক্ষমতা দখলের প্রতিশোধ নিতে আহমদ শাহ ১৭৫৯ খৃ পঞ্চমবার ভারত আক্রমণ করে পাঞ্জাব অধিকার করেন। তারপর মারাঠা শক্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ১৭৬১ খৃ পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে আহমদ শাহ আবদালি যে বিশাল মারাঠা বাহিনীর

সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন সে যুদ্ধ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নামে খ্যাত। যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয় হয়।

আহমেদ শাহ আবদালি মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্আলমকে ভারতের সম্রাট বলে স্বীকার করে নেন।

আহোমরাজ্য : ব্রহ্মের শান ও তাই উপজাতির একটি শাখা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুকাফার নেতৃত্বে পূর্ব আসামে প্রবেশ করে এবং ১২৫৩ খৃ সেখানে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। ঐ রাজ্য আহোমরাজ্য নামে অভিহিত আহোমরা পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও নিজ ভাষা ভুলে গিয়ে অসমিয়া ভাষা গ্রহণ করে। এক সময় শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা থেকে ইয়ুনান পর্যন্ত আহোমরাজ্য বিস্তৃত ছিল। মোগল আক্রমণে আহোমরাজ্য ধীরে ধীরে দুর্বল ও পরিশেষে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।

ইউচি : ভারতের শক বংশীয় শাসকদের পূর্ব পুরুষ, মধ্য এশিয়ার একটি যাযাবর উপজাতি। তাদের একটি শাখা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতে প্রবেশ করে। ঐ শাখাই শককুষাণ নামে অভিহিত। কুষাণ সাম্রাজ্য কাবুল কান্দাহার থেকে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। ঐ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কণিষ্ক; তাঁর সিংহাসনারোহণকাল ৭৮ খৃ থেকে 'শকাব্দ' প্রবর্তিত হয়। ভারতে বসবাসকারী ইউচিরা ভারতীয় আচার ব্যবহার গ্রহণ করে এবং সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় হয়ে যায়।

ইউসুফ আদিল শাহ (খাঁ) **:** পশ্চিম এশিয়া থেকে ভাগ্যান্বেষণে ভারতে আসেন এবং পরবর্তীকালে স্বীয় দক্ষতায় বেরার প্রদেশের অন্তর্গত বিজাপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ১৪৯০ খৃ বিজাপুর প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইউসুফ আদিল শাহের বংশধরেরা (আদিল শাহি বংশ) ১৬৮৬ খৃ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে বিজাপুর শাসন করেন। ঐ বছর বিজাপুর মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইউসুফ আদিল শাহ ধর্মনিরপেক্ষ সুশাসক ছিলেন। তিনি বহু হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। পারস্য, তুর্কিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে বহু জ্ঞানীগুণী শিল্পী তাঁর রাজসভায় আসেন। ১৫১০ খৃ ইউসুফ আদিল শাহের মৃত্যু হয়।

ইংরেজ, ভারতে : ভারত ও দূরপ্রাচ্যে পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক সাফল্য ইউরোপের বহু দেশকে এপথে আকৃষ্ট করে। এজন্য ১৬০০ খৃ সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের শাসনকালে ইংলণ্ডে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি বাণিজ্য সংস্থা গঠিত হয়। ঐ কোম্পানি উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। অবশ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বণিকেরা ভারতে আসার আগেও কয়েকজন ইংরেজ বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময়ে ভারতে এসেছিলেন। প্রথম যে ইংরেজের ভারতে আসার কথা জানা যায় তাঁর নাম ষ্টিফেন্স। জেসুইট ধর্মাবলম্বী ঐ ইংরেজ ১৫৭৯ খৃ ভারতে আসেন।

ভারতে ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যিক সুবিধাদানের আবেদন জানাতে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের অনুমোদনক্রমে ১৬০৮ খৃ ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হকিন্স মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরের দরবারে সদলবলে উপস্থিত হন। কিন্তু হকিন্সের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়। তবে ১৬১২ খৃ ইংরেজ বণিকদের সুরাটে কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয় এবং ১৬১২ খৃ স্যার টমাস রোর নেতৃত্বে ইংরেজ বণিকেরা আবার বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধার জন্য মোগল সম্রাটের দ্বারস্থ হলে সেবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে কিছু কিছু সুবিধা মঞ্জুর করা হয়। ক্রমে ক্রমে মাদ্রাজ (১৬৯০), বোম্বাই (১৬৬৮) ও কলকাতায় (১৬৯০) ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগালের কাছে থেকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ ১৬৬৮ খৃ বোম্বাই দ্বীপটি পান। চার্লস ঐ দ্বীপটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বিক্রয় করলে কোম্পানি সেখানে শহর গড়ে তোলে। ধীরে ধীরে পূর্ব ভারতের হরিহরপুর, হুগলি, পাটনা, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানেও কোম্পানির বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়।

ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষ হয় মোগল সম্রাট ঔরংজেবের। মোগলবাহিনী ইংরেজদের পরাস্ত করে এবং তাদের প্রায় সম্পূর্ণ উৎখাতের আশঙ্কা দেখা দেয়। কিন্তু ইংরেজ বণিকেরা মোগল সম্রাটের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে সে বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। পরে বঙ্গদেশে ইংরেজ বণিকদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে এবং ১৭৫৭ খৃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনী পলাশির যুদ্ধে বাঙলার নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করে। ১৭৬৫ খৃ কোম্পানি মোগল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করলে এদেশে বৃটিশ অধিকারের সূচনা হয়। তারপর গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর শাসনকাল থেকে গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসির শাসনকালের মধ্যে (১৭৭২—১৮৫৬ খৃ) সারা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। তখনও পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতেই ভারতের শাসন দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল যদিও বিভিন্ন সময়ে বৃটিশ পার্লামেণ্টের বিভিন্ন আইনবলে কোম্পানির ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ক্রমেই কমিয়ে আনা হচ্ছিল। তারপর ১৮৫৭ খৃ সিপাহি বিদ্রোহের পর, ১৮৫৮ খৃ মহারানী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণাবলে ভারতের শাসনদায়িত্ব কোম্পানির হাত থেকে নিয়ে বৃটিশ সরকারের উপর ন্যস্ত করেন। ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ খৃ ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত ভারত সরাসরি বৃটিশ সরকারের শাসনাধীন ছিল। সে সময়ে ভারতের শাসনদায়িত্ব ন্যস্ত ছিল বৃটেনের রাজসরকারের প্রতিনিধি ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেলের উপর। তিনি সাধারণত বড়লাট নামে অভিহিত হতেন। আর বৃটিশ পার্লামেণ্টের কাছে ভারত শাসন ব্যবস্থার জন্য দায়ী ছিলেন বৃটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য 'সেক্রেটারি অফ ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া' যিনি এদেশে ভারতসচিব নামে অভিহিত হতেন। দীর্ঘ জাতীয় আন্দোলন ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের শেষে

১৯৪৭ খৃ ১৫ আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। বৃটিশ সরকার এদেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দের হাতে শাসনদায়িত্ব অর্পণ করে ভারত ত্যাগ করে।

এদেশে শিক্ষা বিস্তারে, সমাজ সংস্কারে, আইনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় এবং সর্বোপরি জাতীয় চেতনার উদ্বোধনে ইংরেজ শাসকদের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজসংস্কারকগণ মুখ্যত ইংরেজ সরকারের সহায়তায় এদেশ থেকে নানা নিষ্ঠুর কুসংস্কার ও সামাজিক অন্যায়ের অবসান ঘটান। দেশে শিক্ষাবিস্তারেও তাঁরা ইংরেজ সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ শাসক ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের সযত্ন প্রয়াসে ভারতের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ঘটে। ভারতের জাতীয় চেতনার উদ্বোধনেও ইংরেজদের ভূমিকা সামান্য ছিল না। হিউম প্রমুখ কয়েকজন ইংরেজের উদ্যোগেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। তাছাড়া ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা যে নবজাগরণের সঞ্চার করে তারই ফলে আধুনিক ভারতের সৃষ্টি হয়।

ইকবাল, স্যার মহম্মদ (১৮৭৬—১৯৩৮): 'সারে জাহাঁসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা' গানের রচয়িতা বিশিষ্ট উর্দু কবি। পাঞ্জাবে জন্ম, পূর্বপুরুষেরা কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইকবাল ছিলেন আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত এবং পেশায় ব্যারিষ্টার। ভারতের মুস্লিমদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-গঠনের চিন্তা ইকবাল করেছিলেন।

ইক্ষ্বাকু: বেদ পুরাণে উল্লেখিত রাজবংশ। রাজা ভরত, রাজা দশরথ প্রমুখ পুরাণোল্লেখিত নৃপতিবর্গ ইক্ষাকু বংশীয় রাজা নামে অভিহিত।

দক্ষিণ ভারতে খৃষ্টিয় তৃতীয় শতাব্দীতে ইক্ষাকু নামে এক রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। রাজ্যের প্রভাব বিস্তারের জন্য তাঁরা উজ্জয়িনী প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে মৈত্রী স্থাপন করেন। ইক্ষাকু রাজাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় চান্তামূল, বীর পুরুষদত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ইঙ্গ—আফগান যুদ্ধ, প্রথম: শাহ সুজা ১৮০৩ সালে কাবুলের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, কিন্তু অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিদ্রোহের জন্য ১৮০৯ সালে রাজ্যত্যাগ করে তিনি ভারতে পালিয়ে আসেন ও লাহোরে মহারাজ রণজিৎ সিংহের আশ্রয় নেন। ঐসময়েই তিনি তাঁর সঙ্গে আনা বিশ্বখ্যাত হীরক খণ্ড কোহিনূর রণজিৎ সিংহকে উপহার দেন। ১৮২৫ সালে শাহ সুজা লাহোর ত্যাগ করে লুধিয়ানায় ইংরেজের আশ্রয় নেন। ওদিকে ১৮২৬ সালে আফগানিস্তানের আমির হন দোস্ত মহম্মদ। ১৮৩৩ সালে শাহ সুজা মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহায়তায় কাবুল জয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ

হন, কিন্তু ঐ সময়েই শিখ সৈন্যরা পেশোয়ার জয় করে। এইভাবে শিখ সাম্রাজ্য শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীর থেকে উত্তরে কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিমে পোশোয়ার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করলে আফগানিস্তানের পক্ষে বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়। ওদিকে রুশ সাম্রাজ্যের বিস্তারও চিন্তার কারণ হয়ে উঠছিল। এই পরিস্থিতিতে আমির দোস্ত মহম্মদ শিখ ও রাশিয়াকে রুখতে ইংরেজের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হতে আগ্রহী হন। কিন্তু মহারাজ রণজিৎ সিংহের সঙ্গে ইংরেজদের আগেই মৈত্রী চুক্তি (অমৃতসর চুক্তি, ১৮০৯) স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং রুশ সাম্রাজ্যের ভারত অভিমুখি বিস্তারের আশংকায় ইংরেজ সরকারও চাইছিলেন উত্তর-পশ্চিম ভারতে শিখ সাম্রাজ্য একটি বাফার স্টেট হিসাবে গড়ে উঠুক। সুতরাং দোস্ত মহম্মদ ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে শিখদের বিরুদ্ধে কোন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেলেন না। ক্ষুব্ধ আমির তখন আত্মরক্ষার তাগিদে পারস্য ও রাশিয়ার সাহায্যপ্রার্থী হলেন।—এই রুশ আফগান মৈত্রী ইংরেজদের কাছে আরও বিপজ্জনক মনে হওয়ায় ইংরেজরা দোস্ত মহম্মদকে অপসারিত করে তার জায়গায় শাহ সুজাকে আমির করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন।

লর্ড অকল্যাণ্ড গভর্নর-জেনারেল হয়ে আসার পরেই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণ করেন এবং শাহ সুজাকে আফগানিস্তানের আমির করার জন্য তৎপর হন। ১৮৩৮ সালের ২৬ জুন ঐ উদ্দেশ্যে শাহ সুজা, রণজিৎ সিংহ ও ইংরেজদের মধ্যে লাহোরে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ ঐ চুক্তিরই স্বাভাবিক পরিণতি।

যুদ্ধ শুরু হয় ১৮৩৯ সালের এপ্রিলে, এবং ইংরেজ সৈন্যরা কান্দাহার ও গজনি দখলের পর কাবুল জয় করে আগস্ট মাসে। দোস্ত মহম্মদ পরাজিত ও বন্দী হন এবং শাহ সুজা আফগানিস্তানের আমির ঘোষিত হন। বন্দী দোস্ত মহম্মদকে কলকাতায় আনা হয়। কিন্তু ইংরেজ ও শিখদের সহায়তায় ক্ষমতাসীন শাহ সুজা কিছুতেই প্রজাদের সমর্থন পেলেন না। তাই বিদ্রোহ ও অশান্তি দমন করতে বিশাল ইংরেজ বাহিনী কাবুলে মোতায়েন রাখতে হল ও তাদের ব্যয়বহনে ভারত সরকারের অর্থভাণ্ডারে অসম্ভব চাপ পড়তে লাগল। ওদিকে মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হওয়ায় শিখ রাজ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয় যার ফলে শিখদের সবরকম সহযোগিতাও বন্ধ হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় দোস্ত-মহম্মদের পুত্র আকবর খাঁর নেতৃত্বে আফগানদের পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়। ১৮৪১ সালের ২ নভেম্বর বৃটিশ বাহিনীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা আলেকজাণ্ডার বার্নেস সহ কয়েকজন ইংরেজ আফগানদের হাতে নিহত হন। প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে লর্ড অকল্যাণ্ড ইংরেজদের পিছু হটার নির্দেশ দিলেন। কাবুলে বৃটিশ পলিটিকাল অফিসার ম্যাকনাটেন ১৮৪১ সালের ১১ ডিসেম্বর আকবর খাঁর সঙ্গে অত্যন্ত অসম্মানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। সন্ধির

শর্ত হল, বৃটিশ বাহিনী আফগানিস্তান ত্যাগ করবে, দোস্ত মহম্মদকে কাবুলে ফিরিয়ে আনা হবে ও শাহ সুজাকে পেনসন দিয়ে হয় আফগানিস্তানে রাখা হবে, নয়ত বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে ভারতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু এত করেও ইংরেজদের পক্ষে শেষ রক্ষা করা সম্ভব হল না। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ আফগানদের হাতে তুলে দিয়ে ইংরেজ সৈন্য বাহিনী কূটনীতিক ও তাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে প্রায় সাড়ে ষোল হাজার লোক যখন ১৮৪২ সালের ৬ জানুয়ারি ভারত অভিমুখে যাত্রা শুরু করে তখন তাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হয়। ক্ষুধায়, হিমেল হাওয়ায়, পথশ্রমে ক্লান্ত ইংরেজদের পক্ষে ঐ আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। ফলে হাজারে হাজারে তাদের মৃত্যু হতে থাকে, মাত্র ১২০ জন আকবর খাঁর হাতে বন্দী হন ও ডাঃ ব্রাইডন নামে একজন মাত্র ইংরেজ দারুণ আহত অবস্থায় ১৩ জানুয়ারি জালালাবাদ পৌঁছিয়ে ঐ চরম পরাজয় ও লাঞ্ছনার কাহিনী ইংরেজ সরকারকে জানান। এই ঘটনার পর লর্ড অকল্যাণ্ডের পদত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। ১৮৪২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি লর্ড এলেনবরো তাঁর কার্যভার গ্রহণ করেন।

লর্ড এলেনবরো ইংরেজদের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে ১৮৪২ সালের আগস্ট মাসে পোলকের নেতৃত্বে আট হাজার বাছাই বৃটিশ সৈন্য কাবুল জয়ের জন্য পাঠান এবং ১৫ সেপ্টেম্বর ঐ সৈন্যদল কাবুলে পৌঁছিয়ে আবার বৃটিশ পতাকা উড্ডীন করে। বন্দী ইংরেজদের মুক্ত করা হয় ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে কাবুল বাজার তছনছ করা হয়। অবশেষে ১২ অক্টোবর বৃটিশ বাহিনী স্বেচ্ছায় আফগানিস্তান ত্যাগ করে ও সিমলা থেকে এক ঘোষণায় বলা হয়, আফগানিস্তানে যে সরকারই গঠিত হোক বৃটিশ সরকার তা মেনে নেবে।

দোস্ত মহম্মদকে মুক্তি দেওয়া হয় ও তিনি আবার আফগানিস্তানের আমির হন। তিনি ১৮৬৩ সালে ৮০ বছর বয়সে মারা যান। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। ১৮৫৫ সালে আফগানিস্তানের সঙ্গে ইংরেজদের যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাতে ইংরেজ সরকার আফগানিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার ও আফগানিস্তান "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শত্রুদের শত্রু ও মিত্রদের মিত্র জ্ঞান করার" প্রতিশ্রুতি দেয়।

ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ, দ্বিতীয়ঃ মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার সাম্রাজ্য-বিস্তারের তৎপরতা ১৮৬৪ সালে নতুন করে শুরু হয়। ১৮৬৮ সালে সমরকন্দ রাশিয়ার দখলে যায়। রাশিয়ার এই অগ্রগতিতে শঙ্কিত আফগানিস্তানের আমির শের আলি বৃটিশের শরণ নেন। ১৮৬৯ সালে আম্বালায় শের আলি ও তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মেয়োর মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। ১৮৭৩ সালে খিবা রুশ অধিকারে গেলে আমির শের আলি তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুকের কাছে দূত পাঠান। নর্থব্রুকের কাছে প্রতিশ্রুতি চাওয়া হয় যে আফগানিস্তান আক্রান্ত হলে বৃটিশ

সরকার অস্ত্র, অর্থ, সৈন্য দিয়ে আফগানিস্তানকে সাহায্য করবে। কিন্তু নর্থব্রুক অনুরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অনুমতি বৃটেনের উদারনৈতিক গ্ল্যাডস্টোন সরকারের কাছ থেকে পেলেন না। ফলে নিরুপায় আমির আবার রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতায়-আসতে উদ্যোগী হলেন।

ইতিমধ্যে বৃটেনে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। ১৮৭৪ সালে ডিসরেলি প্রধানমন্ত্রী হন এবং ১৮৭৬ সালে ভারতে ভাইসরয় হয়ে আসেন লর্ড লিটন। বৃটেনের নতুন মন্ত্রিসভার নীতি হয় আফগানিস্তানকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ও রাশিয়াকে তফাত রাখা।

কাবুলে একজন রুশ দূত নিযুক্ত হলে লর্ড লিটন একজন ইংরেজ দূতকে কাবুলে রাখার দাবি জানান। কিন্তু রাশিয়ার সমর্থনের ভরসায় আমির সে দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন। ঐ প্রত্যাখ্যানের পর ১৮৭৮ সালের ২০ নভেম্বর বৃটিশ সৈন্য আফগানিস্তান আক্রমণ করে এবং ঐ চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে রাশিয়া আফগানিস্তানের সমর্থন এগিয়ে আসে না। সুতরাং ডিসেম্বরের মধ্যেই আফগানিস্তান পরাজিত হয় ও আমির শের আলি তুর্কিস্তানে পলায়ন করেন, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। শের আলির পুত্র ইয়াকুব আমির হয়ে ১৮৭৯ সালের ২৬ মে সম্পূর্ণরূপে ইংরেজের শর্তে 'ট্রিটি অফ গণ্ডামক' স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুসারে কাবুলে স্থায়ী বৃটিশ প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা হয় ও বৃটিশ ভারতের ভাইসরয়ের পরামর্শ অনুসারে আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ব্যবস্থা হয়। কুরাম, পিশিন ও সিবি জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে বৃটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুনির্ধারিত হয়।

লর্ড রিপনের শাসনকালে (১৮৮০-৮৪) আফগানরা আবার একবার বিদ্রোহী হলে ইংরেজরা সে বিদ্রোহ দমন করে এবং ইয়াকুবকে অপসারিত করে শের আলির ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রহমানকে আমির পদে বসানো হয়। আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বৃটিশের হাতে অর্পণ করা হয় এবং আমিরকে বছরে ১২ লক্ষ টাকা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ১৮৯৩ সালে স্যার মার্টিমার ডুরাণ্ডের নেতৃত্বে এক কমিশন বৃটিশ ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিত করেন। ঐ সীমান্ত রেখা ডুরাণ্ড লাইন নামে অভিহিত। নতুন সীমান্ত রেখা আরও কিছু আফগান অঞ্চল বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে বলে খেসারত হিসাবে আমিরের ভাতা ১২ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ১৮লক্ষ টাকা করা হয়। ঐ সময়েই চিত্রল, গিলগিট প্রভৃতি পার্বত্য রাজ্যগুলি বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ, তৃতীয়: আমির হবিবুল্লা ১৯১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নিহত হলে তাঁর পুত্র আমানুল্লা আমির হন এবং রাজ্যের যুদ্ধবাদীদের চাপে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ মাত্র দুমাস চলে (এপ্রিল-মে, ১৯১৯)। বোমা বর্ষণ করে ও প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে ইংরেজরা আফগানদের

সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে। ১৪ মে আফগানরা শান্তি প্রস্তাব দেয় ও সেই মতো ৮ আগস্ট রাওয়ালপিণ্ডিতে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯২১ সালে আর এক চুক্তিতে বৃটিশ সরকার আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে ও ঐ রাজ্যের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণের দাবি ত্যাগ করে। আমিরের ভাতা বন্ধ হয়। লণ্ডন ও কাবুলের মধ্যে দূত বিনিময়েরও ব্যবস্থা হয়।

ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ : নেপালে গুর্খাদের অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৬৮ খ্রী। তারপর শক্তিশালী রাজ্যরূপে নেপাল আধিপত্য বিস্তারে তৎপর হয়। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নেপাল রাজ্য পূর্বে তিস্তা ও পশ্চিমে শতদ্রু নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ১৮০১ খ্রী বর্তমান উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলা ইংরেজদের অধিকারে এলে নেপাল রাজ্য ও বৃটিশ ভারতের সীমানা পরস্পরকে স্পর্শ করে ও বৃটিশ ভারতে গুর্খা হামলা শুরু হয়। লর্ড মিণ্টো যখন গভর্নর-জেনারেল তখন গুর্খারা বুটোয়াল (বর্তমান বস্তি জেলা) দখল করে ও আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হয়।

১৮১৪ খ্রী মে মাসে গুর্খারা বুটোয়াল জেলার তিনটি থানা আক্রমণ করলে তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড হেস্টিংস ঐ বছর অক্টোবর মাসে নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে গোড়ার দিকে ইংরেজদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়, কিন্তু পরে ১৮১৫ সালে কুমায়ুন ইংরেজদের দখলে আসে এবং ঐবছর অক্টোবর মাসে মালাওঁর যুদ্ধে গুর্খা নেতা অমর সিং থাপা জেঃ অক্টারলোনির কাছে পরাজিত হলে নেপালের প্রতিরোধ শক্তি ভেঙ্গে পড়ে। ১৮১৫খ্রী ২৮ নভেম্বর সাগাউলির চুক্তি অনুসারে ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধের অবসান হয়। কিন্তু নেপাল সরকার যুদ্ধবাদীদের চাপে ঐ চুক্তি মানতে না চাইলে জেঃ অক্টারলোনির নেতৃত্বে বৃটিশ বাহিনী আবার অভিযান শুরু করে ও ১৮১৬ খ্রী ২৮ ফেব্রুয়ারি মাকওয়ানপুরের যুদ্ধে নেপালের চূড়ান্ত পরাজয় হয়। তারপর নেপাল পূর্বস্বাক্ষরিত চুক্তি মেনে নেয়।

চুক্তির শর্ত অনুসারে নেপাল দক্ষিণের তরাই অঞ্চল পশ্চিমে কুমায়ুন ও গাড়োয়াল জেলা বৃটিশ ভারতকে অর্পণ করে, সিকিমের উপর দাবি ত্যাগ করে ও কাঠমাণ্ডুতে বৃটিশ রেসিডেণ্ট রাখতে সম্মত হয়। এই যুদ্ধে উত্তরে হিমালয় অঞ্চলে ভারতের সীমানা সুনির্দিষ্ট হয়। সিমলা, মুসৌরী, আলমোরা, রানিক্ষেত, নৈনিতাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বহু শৈলনগরী ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। নেপাল থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অংশ ১৮১৭ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে ইংরেজ সরকার সিকিমের রাজাকে অর্পণ করেন, যা নেপাল ও ভুটান রাজ্যের মধ্যে ভূমি ব্যবধানের সৃষ্টি করে।

ইঙ্গ-বর্মা যুদ্ধ, প্রথম : বর্মার রাজা বোদাও-পয়ার শাসনকালে (১৭৭৯-১৮১৯) মণিপুর বর্মার অধিকারভুক্ত হয় (১৮১৩)। তারপর ১৮২১-২২ সালে আসাম বর্মার দখলে গেলে

বর্মার রাজ্য বৃটিশ ভারতের সীমানা স্পর্শ করে। ১৮২৩ সালে বর্মার সৈন্য-দল চট্টগ্রামের নিকটবর্তী শাহপুরি দ্বীপ ইংরেজদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়। গভর্নর-জেনারেল লর্ড এমহার্স্ট ১৮২৪ খ্রী ২৪ ফেব্রুয়ারি বর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইংরেজ সরকার অবিলম্বে সমগ্র আসাম বর্মার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। জেঃ স্যার আর্চিবল্ড ক্যাম্পবেলের নেতৃত্বে আর এক সৈন্য-বাহিনী জলপথে অগ্রসর হয়ে ১৮২৪ খ্রী ১১ মে রেঙ্গুন দখল করে। পরের বছর, এপ্রিল মাসে, নিম্ন বর্মার রাজধানী প্রোম ইংরেজদের দখলে আসে। এর-পর ইংরেজদের শান্তি উদ্যোগ ব্যর্থ হলে ১৮২৫ সালের শেষের দিকে তারা নতুন উদ্যমে বর্মা অভিযান শুরু করে। অবশেষে বর্মা হার মানে ও ১৮২৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি মোটামুটিভাবে ক্যাম্পবেলের শর্তেই যুদ্ধের অবসান ঘটে

যুদ্ধের অন্যান্য শর্তের মধ্যে বর্মা মেনে নেয় যে আসাম, কাছাড় ও জয়ন্তিয়া তার এক্তিয়ার বহির্ভূত এলাকা। মণিপুর রাজ্যের স্বাধীনতাও বর্মা মেনে নেয়। চট্টগ্রামের উপকূল-বর্তী অঞ্চল থেকে বর্মার প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। বর্মা ও ইংরেজ সরকারের মধ্যে সম্পাদিত ঐ চুক্তি 'ইয়ানদাবুর সন্ধি' নামে অভিহিত।

ইঙ্গ-বর্মা যুদ্ধ, দ্বিতীয়ঃ গভর্নর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসির শাসন-কালে ১৮৫২ সালে বর্মার বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার দ্বিতীয়বার যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইংরেজ রেসিডেন্টদের প্রতি সদাচরণ করা হয়নি ও ইংরেজ বণিকদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে এই অভিযোগে ইংরেজ সরকার বর্মার কাছ থেকে ১৮৫২খ্রী ১ এপ্রিলের মধ্যে এক লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দাবি করে। ঐ চরম পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হতেই যুদ্ধ শুরু হয়। অবিলম্বে বর্মার বিভিন্ন শহর ও অঞ্চল ইংরেজের দখলে আসে। লর্ড ডালহৌসি স্বয়ং সেপ্টেম্বর মাসে রেঙ্গুন দর্শনে যান। বঙ্গোপসাগরের সমগ্র পূর্ব উপকূলে বৃটিশ কর্তৃত্ব কায়েম হয়। নিম্ন বর্মার আরাকান, তেনাসেরিম, পেগু বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। খণ্ডিত বর্মা রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় মান্দালয়ে, ১৮৫৭ সালে। সেখানে বৃটিশ রেসিডেন্ট থাকার ব্যবস্থা হয়।

ইঙ্গ-বর্মা যুদ্ধ, তৃতীয়ঃ বর্মার বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার তৃতীয়বার যুদ্ধ ঘোষণা করে ১৮৮৫ সালের ৯ নভেম্বর। যুদ্ধ ঘোষণার কুড়ি দিনের মধ্যে রাজ-ধানী মান্দালয়ের পতন হয়। তারপর ধীরে ধীরে পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে সমগ্র বর্মা ইংরেজ অধিকারে আসে। সমগ্র বর্মা বৃটিশ ভারতের অন্যতম প্রদেশে পরিণত হয় ১৮৮৬ খ্রী ১ জানুয়ারী ও রেঙ্গুন হয় সেই প্রদেশের রাজধানী।

১৯৩৭ খ্রী বর্মাকে বৃটিশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র উপ-নিবেশ করা হয়।

ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ভুটান একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। কোচবিহাররাজের অনুরোধে ইংরেজ সরকার ঐ রাজ্য থেকে ভুটানি-

দের বিতাড়িত করলে ভুটানের সঙ্গে বৃটিশ ভারতের বিরোধ শুরু হয়। কোচবিহার ও ভুটানের মধ্যবর্তী ডুয়ার্স অঞ্চলে ভুটানিরা বারবার হানা দিতে থাকে। ময়নাগুড়ি, আমবাড়ি, ফালাকাটা প্রভৃতি স্থান ভুটানের দখলে চলে যায়। কোচবিহার ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অধিনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হলে তার সমীপবর্তী সামন্তরাজ্য বৈকুণ্ঠপুরও ইংরেজের অধীনে আসে। কিন্তু ঐ সময় ভুটান সরকার বৈকুণ্ঠপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে নেয় আর ইংরেজরাও তার কোন প্রতিবাদ করে না। কারণ ভুটানের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের তিব্বতে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস রংপুরের শাসক গুডল্যাডকে এক চিঠিতে লেখেন, এমন কিছু যেন না করা হয় যাতে ভুটান অসন্তুষ্ট হতে পারে।

কিন্তু ভুটানের ঘন ঘন হামলা ইংরেজ সরকারের পক্ষে শেষ পর্যন্ত অসহনীয় হয়। ভুটানের সঙ্গে ফয়সালায় আসার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার ১৮৬৩ সালে অ্যাশলি ইডেনকে ভুটানে পাঠান। কিন্তু ইডেন চরম অপমানিত হয়ে ফিরে আসেন। এরপর ভুটানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া ইংরেজের গত্যন্তর থাকে না।

যুদ্ধে ভুটানের পরাজয় হলে ১৮৬৫ সালের ১১ নভেম্বর ইংরেজ সরকার ও ভুটানের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাতে সমগ্র ডুয়ার্স অঞ্চলের উপর ভুটান অধিকার ত্যাগ করে। ডুয়ার্স বৃটিশ ভারতের অংশ হয়। ডুয়ার্সের সঙ্কোষ নদীর পূর্ব তীর বর্তী অংশ আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় আর পশ্চিম অংশ সংযুক্ত হয় জলপাইগুড়ি জেলার সঙ্গে। ভুটানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইংরেজ সরকারের সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন কর্নেল হেদায়েৎ আলি খাঁ। তারই নামানুসারে জলপাইগুড়ি জেলার মহকুমা ডুয়ার্সের নাম হয় আলিপুর ডুয়ার্স। বর্তমান দার্জিলিং জেলার কালিম্পং মহকুমাটি ১৭০৬ খ্রী ভুটান দখল করে নিয়েছিল। ঐ অংশ আবার দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৮৫৮ খ্রী মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় বলা হয়, ভারতে আর সাম্রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা বৃটিশ সরকারের নেই। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার দুটি মহকুমা ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলার কিছু অংশ ঐ ঘোষণার সাত বছর পরে বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইতমাদউদ্দৌলা : মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরের মহিষী নূরজাহানের পিতা, প্রকৃত নাম মির্জা গিয়াস বেগ। খোরাসানের উজির খাজা মহম্মদ শরিফের পুত্র। ১৫৭৭ খ্রী সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ভারতে আসেন এবং স্বীয় প্রতিভা ও বুদ্ধিবলে রাজদরবারে প্রভাব বিস্তার করেন। ১৫৯৫ খ্রী কাবুলের দেওয়ান নিযুক্ত হন। পরে সমগ্র সাম্রাজ্যের দেওয়ান হন ও সম্রাট জাহাঙ্গিরের কাছ থেকে ইতমাদ-

উদ্দৌলা উপাধি লাভ করেন কিছুকাল পরে জাহাঙ্গিরকে হত্যাচেষ্টার এক ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হন। কিন্তু কিছু-কাল পরে মুক্তিলাভ করেন ও পুনরায় উচ্চ রাজপদ পান। তিনি ছিলেন সুলেখক, সুবক্তা, উচ্চশিক্ষিত ও সদালাপী। ১৬২২ খ্রী তাঁর মৃত্যু হয়।

১৬২৮খ্রী আগ্রায় ইতমাদউদ্দৌলার সমাধি নির্মিত হয়। সে সমাধি মোগল স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম নিদর্শন।

ইণ্ডিয়া কাউন্সিল : ১৮৫৮ খ্রী মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা অনুসারে বৃটিশ সরকার ভারতের শাসনদায়িত্ব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে স্বহস্তে গ্রহণের পর 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিল' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। ১৫-সদস্যবিশিষ্ট ঐ কাউন্সিলের কাজ ছিল ভারতশাসন বিষয়ে বৃটিশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত সচিব সেক্রেটারি অফ্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়াকে পরামর্শ দেওয়া। ১৯০৭ খ্রী সর্বপ্রথম দুজন ভারতীয়কে ঐ কাউন্সিলের সদস্য করা হয়। তাঁদের নাম কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ও সৈয়দ হোসেন বিল গ্রামি। ১৯৩৫ খ্রী ভারত শাসন আইন অনুসারে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের বিলুপ্তি ঘটে।

ইণ্ডিয়া লীগ : ১৮৭৫ খ্রী ২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় গঠিত একটি রাজনৈতিক সংগঠন। সংগঠনের উদ্যোক্তা ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি। প্রদেশ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের কল্যাণসাধন ও জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন ছিল ঐ সংগঠনের প্রধান কর্মসূচী।

মতান্তর ঘটায় সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রমুখ কয়েকজন জননেতা ইণ্ডিয়া লীগ ত্যাগ করে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' নামে আর একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করেন। পরে ইণ্ডিয়া লীগের অধিকাংশ সদস্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে যোগ দিলে পূর্বোক্ত সংগঠনটি কার্যত বিলুপ্ত হয়।

ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট : বৃটিশ পার্লামেন্টের এই আইনবলে ১৯৪৭ খ্রী ১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং পরদিন ১৫ আগস্ট, ভারত স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের পাঁচ শতাধিক দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের বিভিন্ন সময়ে যে সব চুক্তি ও সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট অনুসারে তা সবই বাতিল হয়ে যায়। ফলে দেশীয় রাজ্যগুলির ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগদান ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট অনুসারে সৃষ্ট দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের উপর বৃটিশ সরকারের যাবতীয় সার্বভৌম কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। বৃটিশ রাজার 'ভারত-সম্রাট' উপাধি লোপ পায়।

ইন্দুরাজ : ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার। কাশ্মীরে জন্ম; আবির্তাবকাল সম্ভবত খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ।

ইন্দ্র : দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট বংশে ইন্দ্র নামে চারজন রাজা ছিলেন। তাঁদের

মধ্যে তৃতীয় ইন্দ্র সর্বাধিক খ্যাত ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল সম্ভবত ৯১৪—২৮ খ্রী। তিনি পরাক্রমশালী ও সুনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। গুর্জরপ্রতিহাররাজ মহীপালকে পরাজিত করে তিনি ৯১৬ খ্রী কনৌজ অধিকার করেন। তারপর তিনি বেঙ্গীর চালুক্যরাজ চতুর্থ বিজয়াদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। যুদ্ধে বিজয়াদিত্যের মৃত্যু হয়। বেঙ্গীর সিংহাসনে অনুগত একজনকে বসিয়ে তৃতীয় ইন্দ্র ঐ রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করেন।

ইন্দ্রপ্রস্থ : পুরাতন দিল্লীর প্রাচীন নাম। মহাভারতে খাণ্ডবপ্রস্থ নামে উল্লেখিত। যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের প্রথম রাজা। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতেও ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীর অস্তিত্ব ছিল।

ইবন বাতুতা (১৩০৪—৭৮): প্রখ্যাত পর্যটক। জাতিতে আরব, তাঁর পূর্বপুরুষেরা মরক্কোর তানজানিয়ার অধিবাসী ছিলেন। ১৩৩৩খ্রী মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে ভারতে আসেন ও ১৩৪৭ খ্রী পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করেন। ইবন বাতুতা দিল্লীর রাজসভায় বিশেষ সমাদৃত ছিলেন। কয়েক বছর দিল্লীর কাজি বা প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তারপর দিল্লীর রাজদূতরূপে চীনে যান। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

ইব্রাহিম কুতব শাহ : গোলকুণ্ডার কুতব বংশের চতুর্থ সুলতান। রাজত্বকাল ১৫৫০—৮০ খ্রী। ধর্মনিরপেক্ষ সুশাসকরূপে খ্যাত। ১৫৬৫ খ্রী বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। পরে রাজমহেন্দ্রির হিন্দু রাজাকে পরাজিত করে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন।

ইব্রাহিম লোদি : দিল্লীর লোদি বংশীয় শেষ সুলতান, শাসনকাল ১৫১৭ — ২৬ খ্রী। পিতা সিকন্দার লোদির মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেই অনুজ জালাল খাঁর বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। সুলতানের আদেশে পরাজিত জালাল খাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়। অন্যান্য বিদ্রোহও তিনি কঠোর হাতে দমন করেন এবং যাকেই সন্দেহ হয় তাকেই হত্যা করেন। ফলে রাজ্যের সব প্রভাবশালী ব্যক্তিই সুলতানের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। সেই ক্ষোভ ও অরাজকতার সুযোগ নিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ভারত আক্রমণ করেন। মাত্র ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে বাবর দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হলে ইব্রাহিম লোদি এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে ঐ আক্রমণরোধে অগ্রসর হন। ১৫২৬ খ্রী ২১ এপ্রিল, পানিপথের বিশাল প্রান্তরে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। কিন্তু অর্ধদিনের যুদ্ধেই বাবর জয়ী হন ও ইব্রাহিম লোদি রণক্ষেত্রে প্রাণ হারান। ফলে দিল্লীতে পরপর পাঁচটি সুলতান বংশের অবিচ্ছিন্ন শাসনের অবসান ঘটে ও মোগল শাসনের সূচনা হয়।

ইমাদশাহি বংশ : বাহমনি সাম্রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণ ভারতে যে পাঁচটি স্বতন্ত্র মুস্লিম রাজবংশের শাসন কায়েম হয়, ইমাদশাহি বংশ তাদের

একটি। ঐ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ফতুল্লাহ ইমাদশাহ প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন। বেরারের রাজদরবারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরে বেরারের শাসনকর্তা খান-ই-জাহানের মৃত্যু হলে বেরারের শাসনক্ষমতা দখল করেন। মাহমুদ বাহমনির রাজত্বকালে ইমাদশাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ১৫৪৭ খ্রী পর্যন্ত, প্রায় শতাব্দীকাল তাঁর বংশধরেরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন।

ইম্পে, স্যার ইলাইজা (১৭৩২—১৮০৯): ১৭৭৩ খ্রী কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সহপাঠি ও বন্ধু ছিলেন। ১৭৭৫ খ্রী মহারাজ নন্দকুমার তাঁরই আদালতে জালিয়াতির অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

ইয়ং হাজব্যাণ্ড, ফ্রান্সিস এডওয়ার্ড (১৮৬৩—১৯৪২): বৃটিশ সামরিক কর্মচারী ও দুঃসাহসী অভিযাত্রী।

তিব্বত অভিযানের জন্য খ্যাত। তিব্বত-ভারত সীমান্তে অশান্তি দেখা দিলে ১৯০৪ খ্রী তাঁর নেতৃত্বে এক বৃটিশ প্রতিনিধিদল তিব্বতের রাজধানী লাসায় যান এবং ঐ বছরেই ইঙ্গ-তিব্বত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তিবলে ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান পর্যন্ত তিব্বতের উপর ভারত সরকারের কতকগুলি বিশেষ অধিকার কায়েম থাকে। ভারত স্বাধীনতালাভের পর স্বেচ্ছায় ঐ বিশেষ অধিকারগুলি ত্যাগ করে।

ইয়ুল, জর্জ: ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদে কংগ্রেসের চতুর্থ জাতীয় অধিবেশনে পৌরহিত্য করেন। তিনি ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট ইংরেজ বণিক।

ইলতুৎমিস: দিল্লীর দাসবংশীয় সুলতান, শাসনকাল ১২১১-৩৬ খ্রী। পূর্ণ নাম সামসুদ্দিন ইলতুৎমিস। প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। তুর্কি অভিজাত পরিবারের সন্তান, তাঁর ভাইরা তাঁকে দিল্লীর সুলতান কুতবুদ্দিন আইবকের কাছে বিক্রয় করেন। কুতব তাঁর কর্মদক্ষতায় প্রীত হয়ে তাঁকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন এবং নিজ কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেন।

কুতবুদ্দিন আইবকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আরাম শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিলাসী, মদ্যপ ও রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন বলে এক বছরের মধ্যেই সিংহাসনচ্যুত হন এবং প্রভাবশালী আমির ওমরাহদের সমর্থনে ইলতুতমিস দিল্লীর মসনদ লাভ করেন। কিন্তু তার পরেই তাঁকে চারিদিকে বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। বাঙলার শাসক আলি মর্দান খলজি দিল্লীর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করেন। মুলতানের শাসক নাসিরুদ্দিন কুবাচাও নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন এবং লাহোর অধিকার করে সমগ্র পাঞ্জাবের উপর কর্তৃত্ব বিস্তারে তৎপর হন। ওদিকে মহম্মদ ঘুরির উত্তরাধিকারী, গজনির রাজা তাজুদ্দিন ইলদুজ দিল্লীর সুলতানশাহির উপর সার্বভৌমত্ব দাবি করেন এবং দিল্লীর সুলতানকে গজনির রাজ-

প্রতিনিধির মর্যাদা স্বীকার করে নিতে বলেন। রাজপুতেরাও বিদ্রোহী হয়ে রনথম্বোর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থান পুনরধিকার করে। কিন্তু ইলতুৎমিস ১২১৭ খ্রী মধ্যে সব বিদ্রোহ দমন করে সমগ্র রাজ্যে স্বীয় কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

ইলতুৎমিসের শাসনকালে চেঙ্গিজ খাঁর নেতৃত্বে দুর্ধর্ষ মোঙ্গলরা ভারত আক্রমণ করেন। কিন্তু সিন্ধু নদীর অববাহিকা পর্যন্ত পৌঁছানোর পর, ইলতুৎমিসের সৌভাগ্যবশত, চেঙ্গিজ খাঁর বাহিনী আর অগ্রসর না হয়ে ১২২২ খ্রী হিন্দুকুশ অতিক্রম করে আফগানিস্তান অভিমুখে অগ্রসর হয়।

ইলতুৎমিস স্বেচ্ছায় বাগদাদের খলিফার আনুগত্য স্বীকার করেন এবং তার বিনিময়ে খলিফা তাঁকে স্বাধীন সুলতানের মর্যাদা দান করেন। ইলতুৎমিসের সুশাসন ও দূরদর্শিতার গুণে বঙ্গদেশ থেকে সিন্ধু পর্যন্ত সুলতানি শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি যেমন ধার্মিক, তেমনই শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর শাসনকালে দিল্লীর বিখ্যাত কুতব মিনার নির্মিত হয়। ইলতুৎমিসই প্রথম দিল্লীকে রাজ্যের রাজধানী মনোনীত করেন এবং মোগলদের অভ্যুত্থান পর্যন্ত দিল্লীর সে মর্যাদা অপরিবর্তিত থাকে। ইলতুৎমিসের আগে, মহম্মদ ঘুরি ও কুতবুদ্দিন আইবকের শাসনকালে লাহোর ছিল সুলতানশাহির রাজধানী। মোগল যুগে শাহজানের সময় থেকে এবং ইংরেজ আমলে ও পরিশেষে স্বাধীন ভারতে দিল্লীই ভারতের রাজধানী মনোনীত হয়। সুতরাং ভারতের রাজধানী নির্বাচনে ইলতুৎমিস দূরদর্শিতার পরিচয় দেন একথা অবশ্যই বলা যায়। ১২৩৬খ্রী ইলতুৎমিসের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর কন্যা রাজিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

ইলবার্ট বিল: লর্ড রিপনের শাসনকালে, ১৮৮৩ খ্রী ৩০ জানুয়ারি, ফৌজদারি বিচার আইন সংশোধন করে বড়লাটের আইন সভায় একটি বিল আসে। বিলটির প্রণেতা ছিলেন ভারত সরকারের তৎকালীন আইন সচিব স্যার ইলবার্ট। তৎকালীন প্রচলিত আইন অনুসারে কোন ইউরোপীয়র বিচার ভারতীয় জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট করতে পারতেন না। লর্ড রিপন ঐ অন্যায় বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে স্যার ইলবার্টের উপর নূতন আইন প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ইলবার্ট বিলে ইউরোপীয় আসামীদের বিচারের ক্ষমতা ভারতীয় বিচারকদের উপর অর্পণের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু বিলের খসড়া প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। বিলটি প্রত্যাহারের জন্য তাঁরা আন্দোলন শুরু করেন। অপর দিকে বিলটির সমর্থনে ভারতীয়রাও সভাসমিতি করতে থাকেন। এ আন্দোলনে ভারতীয়দের পক্ষে নেতৃত্ব করেন প্রখ্যাত বাগ্মী লালমোহন ঘোষ। ঢাকার নর্থব্রুক হলে তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণ এ দেশের জাতীয় আন্দোলনের একটি স্মরণীয় ঘটনা।

ইউরোপীয়দের আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত ইলবার্ট বিল প্রত্যাহৃত হয়।

ইউরোপীয়দের বিশেষ অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে ইউরোপীয় ও ভারতীয় বিচারকদের বিচারক্ষমতা ও পদমর্যাদা সমান করা হয়। ইলবার্ট বিলের পক্ষে ও বিপক্ষে যে আন্দোলন হয় তা থেকে এ দেশের শিক্ষিত সমাজ বহু মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। একটি অবাঞ্ছিত বিলের বিরুদ্ধে কিভাবে সভা করে আবেদন-নিবেদন পেশ করে ও প্রতিবাদের ঝড় তুলে আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়, স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ সমাজের কাছে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ সেই প্রথম তা শিক্ষালাভ করে। ইংরেজ সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে ভারতের শিক্ষিত সমাজের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা সেই সময়েই হয়। ইলবার্ট বিল সম্পর্কিত আন্দোলনের দু'বছর পরে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম।

ইলম্‌কো-অটিকল : খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর তামিল কবি। তিনি জৈন ধর্মাবলম্বী ও চের রাজবংশীয় ছিলেন। তাঁর রচিত 'চিলপ পতিকারম' কাব্যটি 'সঙ্গম' যুগের পঞ্চকাব্যম-এর অন্যতম। এই কাব্যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর তামিলনাদের জনগণের জীবন-যাত্রা এবং বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ ও তত্ত্বচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী : ভারত ও পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের একদল বণিক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করেন ও ১৬০০খ্রী ৩১ ডিসেম্বর রানী এলিজাবেথের সনদবলে উক্ত কোম্পানী উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। ঐ কোম্পানি ১৬০৮খ্রী মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরের শাসনকালে সুরাটে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি পায়। পরে আগ্রা, আমেদাবাদ, বরোচ, এবং আরও পরে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে হরিহরপুর, মাদ্রাজ ও হুগলিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৪০খ্রী কোম্পানি মাদ্রাজে সুরক্ষিত সেণ্ট জর্জ দুর্গ নির্মাণ করে। ১৬৯০ খ্রী জব চার্নক হুগলী নদীর তীরবর্তী সুতানুটি গ্রামে একটি কারখানা স্থাপন করেন। আট বছর পরে মোগল সম্রাট ঔরংজেবের অনুমতি অনুসারে চার্নক সুতানুটিসহ কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামক পল্লী দুটি নিয়ে কলকাতা নগরীর পত্তন করেন। ১৭১৫ খ্রী মোগল দরবার থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। সে মুদ্রা মোগল সাম্রাজ্যেও চালু হয়। ১৬৬৮ খ্রী ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস বিবাহের যৌতুক স্বরূপ বোম্বাই দ্বীপটি পর্তুগালের কাছ থেকে পান। তিনি ঐ দ্বীপটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিলে কোম্পানী সেখানেও একটি দুর্গ নির্মাণ করে।

১৭৫৭ খ্রী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনী পলাশির যুদ্ধে বাঙলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে পূর্বভারতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি করতে থাকে। ১৭৬৫ খ্রী কোম্পানি মোগল সম্রাটের কাছ থেকে বাঙলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করলে পূর্ব ভারতে বৃটিশ কর্তৃত্ব

সুদৃঢ় হয়। তারপর গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড ডালহৌসির শাসনকালের মধ্যে (১৭৭২—১৮৫৬ খ্রী) সারা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করে। তখনও পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপর ভারতের শাসন-দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রী সিপাহি বিদ্রোহের পর বৃটিশ সরকার উপলব্ধি করেন যে এতবড় একটি দেশের শাসনদায়িত্ব একটি কোম্পানির হাতে ন্যস্ত থাকা ঠিক নয়। সে কারণে ১৮৫৮ খ্রী বৃটিশ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণাবলে ভারতের শাসনদায়িত্ব সম্পূর্ণ রূপে বৃটিশ সরকারের উপর ন্যস্ত হয় এবং কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে।

কোম্পানির শাসনকাল অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন ও জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার অগণিত কাহিনীতে কলঙ্কিত হলেও ঐ সময়ে ভারতের কল্যাণকর পরিবর্তনও লক্ষণীয়। কোম্পানির শাসনকালে ভারতে সতীদাহ, শিশুহত্যা প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রথার অবসান ঘটে; পিণ্ডারি, ঠগী প্রভৃতি দস্যুদের সম্পূর্ণরূপে দমন করা হয়, অরাজকতা দূর হয়। কোম্পানির শাসনকালে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রমুখ বহু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুনরুদ্ধারে কোম্পানির আমলের রাজকর্মচারীগণ বিশেষ তৎপর ছিলেন। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার আধুনিক যুগের সূচনাতেও কোম্পানির আমলের শিক্ষানুরাগীদের অবদান সীমাহীন।

ইসলাম, ভারতে: ইসলামধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মৃত্যুর (৬৩২খ্রী) শতাব্দীকালের মধ্যেই দুর্ধর্ষ আরব জাতির দিগ্‌বিজয় শুরু হয়।

ভারতের সিন্ধু প্রদেশের হিন্দু রাজা দাহিরের রাজত্বকালে প্রথম আরব আক্রমণ হয়। দাহির পরাজিত ও নিহত হন এবং সিন্ধুপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের একাংশ আরবদের অধিকারে যায়। কিন্তু চালুক্য, গুর্জর-প্রতিহার প্রভৃতি হিন্দুরাজ্যগুলির বাধাদানের ফলে এবং আরবদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ শুরু হওয়ায় আরব অধিকার আর বিস্তারলাভে সমর্থ হয় না। তবে আরবদের প্রভাবে ঐ এলাকায় প্রায় সকলেই ইসলামধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। ভারত ও আরব সংস্কৃতিরও যোগাযোগ ঘটে।

সিন্ধু প্রদেশে আরবদের আক্রমণের পর ভারতে উল্লেখযোগ্য মুস্লিম অভিযান পরিচালিত হয় সুলতান মামুদের নেতৃত্বে। ১০০০ খ্রী তিনি প্রথমবার ভারত আক্রমণ করেন এবং ১৭ বার ভারতের বিভিন্ন দিকে সুলতান মামুদের অভিযান পরিচালিত হয়। কিন্তু ভারতের অফুরন্ত ধন-সম্পদ লুণ্ঠন ও অমুস্লিমদের পীড়নই ছিল সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর ভারতে গজনি শাসনের স্থায়ী ফলাফল কিছুই প্রায় থাকে না।

ভারতে তৃতীয় বৃহৎ মুস্লিম অভিযানের নেতা ছিলেন ঘুর রাজ্যের শাসক মহম্মদ ঘুরি বা ঘোরি। ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তিনি ভারত আক্রমণ করেন। তিনি ১১৭৫ খ্রী এদেশে আরব শাসনের অবসান ঘটান এবং তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে,

১১৯২ খ্রী পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত ও নিহত করে এবং দু বছর পরে জয়চাঁদকে পরাজিত করে উত্তর ভারতে একটি বৃহৎ রাজ্য গড়ে তোলেন। স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের আগে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত ক্রীতদাস কুতবুদ্দিন আইবককে ভারতে অধিকৃত স্থানগুলির শাসনদায়িত্ব অর্পণ করেন। কুতব হন মহম্মদ ঘুরির রাজপ্রতিনিধি, সুলতান। মহম্মদ ঘুরি ১২০৬খ্রী মারা গেলে কুতব স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন শুরু করেন।

কুতব মহম্মদ ঘুরির ক্রীতদাস ছিলেন বলে কুতব ও তাঁর বংশধরদের শাসনকে দাস বংশীয় শাসন বলা হয়। দাস বংশের সুলতান কাইকোবাদকে হত্যা করে জালালুদ্দিন ফিরুজ খলজি ১২৯০ খ্রী দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন, শুরু হয় খলজি বংশীয় সুলতান শাসন। ১৩২০ খ্রী খলজি বংশীয় শেষ সুলতান খসরুকে হত্যা করে দিল্লীর মসনদে বসেন গিয়াসুদ্দিন তুঘলক ও সেই সঙ্গে তুঘলক বংশীয় সুলতানি শাসনের সূচনা হয়। তুঘলক বংশীয় শেষ সুলতান মামুদ শাহের মৃত্যু হলে (১৪১৯ খ্রী) দিল্লীর আমির ওমরাহদের অনুমোদনক্রমে দৌলত খাঁ লোদি দিল্লীর সুলতান হন। কিন্তু তাঁকে উৎখাত করেন মুলতানের শাসনকর্তা খিজির খাঁ। তৈমুর ভারত ত্যাগের সময় খিজির খাঁকে তাঁর প্রতিনিধি মনোনীত করে যান। এ কারণে খিজির খাঁ দিল্লীর সিংহাসনে বসলেও সুলতান নাম গ্রহণ করেন না, তৈমুরের প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তাঁর পুত্র মোবারক শাহ অবশ্য সুলতান পদবী গ্রহণ করেন। খিজির খাঁর বংশধরেরা হজরত মহম্মদের বংশধর সৈয়দ বংশীয় বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন, সে কারণে তাঁরা সৈয়দ বংশীয় সুলতান নামে অভিহিত। সৈয়দ বংশীয় শেষ সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহকে অপসারিত করে বহলুল লোদি নামে দিল্লীর এক প্রভাবশালী আফগান ওমরাহ সুলতানির মসনদ দখল করলে ১৪৫১ খ্রী সৈয়দ বংশীয় শাসনের অবসান ও লোদি বংশীয় শাসনের সূচনা হয়।

লোদিবংশীয় সুলতানশাহির অবসান ঘটান মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর, ১৫২৬ খ্রী। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদিবংশীয় সুলতান ইব্রাহিম লোদি পরাজিত ও নিহত হন এবং দিল্লীর সিংহাসনে বসেন মোগল সম্রাট বাবর।

মোগল সম্রাটদের শাসনকালে সমগ্র ভারতে মুস্লিম অধিকার কায়েম হয়। মুস্লিম শাসনকালে মোগল যুগই সর্বাধিক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তৃতীয় মোগল সম্রাট আকবর বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতিরূপে স্বীকৃত। ঔরংজেবের শাসনকালে মোগল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ভারতখণ্ড ক্ষুদ্র অগণিত রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৮৫৭ খ্রী পর্যন্ত নামেমাত্র মোগল সম্রাটের অস্তিত্ব থাকলেও ইংরেজরাই তখন ছিলেন ভারতের প্রকৃত শাসক। শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ সিপাহি বিদ্রোহে যোগদান করায় ইংরেজ সরকারের

হুকুমনামায় দিল্লীর মোগল সম্রাটদের নামমাত্র অস্তিত্বেরও অবসান ঘটে।

ইসা খাঁ: পূর্ববঙ্গের বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম। পিতা কালিদাস গজদানি ছিলেন রাজপুত হিন্দু, পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। বর্তমান ঢাকা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, রংপুর, পাবনা ও বগুরা জেলার বিভিন্ন অংশ নিয়ে ইসা খাঁর রাজ্য গঠিত ছিল। এই স্বাধীনচেতা নৃপতির সঙ্গে মোগল সম্রাট আকবরের বিভিন্ন সেনাবাহিনীর কয়েক বার সংঘর্ষ হয়। ১৮৫৬ খ্রী মোগলদের সঙ্গে ইসা খাঁকে দমন করতে মোগল-সম্রাট আকবর তাঁর রাজপুত সেনাপতি মানসিংহকে পাঠান। ইসা খাঁ প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেন এবং তাঁর আক্রমণে মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহ নিহত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসা খাঁকে পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করতে হয়। ১৫৯৯ খ্রী ইসা খাঁর মৃত্যু হয়।

ইহুদি, ভারতে: খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে ইহুদিরা এসে প্রথম বসতি স্থাপন করে। পরে তারা মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলকাতা প্রভৃতি শহরেও ছড়িয়ে পড়ে। একাদশ শতাব্দীতে মালাবারের ইহুদি সম্প্রদায়ের নেতা জোসেফ রাব্বান সেখানকার রাজা ভাস্কর রবি বর্মার কাছ থেকে ক্রাঙ্গানোর শহরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি লাভ করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ক্রাঙ্গানোর শহরটি ধ্বংস হলে ইহুদিরা কোচিন শহরে বসতি স্থাপন করে। ইহুদিদের সহায়তায় সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজরা কোচিন অধিকার করে। প্রায় দেড়শ বছর কোচিন ওলন্দাজদের অধিকারে থাকে। ঐ সময়ে ভারতে ইহুদিদের সর্বাধিক সমৃদ্ধি ঘটে। ইহুদিরা কোন সময়েই এদেশে সংখ্যায় খুব বেশি ছিল না। ১৯৫১ খ্রী লোকগণনায় দেখা যায় যে তখন এদেশে প্রায় বিশ হাজার ইহুদির বাস ছিল। ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েল গঠিত হওয়ার পর বহু ইহুদি এদেশ ত্যাগ করে। এখন ভারতে ইহুদিদের সংখ্যা নগণ্য।

ঈৎসিং (৬৩৫-৭১৩ খ্রী): চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক। ৬৭১ খ্রী জলপথে তাম্রলিপ্ততে আসেন ও পদব্রজে বৌদ্ধ তীর্থগুলি ভ্রমণ করেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫৬, মৌল গ্রন্থ লেখেন সাতটি। সে সব গ্রন্থে তৎকালীন ভারতের ধর্ম ও সমাজ জীবনের বর্ণনা আছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১): সুপণ্ডিত, সুলেখক ও সমাজ সংস্কারক। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে বিশেষ উদ্যোগী হন। দেশের নানা কুসংস্কার ও নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। তাঁরই নিরলস আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ খ্রী এক আইনবলে বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ হয়।

উইলকিনস, চার্লস: ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে ১৭৭০ খ্রী ভারতে আসেন। তারপর ফারসি ও বাংলা ভাষা শিক্ষায় পারদর্শিতার পরিচয় দেন। পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় তিনিই প্রথম বাংলা হরফ নির্মাণ করেন এবং ১৭৭৮ খ্রী তাঁর লেখা বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন।

পরে তিনি সংস্কৃত ও ফারসি ভাষারও হরফ নির্মাণ করান। তিনি গীতার ইংরেজি অনুবাদ করেন এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসের ভূমিকা সম্বলিত ঐ অনূদিত গীতা কোম্পানির খরচে ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়। উইলকিন্‌স মনুসংহিতারও কিছুটা অনুবাদ করেন এবং সংস্কৃত ভাষায় লেখা কিছু শিলালিপি ও তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার করেন।

উইলিংডন, লর্ড : লর্ড উইলিংডন ১৯৩১—৩৬ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন। তাঁর শাসনকালে ভারতের জাতীয় আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর মহাত্মা গান্ধী ১৯৩১ খ্রী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। ঐ সময়, ১৯৩২ খ্রী, বৃটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অনুসারে মুসলমান ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা হয়। অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের নাম একটি তালিকা বা তপশিল-এ লিপিবদ্ধ করা হয়, এ কারণে তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়গুলি 'তপশিলি সম্প্রদায়' বা 'শিডিউলড কাস্ট' নামে অভিহিত হয়। হিন্দু সমাজকে ঐ ভাবে দ্বিধাবিভক্ত করার প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন শুরু করেন। তখন তপশিলি সম্প্রদায়ের নেতা ডাঃ আম্বেদকর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অনুযায়ী প্রাপ্ত আসনের দ্বিগুণসংখ্যক আসনের প্রতিশ্রুতি মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে পেয়ে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার দাবি ত্যাগ করেন। মহাত্মা গান্ধী ও ডাঃ আম্বেদকরের মধ্যে তখন যে চুক্তি হয় তা পুনা চুক্তি নামে অভিহিত।

লর্ড উইলিংডনের শাসনকালের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন।

উজ্জয়িনী : বর্তমান মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমপ্রান্তে শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন নগরী। উৎখননের ফলে ঐ নগরীর চারিদিকে একটি প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। সেটি খ্রী-পূ সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত হয় বলে মনে হয়। উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির প্রসিদ্ধ। উজ্জয়িনী শকারি বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। শক ও গুপ্ত যুগে উজ্জয়িনী জ্যোতিষ বিদ্যা চর্চার কেন্দ্র ছিল।

উডরফ, স্যার জন জর্জ (১৮৬৫—১৯৩৬): ব্যারিস্টারি পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। পরে বিচারপতি ও প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন।

উডরফ এ দেশের তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ে বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে কয়েকটি লুপ্তপ্রায় তন্ত্র-গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। গ্রন্থগুলি প্রকাশ কালে তিনি 'আর্থার এভলন' ছদ্মনাম গ্রহণ করেন।

উৎপল বংশ : কাশ্মীরের এক রাজবংশ। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে অবন্তীবর্মা (রাজত্বকাল ৮৫৫—৮৩ খ্রী) ঐ বংশের রাজত্বের সূচনা করেন। তিনি প্রজাবৎসল বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। অবন্তীবর্মার মৃত্যুর পর তাঁর

পুত্র শঙ্করবর্মা (রাজত্বকাল ৮৮৩-৯০২ খ্রী) রাজা হন ও রাজ্য বিস্তার করেন। সে সময় কাশ্মীর রাজ্যের সীমা পাঞ্জাব ও গুজরাতের বিভিন্ন স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু শঙ্করবর্মা অত্যাচারী ছিলেন এবং বিদ্রোহী প্রজাদের হাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর কয়েক বছর অরাজকতার মধ্যে কাটে এবং ৯৩৯ খ্রী যশস্কর নামে এক ব্রাহ্মণ কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

উত্তর প্রদেশ: ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম ও সর্বাধিক জনবহুল অঙ্গরাজ্য। উত্তরে অবস্থিত বলে নাম উত্তর প্রদেশ, সংক্ষেপে ইউ পি। ১৮৩৩ খ্রী বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে আগ্রাকে বিচ্ছিন্ন করে আগ্রা প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়। ১৮৩৬ খ্রী আগ্রা ও সমীপবর্তী বৃটিশ অধিকৃত স্থান নিয়ে গঠিত হয় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ (নর্থ-ওয়েস্টার্ন-প্রভিন্স)। ১৯২১ খ্রী অযোধ্যা ঐ প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় প্রদেশটির নাম হয় 'ইউনাইটেড প্রভিন্স অফ আগ্রা অ্যাণ্ড আউধ' সংক্ষেপে ইউ পি। স্বাধীনতার পর নতুন সংবিধানে প্রদেশটির নাম রাখা হয় উত্তর প্রদেশ। তিনটি দেশীয় রাজ্য—টিহরি গাড়ওয়াল, রামপুর ও বারাণসী এবং রাজস্থান ও প্রাক্তন-বিন্ধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ উত্তর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের আয়তন ২,৯৪,৩৬৪ বর্গ কিলোমিটার। রাজ্যে বিভাগ আছে ১১টি আর জেলার সংখ্যা ৫৪। রাজধানী লখনউ। হাইকোর্ট এলাহাবাদে অবস্থিত।

উত্তর প্রদেশ প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। অযোধ্যা রামায়ণ কাহিনীর পশ্চাৎপট। মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, হরিদ্বার, প্রয়াগ হিন্দুদের সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। কাশীর সমীপবর্তী সারনাথ বৌদ্ধদের পবিত্র তীর্থভূমি। আবার ফতেপুর সিক্রি, আগ্রায় আছে মুস্লিম স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আগ্রার তাজমহল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-কীর্তি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও উত্তর প্রদেশের বিরাট অবদান। ১৮৫৭ খ্রী সিপাহি বিদ্রোহ উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানেই সর্বাধিক ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। পরবর্তীকালে মোতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোযাত্রীরা উত্তর প্রদেশেই ভূমিষ্ঠ হন। ভারতের প্রথম তিন প্রধানমন্ত্রী—জওহরলাল নেহরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উত্তর প্রদেশের মানুষ। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁও উত্তর প্রদেশের মানুষ ছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ: বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত এই প্রদেশটি গঠিত হয় ভাইসরয় লর্ড কার্জনের শাসনকালে ১৯০১ সালে। আয়তন ৩৯ হাজার বর্গ মাইল। রাজধানী পেশোয়ার। পাকিস্তান সৃষ্ট হওয়ার পর চিত্রল, সোয়াত, অম্ব ও দির—এই চারটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য ঐ প্রদেশের অন্তর্গত হয়। অধিবাসীদের ভাষা পুশতু।

১৯৩৭ সালে প্রদেশটি ভারতের

তৎকালীন ১১টি প্রদেশের অন্যতম রূপে স্বীকৃত লাভ করে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সীমান্ত প্রদেশের অবদান গৌরবময়। ঐ প্রদেশের নেতা খান আব্দুল গফ্ফর খান সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত। তাঁর অগ্রজ ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশে প্রথম কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সীমান্ত প্রদেশে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম কালের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন ডাঃ চারু ঘোষ।

উদয়গিরি-খণ্ডগিরি : ওড়িশার অন্তর্গত প্রত্নসম্পদে সমৃদ্ধ দুটি বালি-পাহাড়। উৎখননে আবিষ্কৃত কোন কোন প্রত্নসামগ্রী দু হাজার বছরের পুরানো। অধিকাংশ নিদর্শন জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবিত; হিন্দুধর্ম প্রভাবিত নিদর্শনেরও সন্ধান মিলেছে। খণ্ডগিরি খ্রী-পূ প্রথম শতাব্দীতে মহামেঘবংশের রাজা খারবেলের রাজত্বকালে জৈন ধর্মের একটি পীঠস্থান ছিল। উদয়-গিরির গণেশ গুম্ফায় অষ্টম শতাব্দীর ভৌম রাজাদের লিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। দশম-একাদশ শতাব্দীর নিদর্শন-গুলি অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবিত। সে সময় উদয়গিরি বৌদ্ধ ধর্মের বজ্রযান সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

উদয়ন : ভগবান বুদ্ধের সমকালীন ১৬টি মহাজনপদের অন্যতম বৎস-রাজ্যের নৃপতি। উদয়নের শাসনকালে বৎসরাজ্য সমৃদ্ধি ও বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি প্রথম জীবনে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী হলেও পরে ঐ ধর্মে দীক্ষা নেন।

উদয়নালা : সাওতাল পরগণা জেলার অন্তর্গত ইতিহাস প্রসিদ্ধ যুদ্ধ-ক্ষেত্র। নবাবি আমলে সেখানে একটি দুর্গ নির্মিত হয়। নবাব মিরকাশিম দুর্গটিকে আরও সুরক্ষিত করেন। ১৭৬১ খ্রী উদয়নালায় মিরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের পর বাঙলা-বিহার-ওড়িশায় ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

উদয়পুর : বর্তমান রাজস্থান রাজ্যের একটি জেলা। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে উদয়পুরে বিভিন্ন সময়ে অনেক-গুলি রাজ্য গড়ে ওঠে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিশোদিয়া বংশের রাজা সমর সিংহের রাজত্বকালে উদয়পুর রাজ্য চিতোর থেকে আবু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে খলজি বংশীয় সুলতান আলা-উদ্দিনের ভ্রাতা উলুঘ খাঁ প্রথম উদয়পুর জয় করেন। তারপর আলাউদ্দিন, শের শাহ ও সম্রাট আকবরের আক্র-মণে উদয়পুর বার বার বিপর্যস্ত ও অধিকৃত হয়। উদয় সিংহের পুত্র রানা প্রতাপ সিংহ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংগ্রাম করেও মোঘলদের দখল থেকে উদয়পুর ও চিতোর উদ্ধার করতে পারেন নি। ১৬৮১ খ্রী রাজা জয়সিংহ উদয়পুরের রাজারূপে মোগল সম্রাটের স্বীকৃতি লাভ করেন।

উদয়সিংহ (১৫২২-৭২)**:** মেবারের রাজা সংগ্রাম সিংহের পুত্র। ধাত্রী পান্না কর্তৃক নিজ পুত্রের জীবনের বিনিময়ে শিশু উদয় সিংহের প্রাণ রক্ষার কাহিনী সুবিদিত। উদয় ১৫৪১ খ্রী মেবারের রাজা হন। তার তিন বছর পরে শের শাহ চিতোর জয় করলে

উদয় পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেন এবং হৃত রাজ্য উদ্ধারের জন্য সংগ্রাম করে যান। শের শাহের মৃত্যুর পর তিনি চিতোর জয় করেন। কিন্তু ১৫৬৭ খ্রী মোগল সম্রাট আকবর চিতোর আক্রমণ করলে তিনি পুনরায় পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করেন। তখন তাঁর দুই বিশ্বস্ত অনুচর জয়মল ও পত্ত চিতোর রক্ষার চেষ্টায় মৃত্যু বরণ করেন। ১৫৬৮ খ্রী চিতোর মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উদয় সিংহ ১৫৫৯ খ্রী উদয়পুর নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৭২ খ্রী উদয় সিংহের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র প্রতাপ সিংহ মেবারের রাজা হন।

উদয়াদিত্য : একাদশ শতাব্দীর মালবের পারমার বংশীয় নৃপতি। চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের আক্রমণ প্রতিহত করে তিনি পারমার রাজ্যের সমৃদ্ধি সাধন করেন। সাহিত্য ও শিল্পানুরাগী, প্রজাহিতৈষী ও বীর যোদ্ধারূপে রাজপুতবংশীয় পারমাররাজ উদয়াদিত্য সুখ্যাত।

উদয়িন : মগধের রাজা অজাতশত্রুর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর শাসনকালে পাটলিপুত্র মগধের রাজধানী হয়। অবন্তির রাজার সঙ্গে উদয়িনের যুদ্ধের কথা জৈনগ্রন্থে উল্লেখিত আছে।

উদ্ভট : অলঙ্কার শাস্ত্রের বিশিষ্ট পণ্ডিত, কাশ্মীরাধিপতি জয়পীড়াদেবের (৭৭৯ - ৮১৩ খ্রী) রাজসভার প্রধান ছিলেন। বিশিষ্ট আলঙ্কারিক ভামহ রচিত 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থখানির উপর উদ্ভট একটি টীকা রচনা করেন। টীকা গ্রন্থটির নাম ভামহ বিবরণ। গ্রন্থটির কোন অনুলিপি পাওয়া যায়নি। শুধু বিভিন্ন আলঙ্কারিকের গ্রন্থে তার উল্লেখ ও উদ্ধৃতি মেলে।

উপনিষদ : বেদ চারখণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতিটি বেদ সংহিতা অথবা মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক—এই তিন বিভাগে বিভক্ত। শেষোক্ত বিভাগের নাম আরণ্যক হওয়ার কারণ, অরণ্যে বাসকালে এটি অধ্যয়নের রীতি ছিল। আরণ্যকের শেষাংশকে উপনিষদ বলা হয়। উপনিষদের সঠিক সংখ্যা বর্তমানে নিরুপণ করা সম্ভব নয়। তবে 'মুক্তিকা উপনিষদ' গ্রন্থে ১৮০টি উপনিষদের উল্লেখ আছে। শ্রীশঙ্করাচার্য তার মধ্যে ১১টি উপনিষদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উপনিষদ বেদের শেষ অংশ বলে তাকে বেদান্তও বলা হয়। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে কর্মের প্রাধান্য, উপনিষদে জ্ঞানের প্রাধান্য। উপনিষদগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ঈশ-ভাষ্য, কেন, কঠবল্লী, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি।

শুধু ভারতীয় দর্শন নয়, পাশ্চাত্য চিন্তাজগতেও উপনিষদের প্রভাব দেখা যায়। ১৬৫৬ খ্রী দারা শিকোর চেষ্টায় ৫০টি উপনিষদের ফারসি অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। ১৮০১-০২ খ্রী ঐ গ্রন্থগুলির আবার লাতিন অনুবাদ হয়। পরবর্তীকালে জার্মান ও ইংরেজি ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ হয়।

উমিচাঁদ : অমৃতসরের অধিবাসী, শিখ ধর্মাবলম্বী। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দালালি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ১৭৫৭ খ্রী পলাশীর যুদ্ধের

আগে নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪ -১৯০৬): জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি। ১৮৬৮ খ্রী ব্যারিস্টারি পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। ভারতের রাজনৈতিক দাবির সমর্থনে ১৮৬২ খ্রী যে 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি' গঠিত হয় তিনি তার প্রথম সম্পাদক। ১৮৮৩ খ্রী আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ সমর্থন করেন। ১৮৮৫ খ্রী বোম্বাইয়ে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে, এবং ১৮৯২ খ্রী এলাহাবাদে অষ্টম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯০২ খ্রী স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

উরুবিল্ব: প্রাচীন মগধ রাজ্যের, বর্তমান বিহারের গয়া শহরের নিকটবর্তী ফল্গু নদীর (প্রচীন নাম নিরঞ্জনা) তীরবর্তী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। ঐখানে বোধিদ্রুমতলে ছ বছর ধ্যানমগ্ন থাকার পর গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তারপর ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বুদ্ধদেব উরুবিল্ব ত্যাগ করে সারনাথ অভিমুখে যাত্রা করেন।

ঋগ্‌বেদ: চার বেদের মধ্যে প্রথম এবং ভারতে আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্যকৃতির নিদর্শন। রচনাকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাব আছে। তবে মোটামুটিভাবে ঐ বেদখণ্ডের রচনাকাল খ্রীষ্ট-পূর্ব সার্ধ-সহস্রাব্দ থেকে দুই সহস্রাব্দের মধ্যবর্তীকালীন সময় —এ বিষয়ে সকলেএকমত। ঋগ্‌বেদের সব মন্ত্র ছন্দে লেখা।

ঋগ্‌বেদের সর্বাধিক মন্ত্র অগ্নি দেবতার উদ্দেশ্যে লেখা। তারপর ইন্দ্রের প্রাধান্য। অন্যান্য দেবতার মধ্যে আছেন সূর্য, বিষ্ণু, পর্জন্য, নদী প্রভৃতি। ঋগ্‌বেদে তৎকালীন বৈদিক সমাজের যেমন আধ্যাত্মিক চিন্তার পরিচয় মেলে, তেমনই পাওয়া যায় সে সময়ের সমাজজীবনের বিস্তারিত পরিচয়। (বেদ-দ্র)

একডালা: দিনাজপুর জেলার একটি ঐতিহাসিক স্থান। বঙ্গদেশের সুলতান ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৭) এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং সেখান থেকে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ তুঘলকের বিরুদ্ধে ১৩৫৪ খ্রী যুদ্ধ পরিচালনা করেন। পরবর্তী সুলতান সিকন্দর শাহ ১৩৫৯ খ্রী ঐ দুর্গ থেকে পুনরায় ফিরোজ তুঘলকের আক্রমণ প্রতিহত করেন। সুলতান হুসেন শাহর আমলে একডালা কিছুদিনের জন্য বঙ্গদেশের রাজধানী হয়।

এনি বেসান্ট (১৮৪৭-১৯৩৩): বৃটিশ মহিলা, লণ্ডনে জন্ম। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ১৮৮৯ খ্রী ভারতে আসেন এবং এখানেই জীবন অতিবাহিত করেন। মধ্যে ১৯০৭ খ্রী ফিলসফিকাল সোসাইটির প্রেসিডেন্টরূপে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন। ১৯১৪ খ্রী 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির বহু রচনায় ভারতে ইংরেজ শাসনের সমালোচনা থাকায় পত্রিকাটির কাছে একবার দুহাজার টাকা

জামানত দাবি করা হয়। ভারতের স্বায়ত্বশাসন অর্জনকল্পে বেসাণ্ট ১৯১৬ খ্রী 'হোমরুল লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯১৭ খ্রী অন্তরীণ হন এবং ঐ বছরেই কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। জীবনের শেষ দিকে হিন্দু ধর্ম প্রভাবিত হয়ে আধ্যাত্মিক প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

এণ্টনি কবিয়াল : উনিশ শতকের প্রথমার্ধের লোক। জাতিতে পর্তুগীজ ও খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী। কিন্তু বাঙলার সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। এবং একজন কবিয়ালরূপে খ্যাতি অর্জন করেন।

এমহার্স্ট, উইলিয়ম পিট : লর্ড এমহার্স্ট ১৮২৩-২৮খ্রী ভারতে গভর্নর-জেনারেল ছিলেন। তাঁর শাসনকালে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ হয় ১৮২৪-২৬ খ্রী। ১৮২৬খ্রী ইয়ান্দাবুর সন্ধিতে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের অবসান হয়। ব্রহ্মরাজকে আরাকান ও টেনাসেরিম ছেড়ে দিতে হয় ও দশ লক্ষ টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। মণিপুর, আসাম, কাছাড় প্রভৃতি স্থানের দাবিও ব্রহ্মরাজকে ত্যাগ করতে হয়।

লর্ড এমহার্স্টের শাসনকালে ১৮২৬ খ্রী জানুয়ারি মাসে ইংরেজ সরকার ভরতপুর রাজ্য জয় করে। তাঁর শাসন কালেই, ১৮২৪ খ্রী, ব্যারাকপুর শিবিরে প্রথম সৈন্যবিদ্রোহ ঘটে। কঠোর হাতে সে বিদ্রোহ দমন করা হয়। গভর্নর-জেনারেল হিসাবে তিনিই প্রথম (১৮২৭ খ্রী) গ্রীষ্মকালে সিমলায় অবস্থানের রীতি প্রচলন করেন। সতীদাহ প্রথা নিবারণে লর্ড এমহার্স্টের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তিনি ১৮২৩ খ্রী সতীদাহ সম্পর্কে যে কয়েকটি বিধি-নিষেধ জারি করেন তা রাজা রামমোহন সহ তৎকালীন ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা সমর্থিত হয়। তাঁর যুদ্ধনীতি বৃটিশ সরকার অনুমোদন না করায় ১৮২৮খ্রী ১০মার্চ লর্ড এমহার্স্ট পদত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

এলগিন, লর্ড (প্রথম) : ১৮৬২খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় নিযুক্ত হন। কিন্তু কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই ১৮৬৩ খ্রী তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শাসনকালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কয়েকটি পাঠান উপজাতিকে দমনের জন্য সৈন্য পাঠানো হয়। লর্ড এলগিনের মৃত্যুর পর স্যার জন লরেন্স তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

এলগিন, লর্ড (দ্বিতীয়) : লর্ড এলগিন ১৮৯৪-৯৯খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন। তিনি উদারনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং নানা উপায়ে এদেশের বৈষয়িক উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। তাঁর সময়ে ইঙ্গ-রুশ চুক্তির মাধ্যমে বৃটিশ ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে দীর্ঘ সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হয়।

এলাহাবাদ : বর্তমান উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত একটি সুপ্রাচীন শহর। পূর্বনাম প্রয়াগ। প্রয়াগ আর্যদের অন্যতম প্রাচীন উপনিবেশ এবং পুরাণে তার উল্লেখ আছে। সম্রাট অশোকের শাসনকাল থেকে

প্রয়াগ প্রসিদ্ধ নগরী। সম্রাট হর্ষবর্ধন প্রয়াগের সঙ্গমে পাঁচবছর অন্তর ধনরত্ন বিতরণ করে সর্বস্বান্ত হতেন, পরিব্রাজক হিউ এন সাং-এর বিবরণীতে তার উল্লেখ আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এলাবাদ মুস্লিম শাসনাধীনে ছিল। মোগল সম্রাট আকবর প্রয়াগের নাম দেন আল্লাহবাদ, তা থেকে এলাহাবাদ নামের উৎপত্তি। এলাহাবাদ ছিল সম্রাট আকবরের ১৫টি সুবার একটি। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্বল্পকালের জন্য এলাহাবাদ মারাঠাদের অধিকারে ছিল। ১৭৭০ খ্রী ওয়ারেন হেস্টিংস এলাহাবাদকে ইংরেজ সরকারের অধীনে আনেন।

এলেনবরা, লর্ড ঃ লর্ড এলেনবরা ১৮৪২ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন এবং ১৮৪৪ খ্রী পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। লর্ড অকল্যাণ্ডের শাসনকালে আফগানিস্তানে বৃটিশের যে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় এলেনবরা ব্যর্থ হন।

লর্ড এলেনবরার শাসনকালে সিন্ধু দেশ বৃটিশ ভারতের অঙ্গীভূত হয়। গোয়ালিয়রও ঐ সময় বৃটিশ আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। তাঁর শাসনকালে ভারতে দাসপ্রথার অবসান হয়। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করেন ও পুলিশ প্রশাসনের উন্নতি করেন।

এলেশ্বরম ঃ অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষ্ণা নদীর তীরে এই স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর ইক্ষাকু রাজাদের বহু প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

এলোরা ঃ প্রাচীন শিল্পকলার জন্য খ্যাত, মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি অনুচ্চ পর্বত। ঐ পর্বতের গায়ে অর্ধশতাধিক কৃত্রিম গুহায় বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন ধর্মপ্রভাবিত শিল্পকলার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগেরও বহু সামগ্রীর সন্ধান পাওয়া গেছে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে বাদামির চালুক্য রাজাদের শাসনকালে ঐ গুহাগুলি খনন করা হয় এবং তাতে বিভিন্ন ধর্মের দেবতাদের নানা চিত্র অঙ্কন শুরু হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এলোরার পর্বতগুহায় শিল্প রচনা চলে বলে অনুমান করা হয়।

ওড়িশা ঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগে ওড়িশার পূর্বাংশ উৎকল এবং উপকূলবর্তী পশ্চিমাংশ কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগের কোন কোন গ্রন্থে ওড়িশাকে অনার্যদের দেশ বলা হয়েছে।

কলিঙ্গদেশে প্রথম উল্লেখযোগ্য বহিরাক্রমণ ঘটে খ্রী-পূ চতুর্থ শতাব্দীতে। মগধের রাজা মহাপদ্ম নন্দ তখন কলিঙ্গ জয় করেন। তারপর খ্রী-পূ তৃতীয় শতাব্দীতে বিপুল রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে কলিঙ্গ জয় করেন মৌর্যবংশীয় সম্রাট অশোক। খ্রী-পূ প্রথম শতাব্দীতে 'মহামেঘবাহন' নামক এক অর্যবংশীয় নৃপতিকুল কলিঙ্গ শাসন শুরু করেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কলিঙ্গ গুপ্ত সম্রাটদের শাসনাধীনে আসে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে কলিঙ্গদেশে আবার স্থানীয় নৃপতিদের শাসন শুরু হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর সূচনায় গঙ্গ বংশীয় নৃপতি চোড়গঙ্গের শাসনকালে পুরীর মন্দির নির্মিত হয়। কোণার্কের সূর্যমন্দির নির্মিত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা নরসিংহের শাসনকালে। পঞ্চদশ

শতাব্দীর প্রথমার্ধে সূর্যবংশীয় নৃপতি কপিলেশ্বরের শাসনকালে কলিঙ্গ সাম্রাজ্য পূর্বে ভাগীরথী নদীর তীর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে মাদ্রাজের তিরু-চিরাপল্লী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। কলিঙ্গ রাজ্যের সেটি স্বর্ণযুগ। কপি-লেশ্বরের পৌত্র প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কলিঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দ হরিচন্দন (১৫৫৯-৬৮)। তারপর কলিঙ্গদেশ মুস্লিম অধিকারে আসে, এবং সম্রাট আকবরের শাসনকালে ওড়িশা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৬৫ খ্রী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বঙ্গ-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করে। ইংরেজ শাসনকালে ১৯৩৬ খ্রী ওড়িশা একটি প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। তখন ওড়িশার মধ্যে ময়ূরভঞ্জ, ঢেনকানল, কালাহাণ্ডি, বোলাঙ্গির প্রমুখ ছাব্বিশটি ছোটবড় দেশীয় রাজ্য ছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ঐ রাজ্যগুলি ওড়িশার অন্তর্ভূত হয়। শুধু সড়ইকেলা ও খরসওয়ান রাজ্যদুটি বিহারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। বর্তমান ওড়িশা রাজ্যের আয়তন ১,৫৫,৭৮২ বর্গকিলোমিটার।

ওড়িশার খ্যাতি তার স্থাপত্য-শিল্পের জন্য। বিভিন্ন ছাঁদে নির্মিত পুরী, ভুবনেশ্বর ও কোণার্কের মন্দির-গুলি স্থাপত্যকীর্তির বিস্ময়কর নিদর্শন। বিখ্যাত মন্দিরগুলি সবই খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর সৃষ্টি। রাজ আনুকূল্যে ওড়িশাবাসীদের স্থাপত্য তৎপরতা চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন থাকে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ওড়িশার জননেতাদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন গোপবন্ধু দাস, বিশ্বনাথ দাস, হরেকৃষ্ণ মহাতাব প্রভৃতি।

ওদন্তপুরী ঃ নালন্দার সমীপবর্তী অষ্টম শতাব্দীর একটি শিক্ষাকেন্দ্র। বৌদ্ধতত্ত্বাচার্য অতীশ দীপঙ্কর একদা ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আচার্য ছিলেন।

ওয়াজিদ আলি শাহ ঃ অযোধ্যার শেষ নবাব, অযোগ্যতার জন্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক ১৮৫৬ খ্রী গদিচ্যুত হন। সঙ্গীতজ্ঞ, কবি ও সাহিত্যিকরূপে খ্যাত ছিলেন। রাজ্যচ্যুত হওয়ার পর কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। সিপাহি বিদ্রোহের সময় বছরখানেক বন্দী ছিলেন।

ওয়াভেল, লর্ড ঃ লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৩-৪৭ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন। তার আগে ছিলেন ভারতের জঙ্গিলাট। ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রস্তুতিপর্ব লর্ড ওয়াভেলের শাসনকালে শেষ হয়। ভারতের নতুন সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়াভেল একটি সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠনে উদ্যোগী হন। এজন্য তিনি সিমলায় সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। কিন্তু মুস্লিম লীগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্না পাকিস্তানের দাবিতে অটল থাকায় সে সম্মেলন ব্যর্থ হয়।

ওদিকে ১৯৪৫ খ্রী বৃটেনে শ্রমিকদল সাধারণ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভের পর ক্ষমতাসীন হয়েই ভারতের স্বাধীনতা প্রশ্নের দ্রুত মীমাংসার জন্য তৎপর হন। বৃটেনের নতুন প্রধান মন্ত্রী ক্লিমেণ্ট এটলি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাঁর মন্ত্রিসভার তিন সদস্যকে পাঠান। বৃটিশ মন্ত্রিসভার ঐ

দৌত্য 'ক্যাবিনেট মিশন' নামে খ্যাত। ক্যাবিনেট মিশন মিঃ জিন্নার পাকিস্তানের দাবি স্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁরা যে সর্বভারতীয় যৌথ রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন তাতে হিন্দু প্রধান রাজ্যগুলিকে 'ক' শ্রেণীভুক্ত, মুস্লিম প্রধান উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের রাজ্য-গুলিকে 'খ' শ্রেণীভুক্ত এবং বঙ্গদেশ ও আসামকে 'গ' শ্রেণীভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। বলা হয় যে, তিন শ্রেণীভুক্ত প্রদেশ জোটগুলির শাসনব্যবস্থা তাদের নিজস্ব সংবিধান মতো পরিচালিত হবে এবং তিন প্রদেশ-জোটের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে ভারতের যৌথরাষ্ট্রীয় সংবিধান ও সেই অনুসারী শাসনব্যবস্থা। দেশীয় রাজ্যগুলি তাদের নিজ ইচ্ছা-মতো ভারত যৌথরাষ্ট্রে যোগ দেবে। নতুন সংবিধান অনুসারে দেশের শাসন-কার্য পরিচালিত হওয়ার আগে কেন্দ্রে একটি সর্বদলীয় অন্তর্বর্তী সরকার গঠনেরও প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব কংগ্রেস, লীগ উভয়ই গ্রহণের অযোগ্য বিবেচনা করে।

নানা রাজনৈতিক ওলটপালটের পর কংগ্রেস ১৯৪৬ খ্রী সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয় এবং পরে মুস্লিমলীগও কংগ্রেসকে অনুসরণ করে। ঐ সময় বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ খ্রী জুন মাসে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে কলকাতায় ভয়ংকর-ভাবে এবং সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় এবং মুস্লিমলীগও তার পাকিস্তানের দাবিতে অবিচল থাকে। ক্রমে ক্রমে বৃটিশ সরকার ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে থাকেন যে, পাকিস্তানের দাবি স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না।

কিন্তু লর্ড ওয়াভেল নাকি ভারত বিভাগের সমর্থক ছিলেন না এবং সে কারণে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হয়। সে কারণে ১৯৪৭ খ্রী জুন মাসে লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর স্থলা-ভিষিক্ত হন লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪৭ খ্রী ১৫ আগস্ট বিভক্ত ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮) : ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে ভারতে ইংরেজ সরকারের প্রথম গভর্নর-জেনারেল। অল্প বয়সে অতি সামান্য বেতনেইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী রূপে এদেশে আসেন তার পর স্বীয় প্রতিভা ও দক্ষতাবলে ক্রমে ক্রমে উচ্চ-পদে অধিষ্ঠিত হতে থাকেন। ১৭৭২খ্রী বঙ্গদেশের গভর্নর নিযুক্ত হয়। ১৭৭৩খ্রী বৃটিশ পার্লামেণ্ট রেগুলেটিং এক্ট পাশ হওয়ার পর বঙ্গদেশের গভর্নর পদাধিকার বলে বৃটিশ শাসিত ভারতের গভর্নর-জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস সেই পদ লাভ করেন। তিনি সুযোগ্য শাসক ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর শাসনকালেই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতি ও অন্যায় আচরণের অভিযোগ ওঠায় ১৭৮৫খ্রী গভর্নর-জেনারেল পদে ইস্তফা দিয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বার্ক, ফক্স, শেরিডান প্রমুখ

ইংলণ্ডের জগৎখ্যাত বাগ্মীগণ সেদেশে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তোলেন। ইংলণ্ডের জনমতের দাবিতে কমন্স সভা লর্ড সভার কাছে ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে রোহিলা যুদ্ধে বৃটিশ সৈন্যের অন্যায় নিয়োগ, চৈৎসিং ও অযোধ্যার বেগমদের প্রতি অন্যায় আচরণ ও অত্যাচারের কয়েকটি অভিযোগ আনেন। সেইসব অভিযোগের ভিত্তিতে ১৭৮২ খ্রী ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার (ইম্‌পিচমেণ্ট) শুরু হয় এবং সাত বছর ধরে সে বিচার চলে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি অভিযোগমুক্ত হন। কিন্তু দীর্ঘ বিচারের শেষে তিনি সর্বস্বান্ত হন এবং চরম অসম্মান ও উপেক্ষার মধ্যে তাঁর অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হয়।

শাসন দায়িত্ব গ্রহণের পরেই ওয়ারেন হেস্টিংস সরকারের অর্থ-সঙ্কট দূর করার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থাবলম্বন করেন। দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে তিনি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে সরকারের হাতে নিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে 'কালেক্টর' পদের সৃষ্টি হয়। রাজস্ব সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের তদারকির জন্য রেভিনিউ বোর্ড গঠিত হয় এবং জমিদারদের পাঁচ বছরের জন্য জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।

বিচার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস প্রতি জেলায় একটি করে দেওয়ানি ও একটি করে ফৌজদারি আদালত স্থাপন করেন। জমি সম্পর্কিত যাবতীয় মামলার নিষ্পত্তির দায়িত্ব ন্যস্ত হয় দেওয়ানি আদালতের উপর এবং কালেক্টর হন দেওয়ানি আদালতের বিচারক। ফৌজদারি আদালতের বিচার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় কাজি ও মুফতির উপর। ফৌজদারি বিচারের সর্বোচ্চ আদালত ছিল 'সদর নিজামত আদালত' এবং ঐ আদালতের বিচারপতি ছিলেন নবাব স্বয়ং। ফৌজদারি আদালতের প্রাণদণ্ডাদেশ নবাবের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু আইন এবং মুস্লিমদের বিচারে কোরান ও শরিয়তের নির্দেশ প্রয়োগের রীতি ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলেই প্রবর্তিত হয়। বিচারকদের নিয়মিত বেতনদানের ব্যবস্থাও তিনি প্রবর্তন করেন। ১৭৭৩ খ্রী রেগুলেটিং এক্ট অনুসারে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়।

গভর্নর-জেনারেলের কাজের সুবিধার জন্য রেগুলেটিং এক্ট অনুসারে চারজন সদস্য নিয়ে একটি কাউন্সিল গঠিত হয়। প্রথম কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন ক্লেভারিং, মনসন, ফ্রান্সিস ও বারোয়েল। কাউন্সিলের সঙ্গে হেস্টিংসের সদ্ভাব ছিল না, একমাত্র বারোয়েল ছাড়া অপর তিনজন প্রায়ই তাঁর কাজে বাধা দিতেন। ঐ বিরোধিতার সুযোগ নিয়ে দেশের বহু বিশিষ্ট লোক কাউন্সিল সমীপে ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নানা অত্যাচার, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ পেশ করতেন। ঐ সব অভিযোগকারীদের মধ্যে ছিলেন বর্ধমানের রানী, রাজশাহির রানী ভবানী, মহারাজ নন্দকুমার প্রভৃতি। বর্ধমানের রানী বৃটিশ রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার যে অভিযোগ আনেন, হেস্টিংস তার তদন্তে বাধা দেন। রাজস্ব দিতে বিলম্ব করার অভিযোগে রানী ভবানীর

জমিদারি কেড়ে নেওয়া হয়। কিন্তু কাউন্সিলের কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি তাঁর জমিদারি ফিরে পান। মহারাজ নন্দকুমারের অভিযোগ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি হেস্টিংসের বিরুদ্ধে মিরজাফরের বিধবা পত্নী মনি বেগমের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ আনেন। কিন্তু ঐ অভিযোগের নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই মহারাজ নন্দকুমারকে জালিয়াতির মিথ্যা অভিযোগে বিচার করে অতি দ্রুত মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বারাণসীর রাজা চৈৎসিং ও অযোধ্যার বেগমদের উপর অত্যাচার হেস্টিংসের শাসনকালের সর্বাধিক কলঙ্কিত কাহিনী।

কোম্পানির সঙ্গে এক চুক্তি অনুসারে বারাণসীর রাজা চৈৎসিংকে পাঁচ লক্ষ টাকা বাৎসরিক কর দিতে হত। কিন্তু ফরাসি ও মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য কোম্পানির প্রচুর টাকার প্রয়োজন হলে হেস্টিংস চৈৎসিং-এর কাছ থেকে একবার পাঁচ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আদায় করেন। পরে আবার চৈৎসিংকে টাকা দিতে বলা হলে তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করেন। হেষ্টিংস তখন সৈন্য পাঠিয়ে চৈৎসিংকে দাবি করা টাকার উপর অতিরিক্ত আরও দুই শত পাউণ্ড জরিমানা দিতে বাধ্য করেন। পরের বছর আবার টাকা ও সৈন্যের জন্য জুলুম করা হলে চৈৎসিং বিদ্রোহী হন (১৭৮০ খ্রী)। হেস্টিংস সহজেই সে বিদ্রোহ দমন করেন এবং চৈৎসিংকে বিতাড়িত করে মহীপ নারায়ণ নামক চৈৎসিং-এর এক আত্মীয়কে বারাণসীর সিংহাসনে বসান।

অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলার কাছ থেকে ওয়ারেন হেস্টিংস যখন কোম্পানীর পাওনা অনাদায়ী টাকার জন্য চাপ দেন তখন নবাব নিরুপায় হয়ে তাঁর মাতা ও পিতামহীর কাছ থেকে তাঁদের সঞ্চিত ত্রিশ লক্ষ টাকা আদায় করে কোম্পানিকে দেন। কথা হয় যে, আর কখনও বেগমদের কাছ থেকে ও ভাবে টাকা আদায় করা হবে না। কিন্তু টাকার দরকারে হেস্টিংস সে প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে অযোধ্যার বেগমদের বিরুদ্ধে বারাণসীর রাজা চৈৎসিংকে বিদ্রোহে সহায়তা করার মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁদের বন্দী ও লাঞ্ছিত করার ভয় দেখান এবং সৈন্য পাঠিয়ে বেগমদের সব সঞ্চিত অর্থ ও অলঙ্কার দিতে বাধ্য করেন।

হেস্টিংসের হাতে যখন ভারতে ইংরেজ সরকারের শাসন দায়িত্ব অর্পিত হয় তখন এদেশে মারাঠারাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য শক্তি ছিল। দিল্লীর মোগল সম্রাট শাহ আলম তখন মারাঠাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছেন। ক্লাইভ বছরে ২৬ লক্ষ টাকা কর দানের প্রতিশ্রুতিতে মোগল সম্রাটের কাছ থেকে বাঙলা বিহার, ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করেন। হেষ্টিংসের সুনিশ্চিত ধারণা হয় যে, ঐ টাকার একটি বড় অংশ মারাঠারা মোগল সম্রাটের কাছ থেকে আদায় করে। তাই তিনি মোগল সম্রাটকে টাকা দেওয়া বন্ধ করেন। পরন্তু কারা ও এলাহাবাদ মোগল সম্রাটের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে, তিনি ঐ দুটি স্থান অযোধ্যার নবাবকে দান করেন। পরে অযোধ্যার নবাবকে

চল্লিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে রোহিলাখণ্ড জয়ে সাহায্য করতে তিনি ইংরেজ সৈন্য বাহিনী পাঠান। ইংরেজ সৈন্যদের এইভাবে ভাড়াটে বাহিনী হিসাবে ব্যবহার করার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসকে পরে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর বিচারকালে এটি ছিল তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অন্যতম অভিযোগ।

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে ইংরেজদের সঙ্গে একবার মারাঠাদের (প্রথম মারাঠা-ইঙ্গ যুদ্ধ-দ্র) ও একবার মহীশূরের সুলতান হায়দর আলির (মহীশূর-ইঙ্গ যুদ্ধ, দ্বিতীয়-দ্র) যুদ্ধ হয়।

ভারতে ইংরেজ শাসকদের মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বাধিক বিতর্কিত চরিত্র। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ যেমন মিথ্যা ছিল না, একথাও তেমনিই সত্য যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও বৃটিশ স্বার্থকে তিনি সর্বদা ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে রেখেছিলেন। তাঁর শাসনকালে সলসেট ইংরেজ অধিকারে আসে। তিব্বত ও নেপালের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ভারতে ইংরেজ শাসনের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা শক্তিকে তিনি খর্ব করেন, ইংরেজ অধিকারের সীমান্তবর্তী অযোধ্যা রাজ্যের নবাবকে ইংরেজ সরকারের তাঁবে আনেন এবং কোন সময়ে মারাঠা, মহীশূর ও নিজামকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে না দিয়ে কূটনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তাছাড়া বিচার ও শাসন ব্যবস্থার সংস্কার করে রাজ্যে বহুপরিমানে অরাজকতার অবসান ঘটান।

ওয়ারেন হেস্টিংসের বিদ্যোৎসাহিতাও উল্লেখযোগ্য। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হয়। হলহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ, চার্লস উইলকিন্স কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত গীতা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মুদ্রিত হয়। উইলকিন্স অনূদিত গীতার ভূমিকা তিনি লেখেন এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্প্যানির পয়সায় গ্রন্থটি ইংলণ্ডে মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন তাঁর শাসনকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ওয়ার্ধা ঃ বর্তমানে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি প্রাচীন শহর। অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হলে মহাত্মা গান্ধী গুজরাতের সাবরমতী আশ্রমে আর প্রত্যাবর্তন করেননা। তারপর ওয়ার্ধায় তাঁর একান্ত অনুগত শেঠ যমুনালাল বাজাজের তত্ত্বাবধানে নতুন আশ্রম স্থাপিত হয়। সে কারণে ভারতের পরবর্তীকালের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ওয়ার্ধা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

ওয়াহাবি আন্দোলন ঃ মক্কায় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন আবদুল ওয়াহাব। তারই নামে ঐ আন্দোলন 'ওয়াহাবি আন্দোলন' নামে পরিচিত হয়। ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের সূচনা করেন বেরিলির সৈয়দ আহমেদ। ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রচার কেন্দ্র ছিল পাটনা, এবং সরলভাষায় লিখিত গান ও কবিতার মাধ্যমে শীঘ্রই পল্লী অঞ্চলে সে আন্দোলন ব্যাপক প্রসার লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়

দিকে ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলন একটি সুসংগঠিত সংগ্রামী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইসলামে অনুপ্রবিষ্ট নানা আচার অনুষ্ঠান ও পুরোহিত তন্ত্রের বিরোধিতা করা ঐ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল, কিন্তু শীঘ্রই ওয়াহাবি আন্দোলন রাজনীতি প্রভাবিত হয়। একদা রণজিৎ সিংহের শাসনের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করে, পরে ইংরেজ সরকারের উৎখাত তাদের আন্দোলনের লক্ষ্য হয়।

বাঙলাদেশে ওয়াহাবি আন্দোলন 'ফেরাজি' আন্দোলন নামে পরিচিত হয়। 'ফেরাজ' কথাটির উদ্ভব 'ফর্জ' থেকে যার অর্থ আল্লার আদেশ। ফেরাজিদের বক্তব্য ছিল, জমি ঈশ্বরের দান সুতরাং জমি যে চাষ করে জমির মালিক সে। তারা সরকারকে খাজনা দেওয়ার বিরোধী ছিল না, কিন্তু জমিদারের মধ্যস্বত্ব ভোগের অধিকার তারা স্বীকার করত না। ফলে জমিদারদের সঙ্গে ফেরাজিদের সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৮৩১-৩২ খ্রী বারাসত অঞ্চলে ফেরাজি আন্দোলনের সূচনা হয়, পরে তা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। নীলকরদের বিরুদ্ধেও ওয়াহাবি আন্দোলন তীব্র হয়। জমিদার ও ইংরেজ সরকারের মিলিত আক্রমণে বাঙলাদেশে ফেরাজিদের আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ফেরাজি আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন তিতুমির, তাছাড়া বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন ব্যক্তি আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে আসেন। আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মহৎ হলেও তা মুখ্যত ধর্মীয় আন্দোলন এবং মুস্লিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে জমিদাররা হিন্দু কৃষকদেরও ঐ আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমবেত করাতে সমর্থ হন। ১৮৭৫ খ্রী পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় ফেরাজিদের জমিদখল আন্দোলন চলে। তারপর ইংরেজ সরকারের প্রচণ্ড পীড়নে সে আন্দোলন ভেঙে পড়ে।

সিপাহি বিদ্রোহকালে ওয়াহাবিরা বিদ্রোহে যোগ দেয় এবং বহু স্থানের বিদ্রোহে নেতৃত্ব গ্রহণ করে। সারা ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের সংগ্রামে এবং বাঙলাদেশে জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রজাদের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের সূচনায় ওয়াহাবিদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

ওয়েলিংটন, ডিউক অফ (১৭৬৯-১৮৫২): ভারতে ইংরেজ সরকারের গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির ভাই আর্থার ওয়েলেসলি তাঁর বীরত্বের জন্য বৃটিশ সরকার কর্তৃক ডিউক অফ ওয়েলিংটন উপাধিতে ভূষিত হন। ভারতে মহীশূরের টিপু সুলতানকে যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি প্রথমে রণকুশলতার পরিচয় দেন এবং চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে টিপুর মৃত্যু ও মহীশূরের পরাজয়ের পর ১৭৯৯ খ্রী মহীশূরের গভর্নর নিযুক্ত হন। পরে কয়েকটি যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজিত করেন এবং ১৮০৫ খ্রী ভারত ত্যাগ করেন। ১৮১৫ খ্রী ওয়াটারলুর যুদ্ধে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নকে পরাজিত করাই তাঁর সৈনিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

ওয়েব, আলফ্রেড: বৃটিশ পার্লামেন্টের আইরিশ সদস্য। ১৮৯৪ খ্রী

মাদ্রাজে কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

ওয়েলেসলি, লর্ড (১৭৬০-১৮৪২) : লর্ড ওয়েলেসলি ১৭৯৮ খ্রী গভর্নর-জেনারেল হয়ে ভারতে আসেন। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ও দেশীয় নৃপতিদের ইংরেজ শাসনের অধীনে আনা—এই ছিল তাঁর শাসনের মূল উদ্দেশ্য। এ জন্য শাসনদায়িত্ব গ্রহণের পরেই লর্ড ওয়েলেসলি আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করেন।

দেশীয় নৃপতিদের ইংরেজ শাসনের অধীনে আনার জন্য লর্ড ওয়েলেসলি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি (Policy of Subsidiary Alliance) প্রবর্তন করেন। ঐ নীতির মূলকথা ছিল—যেসব রাজ্যের রাজা স্বেচ্ছায় ইংরেজ সরকারের বশ্যতা স্বীকার করবে, তাদের অন্য রাজ্যের আক্রমণ থেকে রক্ষার দায়িত্ব ইংরেজ সরকার গ্রহণ করবে। তার বিনিময়ে ঐ রাজ্যগুলির কোন স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি থাকবে না এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও রাজ্যগুলিকে বহু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে ; আর রাজ্যরক্ষায় নিযুক্ত ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভারও তাদের বহন করতে হবে।

অধীনতামূলক মিত্রতা প্রথম স্বীকার করেন হায়দরাবাদের নিজাম, ১৮০০ খ্রী। তিনি ইংরেজ সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করেন ও রাজ্যে অবস্থানকারী ইংরেজ সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজ্যের একাংশ, কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ দিকের যাবতীয় স্থান, ইংরেজ সরকারকে ছেড়ে দেন। ১৮০২ খ্রী পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও অনুরূপভাবে ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করেন। তারপর স্বীকার করেন নাগপুরের ভোঁসলা ও গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া।

টিপু ইংরেজ সরকারের অধীনতামূলক মিত্রতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ১৭৯৯ খ্রী ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয় (চতুর্থ মহীশূর-ইঙ্গ যুদ্ধ দ্র)। যুদ্ধে টিপু পরাজিত ও নিহত হন এবং তাঁর রাজ্যের একাংশ ইংরেজ সরকারের অধীনে আসে ও আর এক অংশ নিজামের দখলে চলে যায়। টিপুর অবশিষ্ট রাজ্যে মহীশূরের প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের এক উত্তরাধিকারীকে বসানো হয়। তিনি অধীনতামূলক মিত্রতা স্বীকার করে নেন।

১৭৯৯ খ্রী তাঞ্জোরের রাজা এবং সুরাটের নবাবকে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করে লর্ড ওয়েলেসলি তাঁদের রাজ্যগুলি ইংরেজ সরকারের অধীনে আনেন। সুরাটের নবাব সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলে রাজ্যটি সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮০১ সালে কর্ণাটক রাজ্য ইংরেজ শাসনাধীনে যায় এবং ইংরেজ অনুগত একজনকে কর্ণাটকের নবাব করা হয়। অযোধ্যার নবাবকে লর্ড ওয়েলেসলি গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের একাংশ, রোহিলাখণ্ড ও গোরখপুর ছেড়ে দিতে বাধ্য করেন। এইভাবে লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিশাল আকার ধারণ করে এবং মহীশূর ও মারাঠা শক্তি সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়।

তাঁর শাসনকালে ১৮০০ খ্রী কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়, যা অনতিবিলম্বে এদেশের

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনায় বিশেষ সহায়ক হয়। লর্ড ওয়েলেসলি গঙ্গা-সাগরে সন্তান বিসর্জনের নিষ্ঠুর প্রথার অবসান ঘটান।

ভারতে ফরাসি শক্তির প্রাধান্য-নাশে লর্ড ওয়েলেসলির তৎপরতাও বিশেষ উল্লেখ্য। ফরাসি সম্রাট নেপলিয়ন মিশরের মধ্য দিয়ে ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়েছেন, এ সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি ভারত থেকে মিশরে সৈন্য পাঠান। সে সৈন্যদল মিশরে পৌঁছানোর আগেই নেপলিয়ন সে স্থান ত্যাগ করেন। ভারতে বৃটিশ স্বার্থ নিরাপদ করার জন্য ওয়েলেসলি ব্রহ্মদেশ, পারস্য, আফগানিস্তান প্রভৃতি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

ইংলণ্ডে লর্ড ওয়েলেসলির আক্রমণাত্মক নীতির সমালোচনা শুরু হওয়ায় ও তাঁর কার্যকলাপে কোম্পানি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ায় ১৮০৫ খ্রী তাঁকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

ওলন্দাজ, ভারতে: ওলন্দাজ কথাটি 'হল্যাণ্ডিজ' শব্দের অপভ্রংশ। হল্যাণ্ডিজ, অর্থাৎ হল্যাণ্ডের লোকেরা সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনাতেই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে উদ্যোগী হয়। ১৬০২ খ্রী উলফ ও লাফের নামক দুই ওলন্দাজ বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন ও বর্তমান গুজরাত রাজ্যে যান। অবশ্য তার আগেও বহু ওলন্দাজ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আসেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইয়ান হুইখেন ফান লিন্সখোটেন (Ian Huyghen Van Linschoten)। তিনি ১৫৮৩-৮৯ খ্রী পর্তুগীজ উপনিবেশ গোয়ায় বাস করেন। লিন্সখোটেন লেখকরূপে সুপরিচিত ছিলেন।

উলফ ও লাফের ভারতে আসার এক বছর পরে গোয়ায় পর্তুগীজদের হাতে নিহত হন। তখন ওলন্দাজ সরকারের একটি শক্তিশালী নৌবহর ভারতে এসে কালিকট বন্দরে অবতরণ করে। কালিকটের রাজা তাদের সঙ্গে সন্ধি করেন ও মসুলিপত্তনে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন। তারপর পুলিকট, গোলকুণ্ডা, মাদ্রাস-পত্তম ও পোর্টোনাভোতেও ওলন্দাজ বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। পর্তুগীজ আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে ওলন্দাজরা পুলিকটে ফোর্ট গেলড্রিয়া নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৬১৬ খ্রী সুরাটে ওলন্দাজ বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। তারপর কয়েক বছরের মধ্যে ব্রোচ, কাম্বে, আহমেদাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ওলন্দাজদের আরও কয়টি বাণিজ্য কুঠি গড়ে ওঠে। ১৬৬৩ খ্রী ওলন্দাজরা কালিকটের রাজার সাহায্যে পর্তুগীজ-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও কোচিন শহর দখল করে। ঐ সময় মালাবার অঞ্চলে ওলন্দাজদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। পূর্ব-ভারতে ওলন্দাজদের বাণিজ্য শুরু হয় ১৬২৭ খ্রী। দক্ষিণ ভারত থেকে কিছু ওলন্দাজ বণিক ও কর্মচারী পিপলিতে এসে কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৫৩ খ্রী চুঁচুড়া পূর্বভারতে ওলন্দাজদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হয়। বালেশ্বর, কাশিম-

বাজার ও পাটনাতেও ওলন্দাজ বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে। চুঁচুড়ায় ওলন্দাজরা ফোর্ট গুস্তাফাস নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করে। দক্ষিণ ভারত থেকে ওলন্দাজরা কাপড়, চাল, জিরা, মরিচ, প্রভৃতি ইউরোপে চালান দিত। সুরাটে তাদের প্রধান বাণিজ্যিক পণ্য ছিল নীল। ১৬২৪ খ্রী সুরাট থেকে হল্যাণ্ডে প্রথম যে বাণিজ্য জাহাজটি যায় তার প্রধান পণ্য ছিল নীল। পূর্ব ভারত থেকে তাদের রপ্তানীর পণ্য ছিল তাঁতের কাপড়, সোরা, আফিং প্রভৃতি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ ও ফরাসিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ভারতে ওলন্দাজদের প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে থাকে। পলাশির যুদ্ধের পর পূর্ব ভারতে ইংরেজদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় ওলন্দাজদের দুর্দিন শুরু হয়। ১৭৫৯খ্রী মিরজাফর ওলন্দাজদের সহায়তায় বঙ্গদেশ থেকে ইংরেজদের উৎখাতের চেষ্টা করেন। কিন্তু বাটাভিয়া থেকে প্রেরিত ওলন্দাজ নৌবহর হুগলি নদীর মোহনায় বাদারের যুদ্ধে ইংরেজ নৌবহরের আক্রমণে পরাস্ত হয়। এর পর পূর্বভারতে ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক তৎপরতা প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পায় ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তারা পূর্ব ভারত সম্পূর্ণ ত্যাগ করে।

এদেশে একমাত্র কোচিনে সাময়িকভাবে ওলন্দাজ অধিকার কায়েম হয়। ১৬৬৩ খ্রী তারা পর্তুগীজদের বিতাড়িত করে কোচিন শহরে কর্তৃত্ব কায়েম করে এবং ১৭৫৯খ্রী কালিকটের রাজা কোচিন অধিকার না করা পর্যন্ত সে কর্তৃত্ব কায়েম থাকে।

ঔরংজেবঃ মোগল সম্রাট শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র ও পরবর্তী সম্রাট। রাজত্বকাল ১৬৫৮-১৭০৭ খ্রী। সিংহাসন দখলের আগে ঔরংজেব দাক্ষিণাত্য (১৬৩৬-৪৪), গুজরাত (১৬৪৫-৪৭) ও মুলতানের (১৬৪৭-৫২) এবং পরে আবার দাক্ষিণাত্যের (১৬৫২-৫৭) সুবাদার ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে দ্বিতীয়বার সুবাদার থাকাকালে পিতা সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ পান। স্বভাবতই পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র দারার সিংহাসন লাভের কথা! কিন্তু শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্র তাঁর অপর তিন পুত্রও (সুজা, ঔরংজেব ও মুরাদ) সিংহাসন দখলের জন্য তৎপর হন, এবং শাহাজাহানের জীবদ্দশাতেই ঔরংজেব অপর তিন ভাইকে কূটবুদ্ধিতে ও অস্ত্রবলে পরাজিত ও নিহত করে ১৬৫৮ খ্রী সিংহাসন অধিকার করেন এবং পিতা শাহজাহানকে আগ্রার দুর্গে বন্দী করে রাখেন। সেখানে প্রায় আটবছর বন্দী থাকার পর ১৬৬৬ খ্রী ৭৪ বছর বয়সে শাহজাহানের মৃত্যু হয়।

দিল্লীর সিংহাসনে বসে ঔরংজেব 'আলমগির বাদশাহ গাজি' উপাধি গ্রহণ করেন। ঔরংজেবের রাজত্বকাল দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। দীর্ঘ রাজত্বকালের প্রথম চব্বিশ বছর তিনি উত্তর ভারতে অতিবাহিত করেন। তারপর দক্ষিণ ভারতে মারাঠা ও অন্যান্য বিদ্রোহী শক্তিকে দমন করতে যে ১৬৮১ খ্রী দক্ষিণ ভারতে যাত্রা করেন তারপর আর উত্তর ভারতে প্রত্যাবর্তন করতে পারেননি। আর রাজধানী

দিল্লীতে তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে বিদ্রোহ ও অরাজকতা দেখা দেয় তার ফলেই মোগল সাম্রাজ্যের শেষ দিন ঘনিয়ে আসে।

সম্রাট ঔরংজেবের শাসনকালে মোগল সাম্রাজ্য পূর্বে আসাম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে এবং মোগল সৈন্য-বাহিনী চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ থেকে পর্তু-গীজদের বিতাড়িত করে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে ছত্রপতি শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠাদের যে বিদ্রোহ হয় তা ঔরং-জেবের পক্ষে নানাভাবে চেষ্টা করেও দমন করা সম্ভব হয়নি; তারপর তিনি সম্রাট আকবর অনুসৃত উদার ধর্মনীতি ত্যাগ করায় রাজস্থানের অনুগত হিন্দু নৃপতিরাও মোগল সম্রা-টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তিনি সব প্রাদেশিক শাসককে হিন্দু মন্দির ও বিদ্যালয় ধ্বংসের নির্দেশ দেন এবং সমস্ত উৎসব ও মেলা পার্বণ নিষিদ্ধ হয়। তারপর সম্রাট আকবর যে জিজিয়া কর প্রত্যাহার করেন সম্রাট ঔরংজেবের নির্দেশে তা পুনরায় বলবৎ হয়।

দক্ষিণ ভারতে অবস্থানকালে সম্রাট ঔরংজেব তাঞ্জোর ও তিরুচিরাপল্লী পর্যন্ত তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেন। ফলে সেই সময়ই মোগল সাম্রাজ্য সর্বপ্রথম সারা ভারতে বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু একই সঙ্গে উত্তর ভারতে শিখ, রাজপুত ও জাঠদের বিদ্রোহে মোগল সাম্রাজ্যের বনিয়াদে ভাঙন শুরু হয়। দক্ষিণে মারাঠাদেরও দমন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর ঐসব বিদ্রোহ দমন করতে ও যুদ্ধের ব্যয় বহন করতে দিল্লীর রাজকোষ শূন্য হতে থাকে। ফলে নিয়মিত বেতন না পাওয়ার জন্য সৈন্যরাও বিদ্রোহ শুরু করে। মোগল সাম্রাজ্যের সেই অরা-জক ও ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ১৭০৭খ্রী সম্রাট ঔরংজেব আহমেদনগরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ঔরংজেব ছিলেন রণকুশলী যোদ্ধা, দক্ষ কূটনীতিক ও প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। ধর্মে নিষ্ঠার জন্য সম্রাট হয়েও তিনি সব বিলাস আড়ম্বর ত্যাগ করে দীন ফকিরের মতো জীবন যাপন করতেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল পরকে অবিশ্বাস এবং নিজ ধর্মের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠার জন্য পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ। রাজ্যের শাসন দায়িত্ব তিনি কারও উপর বিশ্বাস করে ন্যস্ত করতে পারেননি। সে কারণে বিশাল সাম্রাজ্যের সব কাজ এক হাতে সম্পন্ন করতে গিয়ে তিনি সর্বত্র চূড়ান্ত অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করেন। আর ধর্মবিদ্বেষী নীতি অনু-সরণ করতে গিয়ে তিনি রাজ্যের অধিকাংশ প্রজাকে শত্রু করেন। ফলে তাঁর শাসনকালে মোগল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করলেও সে বিশাল সাম্রাজ্য যে তাঁর জীবদ্দশাতেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তার জন্য তিনিই সর্বাধিক দায়ী।

ঔরংজেব জানতেন, তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে পুত্রদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ অনিবার্য হবে। এ কারণে তিনি বেঁচে থাকতেই তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে (মোয়াজ্জেম, আজম ও কামবক্স) সাম্রাজ্য ভাগ করে দিয়ে এক উইল রচনা করেন। কিন্তু

সম্রাটের মৃত্যুর পর পুত্ররা সে উইল উপেক্ষা করে পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন এবং অপর দুই ভ্রাতাকে হত্যা করে মোয়াজ্জেম দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। শাসনক্ষমতা অধিকারের পর মোয়াজ্জেম 'বাহাদুর শাহ' নাম গ্রহণ করেন। তিনি 'শাহ আলম' নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন।

ঔরংজেবের রাজ্য বিস্তার :— দাক্ষিণাত্যে সুবাদার থাকাকালেই ঔরংজেব প্রশাসনিক দক্ষতা ও রণকুশলতার পরিচয় দেন। গোলকুণ্ডার কাছ থেকে কয়েক বছরের অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের অজুহাতে ঔরংজেব গোলকুণ্ডা দখলে উদ্যোগী হন। কিন্তু শাহজাহান তাতে সম্মতি না দেওয়ায় গোলকুণ্ডা রাজ্য সেবারের মতো রক্ষা পায়। কিন্তু গোলকুণ্ডার সুলতানকে দশ লক্ষ মুদ্রা ও রণগির নামক স্থানটি ঔরংজেবের হাতে তুলে দিতে হয়। পরে বিজাপুর রাজ্যে সুলতানির উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ শুরু হলে ঔরংজেব তার সুযোগ নিয়ে বিজাপুর আক্রমণ করেন এবং বিজাপুরের সুলতানের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ ও সেইসঙ্গে কল্যাণী, বিদর ও পারিন্দা নামক স্থানগুলি আদায় করে সুলতানকে অব্যাহতি দেন। পরে সম্রাট হয়ে ঔরংজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা, উভয় রাজ্যকেই জয় করে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাকে মিত্ররাষ্ট্ররূপে মারাঠাদের বিরুদ্ধে কাজে না লাগিয়ে তাদের ঐ ভাবে বলপ্রয়োগের সাহায্যে জয় করে ও ঐ দুই রাজ্যের প্রভাবশালী রাজপুরুষদের শত্রুতে পরিণত করে ঔরংজেব একটি বড় ভুল করেছিলেন।

ঔরংজেব সিংহাসনে আরোহণের পরেই ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বিভিন্ন খণ্ডে বিদ্রোহ দমন করেন। প্রথমে মিরজুমলা, পরে মাতুল সায়েস্তা খাঁর সহায়তায় তিনি আসামে আহোমদের, উত্তরবঙ্গে কোচদের ও আরাকান অঞ্চলে মগদের দমন করেন। সন্দ্বীপ থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করা হয়। এইভাবে ভারতের সমগ্র উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মোগল শাসন সর্বপ্রথম দৃঢ়ভাবে কায়েম হয়।

একই সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেও সম্রাট ঔরংজেব বিভিন্ন আফগান উপজাতির বিরোধের সুযোগ নিয়ে মোগল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে যখন তিনি তাঞ্জোর ও ত্রিচিনাপল্লী রাজ্য দুটি জয় করেন মোগল সাম্রাজ্য তখন উত্তর-পশ্চিমে কাবুল, উত্তরে কাশ্মীর, উত্তর-পূর্বে আসাম এবং দক্ষিণে মাদুরাই পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মোগল সাম্রাজ্য এত বিশালরূপ ইতিপূর্বে কখনও ধারণ করেনি।

কিন্তু ঔরংজেবের সঙ্কীর্ণ ধর্মনীতির জন্য মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনাও তখনই হয়। সম্রাট ঔরংজেবের ধর্মান্ধ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী হয় জাঠরা, ১৬৬৯খ্রী। প্রথমে গোকলা, তারপরে রাজারাম, তৃতীয়বারে চূড়ামনের নেতৃত্বে জাঠরা বিদ্রোহী হয় এবং সম্রাট ঔরংজেব কঠোর হাতে পীড়ন করলেও সে বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয় না। জাঠদের প্রায় সমকালেই বিদ্রোহী হয় মালব ও বুন্দেলখণ্ডের

বুন্দেলরা। ঔরংজেবের হিন্দু-বিরোধী জেহাদের বিরুদ্ধে প্রথমে চম্পৎ রায়, তারপরে তার পুত্র ছত্রশালের নেতৃত্বে বুন্দেলরা বিদ্রোহী হয় এবং ১৬৭১ খ্রী ছত্রশালের নেতৃত্বে বুন্দেলরা পূর্ব মালবে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। বুন্দেলদের অনুপ্রেরণায় পরের বছর বিদ্রোহী হয় পাতিয়ালা ও আলোয়ার অঞ্চলের সৎনামি সম্প্রদায়। সৎনামিরা সাময়িকভাবে নারজোল নামক স্থানে স্বাধীন রাজ্য কায়েম করে, কিন্তু মোগল সৈন্যরা কঠোর হাতে সৎনামি বিদ্রোহ দমন করে।

ঔরংজেব শিখ ধর্মগুরু তেগবাহাদুরকে হত্যা করেন। পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পরবর্তী ও শেষ শিখ ধর্মগুরু গোবিন্দ সিং শিখ ধর্মাবলম্বীদের এক দুর্ধর্ষ সামরিক জাতিরূপে গড়ে তোলেন। শিখদের বিদ্রোহ ঔরংজেবের পক্ষে দমন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সম্রাট আকবরের সময় থেকে রাজপুতদের সঙ্গে মোগলদের যে সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিল ঔরংজেব তাও ক্ষুণ্ণ করেন। মোগলদের সুহৃদ মাড়োয়াররাজ যশোবন্ত সিংহ ১৬৭৮ খ্রী মারা গেলে ঔরংজেব তাঁর অনুগত ও যশোবন্ত সিংহের এক আত্মীয়কে ঐ সিংহাসনে বসান। কিন্তু মাড়োয়ারের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যশোবন্ত সিংহের শিশুপুত্র অজিত সিংহকে সিংহাসনে বসানোর দাবি জানালে ঔরংজেব বলেন, অজিত সিংহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তবেই তিনি তার দাবি মেনে নেবেন। ঔরংজেবের এই প্রস্তাবে রাজপুতদের সঙ্গে মোগলদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়। রাজপুতদের পক্ষে নেতৃত্ব করেন পরলোকগত রানা যশোবন্ত সিংহের বিশ্বস্ত অনুগামী দুর্গাদাস। ঔরংজেবের এক পুত্র আকবরও কিছু সময় বিদ্রোহী হয়ে রাজপুতদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী সম্রাট প্রথম বাহাদুর শাহ অজিত সিংহকে মাড়োয়ারের রানা বলে স্বীকার করে নেন।

তবে ছত্রপতি শিবজির নেতৃত্বে মারাঠা জাতির যে অভ্যুত্থান ঘটে সেই অদম্য শক্তির প্রচণ্ড আঘাতই মোগল সাম্রাজ্যকে সর্বাধিক বিপর্যস্ত করে। শিবজিকে দমনের জন্য ঔরংজেব প্রথমে শায়েস্তা খাঁকে পাঠান। কিন্তু শিবজির অতর্কিত আক্রমণে শায়েস্তা খাঁ কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হন। তারপর তিনি সেনাপতি দিলির খাঁ ও অম্বররাজ জয়সিংহকে শিবজির বিরুদ্ধে পাঠান। শিবজি সাময়িকভাবে পরাজয় স্বীকার করেন ও পুরন্দরের সন্ধি (১৬৬৫) অনুসারে ২৩টি দুর্গের অধিকার মোগলদের ছেড়ে দেন। কিন্তু তারপর শিবজি ঐ সব দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন ও সেই সঙ্গে একটি মারাঠা রাজ্য গড়ে তোলেন। ঔরংজেব যখন দাক্ষিণাত্যে আসেন (১৬৮১) তার এক বছর আগে শিবজির মৃত্যু হয়। কিন্তু মারাঠা জাতিকে তিনি এমনভাবে অনুপ্রাণিত করে যান যে জীবনের অবশিষ্ট ছাব্বিশ বছর দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেও ঔরংজেব মারাঠা রাজ্যের বিস্তার রোধ করতে পারেন না। ওদিকে রাজধানীতে তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে উত্তর ভারতের অধিকৃত

রাজ্যগুলি একে একে বিদ্রোহ করতে থাকে। সাম্রাজ্যব্যাপী সেই বিদ্রোহ ও অশান্তির মধ্যে ১৭০৭ খ্রী সম্রাট ঔরংজেব ভগ্নহৃদয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ঔরঙ্গাবাদ ঃ বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন শহর। ১৬১০ খ্রী মালিক অম্বর ঐ শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন শহরটির নাম ছিল ফতেনগর। ঔরংজেব যখন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন তখন ফতেনগর ছিল তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র এবং তিনিই ফতেনগরের নাম রাখেন ঔরঙ্গাবাদ। পরবর্তীকালে ঔরঙ্গাবাদ নিজাম রাজ্যের রাজধানী হয়। ১৭৪৮ খ্রী. নিজামের রাজধানী হায়দরাবাদে স্থানান্তরিত হলেও ঔরঙ্গাবাদ নিজাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। ১৯৫৬ খ্রী রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির সুপারিশ অনুসারে ঔরঙ্গাবাদ বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে বোম্বাই রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হয়ে মহারাষ্ট্র ও গুজরাত রাজ্যের সৃষ্টি হলে ঔরঙ্গাবাদ মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

কংগ্রেস ঃ ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের শাসনকালে অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ আই সি এস এলান অক্টেভিয়ান হিউম ১৮৮৩ খ্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের উদ্দেশ্যে লিখিত এক খোলা চিঠিতে ভারতীয়দের রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য একটি সংস্থা গঠনের আহ্বান জানান। লর্ড ডাফরিনও ঐ ধরনের একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। শিক্ষিত ভারতীয়রা অনেকদিন আগেই একটি জাতীয় রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের কথা চিন্তা করেন। ঐ চিন্তা থেকে প্রথমে ১৮৫১ খ্রী রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের উদ্যোগে গঠিত হয় 'বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন'; তারপর ১৮৭৬ খ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে গঠিত হয় 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'। তারপর ১৮৮৩ খ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স' নামে এক জাতীয় সম্মেলনের আহ্বান জানান। ঐ সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। সেখানেই সর্বপ্রথম একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার কথা চিন্তা করা হয়। ১৮৮৫খ্রী কলকাতায় যেদিন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন শেষ হয়, সেইদিনই বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন বসে। জাতীয় কংগ্রেস কিন্তু ঠিক ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা ছিল না। কারণ জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোক্তারা ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিবেশনের বিবরণ জানাবার অনুরোধ জানিয়ে সুরেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছিলেন। আর জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হওয়ার পরের বছরেই ন্যাশনাল কনফারেন্স তার অন্তর্ভুক্ত হয়।

হিউমের আহ্বানে ১৮৮৫ খ্রী ২৫ ডিসেম্বর বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের যে প্রথম অধিবেশন হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন কলকাতার প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার ডবলিউ সি বনার্জি। ঐ

সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মোট ৭২ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি রচনায় কয়েকজন পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী সহযোগিতা করেন। ঐ সম্মেলনেই স্থির হয় যে, সম্মেলনে গঠিত সর্বভারতীয় সংস্থা 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' নামে অভিহিত হবে।

কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলনে সব বক্তা ইংলণ্ডেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ করেন। তবু বৃটিশ সরকার ও বৃটেনের রক্ষণশীল ব্যক্তিরা প্রথম থেকেই কংগ্রেসকে ভাল চোখে দেখেন নি। লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকায় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী পর্যালোচনা করে বলা হয় কংগ্রেসের দাবি মেটানোর অর্থ হল, ভারতকে স্বায়ত্বশাসন দিয়ে আমাদের ঘরে ফিরে আসা। কিন্তু কয়েকজন বাক্যবাগীশের কথায় আমরা ভারত ছাড়তে পারি না।

বৃটিশ সরকারের মনোভাবের জন্য এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল, বালগঙ্গাধর টিলক প্রমুখ জাতীয় নেতারা কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় শীঘ্রই এদেশের ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগসূত্র ছিন্ন হয়। ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন, যিনি জাতীয় কংগ্রেস গঠনের অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন, তিনিও দেশত্যাগের আগে এক সভায় কংগ্রেসের নিন্দা করে বলে যান, কংগ্রেস মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের সংগঠন। তবে হিউম তখনও কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন, এবং ইংরেজ সরকার বারবার কংগ্রেসের দাবি উপেক্ষা করায় তিনি ব্যাপক গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এজন্য যুক্তপ্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) তৎকালীন গভর্নর কলভিন সেদিন তীব্র ভাষায় হিউমের সমালোচনা করেন।

১৯০৬ খ্রী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় কলকাতায় দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে সম্মেলন হয়, তাতে ঘোষণা করা হয়—স্বরাজই কংগ্রেসের লক্ষ্য। ঐ সময় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। চরমপন্থীদের নেতা ছিলেন বালগঙ্গাধর টিলক, লালা লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল (লাল-বাল-পাল), আর নরমপন্থীদের পুরোভাগে ছিলেন ফিরোজ শাহ মেহতা, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি। ১৯০৭ খ্রী সুরাটে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ঐ বিরোধ চরমে ওঠে এবং চরমপন্থী কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ১৯১৫ খ্রী বিরোধের মীমাংসা হয় এবং ১৯১৬ খ্রী লখ্নৌ কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীরা আবার মিলিত হন। কিন্তু ১৯১৮ খ্রী মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার গ্রহণের প্রশ্নে আবার দুই পক্ষে বিরোধ দেখা দেয়। শাসন সংস্কার গ্রহণের পক্ষপাতীরা কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং 'অল ইণ্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশন' নামে নতুন একটি উদারনৈতিক দল গঠন করেন। ঐ নতুন দলের নেতা হন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু, দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জন, খাঁ আবদুল গফুর খাঁ, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় কংগ্রেসের রাজনৈতিক চরিত্র আরও স্পষ্ট হয় এবং আন্দোলন করে স্বরাজ অর্জনের জন্য কংগ্রেসের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ খ্রী পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধী ছিলেন কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতা এবং ঐ সময় কংগ্রেস নেতৃত্বে বার বার সত্যাগ্রহ, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন হয়। '৪২-এর আগস্ট আন্দোলন প্রায় গণ-বিপ্লবের রূপ ধারণ করে তারপরেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের গৌরবময় সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ দেশব্যাপী বিদ্রোহের পরিণতিরূপে ১৯৪৭ খ্রী ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

কণিষ্ক: কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। তাঁর সিংহাসনারোহণকাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকের মতে তিনি ৭৮ খ্রী সিংহাসনারোহণ করেন এবং তখন থেকে শকাব্দের প্রবর্তন হয়। কিন্তু স্মিথ, মার্শাল প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে কণিষ্ক ১২০ খ্রী সিংহাসনে বসেন এবং প্রায় চল্লিশ বছর, সম্ভবত ১৬২ খ্রী পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

দ্বিতীয় কুষাণ নৃপতি বিম কদফেসিসের মৃত্যু হয় সম্ভবত ১১০ খ্রী। তার দশ বছর পরে কণিষ্ক কুষাণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। মধ্যে দশ বছর কে রাজা ছিলেন, অথবা কণিষ্ক কি সূত্রে কুষাণ সাম্রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন তা সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না। বিম কদফেসিসের সঙ্গে কণিষ্কের কোন সম্পর্ক ঐতিহাসিকরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। সম্রাট কণিষ্কের শাসনকালে কুষাণ সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়ার খোটান ও খোরাসান থেকে পূর্বে বিহার এবং দক্ষিণে উজ্জয়িনী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। বর্তমান ভারত উপ-মহাদেশের কাশ্মীর, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তরপ্রদেশ এবং তার বাইরে আফগানিস্থান, বাকট্রিয়া, কাশগড়, খোটান ও ইয়ারখন্দ কণিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সম্রাট কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর ছিল বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্র চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। পুরুষপুর বর্তমান পেশোয়ার। তাঁর উদ্যোগে বৌদ্ধদের চতুর্থ ও শেষ মহাসঙ্গীতি আহূত হয়। ভগবান বুদ্ধের দেহাস্থির উপরে কণিষ্ক একটি সুন্দর স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও কণিষ্ক অন্যান্য ধর্মের প্রতি সমান উদার ছিলেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক কণিষ্কের রাজসভায় অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, চরক, সুশ্রুত প্রমুখ মনীষীগণ উপস্থিত ছিলেন বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

রাজ্য বিস্তার : কণিষ্ক শাসনক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথমে কাশ্মীর জয় করেন। কাশ্মীরে তিনি বহু নগরী গড়ে তোলেন; শ্রীনগরের সন্নিকটে কণিষ্কপুর নামক স্থানটির এখনও অস্তিত্ব আছে। সম্ভবত কাশ্মীরেই চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি আহূত হয়। কাশ্মীর জয়ের পর কণিষ্ক মগধ রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও ঐ রাজ্যের অন্ত-

র্গত বারাণসী পর্যন্ত স্থান জয় করেন। সম্ভবত পাটলিপুত্র তাঁর অধিকারমুক্ত ছিল। মগধ রাজ্য থেকেই কণিষ্ক অশ্বঘোষকে তাঁর রাজ্যে নিয়ে যান। সম্রাট কণিষ্কের বৃহত্তম যুদ্ধ হয় চীনের বিরুদ্ধে। বিম কদফেসিস চীনের কাছে পরাজয় স্বীকার করে বাৎসরিক কর-দানে বাধ্য হন। কিন্তু কণিষ্ক ঐ করদান বন্ধ করেন। চীন সম্রাট তার প্রতিবাদে তাঁর রাজ্যে কণিষ্কের দূতকে গ্রেপ্তার করেন। তখন চীন সম্রাটের সঙ্গে কণিষ্কের যুদ্ধ অনিবার্য হয়। কিন্তু যুদ্ধে প্রথমে কণিষ্ক পরাজিত হন। তবে তাতে হতোদ্যম না হয়ে তিনি আবার প্রস্তুতি শুরু করেন ও পরবর্তী যুদ্ধে বিপুল সাফল্য অর্জন করেন। তিনি চীন সাম্রাজ্য থেকে কাশগড়, খোটান ও ইয়ারখন্দ জয় করে কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

কণিষ্ক শাসক হিসাবে ছিলেন স্বৈর-তন্ত্রী। কিন্তু প্রজাপালন ও সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি ছিল তাঁর শাসনের মূল লক্ষ্য। সারনাথের এক লিপিপাঠে জানা যায় যে, কণিষ্ক তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য অনেক-গুলি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং ক্ষত্রপ-দের উপর প্রদেশগুলির শাসনদায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। ক্ষত্রপদের বিদ্রোহের আশঙ্কা দূর করার জন্য খুব সতর্কতার সঙ্গে তাঁদের বাছাই করা হত এবং তারপরেও তাঁদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হত। রাজ্যের শাসনশৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সম্রাট কণিষ্ক সর্বদা তৎপর থাকতেন এবং কোথাও বিদ্রো-হের সামান্য লক্ষণ প্রকাশ পেলেই তা কঠোর হাতে দমন করা হত। কাশ-গড়, খোটান, ইয়ারখন্দ, বাক্‌ট্রিয়া, আফগানিস্তান, পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাশ্মীর ও মথুরা—এই কটি প্রদেশে কণিষ্কের সাম্রাজ্য বিভক্ত ছিল।

সম্রাট কণিষ্কের বিশাল সাম্রাজ্যের সীমানা চীন পার্থিয়া ও অন্ধ্র সাম্রাজ্যের সীমা স্পর্শ করেছিল। ঐ সব সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে কণিষ্কের শাসনাধীন ভারতের বিপুল সমৃদ্ধি ঘটে। ঐ সময় ভারত থেকে মূল্যবান পাথর মুক্তা, হাতীর দাঁত, রেশম বস্ত্র, মসলিন, সুগন্ধি ও মসলা বিদেশে রপ্তানি হত এবং বিদেশ থেকে সোনা, রূপা, মদ ও বিভিন্ন বিলাস সামগ্রী এদেশে আমদানি হত।

কবি, দার্শনিক ও সঙ্গীতজ্ঞ অশ্ব-ঘোষ, বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ বসুমিত্র, বৈজ্ঞানিক নাগার্জুন, আয়ুর্বেদ তত্ত্ববিদ চরক প্রমুখ মহাপ্রতিভাধর মনীষীদের কর্মসাধনায় কণিষ্কের শাসনকালে ভারতে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়। সম্রাট কনিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত সাহিত্যেরও বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটে।

স্থাপত্যশিল্পেও সম্রাট কণিষ্কের বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। অনেক-গুলি নগর প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও তিনি পুরুষপুর শহরে ভগবান বুদ্ধের দেহাস্থির উপর একটি চার শ ফুট উঁচু মিনার নির্মাণ করেন। মার্শাল মনে করেন কাশ্মীরেও কণিষ্ক একটি অনুরূপ মিনার নির্মাণ করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণের সূচনা তাঁর শাসনকালে হয়। গ্রীক ভাস্কর্যের অনুকরণে সেদিন যে ভাস্কর্য শিল্প প্রবর্তিত হয় তা গান্ধার-শিল্প নামে অভিহিত। মথুরায় সম্রাট

কণিষ্কের যে মুণ্ডহীন ব্রোঞ্জমূর্তিটি পাওয়া গেছে সেটি গান্ধারশিল্পের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন।

কণিষ্কের মৃত্যু সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছু জানা যায় না। সম্ভবত বিয়াল্লিশ বছর রাজ্যশাসনের পর, ১৬২ খ্রী তিনি তাঁর প্রজাদের হাতে নিহত হন। সম্রাট কণিষ্কের মৃত্যুর পরেই কুষাণ সাম্রাজ্যের ভাঙন ও পতন শুরু হয়।

কণিষ্ক নামে আরও একজন কুষাণ-বংশীয় নৃপতি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করেন।

কদফেসিস, প্রথম : কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কোজোল কদফেসিস প্রথম কদফেসিস নামে অভিহিত; শাসনকাল সম্ভবত ৪০-৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই সুদক্ষ যোদ্ধা, সম্ভবত গ্রীকদের যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং কাবুল, কান্দাহার ও আফগানিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেন। সিন্ধু নদীর পশ্চিমতীর পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল বলে অনুমান করা হয়। তিনি সিন্ধু নদী অতিক্রম করেছিলেন কিনা জানা যায় না। প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্ব করার পর সম্ভবত আশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

কদফেসিস, দ্বিতীয় : প্রথম কদফেসিসের পুত্র বিম কদফেসিস দ্বিতীয় কদফেসিস নামে অভিহিত। তিনিও পিতার মতো সুযোদ্ধা ও সুশাসক ছিলেন। তিনি শক ক্ষত্রপদের পরাজিত করেন ও পূর্বে বারাণসী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁর রাজত্বকাল সম্ভবত ৭৮-১১০ খ্রী। বিম কদফেসিসের সঙ্গে চীনা সেনানায়ক প্যান চাওর যুদ্ধ হয় এবং সে যুদ্ধে বিম পরাজিত হন। তিনি রোম সম্রাটের রাজসভায় দূত প্রেরণ করেন। বিম শিবের উপাসক ছিলেন। তাঁর সমকালীন অনেক রোমান মুদ্রা উৎখননের ফলে পাওয়া গেছে। তাতে সে সময় ভারত ও রোমের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগের প্রমাণ মেলে।

কদম্ব : ময়ূরবর্মণ নামে এক ব্রাহ্মণ কদম্ব রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে কর্ণাটক (মহীশূর) অঞ্চলের একাংশে কদম্ব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। কাকুস্থবর্মণ ঐ রাজ্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য নৃপতি। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে রবিবর্মণ নামে আর এক কদম্ব নৃপতি গঙ্গ ও পল্লব নৃপতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বহু স্থান জয় করেন। হালসি (বর্তমান মহীশূরের বেলগাঁও জেলায়) হয় তাঁর রাজ্যের নতুন রাজধানী।

পরবর্তীকালে চালুক্যবংশীয় নৃপতি প্রথম ও দ্বিতীয় পুলকেশী কদম্ব রাজ্যের বহু স্থান জয় করেন এবং গঙ্গ নৃপতিরা কদম্ব রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চল অধিকার করেন। একটি সুসংহত রাজ্যরূপে কদম্বরাজ্যের ইতিহাসের সেইখানেই পরিসমাপ্তি, কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে কদম্ব বংশীয় নৃপতিদের কয়েকটি ছোট-খাটো রাজ্য টিঁকে থাকে। কদম্ব রাজ্যে শৈব ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ছিল।

কনস্তান্তিনসবেস্কি (১৬৮০-১৭৪৬) : একজন ইতালীয় জেসুইট ধর্মযাজক। বীরম মুনিবর নাম গ্রহণ করে বাইবেলের কয়েকটি অনুচ্ছেদ তামিল

ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর অনুদিত বাইবেল ১৫০ বছর বাদে ১৮৫৩ খ্রী প্রথম মুদ্রিত হয়।

কপিলবাস্তু : বুদ্ধদেবের জন্মস্থান-রূপে খ্যাত। কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীতে কপিলবাস্তু ঠিক কোথায় ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফা হিয়েন ও হিউ এন সাং-এর বিবরণীতে এবং বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীর চীনা ও সিংহলীয় অনুবাদে কপিলবাস্তুর অবস্থান সম্পর্কে নানা পরস্পর বিরোধী বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা সেগুলির ভিত্তিতে কপিলবাস্তুর অবস্থান সম্পর্কে দুটি অভিমত ব্যক্ত করেন। হয় নেপালের তরাই অঞ্চল, নয়ত ভারত-নেপাল সীমান্তে উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলায় কপিলবাস্তু অবস্থিত ছিল বলে তাঁরা মনে করেন। বস্তি জেলায় পিপরাওয়াতে উৎখননের ফলে যে সব প্রাক-মৌর্য যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে ঐ স্থানটিই বুদ্ধ-দেবের জন্মস্থান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

কপিলেন্দ্র দেব ঃ ওড়িশার শক্তি-শালী নৃপতি, পূর্ব গঙ্গ বংশের শেষ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে আনুমানিক ১৪৩৫ খ্রী রাজা হন। তাঁর শাসন-কালে ওড়িশা রাজ্য গঙ্গার পশ্চিম তীর থেকে কাবেরীর উত্তর তীর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে এবং কপিলেন্দ্র দেব গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেন। ১৪৬৭ খ্রী তাঁর মৃত্যু হয়।

কবিত্রয় ঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নন্নয় নামে এক তেলেগু কবি তেলুগু ভাষায় মহাভারত অনুবাদ আরম্ভ করেন। ঐ অনূদিত মহাভারত থেকে তেলুগু সাহিত্যের সূচনা ধরা হয়। নন্নয় মাত্র আড়াই পর্বের অনু-বাদ সম্পূর্ণ করেন। তার প্রায় দুই শত বছর পরে তিক্কন নামে অপর এক-তেলুগু কবি বিরাট পর্ব থেকে স্বর্গারো-হণ পর্ব পর্যন্ত অনুবাদ শেষ করেন। আরও পঁচাত্তর বছর বাদে এররাপ্রগড নামে আর এক তেলুগু কবি অসমাপ্ত বনপর্ব ও সেইসঙ্গে হরিবংশের অনু-বাদ সম্পূর্ণ করেন। এইভাবে তিন শতাব্দীতে তিন তেলুগু কবির চেষ্টায় তেলুগু ভাষায় মহাভারত মহাকাব্য অনুবাদের কাজ শেষ হয়। ঐ তিন কবি অন্ধ্রবাসীদের কাছে কবিত্রয় নামে পরিচিত।

কবীর (১৪৪০-১৫১৮) : মধ্য-যুগের সমন্বয়বাদী সাধক, রামানন্দের শিষ্য। নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু সাধু-সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। স্বভাব-কবি ছিলেন, তাঁর মুখে মুখে রচিত ভজন গানগুলি আজও পরম সমাদরে গীত হয়। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে মিলনের জন্য কবীর সচেষ্ট হন বলে একদা উভয় সম্প্রদায়েরই গোঁড়া সমাজের বিরাগভাজন হন। কিন্তু সমাজের নিচের স্তরের মানুষের মধ্যে কবীর অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

কমনওয়েলথ ঃ একদা যে সব দেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলি স্বাধীনতা লাভের পর স্বেচ্ছায় কমন-ওয়েলথ-এর সদস্য হয়। প্রথমে অস্ট্রে-লিয়া, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি শ্বেত উপনিবেশগুলি নিয়ে কমনওয়েলথ গঠিত হয় এবং তার নাম ছিল 'বৃটিশ কমনওয়েলথ'। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রী ভারত,

পাকিস্তান প্রভৃতি দেশগুলি স্বাধীনতা লাভের পর কমনওয়েলথে যোগ দিলে 'বৃটিশ কমনওয়েলথ' নাম পরিবর্তিত করে 'কমনওয়েলথ অফ নেশনস্' বা শুধু 'কমনওয়েলথ' নামে অভিহিত হতে থাকে।

বৃটেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানালে পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগ করে। বাংলাদেশ কমনওয়েলথ-এর সদস্য।

কমলা দেবী ঃ গুজরাতের রাজপুত নৃপতি দ্বিতীয় কর্ণদেবের মহিষী। সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সেনাপতি মালিক কাফুর ১৩০৬ খ্রী গুজরাত রাজ্য আক্রমণ করলে রাজা কর্ণদেব পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। মালিক কাফুর তখন রানী কমলা দেবীকে বন্দী করে দিল্লী আনেন। সুলতান আলাউদ্দিন তাঁকে বিবাহ করে প্রধানা মহিষীর মর্যাদা দেন। কিছুদিন পরে কমলা দেবীর পলাতকা কন্যা দেবলা দেবীকেও বন্দী করে দিল্লী আনা হয় এবং তাঁর সঙ্গে সুলতানের পুত্র খিজির খাঁর বিবাহ হয়।

কম্বোজ ঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতে যে ১৬টি মহাজনপদ ছিল, কম্বোজ তার অন্যতম। কম্বোজ সম্ভবত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, অপর মহাজনপদ গান্ধারের সন্নিকটবর্তী ছিল। মহাভারতে, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে ও হিউ এন সাং-এর বিবরণীতে কম্বোজ দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। কম্বোজ সম্ভবত সাধারণতন্ত্র ছিল।

কম্যুনিস্ট পার্টি ঃ ১৯১৭ খ্রী রাশিয়ায় কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা দখলের পর সারা বিশ্বে কম্যুনিস্ট আন্দোলন প্রসারে তৎপর হন। ভারতে কম্যুনিস্ট সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগও সে কারণে প্রথমে ভারতের বাইরেই হয়। ঐ উদ্যোগে অগ্রণী ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখোপাধ্যায়, নলিনী গুপ্ত প্রমুখ ইউরোপ প্রবাসী বিপ্লবীগণ।

নানা বাধাবিপত্তি ও সরকারী নির্যাতনের মধ্যে এদেশে ধীরে ধীরে কম্যুনিস্ট সংগঠন গড়ে ওঠে এবং ১৯২৫ খ্রী কানপুরে প্রথম ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ও তার কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পূর্ণ গোপন থাকে এবং প্রকাশ্যে ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজাণ্টস পার্টি নাম নিয়ে কম্যুনিস্টরা শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন গড়ে তুলতে থাকেন। ১৯২৯ খ্রী বহু কম্যুনিস্ট ও কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সমর্থকদের গ্রেপ্তার করে ইংরেজ সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনেন। ঐ ষড়যন্ত্র মামলা 'মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খ্যাত। চার বছর ধরে ঐ মামলা চলার পর বহু কম্যুনিস্ট নেতার দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। ঐ মামলা চলাকালে ভারতে কম্যুনিস্ট আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং তৎকালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে লিপ্ত বিপ্লবী যুবকরা কম্যুনিস্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৩৪ খ্রী ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট সংস্থা 'থার্ড ইণ্টারন্যাশনাল'-এর শাখারূপে স্বীকৃতি লাভ করে। ঐ বছরেই ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলন বেআইনী ঘোষিত হয়। কিন্তু কোন এক দুর্জ্ঞেয়

কারণে ইংরেজ সরকারের মৌনসম্মতিতে ভারতের বিভিন্ন জেলে ও আন্দামানের বন্দী রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে ব্যাপকভাবে কম্যুনিজম সম্পর্কিত বই ও প্রচারপত্র প্রেরিত হতে থাকে এবং রাজবন্দীরা প্রায় সকলেই বন্দী অবস্থায় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি প্রথমে সে যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে এবং সকল উপায়ে যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করার জন্য দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানায়। ঐ সময় জার্মানি ও সোভিয়েট ইউনিয়ন মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিল এবং সে কারণে নেতাজি সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ খ্রী সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্য দিয়েই জার্মানিতে পৌঁছাতে সমর্থ হন। কিন্তু ঐ বছর জুন মাসে জার্মানি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি তার অল্প পরেই ঘোষণা করে যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছে এবং ঐ যুদ্ধে সকল উপায়ে ভারতবাসীর সাহায্য করা দরকার। তাঁরা নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে দেশের শত্রু বলে ঘোষণা করেন এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সূচিত আগস্ট আন্দোলনকে দেশদ্রোহীদের আন্দোলন বলে ঘোষণা করে। কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি পরিবর্তিত হওয়ায় ইংরেজ সরকার কম্যুনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন এবং বিভিন্ন জেলে বন্দী কম্যুনিস্টরাও দলে দলে ছাড়া পেতে থাকেন। ওদিকে আগস্ট আন্দোলনে যোগদানের জন্য কংগ্রেস ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা হাজারে হাজারে গ্রেপ্তার হওয়ায় সেই শূন্যতায় মুস্লিম লীগের তৎপরতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ভারতের কমুনিস্ট পার্টি সে সময় মুস্লিম লীগের পাকিস্থানের দাবিকেও মুস্লিম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নামে সমর্থন জানায়। যে মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনায় ভারত দ্বিখণ্ডিত হয় তাতেও কমুনিস্ট পার্টির সমর্থন ছিল। ১৯৪৩ খ্রী বোম্বাইতে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন (প্রথম পার্টি কংগ্রেস) হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কমুনিস্ট পার্টির নীতি কিছুটা উগ্র হয় এবং ভারতের স্বাধীনতাকে 'ঝুটা আজাদি' বলে কম্যুনিস্ট পার্টি ঘোষণা করে। ঐ সময় কম্যুনিস্ট পার্টি ভারতে 'প্রকৃত আজাদি' কায়েমের জন্য যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে তাতে সারা ভারতে বহু কম্যুনিস্ট কর্মী গ্রেপ্তার হন এবং দলকে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে অগ্রসর হতে হয়।

কিন্তু ১৯৫১ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির সংগ্রামী কর্মসূচী পরিত্যক্ত হয় এবং দেশের স্বাধীনতাকে কম্যুনিস্ট পার্টি প্রকৃত স্বাধীনতা বলে ঘোষণা করে। ভারতে শ্রমিক কৃষক আন্দোলন সংগঠনে কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে মতভেদ ঘটলে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিও ১৯৬৪ সালে দ্বিখণ্ডিত হয়। উভয় দল বর্তমানে সি পি আই ও সি পি আই (এম) নামে পরিচিত।

কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়াও বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টি (R. C. P. I.), বিপ্লবী

সমাজতন্ত্রী দল (R .S. P.), বলশেভিক পার্টি, র‍্যাডিকাল ডিমক্রাটিক পার্টি, মহারাষ্ট্রের 'পেজেন্টস এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি', বলশেভিক-লেনিনিস্ট পার্টি ইত্যাদি নামেও অনেকগুলি দল কম্যুনিস্ট পার্টির সমসাময়িক কালে বা দু'-চার বছর পরে ভারতের রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়। ঐ দলগুলি মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দল বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐ দলগুলির বিভিন্ন নীতির প্রশ্নে মতান্তর ছিল। উল্লিখিত প্রায় সব ক'টি দল নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্যমতো দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে। শুধু এম. এন. রায় পরিচালিত র‍্যাডিক্যাল ডিমক্রাটিক পার্টি ও বলশেভিক পার্টি কম্যুনিস্ট পার্টির মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে সমর্থন জানায় ও তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করে।

১৯৬৯খ্রী চীনা কম্যুনিস্ট মতবাদের উগ্র সমর্থকরা মুখ্যত সি পি আই (এম) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সি পি আই (এম এল) দল গঠন করেন। নক্সালপন্থী নামে পরিচিত ঐ দল পরে বহু উপদলে বিভক্ত হয়।

কররানি বংশ ঃ শের শাহের অন্যতম রাজকর্মচারী তাজ খাঁ শের শাহর পরবর্তী শূর বংশীর শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ১৫৬৪খ্রী বাঙলার মসনদ দখল করেন এবং স্বাধীন সুলতানরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি ও তাঁর বংশের পরবর্তী শাসকরা কররানি বংশীয় শাসক নামে অভিহিত। তাঁদের শাসনকাল স্বল্পস্থায়ী ছিল।

তাজ খাঁ সিংহাসনে বসার এক বছর পরে মারা গেলে তাঁর ভাই সুলেমান কররানি আট বছর (১৫৬৫—৭২) রাজত্ব করেন। সুলেমানের শাসনকালে বাঙলা একটি শক্তিশালী রাজ্য হয়। ১৫৬৮ খ্রী তিনি ওড়িশা জয় করেন এবং উত্তর বঙ্গের কোচরাজ তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। সুলেমানের রাজ্য ওড়িশা, বিহার, বঙ্গ ও আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়। তিনি মোগল সম্রাট আকবরের আনুগত্য স্বীকার করে নেন। তাঁর সেনাপতি কালাপাহাড় পুরীর মন্দির লুঠ করে। ১৫৭২খ্রী সুলেমানের মৃত্যুর পর কররানি বংশের প্রভাব দ্রুত হ্রাস পায় ও আত্মকলহ শুরু হয়। সুলেমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বয়েজিদ সিংহাসনে বসার এক বছরের মধ্যেই নিহত হন ও তারপরে সুলেমানের ভ্রাতা দাউদ সিংহাসনে বসেন। তিনিই কররানি বংশের শেষ সুলতান। তিনি রাজমহলের যুদ্ধে (১৫৭৬) মোগল-দের হাতে পরাজিত, বন্দী ও পরে নিহত হন।

কর্ণসুবর্ণ ঃ বাঙলার প্রাচীন সমৃদ্ধ নগরী। সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময়কালে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে, কর্ণসুবর্ণ গৌড়-রাজ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল। পরে গৌড় রাজ্য কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়ে গেলে বর্ণসুবর্ণ নগরীকে কেন্দ্র করে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। কর্ণসুবর্ণ নগরীর সঠিক অবস্থান এখনও নির্ণীত হয়নি। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে স্থানটি ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী রাঙামাটি গ্রাম এলাকায়।

চীনা পরিব্রাজক হিউ এন সাং-এর বিবরণীতে কর্ণসুবর্ণ নগরীর সমৃদ্ধির বর্ণনা আছে।

কর্ণাটক : স্বাধীনতার পর মহীশূর ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্য হয়। ভাষার ভিত্তিতে ভারতের রাজ্যগুলি পুনর্গঠিত হলে দক্ষিণ ভারতের সমগ্র কানাড়িভাষী অঞ্চল মহীশূরের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৭৩ সালে মহীশূর রাজ্যের নাম হয় কর্ণাটক। রাজধানী বাঙ্গালোর। আয়তন ১,৯১,৭৭৩ বর্গ কিলোমিটার। মৌর্য যুগেই কর্ণাটক সুসভ্য রাজ্য ছিল। কেরল তখন তার বিভিন্ন এলাকায় সত্যপুত্র, কেরল পুত্র প্রভৃতি রাজবংশের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তারপর চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, চোল প্রভৃতি রাজবংশ সেখানে শাসন করে। ১৩১০ খ্রী আলাউদ্দিন খলজি হোয়সল বংশীয় রাজ-শাসনের অবসান ঘটিয়ে কর্ণাটক অধিকার করলে সেখানে প্রথম মুস্লিম শাসন কায়েম হয়। কিন্তু সে শাসন স্বল্পস্থায়ী ছিল। ১৩৩৬ সালে কর্ণাটক আবার হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের অন্তর্ভুক্ত হয়। দুই শতাব্দী পরে কর্ণাটক মোগল সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু মোগল অধিকারও দীর্ঘ-স্থায়ী হয় না। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে কর্ণাটকে আবার হিন্দু রাজ্য কায়েম হয়। তখন কর্ণাটকের রাজধানী ছিল মহীশূর। ১৭৬১ খ্রী তৎকালীন হিন্দু রাজাকে সিংহসনচ্যুত করে তাঁর সেনাপতি হায়দর আলি সুলতান হন। রাজধানীর নামানুসারে ঐ রাজ্য তখন মহীশূর নামেই পরিচিতি লাভ করে। হায়দরের পুত্র টিপু সুলতান খুব সাহসী ও স্বাধীনচেতা নৃপতি ছিলেন। ইংরেজ-দের সঙ্গে পর পর কয়েকটি যুদ্ধে টিপুর শক্তি খর্ব হয় এবং ১৭৯৯ খ্রী চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে টিপু পরাজিত ও নিহত হলে সেখানে সুলতান শাসনের অবসান ঘটে। ইংরেজরা পূর্বের রাজবংশের একজনকে মহীশূরের সিংহাসনে বসান এবং মহীশূর ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

কর্ণাটক যুদ্ধ-প্রথম (১৭৪৫-৪৮) : কর্ণাটকের নবাব আনোয়ারুদ্দিন মাদ্রাজ আক্রমণ করলে প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সে সময় মাদ্রাজ ছিল দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের প্রধান সামরিক ঘাঁটি ও বাণিজ্য কেন্দ্র। আর ফরাসিদের ঘাঁটি ছিল পণ্ডিচেরি। অস্ট্রি-য়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে ভারতেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পণ্ডিচেরির ফরাসি-গভর্নর ডুপ্লেক্স দাক্ষিণাত্য থেকে ইংরেজদের উৎখাতের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ আক্রমণ করেন। কিন্তু ফরাসি নৌবহর ইংরেজ-দের তুলনায় দুর্বল হওয়ায় ডুপ্লেক্সের পক্ষে মাদ্রাজে ইংরেজদের ফোর্ট সেন্ট ডেভিড দখল করা সম্ভব হয় না; পরন্তু ফরাসিদের জাহাজ ক'টি ইংরেজ নৌ-বহরের হাতে ধরা পড়ে যায়। তখন ডুপ্লেক্স ফরাসি উপনিবেশ মরিশাস থেকে বিশাল নৌবহর এনে মাদ্রাজ দখল করেন। ডুপ্লেক্স যখন মাদ্রাজ দখলে উদ্যত সে সময় ইংরেজদের

প্ররোচনায় কর্ণাটকের নবাব আনোয়ারুদ্দিন ফরাসিদের মাদ্রাজ ত্যাগের নির্দেশ দেন। গভর্নর ডুপ্লেক্স তখন নবাবকে এই বলে আশ্বাস দেন যে, তাঁকে প্রত্যর্পণের উদ্দেশ্যেই ফরাসিরা মাদ্রাজ দখল করছে। কিন্তু ডুপ্লেক্স মাদ্রাজ দখলের পর সে প্রতিশ্রুতি না রাখায় আনোয়ারুদ্দিন মাদ্রাজ দখলের জন্য ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু মাইলাপুরের যুদ্ধে মাত্র পাঁচ শ ফরাসি সৈন্যর কাছে নবাবের বিশাল বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। একটি বিশাল ভারতীয় বাহিনীর এই শোচনীয় পরাজয়ে ইংরেজ ও ফরাসিরা নিঃসন্দেহ হয় যে, ভারতীয় নৃপতিদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা চূর্ণ করা অতি সহজ কাজ। প্রকৃতপক্ষে কর্ণাটক যুদ্ধে সাফল্য লাভের পরেই ইউরোপীয়রা ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের অনুপ্রেরণা লাভ করে। দ্বিতীয়ত, ইংরেজ ও ফরাসি উভয়েই এটা উপলব্ধি করে যে শক্তিশালী নৌবহর ছাড়া ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার সহজ হবে না।

১৭৪৮ খ্রী এই-ল্যা-শাপেল (Aix-la-chapell) সন্ধি অনুসারে ইউরোপে ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্বের অবসান হলে ভারতেও প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধের অবসান ঘটে। ফরাসিরা ইংরেজদের মাদ্রাজ ফিরিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৭৫১-৫৪): ১৭৪৮ খ্রী হায়দরাবাদের নিজাম-উল-মুলকের মৃত্যু হলে নিজাম পদের উত্তরাধিকার নিয়ে পরলোকগত নিজামের দ্বিতীয় পুত্র নাসির জঙ্গ ও দৌহিত্র মুজফ্ফর জঙ্গ-এর মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ওদিকে কর্ণাটকের নবাবপদ নিয়েও আনোয়ারুদ্দিন ও চাঁদসাহেবের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। কর্ণাটক তখন কার্যত স্বাধীন হলেও হায়দরাবাদের সার্বভৌম অধিকারভুক্ত ছিল। ১৭৪৩ খ্রী কর্ণাটকের নবাব দোস্ত আলি মারাঠাদের হাতে নিহত হলে হায়দরাবাদের নিজাম কর্ণাটকের নবাবপদে আনোয়ারুদ্দিনকে নিযুক্ত করেন। ঐ পদের অন্যতম দাবিদার ছিলেন নিহত নবাব দোস্ত আলির জামাতা চাঁদসাহেব। হায়দরাবাদ ও কর্ণাটকের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে ডুপ্লেক্স দক্ষিণ ভারতে ফরাসি প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে চাঁদসাহেব ও মুজফ্ফর জঙ্গের পক্ষ নিলেন। সে কারণে ইংরেজরা সমর্থন জানালেন আনোয়ারুদ্দিন ও নাসির জঙ্গকে। ফরাসিদের সহায়তায় চাঁদসাহেব অম্বুরের যুদ্ধে আনোয়ারুদ্দিনকে পরাজিত ও নিহত করলে আনোয়ারুদ্দিনের পুত্র মহম্মদ ত্রিচিনাপল্লীতে পলায়ন করেন। আর চাঁদসাহেবের মিত্র হিসাবে ফরাসিদের আর্কট ও কর্ণাটকে ব্যাপক প্রভাব বিস্তৃত হয়। তখন ইংরেজরা নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে নাসির জঙ্গ ও মহম্মদ আলির পক্ষ নিয়ে ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ইংরেজ ও ফরাসিদের ঐ যুদ্ধ দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ নামে অভিহিত।

ঐ যুদ্ধে ডুপ্লেক্সের নেতৃত্বে প্রথম দিকে ফরাসিদের জয় হলেও রবার্ট ক্লাইভ ইংরেজ পক্ষের নেতৃত্ব নিয়ে অবিলম্বে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন।

ক্লাইভ আর্কট জয় করেন (১৭৫১) এবং ত্রিচিনাপল্লীও অবরোধমুক্ত হয়। ইংরেজদের সহায়তায় মহম্মদ আলি কর্ণাটক অধিকার করেন। ইতিমধ্যে দ্যুপ্লেক্স পদচ্যুত হওয়ায় (১৭৫৪) ফরাসিদের অবস্থা আরও খারাপ হয়। অবশেষে ১৭৫৫ খ্রী ইংরেজ ও ফরাসী-দের মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৫৮—৬৩) : ইউরোপ ও আমেরিকায় ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে 'সাত বছরের যুদ্ধ' শুরু হলে ভারতেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১৭৫৭ খ্রী লর্ড ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজ সেনাবাহিনী বাংলার ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগর দখল করে। ওদিকে একই সময়ে ফরাসি সেনাপতি লালি মাদ্রাজে ইংরেজদের সেণ্ট ডেভিড দুর্গ দখল করেন ও শহর অবরোধ করেন। কিন্তু ফরাসি নৌবহর ইংরেজ নৌবহরের কাছে পরাস্ত হওয়ায় ফরাসিদের পক্ষে মাদ্রাজ দখলে রাখা সম্ভব হয় না। ওদিকে সরকারি আদেশে ফরাসি সেনাপতি বুসি হায়দরাবাদ থেকে চলে আসায় সেখানেও ফরাসিদের পরাজয় হয়। ক্লাইভ বাংলা থেকে একদল ইংরেজ সৈন্য দাক্ষিণাত্যে পাঠালে সেখানে ইংরেজপক্ষের শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। ক্লাইভের সৈন্যদের হাতে সেনাপতি বুসির পরাজয় হয়। ওদিকে বন্দিবাসের যুদ্ধেও ইংরেজ সেনাপতি আয়ারকুটের হাতে মঁসিয়ে লালির ফরাসি সেনাবাহিনী পরাজিত হয় (১৭৬০)। পরের বছর অবরুদ্ধ পণ্ডিচেরির ফরাসী বাহিনীও আত্ম-সমর্পণ করে।

১৭৬৩ খ্রী প্যারিসের সন্ধিতে ইঙ্গ-ফরাসি 'সপ্তবর্ষ যুদ্ধ'-র নিষ্পত্তি হলে ভারতেও তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধের অবসান হয়। সন্ধির শর্ত অনুসারে ইংরেজ ও ফরাসিরা পরস্পরের দখল করা এলাকা ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধের পর ভারতে ফরাসি সাম্রাজ্য বিস্তারের সম্ভাবনা চিরতরে লোপ পায়।

কর্নওয়ালিস, চার্লস (১৭৩৮-১৮০৫): লর্ড কর্নওয়ালিস ইংলণ্ডের এক অভিজাত পরিবারের সন্তান। তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে বৃটিশ পক্ষের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন দুর্নীতিমুক্ত ও সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ১৭৮৬ সালে তাঁকে গভর্নর-জেনারেল করে এ দেশে পাঠানো হয়। ১৭৯৩ খ্রী পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন। পরে ১৮০৫ খ্রী তিনি আবার গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হয়ে এদেশে আসেন ; কিন্তু কার্যভার গ্রহণের তিন মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ভারতে ইংরেজ সরকারের গভর্নর-জেনারেল ছাড়াও প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। প্রয়োজনে কাউন্সিলের অধিকাংশের মত উপেক্ষা করে শাসন-কার্য পরিচালনার ক্ষমতাও তাঁকে দেওয়া হয়।

পিটের ভারত আইন অনুসারে দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে ইংরেজ সর-কারের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। সে কারণে লর্ড কর্নওয়ালিস প্রথমে শান্তি নীতি অনুসরণের চেষ্টা করেন। কিন্তু মহীশূরের সুলতান টিপুর জন্য

তাঁর পক্ষে বেশি দিন নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব হয় না। ১৭৮৯খ্রী লর্ড কর্নওয়ালিসের সঙ্গে টিপুর যে যুদ্ধ হয় তা তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ নামে অভিহিত। ১৭৯২ খ্রী ঐ যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয় এবং শ্রীরঙ্গপত্তনমের সন্ধি অনুসারে মাদুরাই, সালেম জেলার একাংশ, কুর্গ, মালাবার প্রভৃতি স্থান ইংরেজ অধিকারে আসে। কর্নওয়ালিসের শাসনকালে আর কোন বড় যুদ্ধ হয়নি।

১৭৯৩ খ্রী ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের মেয়াদ শেষ হলে ঐ বছর লড কর্ন-ওয়ালিসের চেষ্টায় বৃটিশ পার্লামেণ্টে যে চার্টার এক্ট পাশ হয় তাতে কোম্পানি আরও বিশ বছর প্রায় একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে।

লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন বলবৎ হয়। তার আগে জমিদারদের সঙ্গে সরকারের দশ সালা বন্দোবস্তের ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ দশ বছর অন্তর জমিদারদের সরকারের কাছ থেকে জমির বন্দোবস্ত নিতে হত। ঐ ব্যবস্থার বদলে লর্ড কর্নওয়ালিস চির-স্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন ১৭৯৩ খ্রী ২২শে মার্চ বলবৎ হয়। নতুন আইন অনুসারে জমিদার নির্দিষ্ট পরিমাণ বাৎ-সরিক রাজস্বের শর্তে জমির চিরস্থায়ী মালিকানাস্বত্ব লাভ করেন। এতে সরকার রাজস্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হন এবং সরকারের অনুগত জমিদার শ্রেণী এদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করে। লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে ১৭৯০খ্রী নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। তিনি শাসন ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করেন। তাঁর সময়ে কালেক্টরের ক্ষমতা হ্রাস করে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা জেলা জজের উপর ন্যস্ত করা হয়। জমিদারদের প্রজাপীড়ন বন্ধের জন্য তাঁদের পুলিশী ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয় এবং থানা ও দারোগাদের সৃষ্টি হয়।

লর্ড ওয়েলেসলির আক্রমণাত্মক নীতি বৃটিশ সরকার অনুমোদন করেন না বলে ১৮০৫ সালে লর্ড কর্নওয়া-লিসকে আবার গভর্নর-জেনারেল করে এদেশে পাঠানো হয়। কিন্তু দ্বিতীয়-বার কার্যভার গ্রহণের তিন মাসের মধ্যেই, ১৮০৫ খ্রী ৫ অক্টোবর, গাজি-পুরে লর্ড কর্নওয়ালিসের মৃত্যু হয়।

কলচুরি বা হৈহয় ঃ নর্মদা উপত্যকা অঞ্চলে কলচুরি বা হৈহয় রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল কলচুরি রাজাদের শাসনাধীনে আসে। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে দাক্ষিণাত্যের চালুক্য রাজাদের ও উত্তরের গুর্জর প্রতিহারদের আক্রমণে কলচুরি রাজ্য খণ্ড-বিচ্ছিন্ন হয়।

নর্মদা উপত্যকা অঞ্চলে কলচুরি রাজাদের শাসন প্রায় তিন শ বছর স্থায়ী ছিল। কলচুরি রাজাদের মধ্যে কোক্কল, গাঙ্গেয়দেব, লক্ষ্মীবর্ণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ছত্তিশগড় অঞ্চলে কলচুরি রাজাদের শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

কলিকাতা : কলিকাতা ও তার দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত তীর্থক্ষেত্র কালীঘাট সুপ্রাচীন স্থান। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে লেখা বিপ্রদাস পিপলাইর মনসামঙ্গল কাব্যে কলিকাতার উল্লেখ আছে। তবে কলিকাতা তখন ছিল একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম মাত্র। কলিকাতার বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি ইংরেজ আমলে; জব চার্ণক কর্তৃক সেখানে কুঠি স্থাপিত হওয়ার পর। ১৬৯০ খ্রী ২৪শে আগস্ট গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী সুতানুটি গ্রামে চার্নক প্রথম পদার্পণ করেন। ১৬৯৮ খ্রী নবাবের অনুমতি অনুসারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে মাত্র ১৩শ' টাকায় কলিকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটি ক্রয় করেন। ১৭০২ খ্রী কলিকাতায় ইংরেজের প্রথম দুর্গ নির্মিত হয় এবং নগর পত্তনের কাজও তখন থেকে শুরু হয়। ১৭০৭ খ্রী কলিকাতাকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রেসিডেন্সি বলে ঘোষণা করে। ১৭৫৬ খ্রী নবাব সিরাজুদ্দৌলা একবার কলিকাতা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন, কিন্তু অনতিবিলম্বেই ইংরেজরা ফিরে আসে এবং ১৭৫৭ খ্রী পলাশির যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের পর কলিকাতায় ইংরেজদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১২ খ্রী পর্যন্ত কলিকাতা ছিল বৃটিশ ভারতের রাজধানী। তারপর দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

কহ্লন : 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থের লেখক। দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত কাশ্মীরী ঐতিহাসিক।

কাউন্সিল এক্ট, ১৮৯২ : গভর্নর-জেনারেল লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনকালে ১৮৯২ খ্রী বৃটিশ পার্লামেণ্টে কাউন্সিল এক্ট পাশ হয়। ঐ আইন অনুসারে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলির আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। সদস্যরা বাজেট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা করার ও সরকারের প্রশাসনিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করার অধিকার লাভ করেন। কিন্তু কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্যদের নির্বাচিত হওয়ার দাবী স্বীকৃত না হওয়ায় কাউন্সিল এক্ট তৎকালীন ভারতের শিক্ষিত সমাজকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ১৮৯২ খ্রী কাউন্সিল এক্ট অনুসারে পরবর্তীকালে গোপালকৃষ্ণ গোখলে, রাসবিহারী ঘোষ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতীয়গণ কাউন্সিলের সদস্য হন।

কাউন্সিলস এক্ট : ১৯০৯ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড মিণ্টো ও বৃটিশ সরকারের সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া (ভারতসচিব) মর্লে মিলিত উদ্যোগে ভারতের শাসন ব্যবস্থার যে সংস্কার করেন তা 'কাউন্সিলস এক্ট' নামক আইনে বিধিবদ্ধ হয়। ঐ শাসন সংস্কার দুই উদ্যোক্তার নামানুসারে মর্লে-মিণ্টো শাসন সংস্কার নামেও অভিহিত। ঐ আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় আইন সভায় সরকার-মনোনীত সদস্য সংখ্যা হ্রাস করে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতেও একই নীতি অনুসরণ করা হয়। ঐ সময়েই এদেশে

সর্ব প্রথম সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে সদস্যরা বাজেট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার ও ভোটদানের অধিকার লাভ করেন। লেঃ গভর্নর শাসিত প্রদেশগুলিতে লেঃ গভর্নরকে শাসনকাজে সহায়তা করার জন্য শাসন পরিষদ (Executive Council) গঠিত হয়; এবং ঐ শাসন পরিষদগুলিতে ভারতীয় নিয়োগ শুরু হয়।

কাকতীয় বংশ ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে কাকতীয় রাজবংশের শাসন একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। কাকতীয় বংশীয় নৃপতিরা নিজেদের সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলে দাবি করলেও তাঁরা হয়তো শূদ্র বংশীয় ছিলেন। কাকতীয় বংশীয় নৃপতিরা প্রথমে চালুক্য রাজ্যের সামন্ত ছিলেন, পরে স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন শুরু করেন। ১৪২৫ খ্রী বাহমনি সুলতান অহমেদ শাহর আক্রমণে কাকতীয় রাজ্য স্বাধীনতা হারায়।

কাকতীয় বংশের প্রথম পরাক্রমশালী নৃপতি প্রোলরাজ (১১১০-৫৮) পশ্চিম চালুক্য নৃপতিদের বিরুদ্ধে সামরিক সাফল্য অর্জন করেন। গণপতি (১১৯৯-১২৬১) কাকতীয় বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। তিনি কলিঙ্গ, দেবগিরি, চোল, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্যলাভ করেন। তাঁর সময়ে কাকতীয় রাজ্য গোদাবরী জেলা থেকে চিংলেপুট এবং ইয়েলগণ্ডল থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। গণপতির শাসনকালে কাকতীয় রাজ্যের রাজধানী হয় বরঙ্গল।

গণপতির পর কাকতীয় রাজ্য শাসন করেন তাঁর কন্যা রুদ্রাম্বা। তিনি প্রায় ত্রিশ বছর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যাদবরাজ মহাদেব তাঁকে পরাজিত করেন এবং তাঁর সময়েই কাকতীয় রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে গোলযোগ শুরু হয় আর সেই সুযোগে বহু সামন্ত রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু বিখ্যাত ইতালীয় পর্যটক মার্কোপোলো রুদ্রাম্বার শাসনের প্রশংসা করেছেন। রুদ্রাম্বার দৌহিত্র প্রতাপরুদ্র রাজ্যের হৃত মর্যাদা ও প্রতিপত্তি কিছুটা পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তাঁর শাসনকালেই কাকতীয় রাজ্য স্বাধীনতা হারায়। প্রথমে, ১৩১০ খ্রী আলাউদ্দিন খলজির সেনাপতি মালিক কাফুরের কাছে তিনি বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। তারপর ১৩২৩ খ্রী গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের পুত্র উলুঘ খাঁ কাকতীয় রাজ্যের রাজধানী বরঙ্গল দখল করেন ও প্রতাপরুদ্র তাঁর হাতে বন্দী হন।

কাঞ্চিপুরম ঃ কাঞ্চী, কাঞ্চিপুরম, কাঞ্জিবরম ইত্যাদি নামে পরিচিত সুপ্রাচীন শহর। খ্রী-পূ দ্বিতীয় শতাব্দীর মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির গ্রন্থে কাঞ্চীর উল্লেখ আছে। চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন সাং-এর বিবরণীতেও জ্ঞানে সমৃদ্ধিতে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরীরূপে কাঞ্চীর উল্লেখ আছে। চোল, পল্লব প্রভৃতি রাজাদের অধিকারে থাকার পর কাঞ্চিপুরম বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৬৬৪ খ্রী কাঞ্চিপুরম গোলকুণ্ডার-মুস্লিম শাসকদের অধিকারভুক্ত হয়

কাঞ্চিপুরম ইংরেজদেরও অন্যতম প্রাচীন উপনিবেশ। পলাশির যুদ্ধের ছয় বছর আগে, ১৭৫১ খ্রী কাঞ্চিপুরম ইংরেজদের অধিকারে যায়।

কাণ্ব বংশঃ শুঙ্গ বংশীয় শেষ শাসক দেবভূতিকে হত্যা করে তাঁর মন্ত্রী বাসুদেব মগধের সিংহাসন অধিকার করেন এবং এইভাবে শুঙ্গ বংশীয় শাসনের অবসান ও কাণ্ব বংশীয় শাসনের সূচনা হয়। কাণ্ব বংশের শাসন মাত্র ৪৫ বছর স্থায়ী ছিল (৭৩—২৮ খ্রী-পূ)। কাণ্ব বংশীয় রাজাদের নাম বাসুদেব, ভূমিমিত্র, নারায়ণ ও সুশর্মণ। কাণ্ব বংশীয় শাসকদের সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছু জানা যায় না। বায়ু পুরাণে তাঁদের ক্ষুদ্র শাসকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবত তাঁরাও শুঙ্গদের মত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁদের শাসনকালে মগধ সাম্রাজ্যের পরিধি আরও সঙ্কীর্ণ হয়। সম্ভবত ২৮ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে অন্ধ্রের রাজা সিমুক সুশর্মণকে হত্যা করে কাণ্ব বংশীয় শাসনের আবসান ঘটান। কাণ্ব বংশীয় শাসনের অবসান ঘটার সঙ্গে মগধ সাম্রাজ্যেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

কানহোজি আংরেঃ ছত্রপতি শিবাজির নৌ সেনাপতি টুকোজি আংরের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর মারাঠা সাম্রাজ্যের নৌবাহিনীর ভার-প্রাপ্ত হন এবং অতিক্ষুদ্র, দুর্বল নৌ-বহরকে শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ করে তোলেন। মারাঠা সাম্রাজ্যের উপকূলে কানহোজির নৌবহর ইংরেজ, ওলন্দাজ, পর্তুগীজদের পর্যন্ত ত্রাসের কারণ হয়। ১৭১৭-১৮ সালে বোম্বাইয় উপকূলে মারাঠা নৌবহরের কাছে ইংরেজের নৌবহর পরাস্ত হয়। পরে কেলিবায় ইংরেজ ও পর্তুগীজের মিলিত নৌ-বহরের আক্রমণেরও একই পরিণতি ঘটে। ১৭২২ খ্রী কানহোজির মৃত্যু পর্যন্ত কোঙ্কন উপকূলে মারাঠা নৌবহরের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

কানাইলাল দত্তঃ বিশিষ্ট বিপ্লবী ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শহিদ। আলিপুর বোমার মামলায় ধৃত হন। জেলের অভ্যন্তরে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যার অভিযোগে সঙ্গী সত্যেন বসু সহ ১৯০৮ খ্রী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

কামতাপুরঃ কামতাপুর বা কামতা-রাজ্যের প্রারম্ভিক ইতিহাস সুস্পষ্ট নয়। ঐ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নৃপতি দুর্লভ নারায়ণের আমলে কামতারাজ্য উত্তরবঙ্গের করতোয়া নদী থেকে আসামের বরনদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দুর্লভ নারায়ণ সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে রাজত্ব করেন। বাঙলার মুস্লিম ও আসামের আহোম রাজাদের আক্রমণে কামতারাজ্য ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। আহোমরাজ সুখাংফা ও কামতারাজকন্যা রজনীর বিবাহের পর দুই রাজ্যের বৈরিতার অবসান ঘটে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মে বিশ্বাসী খেন উপজাতীয়-দের নেতৃত্বে কামতারাজ্য আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ঐ বংশের তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের শাসনকালে কামতা-রাজ্য পূর্বে গোয়ালপাড়া ও কামরূপ এবং দক্ষিণ-পূর্বে মৈমনসিংহ ও শ্রীহট্ট পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। তখন কামতা-রাজ্যের রাজধানী ছিল কামতাপুর।

বর্তমান কোচবিহার শহরের কাছাকাছি কোন এক স্থানে স্থাপিত এই কামতাপুর শহরটি সেদিন খুবই সমৃদ্ধ ছিল। বাংলার সুলতান রুকনুদ্দিন বরবাক নীলাম্বরের হাতে পরাজিত হন। কিন্তু ১৪৯৮ থেকে ১৫০২ খ্রী মধ্যে হুসেন শাহর আক্রমণে নীলাম্বর সম্পূর্ণ পরাস্ত হন। কামতারাজ্যের একাংশ হুসেন শাহর অধিকারভুক্ত হয় ও অনতিবিলম্বে কামতারাজ্যের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।

কামরূপ ঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কামরূপ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সামন্ত রাজ্য ছিল, হরিষেণের 'এলাহাবাদ প্রশস্তি'তে এর উল্লেখ আছে। পরে গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে কামরূপ স্বাধীন রাজ্যরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়। আসাম, রংপুর ও কোচবিহার নিয়ে কামরূপ রাজ্য গঠিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক হিউ এন সাং যখন কামরূপ রাজ্য পরিভ্রমণ করেন তখন কামরূপের রাজা ছিলেন ভাস্করবর্মণ। কামরূপের রাজারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর কামরূপ বাঙলাদেশের পাল রাজাদের কাছে-স্বাধীনতা হারায়।

কার্জন, লর্ড ঃ লর্ড কার্জন ১৮৯৯-১৯০৫ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন। ভারতে আসার আগে কার্জন বৃটিশ সরকারের ভারত ও পররাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারি ছিলেন। সে কারণে ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা নিয়েই তিনি ভারতে ইংরেজ সরকারের সর্বোচ্চ শাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রশাসনিক দক্ষতা ও বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজের জন্য লর্ড কার্জনের শাসনকাল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁর শাসনকালে সর্বাধিক স্মরণীয় ঘটনা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি ত্যাগ করে লর্ড কার্জন অধিকৃত এলাকায় বৃটিশ কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হন। চিত্রল, কোয়েটা, দরগাই প্রভৃতি স্থানে আধিপত্য স্থাপন করে কার্জন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দূরবর্তী এলাকা থেকে বৃটিশ সৈন্য প্রত্যাহার করে নেন। তাঁর সময়েই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠিত হয়।

তিব্বতে রুশ প্রাধান্য দূর করার জন্য লর্ড কার্জন ১৯০৪ খ্রী সেখানে ইয়ংহাজব্যাণ্ড নামে এক ইংরেজ সামরিক কর্মচারীকে সৈন্যসহ পাঠান। তিব্বতীদের বাধার মধ্যে ইয়ংহাজব্যাণ্ড তিব্বতে প্রবেশ করে লাসা দখল করেন। তারপর তিব্বতের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, এবং তিব্বতে ইংরেজ বণিকরা বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করেন। এরপর রাশিয়ার সঙ্গে ইংরেজ সরকারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে তিব্বতে রুশ প্রভাব বৃদ্ধির আশঙ্কা দূর হয়।

এদেশের বৈষয়িক উন্নতির দিকে লর্ড কার্জনের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি ভারত সরকারের একটি বাণিজ্যদপ্তর সৃষ্টি করেন, পুলিশ বিভাগের সংস্কার করেন এবং কৃষির উন্নতির জন্য কয়েকটি ব্যবস্থাবলম্বন করেন। তিনি জমির গুণাগুণ ও কৃষকের অবস্থানুসারে জমির খাজনা স্থির করার নীতির প্রবর্তন

করেন। চাষের জমি ক্ষুদ্র খণ্ড হয়ে যাতে অলাভজনক না হয়ে পড়ে তার জন্য তিনি 'ভূমি হস্তান্তর আইন' নামে একটি আইন বলবৎ করেন। তবে সে আইনের এক্তিয়ার শুধু পাঞ্জাবেই সীমিত থাকে। সমবায় পদ্ধতিতে চাষের জন্য তিনি কৃষকদের নানাভাবে উৎসাহিত করেন।

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্যও তিনি নানা বিধিব্যবস্থা বলবৎ করেন। তাঁর সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়নের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। তার আগে শুধু পরীক্ষা নেওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজ ছিল। ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক কীর্তি সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক কীর্তির ধ্বংসাবশেষ পুনরুদ্ধারকল্পে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ স্থাপন লর্ড কার্জনের অন্যতম কীর্তি। কলকাতার ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ লর্ড কার্জনের শাসনকালে নির্মিত হয়।

লর্ড কার্জন স্বৈরাচারী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসক ছিলেন। শাসনব্যাপারে ভারতীয় জনমতের তিনি কোন মূল্য দিতেন না। ১৯০৪ খ্রী তিনি যে 'ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি এক্ট' বলবৎ করেন তাতে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার ক্ষুন্ন হয় এবং সরকারি কর্তৃত্ব অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। সে কারণে সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বিরুদ্ধে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রতিবাদ জানান। তার আগে, ১৮৯৯ খ্রী তিনি কলকাতা পৌরসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ৫০ থেকে কমিয়ে ২৫ করেন এবং ঐ সংস্থার উপর সরকারি কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করেন। ঐ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সেদিন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পৌরসভার ২৮জন সদস্য পদত্যাগ করে এক রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন।

এদেশের জনমতের প্রতি লর্ড কার্জনের উপেক্ষার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্ত। প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাতে বাঙলার জনমত উপেক্ষা করে তিনি বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে তার পূর্বাংশ আসামের সঙ্গে এবং পশ্চিমাংশ বিহার-ওড়িশার সঙ্গে সংযুক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে বাঙলায় সেদিন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক জাগরণ দেখা দেয় তাকে দমনের উদ্দেশ্যেই ইংরেজ সরকার সেদিন বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়ে যে প্রবল গণবিক্ষোভ দেখা দেয় তার কাছে ইংরেজ সরকারকে সেদিন নতি স্বীকার করতে হয়। বঙ্গদেশ আবার সংযুক্ত হয়। কিন্তু বঙ্গদেশের রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাসের উদ্দেশ্যে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়।

লর্ড কার্জন দ্বিতীয়বারের জন্য গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হলেও তৎকালীন জঙ্গিলাট লর্ড কিচেনারের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য হওয়ায় এবং সে ব্যাপারে বৃটিশ সরকার তাঁকে সমর্থন না করায় লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রী পদত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে যান।

কার্টিয়ার ঃ কার্টিয়ার ১৭৬৯-৭২ খ্রী বাঙলার গভর্নর ছিলেন। তাঁর শাসন-

কালে বাঙলায় দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে অভিহিত।

কালাপাহাড়ঃ বঙ্গদেশের কররানি বংশীয় সুলতান সুলেমান ও তাঁর পুত্র দায়ুদের সেনাপতি। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়েও পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তীব্র হিন্দু-বিদ্বেষী হন। ১৫৬৮ খ্রী পুরী আক্রমণ করেন এবং জগন্নাথের মন্দির ধ্বংস করেন। কুচরাজ শুক্লধ্বজ বঙ্গদেশ আক্রমণ করলে কালাপাহাড় তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেন। মোগল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে ১৫৮৩ খ্রী বাঙলা ও বিহারে যে বিদ্রোহ হয় কালাপাহাড় তাতে যোগ দেন ও সেই যুদ্ধে নিহত হন।

কালাশোকঃ শিশুনাগের পর মগধের রাজা হন এবং পুনরায় পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁর রাজত্বকালে বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসম্মেলন বা সঙ্গীতি আহূত হয়। তিনি সম্ভবত নন্দ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম কর্তৃক নিহত হন।

কালিদাসঃ মহাকবি কালিদাসের ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী অস্পষ্ট এবং তাঁর আবির্ভাবকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত নন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে তিনি একদা অত্যন্ত নির্বুদ্ধি ছিলেন, পরে দৈব আশীর্বাদে মহাপাণ্ডিত্য লাভ করেন। তাঁর আবির্ভাবকাল বিষয়ে দুটি মত প্রচলিত। একটি মত অনুসারে তাঁর আবির্ভাবকাল খ্রী-পূ প্রথম শতাব্দী। অপর মতে, গুপ্তযুগে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে। সর্বাধিক প্রচলিত মত অনুসারে কালিদাস বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (৩৮০-৪১৩ খ্রী) সভাকবি ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর লেখক বাণভট্ট তাঁর 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে কালিদাসের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন।

কালিদাসের নামে প্রচলিত সব কাব্যগ্রন্থ হয়ত কালিদাসের রচনা নয়। তবে অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্, বিক্রমোর্বশী মালবিকাগ্নিমিত্র, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও ঋতুসংহার অবশ্যই কালিদাসের রচনা। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্র শুঙ্গবংশীয় নৃপতি এবং তাঁর শাসনকাল ১৮৫-৪৮ খ্রী-পূ। আবার কালিদাসের বিভিন্ন রচনায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সমকালীন উজ্জয়িনীর উল্লেখ মেলে। এ সব প্রমাণদৃষ্টে ঐতিহাসিকদের অনুমান, অগ্নিমিত্র ও বিক্রমাদিত্যের মধ্যবর্তী কোন এক সময় মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাবকাল।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জাতীয়তাবাদী নেতা, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ঐ জাতীয় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বৃটেনের জনসাধারণের কাছে কংগ্রেসের কথা প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৯০ খ্রী যে ভারতীয় প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রী কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে সরকারের বিচার-বিভাগ ও শাসন-বিভাগ পৃথক করার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং প্রস্তাবের সমর্থনে স্মরণীয় ভাষণ দেন। ১৯০৮

সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের প্রতিটি অধিবেশনে যোগ দেন ও বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ডঃ সীতারামিয়া তাঁর 'জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস' গ্রন্থে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আলোচনাকালে বলেছেন যে, কালীচরণবাবুর অকাল মৃত্যু না হলে তিনি অবশ্যই কংগ্রেস সভাপতি হতেন। ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজি জাতীয় কংগ্রেসে সকল ধর্মাবলম্বীর উপস্থিতির প্রমাণস্বরূপ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ করেন।

কালীনাথ রায় (১৮৭৭—১৯৪৫): জাতীয়তাবাদী নির্ভীক সাংবাদিক। ১৯১৫ সালে লাহোরের প্রখ্যাত ইংরেজি দৈনিক 'দি ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে প্রবন্ধ লেখার জন্য ১৯১৯ খ্রী গ্রেপ্তার হন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন।

কাশী: খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে যে ষোলটি মহাজনপদ (রাজ্য) ছিল কাশী তার অন্যতম। কাশীর রাজধানী ছিল বারাণসী। প্রথম দিকে মহাজনপদগুলির মধ্যে কাশী সর্বাধিক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে সে মর্যাদার অধিকারী হয় কোশল মহাজনপদ।

কিচলু, সৈফুদ্দিন: বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা। পাঞ্জাবে জন্ম. কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত।

১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের যে সভায় নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটে, ডঃ কিচলুর সে সভায় পৌরোহিত্য করার কথা ছিল। কিন্তু সভা শুরুর আগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯২১ খ্রী জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী যে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব আনেন তা সমর্থন করেন ডঃ কিচলু। তিনি খিলাফৎ আন্দোলনেরও সমর্থক ছিলেন এবং সে সময় মুস্লিম লীগের সঙ্গেও তাঁর নিকট সম্পর্ক ছিল। হিন্দু-মুস্লিমের মিলিত শক্তিতে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ডঃ কিচলু বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। ১৯২৯ খ্রী লাহোরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যে প্রস্তাবে পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয় তার অন্যতম সমর্থক ছিলেন ডঃ কিচলু। তিনি দীর্ঘদিন পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৩ খ্রী ডঃ কিচলুর মৃত্যু হয়।

কিদোয়াই, রফি আহমেদ (১৮৯৪-১৯৫৩): ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা। '২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে '৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন পর্যন্তপ্রতিটি জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন ও দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ থাকেন। প্রথমে উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী ছিলেন, ১৯৫১ খ্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন।

কুকা বিদ্রোহ: শিখ ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য উনিশ শতকের মধ্যবর্তীকালে পাঞ্জাবে কুকা দল নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। 'কুকা' কথার

অর্থ চীৎকার, প্রতিবাদ। কূকা দল জাঠ ও নিম্নশ্রেণীর শিখদের সমর্থনে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তাদের কার্যকলাপ পাঞ্জাবে সগ্য ক্ষমতাসীন ইংরেজ সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের পাশে একটি কশাইখানা স্থাপিত হওয়ার প্রতিবাদে কূকা দল চার জন কশাইকে হত্যা করে। পরে লুধিয়ানা জেলায় আর একটি সংঘর্ষে কূকাদের আক্রমণে কয়েকজন হতাহত হয়। ঐ হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী নয় জন কূকার প্রাণদণ্ড হয়। তার প্রতিবাদে কূকা দল পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে হাঙ্গামার সৃষ্টি করে। ঐ সব হাঙ্গামা ইংরেজ সরকার কঠোর হাতে দমন করেন। কূকা হাঙ্গামা ১৮৬৩ থেকে ১৮৭২ খ্রী পর্যন্ত চলে।

কুৎলঘ খাজা : মোঙ্গল যোদ্ধা, প্রায় দুই লক্ষ অনুচর নিয়ে ১২৯৯ খ্রী সুলতান আলাউদ্দিনের শাসনকালে দিল্লী আক্রমণ করেন। অমাত্যদের পরামর্শ উপেক্ষা করে সুলতান আলাউদ্দিন সেনাপতি উলুঘ খাঁ ও জাফর খাঁর সহায়তায় সে আক্রমণ প্রতিরোধ করে অসমসাহসিকতা ও উচ্চশ্রেণীর রণকুশলতার পরিচয় দেন। যুদ্ধে সেনাপতি জাফর খাঁর মৃত্যু হয়।

কুতবুদ্দিন আইবক : দিল্লীতে দাস বংশীয় সুলতানশাহির প্রতিষ্ঠাতা। মহম্মদ ঘুরি ১১৯৬ খ্রী গজনি প্রত্যাবর্তনের আগে তাঁর ভারতে অধিকৃত স্থানগুলির শাসনদায়িত্ব বিশ্বস্ত অনুচর কুতবুদ্দিন আইবকের উপর ন্যস্ত করেন। তারপর ১২০৬ খ্রী মহম্মদ ঘুরির অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হলে কুতব নিজেকে দিল্লীর সুলতান বলে ঘোষণা করেন। এইভাবে দিল্লীতে সুলতানি শাসনের সূচনা হয়। মাত্র চার বছর স্বাধীন সুলতানরূপে শাসনকার্য চালানোর পর ১২১০ খ্রী এক দুর্ঘটনায় কুতবের মৃত্যু হয়।

প্রথম জীবনে কুতব ছিলেন ক্রীতদাস। সে কারণে কুতব প্রতিষ্ঠিত সুলতান বংশ দাস বংশ নামে অভিহিত। দিল্লীতে মহম্মদ ঘুরির প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্য চালানোর সময়েই তিনি তাঁর সহকর্মী ইখতিয়ারউদ্দিন বিন বখ্‌তিয়ার খলজিকে বিহার ও বঙ্গদেশ জয় করতে পাঠান এবং নিজে অনহিলবার, গোয়ালিয়র, কনৌজ প্রভৃতি জয় করেন। তাঁর স্বল্প শাসনকালেই দিল্লীর সুলতানি শাসন পাঞ্জাব থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পশ্চিম-দক্ষিণে গুজরাট পর্যন্ত সুলতানশাহি বিস্তারলাভ করে।

কুতব রণকুশল ও দক্ষ শাসক ছিলেন। দাতা ও ন্যায়বিচারকরূপেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তবে তিনি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। বহু হিন্দু মন্দির ভেঙে তিনি মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মুস্লিম ধর্ম ভারতে বিস্তার লাভ করে। 'চৌগান' (পোলো) খেলার সময় ঘোড়া থেকে পতনের ফলে ১২১০ খ্রী কুতবুদ্দিন আইবকের মৃত্যু হয়।

কুতব মিনার : দিল্লী শহর থেকে বারো মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক কীর্তিস্তম্ভ। ১১৯৯খ্রী কুতবুদ্দিন আইবকের শাসনকালে কুতব মিনারের নির্মাণকাজ শুরু হয়। কিন্তু

তিনি দ্বিতল পর্যন্ত নির্মাণ করতে পারেন। তারপর কুতবের জামাতা ও পরে সুলতান ইলতুৎমিসের শাসনকালে (১২১১-৩৬ খ্রী) কুতব মিনারের নির্মাণ-কাজ শেষ হয়। পরবর্তী কালের সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলক মিনারটি আরও দশ ফুট উঁচু করেন। পাঁচতল-বিশিষ্ট মিনারটির মোট উচ্চতা ২৩৫ ফুট।

কুতবুদ্দিন নামে এক মুস্লিম ফকিরের কবরের উপর মিনারটি নির্মিত হয় বলে তার নাম কুতব মিনার। গজনির এক মিনারের অনুকরণে ভারতীয় শিল্পীদের দিয়ে নির্মিত ঐ মিনারটি ভারতে মুস্লিম স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কুমারগুপ্ত : গুপ্তবংশীয় সম্রাট, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পুত্র। রাজত্বকাল ৪১৪-৫৫ খ্রী। তাঁর রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শক্তি ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি কোন রাজ্য জয় করেছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে তাঁর রাজত্বকালে অশ্বমেধ যজ্ঞ হয়েছিল যা পরাক্রমশালী রাজারা রাজ্য জয়ের পরেই সাধারণত করতেন।

কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে পুষ্যমিত্র নামে এক উপজাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। কিন্তু যুবরাজ ও পরবর্তী সম্রাট স্কন্দগুপ্তের প্রচণ্ড বিক্রমে পুষ্যমিত্রদের অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

কুমারদেবী : লিচ্ছবি রাজবংশের কন্যা, গুপ্তবংশীয় রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মহীষী। লিচ্ছবি রাজ্য নেপাল ও বিহারের বহু অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কুমারদেবীর বিবাহের ফলে লিচ্ছবি রাজ্যের অনেকখানি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কুমারজীব : বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভারতীয়। কাশ্মীরে ভারতীয় শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেন। খ্রী-পূ চতুর্থ শতাব্দীতে এক যুদ্ধে জয়ী চীনা সম্রাটের হাতে বন্দী হয়ে চীনে প্রেরিত হন এবং সেখানে বহু বৌদ্ধশাস্ত্র চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। শিক্ষকরূপেও কুমারজীব খ্যাতি অর্জন করেন।

কুমারপাল : প্রাচীন অণহিল-পাটকের (বর্তমান গুজরাতের একাংশ) চৌলুক্য বা সোলাঙ্কি বংশীয় রাজা। রাজত্বকাল আনুমানিক ১১৬৩-৭২ খ্রী। দিগ্‌বিজয়ী রাজা ছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। তারপর রাজ্যে পশুহত্যা, দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ হয়। রাজা সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করতে থাকেন।

কুমারিল ভট্ট : খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিন্দুধর্মের সংস্কারের জন্য আন্দোলন করেন। আসামের অধিবাসী, কিন্তু জীবনের বেশিরভাগ উজ্জয়িনীতে অতিবাহিত করেন। সারা ভারতে হিন্দুধর্মের সমর্থনে প্রচারকালে মুখ্যত বৌদ্ধশাস্ত্রকারদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন এবং সর্বত্র বিতর্কে জয়লাভ করেন। তিনি বলেন, বৌদ্ধধর্ম বেদ ও উপনিষদে প্রচারিত ধর্মের অতিরিক্ত কিছু নয়। কুমারিল ভট্টের প্রচার সাফল্যে হিন্দুধর্ম নব অনুপ্রেরণা লাভ করে।

কুম্ভ : মেবারের শিশোদিয়া বংশীয় রানা উপাধিধারী নৃপতি রাজত্বকাল ১৪৩৩-৬৯ খ্রী। মালবের সুলতান

মহম্মদ খলজিকে পরাজিত করা রানা কুম্ভর বিশেষ কীর্তি। সেই বিজয়ের স্মরণে তিনি চিতোরে একটি সুউচ্চ কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। পরে গুজরাত ও মালবের সুলতানদ্বয়ের মিলিত আক্রমণও রানা কুম্ভ প্রতিহত করেন। কুম্ভ যেমন বীর, তেমনই ধর্মপ্রাণ এবং কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। রানা কুম্ভর স্ত্রী মীরাবাঈ কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তিধর্ম প্রচার ও ভজন সঙ্গীতের জন্য সুখ্যাতা। ১৪৬৯ খ্রী পুত্র উদয়বরণ কর্তৃক রানা কুম্ভ নিহত হন।

কুরু ঃ বিভিন্ন বৌদ্ধগ্রন্থে, খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতে যে ১৬টি মহাজনপদের (রাজ্য) উল্লেখ আছে, কুরু তার অন্যতম। কুরু রাজ্যের রাজধানী ছিল বর্তমান দিল্লীর সন্নিকটবর্তী ইন্দ্রপ্রস্থ। ঐ রাজ্যের অপর গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল হস্তিনাপুর।

কুর্গ ঃ বর্তমানে কর্ণাটক রাজ্যের অন্তর্গত একটি জেলা। আয়তন ৪১১৮ বর্গ কিলোমিটার। পূর্বে স্বাধীন রাজ্য ছিল। কুর্গের রাজা বীররাজ প্রজাদের উপর অত্যাচার করেছেন এই অভিযোগে গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের শাসনকালে ইংরেজ সরকার (১৮৩৫ খ্রী) কুর্গ দখল করে। স্বাধীনতার পর ভারতীয় সংবিধানে কুর্গকে 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্য করা হয়। ১৯৫৬ সালে ভাষার ভিত্তিতে ভারতের রাজ্যগুলি পুনর্গঠন করা হ'লে কুর্গ তৎকালের মহীশূর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭৩ সালে মহীশূর রাজ্যের নাম হয় কর্ণাটক।

কুশীনগর ঃ বর্তমান উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া জেলার অন্তর্গত। ভগবান বুদ্ধ এখানে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। উৎখননের ফলে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ চৈত্যটি আবিষ্কৃত হয়েছে।

কুষাণ বংশ ঃ খ্রীষ্টজন্মের প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কোজোল কদফেসিস যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন তার শাসকরা কুষাণবংশীয় রাজা নামে অভিহিত। কুষাণরা মধ্য এশিয়ার যাযাবর ইউচি জাতির একটি অংশ। কোজোল কদফেসিস পারশ্যদেশের সীমান্ত থেকে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত কুষাণ সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। কোজোলের মৃত্যুর পর কুষাণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন বিম কদফেসিস বা দ্বিতীয় কদফেসিস। বিম কদফেসিসের প্রয়াসে কুষাণ সাম্রাজ্যের সীমানা পূর্বে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিম কদফেসিসের সঙ্গে চীনের সেনানায়ক প্যান চাওর যে যুদ্ধ হয় তাতে বিম পরাজিত হন। বিম রোম সম্রাটের রাজসভায় দূত প্রেরণ করেন।

কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কণিষ্ক। তিনি বিম কদফেসিসের পর সিংহাসনে বসেন। বিম কদফেসিসের সঙ্গে কণিষ্কের সম্পর্ক কি ছিল তা জানা যায় না। কণিষ্কের শাসনকালে কুষাণ সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়ার খোটান ও খোরাসান থেকে পূর্বে বিহার ও দক্ষিণে কোঙ্কন পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। কাশ্মীরও তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি চীনা সেনাপতি প্যান চাও-র হাতে বিম কদফেসিসের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন।

তাঁর শাসনকালে কাশ্মীরে বৌদ্ধ সম্মেলন আহূত হয়।

কণিষ্কের পর বাশিষ্ক, হুবিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি কুষাণ বংশীয় রাজারা সিংহাসনারোহণ করেন। কিন্তু বিশাল কুষাণ সাম্রাজ্য শাসনের যোগ্যতা তাঁদের ছিল না। ফলে কণিষ্কের পরেই কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়।

ভারতের সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উন্নয়নে কুষাণ রাজাদের বিপুল অবদান বিশেষ স্মরণীয়। কুষাণ রাজাদের শাসনকালে ভারতের সঙ্গে পূর্বে চীন ও পশ্চিমে রোম পর্যন্ত রাজনৈতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, চরক, সুশ্রুত, পতঞ্জলি প্রমুখ মনীষীগণ কুষাণ যুগেই ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর হয় বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্র চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। ভাস্কর্য শিল্পও তখন চরম উৎকর্ষ লাভ করে। গান্ধার শিল্প কুষাণ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।

কৃষ্ণদেব রায়ঃ দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নৃপতি, শাসনকাল ১৫০৯-৩০ খ্রী। তিনি মহীশূর ও ওড়িশা রাজ্যের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালিত করে বহু স্থান অধিকার করেন। তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী রাইচুর, দোয়াব তিনি জয় করেন। তাঁর শাসনকালে বিজয়নগর রাজ্য উত্তরে ওড়িশা থেকে দক্ষিণে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। কৃষ্ণদেব যেমন পরাক্রমশালী, তেমনই দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তাঁর শাসনকালে পর্তুগীজ পর্যটক পয়েজ বিজয়নগর রাজ্যে আসেন এবং কৃষ্ণদেবের রাজ্যশাসনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। পয়েজ বলেন, বিজয়নগর ছিল তৎকালীন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী।

ব্যক্তিগত জীবনে কৃষ্ণদেব ছিলেন সরল অনাড়ম্বর ও পরম বৈষ্ণব। শিল্পসাহিত্যেরও তিনি বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি অনেক সুন্দর মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তাঁর সময় অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে সব বিদ্যালয়ের সমগ্র ব্যয়ভার রাজদরবার থেকে বহন করা হত। কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পরেই বিজয়নগর রাজ্যের পতন শুরু হয়।

কেরলঃ ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত অন্যতম অঙ্গরাজ্য কেরল বহু প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠভূমি। খ্রীষ্টপূর্ব যুগের বহু স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শনও কেরলে মিলেছে। সম্ভবত ৫২ খ্রী যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য সেণ্ট টমাস কেরলের উপকূলে অবতরণ করেন ও সেখানের বহুজনকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত ইহুদিদের একাংশও কেরলে এসে আশ্রয় নেয়। অষ্টম শতাব্দীতে কেরল আরব বণিকদের সংস্পর্শে আসে ও সেখানে ইসলাম ধর্মের প্রচার হয়। ঐ সময় কেরলের প্রধান বন্দর ছিল মুজিরিস, যার বর্তমান নাম ক্রাঙ্গানোর। কেরলে একদা বৌদ্ধ ও জৈনধর্মেরও ব্যাপক প্রভাব ছিল। তবে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কেরল চের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকাকালে হিন্দুধর্মের প্রাবল্যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের লোপ

পায়। চের রাজাদের শাসনকালে ধর্মগুরু শঙ্করাচার্য (৭৮৮-৮২০ খ্রী) জন্মগ্রহণ করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে চের সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রমুখ অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। ১৪৯৮খ্রী পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা কালিকট বন্দরে অবতরণ করেন। কালিকট তখন ছিল কোঝিকোড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং জামোরিন ছিলেন সে রাজ্যের রাজা। এরপর বর্তমান কেরল রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার উপর প্রভাব বিস্তার নিয়ে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ উপনিবেশীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। মহীশূর-রাজ হায়দরআলি ও পরে তাঁর পুত্র টিপু সুলতানও কেরলের বিভিন্ন অংশ জয়ে তৎপর হন। পরিশেষে শুধু ইংরেজদের আধিপত্য কায়েম হয়। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্য 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

স্বাধীনতার পর প্রথমে ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনকে মিলিত করে 'ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন' নামে ভারতের একটি অঙ্গ-রাজ্য গঠিত হয়। পরে ভাষার ভিত্তিতে, ১৯৫৬ খ্রী সমগ্র মালয়লম-ভাষী অঞ্চল নিয়ে কেরল রাজ্য গঠিত হয়। কেরলের আয়তন ৩৯,০০৫ বর্গ কিলোমিটার। রাজধানী ত্রিবান্দ্রম। কেরল ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য। ভারতে প্রতি বর্গ কিলোমিটার স্থানে গড়ে ১০৫ জনের বাস আর কেরলে প্রতি বর্গ কিলোমিটার স্থানে লোকবসতির ঘনত্ব ৪৩১।

কেরি, উইলিয়ম : (১৭৬১-১৮৩৪) খ্রীষ্টধর্মযাজক, ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৭৯৩ খ্রী ভারতে আসেন। বাঙলা-দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকালে ভাল বাংলা শেখেন এবং ১৮০১ খ্রী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হলে তার বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বাংলা ভাষার উন্নতিতে কেরির অবদান স্মরণীয়। তিনি শ্রীরামপুরে একটি প্রেস স্থাপন করেন এবং স্থানীয় কর্মকার পঞ্চাননকে দিয়ে বাংলা অক্ষর ঢালাই করান। এই ভাবে পঞ্চানন কর্মকার নির্মিত অক্ষরে, কেরি সাহেবের প্রেসে ১৮০১ খ্রী প্রকাশিত হয় প্রথম মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ, অনূদিত বাইবেল। ঐ বছরে কেরি সাহেব স্বলিখিত বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন এবং তারপরে প্রকাশ করেন বাংলা-ইংরেজি অভিধান। পরে তিনি হিন্দি, সংস্কৃত ও মারাঠা ভাষাও শেখেন এবং ঐ সব ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মুখ্যত কেরি সাহেবের উদ্যোগে বাংলা ভাষার গদ্যযুগের সূচনা হয়।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) : প্রখ্যাত বক্তা, ধর্মসংস্কারক, ভারতের জাতীয় চেতনার অন্যতম উন্মেষক। ১৮৫৭ খ্রী ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন, ১৮৬৯ খ্রী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর ধর্মসংস্কারকরূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচার শুরু করলেও তাঁর বাকপ্রতিভা ব্যক্তিত্ব ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা শিক্ষিত ভারত-বাসীর মনে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। ডঃ রমেশ মজুমদার কেশব সম্বন্ধে বলেছেন : He was the first

great all-India figure symbolising the unity of Indian culture.

ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্যের পক্ষে কেশবের দৃপ্ত ভাষণ ভারতের জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর কাছে তর্কযুদ্ধে ইংরেজ মিশনারীদের পরাজয়ও ভারতবাসীদের নিজ ধর্ম সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি নতুন করে আস্থাশীল করে। কেশবের অনুপ্রেরণায় ১৮৬৪ খ্রী বোম্বাই শহরে ডঃ আত্মারাম পাণ্ডুরং-এর নেতৃত্বে 'প্রার্থনা সমাজ' গঠিত হয়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে গড়ে ওঠে উনত্রিশটি ব্রাহ্মসমাজ।

ইংরেজ সিভিলিয়ন ও একদা কংগ্রেস সভাপতি স্যার হেনরি কটন কেশবের মৃত্যুর পর সারা ভারতে তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনাকালে বলেছেন: The death of Keshab Chunder in January, 1884, was one of the earliest occasions for the manifestation of a truely national sentiment in the country. The residents of all parts of India, irrespective of caste and creed united with one voice in the expression of sorrow at his loss and pride in him as member of one common nation.

কোচবিহারঃ ১৫১০ খ্রী ধ্বংসপ্রাপ্ত কামতারাজ্যের একাংশে কোচ উপজাতীয় বিশ্বসিংহের নেতৃত্বে একটি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কোচবিহার হয় সেই রাজ্যের রাজধানী। বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণ ঐ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। ১৫৮১ খ্রী কোচবিহার রাজ্য সোনকোষ নদী বরাবর দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং দুটি রাজ্য কোচবিহার ও কোচ হাজো নামে পরিচিত হয়। কোচ হাজো, বর্তমান কামরূপ ও নিকটবর্তী এলাকা, ১৬৩৯ খ্রী মুস্লিম অধিকারভুক্ত হয়। কোচবিহারের রাজা ভুটানের রাজার সহায়তায় মুস্লিম আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিন্তু ভুটানের রাজা সেই অবকাশে কোচবিহারের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তখন কোচবিহারের রাজা ভুটানের প্রভাবমুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকারের শরণ নেন এবং ১৭৭২ খ্রী কোচবিহার ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

কোচবিহারের রাজভাষা ছিল বাংলা। ১৫৫৫ খ্রী আহোম রাজার কাছে কোচবিহার রাজার বাংলা ভাষায় লেখা একটি চিঠি বাংলা গদ্যের অন্যতম প্রাচীন দলিল। অসমীয়া ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক শঙ্করদেব রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে দীর্ঘদিন কোচবিহার রাজসভায় অবস্থান করেন এবং সেখানেই তিনি তাঁর 'রাজবিজয়' নাটকটি লেখেন। ১৯৪৯ খ্রী ১২ সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের সঙ্গে কোচবিহার মহারাজের চুক্তি অনুসারে কোচবিহার ভারতের অঙ্গীভূত হয়। এখন কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা।

কোণার্কঃ ওড়িশার উপকূলে, পুরী শহরের অদূরে অবস্থিত প্রাচীন স্থান,

সূর্য মন্দিরের জন্য খ্যাত। সূর্য মন্দিরটি নির্মাণ করেন ওড়িশার রাজা লাঙ্গুলিয়া নরসিংহদেব ১২৫০-৬০ খ্রী। ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের কয়েকটি উজ্জ্বলতম নিদর্শনের মধ্যে কোণার্কের সূর্য মন্দির অন্যতম।

কোমাগাতা মারুঃ গুরুদিৎ সিংহ-দ্র।

কোশলঃ খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর সূচনায় ভারতে যে ১৬টি মহাজনপদ (রাজ্য) ছিল, কোশল তার অন্যতম। বর্তমান অযোধ্যা ও তার সমীপবর্তী অঞ্চল নিয়ে কোশল রাজ্য গঠিত ছিল। রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলবাস্তু কোশল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যতম মহাজনপদ কাশীও ক্রমে কোশল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কৌশাম্বীঃ উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ জেলায় যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। সুপ্রাচীন এই নগরীটি একদা ইটের তৈরি প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। সম্ভবত খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীতে নগরীটির পত্তন হয় এবং ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং ঐ নগরীতে কিছুদিন ছিলেন। সম্ভবত গুপ্ত যুগে কৌশাম্বী নগরীটি পরিত্যক্ত হয়। বুদ্ধদেবের সমকালে ভারতে যে ষোলটি মহাজনপদ ছিল তার অন্যতম বংশ বা বৎস রাজ্যের রাজধানী ছিল কৌশাম্বী।

ক্যানিং, লর্ড চার্লস জনঃ লর্ড ক্যানিং অল্প বয়সেই ইংলণ্ডের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৬ খ্রী মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। লর্ড ডালহৌসির অবসর গ্রহণের পর গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হয়ে তিনি ভারতে আসেন এবং ১৮৫৬-৫৯ খ্রী ঐ পদে বহাল থাকেন।

লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা সিপাহি বিদ্রোহ। ক্যানিং দক্ষতার সঙ্গে ঐ বিদ্রোহ দমন করেন। বিদ্রোহ দমনে তিনি নেপাল, ভারতের অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য ও পাঞ্জাবের শিখদের সক্রিয় সাহায্য লাভ করেন। সিপাহি বিদ্রোহের পর কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে এবং বৃটিশ সরকার স্বহস্তে ভারতের শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করেন। গভর্নর-জেনারেল পূর্বের মতোই শাসনব্যবস্থার প্রধান থাকেন, সেইসঙ্গে তিনি হন বৃটিশ রাজসরকারের প্রতিনিধি—ভাইসরয়। লর্ড ক্যানিং ভারতের প্রথম ভাইসরয় ও গভর্নর-জেনারেল।

১৮৫৯ খ্রী ক্যানিং স্বদেশে ফিরে যান। ভারতে প্রশাসনিক সাফল্যের জন্য তিনি এতই খ্যাতি অর্জন করেন যে সে সময় তাঁর বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথাও শোনা যায়। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য লর্ড ক্যানিং আর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি।

ক্যাবিনেট মিশনঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে শ্রমিকদল বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভের পরেই তাঁদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিমতো ভারতের শাসনদায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের হাতে ন্যস্ত করার জন্য তৎপর হন। ঐ উদ্দেশ্যে দিল্লীতে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগ নেতৃবৃন্দের আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু দেশ বিভাগ, পাকিস্তান

সৃষ্টি ও ভারত ও পাকিস্তানের জন্য পৃথক গণপরিষদ গঠনের দাবিতে মুস্লিম লীগ অবিচল থাকায় দিল্লী আলোচনায় যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তার সমাধান করতে বৃটিশ সরকার ১৯৪৬ খ্রী ১৯ ফেব্রুয়ারী ভারতে তিনজন মন্ত্রীর এক প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বৃটিশ মন্ত্রিসভায় তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত ঐ মন্ত্রী প্রতিনিধিদলই 'ক্যাবিনেট মিশন' নামে অভিহিত হয়। ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য হন ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স বাণিজ্য-সচিব স্টাফোর্ড ক্রিপস ও নৌসচিব লর্ড আলেকজাণ্ডার। ১৯৪৬ খ্রী ২৪ মার্চ ক্যাবিনেট মিশন নয়াদিল্লী পৌঁছান ও দেড় মাস ধরে কংগ্রেস-লীগ বিরোধের নিষ্পত্তির চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন ক্যাবিনেট মিশন ১৬ মে তারিখে একটি আপস প্রস্তাব ভারতীয় নেতৃবৃন্দের বিবেচনার্থে পেশ করেন।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে ভারতের এগারোটি বৃটিশ শাসিত প্রদেশ ও সব কটি দেশীয় রাজ্যকে নিয়ে একটি যৌথ রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়, যার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধু পররাষ্ট্রনীতি, দেশরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ঐ তিন বিষয়ে ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। আর বৃটিশ শাসিত প্রদেশগুলিকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। প্রথম গ্রুপে—মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও ওড়িশাকে; দ্বিতীয় গ্রুপে—পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে; ও তৃতীয় গ্রুপে—বাঙলা ও আসামকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। গ্রুপ ব্যবস্থার মধ্যে পাকিস্তানের সূচনার ইঙ্গিত পেয়ে মুস্লিম লীগ ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে। কংগ্রেস গ্রুপ ব্যবস্থার বিরোধী হলেও সমগ্র ভারতের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও একটি গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব থাকায় ক্যাবিনেট মিশনের আপসসূত্র প্রত্যাখ্যান করে না। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গঠন ও প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে আবার লীগ-কংগ্রেস বিরোধ দেখা দেয়।

তিন মাস ধরে মীমাংসার জন্য অবিশ্রান্ত প্রয়াসের পর ২৯ জুন ক্যাবিনেট মিশন ভারত ত্যাগ করেন। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি, কারণ ভারত বিভাগ বন্ধের জন্য তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু ক্যাবিনেট মিশনের সদিচ্ছায় ভারতের কোন রাজনৈতিক দলের মনে সন্দেহ ছিল না। আর তাঁরা যে ভিত্তিতে ভারতের রাজ্যগুলিকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করেন, মোটামুটিভাবে তারই ভিত্তিতে ভারত পরবর্তীকালে বিভক্ত হয়। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমের দুটি খণ্ডিত অংশ নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

ক্রিপস মিশন: স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল বৃটিশ রাষ্ট্রনেতা। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আমন্ত্রণে ১৯৪০ খ্রী তিনি একবার ভারতে আসেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বৃটিশ সরকারের ভারতের জনমত উপেক্ষা করে ভারতেকে ঐ যুদ্ধে জড়িত করা-নোর প্রতিবাদে কংগ্রেস ভারতের আটটি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন এবং বৃটিশ সরকারের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অসহযোগিতার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ওদিকে ১৯৪২ খ্রী জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করে দ্রুত গতিতে ভারতের দিকে এগিয়ে আসায় বৃটিশ সরকার ভারতের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আপস মীমাংসায় উদ্যোগী হন। স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস্ তখন বৃটেনের চার্চিল মন্ত্রিসভার সদস্য। ভারতের জনগণ তাঁর প্রতি আস্থাশীল এই বিবেচনায় ক্রিপসকে এদেশে পাঠানো হয়। ১৯৪২ খ্রী মার্চ মাসে ক্রিপস তাঁর আপস প্রস্তাব নিয়ে এদেশে আসেন। ক্রিপসের ঐ দৌত্য 'ক্রিপস মিশন' নামে অভিহিত।

ক্রিপস্ তাঁর প্রস্তাবে বলেন যুদ্ধের শেষে স্বাধীন ভারতের একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্য সংবিধান পরিষদ আহ্বান করা হবে। ঐ প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তিনি যুদ্ধে ভারতের পূর্ণ সহযোগিতা চান। জাতীয় নেতৃবৃন্দের অনেকে ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর অনমনীয় মনোভাবের জন্য সে প্রস্তাব প্রত্যা-খ্যাত হয়। যুদ্ধে বিপর্যয়ের সম্মুখীন বৃটিশ সরকারের সুদূর ভবিষ্যতের প্রতি-শ্রুতিকে গান্ধীজি Post-dated cheque on a crush-bank বলে উপহাস করেন। ভগ্নহৃদয়ে ক্রিপস স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তার কয়েক মাস পরেই গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো (Quit India) আন্দো-লন শুরু হয়।

ক্লাইভ, লর্ড : রিচার্ড ক্লাইভের পুত্র রবার্ট ক্লাইভ ১৭২৫ খ্রী ইংলণ্ডে জন্ম-গ্রহণ করেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কেরানিরূপে তিনি ভারতে আসেন। তারপর ১৭৫৬ খ্রী ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের সাত বছরের যুদ্ধ শুরু হলে তিনি কেরানিবৃত্তি ছেড়ে সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করেন এবং ভারতে ফরাসি গর্ভনর দ্যুপ্লেক্সের নেতৃত্বে পরিচালিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেন। তাঁর সামরিক দক্ষতা অবিলম্বে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি কর্নেল পদে উন্নীত হন। ক্লাইভের তৎপরতায় কর্নাটের যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হয় এবং দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৫৬ খ্রী ২০ জুন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা যখন কলকাতা দখল করে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন ক্লাইভ তখন মাদ্রাজে ইংরেজ সরকারের ডেপুটি গভর্নর পদে নিযুক্ত ছিলেন। কলকাতা বেদখল হওয়ার সংবাদ পেয়ে তিনি ও এডমিরাল ওয়াটসন সৈন্যবাহিনী নিয়ে জাহাজযোগে কলকাতায় আসেন ও কলকাতা পুনর্দখল করেন (১৭৫৭ খ্রী ২ জানুয়ারী)। দু'মাস পরে ক্লাইভ ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চন্দননগর দখল করেন। তারপর নবাব সিরা[illegible] উদ্দৌলাকে মসনদচ্যুত ক[illegible] জন্য ক্লাইভ নবাবের পরিবারের কয়েকজন ও মিরজাফর, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ষড়যন্ত্রে স্থির হয়, সিরাজ

মসনদচ্যুত হলে মিরজাফর বাঙলার নবাব হবেন এবং যুদ্ধে সাহায্যের জন্য ক্লাইভ ও তাঁর সঙ্গীরা প্রচুর আর্থিক পুরস্কার লাভ করবেন। এই ষড়যন্ত্রের পরেই পলাশির যুদ্ধ হয় (১৭৫৭ খ্রী ২৩ জুন) এবং তাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত ও পলায়নকালে ধৃত ও পরে নিহত হন। পরে পূর্ব ব্যবস্থা মতো মিরজাফর নবাব হন এবং ক্লাইভ নগদ ত্রিশ লক্ষ টাকা ও চব্বিশ পরগণার জায়গিরদারি লাভ করেন। ঐ জায়গির থেকে ক্লাইভের বছরে তিন লক্ষ টাকা আয় হত। মিরজাফরের নবাবীকালে ক্লাইভ কলকাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর নিযুক্ত হন। তিন বছর গভর্নর থাকার পর বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়ে ক্লাইভ ১৭৬০ খ্রী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বৃটিশ সরকার তখন তাঁকে লর্ড উপাধি দেন।

কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিকালে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ নানাভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ায় লর্ড ক্লাইভকে আবার এদেশে ডেকে আনা হয়। তিনি ১৭৬৫ সালের মে মাসে এদেশে আসেন ও ইংরেজ সরকারের গভর্নর নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে ক্লাইভ দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে বাঙলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করেন (১৭৬৫ খ্রী ১২ আগস্ট)। ইংরেজরা তখনই বাঙলা-বিহার-ওড়িশার প্রকৃত শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করে এবং নবাবের নামেমাত্র অস্তিত্ব থাকে।

১৭৬৭ খ্রী ক্লাইভ আবার স্বদেশে ফিরে যান। সে সময় ইংলণ্ডে তাঁর বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতি, অত্যাচার ও অনাচারের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ঐ সব অভিযোগ ও বিচারের অসম্মান থেকে অব্যাহতি পেতে লর্ড ক্লাইভ ১৭৭৪ সালের ২২ নভেম্বর আত্মহত্যা করেন।

ক্ষহরাত: শক জাতির একটি অংশ। দাক্ষিণাত্যের উত্তরাঞ্চলে ও পশ্চিম ভারতে খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতাব্দীতে শক-পহ্লব রাজাদের যেসব রাজ্য গড়ে ওঠে তার প্রাদেশিক শাসক সত্রপরা সাধারণত ক্ষহরাত উপজাতীয় ছিলেন। ক্ষহরাত উপজাতীয়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নৃপতি নহপান সাতবাহন সাম্রাজ্যের একাংশ দখল করে একটি রাজ্য গড়ে তোলেন। সাতবাহন বংশীয় গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির অভ্যুত্থানের পর ক্ষহরাত জাতির প্রাধান্য লোপ পায়।

ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮): ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহিদ। ১৯০৮ খ্রী ৩০ এপ্রিল ইংরেজ রাজকর্মচারী কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে মজঃফরপুরে একটি গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়েন। কিন্তু কিংসফোর্ড সে গাড়িতে ছিলেন না, গাড়ির আরোহী দুই ইংরেজ মহিলা সেই বোমায় নিহত হন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশ হয় এবং ১৯০৮ খ্রী ১১ আগস্ট সে আদেশ কার্যকর করা হয়।

ক্ষুদিরামের সঙ্গী প্রফুল্ল চাকি পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগেই নিজের রিভলবারের গুলীতে আত্মহত্যা করেন (১৯০৮ খ্রী, ১ মে)।

ক্ষেত্র সিংহ : মেবারের রাজা হামিরের পুত্র। ১৩৬৪ খ্রী হামিরের মৃত্যুর পর মেবারের রাজা হন। কিন্তু প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে, সম্ভবত ১৩৮২ খ্রী, নিহত হন। ক্ষেত্র সিংহের পুত্র লাখা তাঁর উত্তরাধিকারী হন।

ক্ষেমেন্দ্র : অলঙ্কার শাস্ত্রের পণ্ডিত, ঔচিত্য বিচার চর্চা গ্রন্থের প্রণেতা। আচার্য ক্ষেমেন্দ্রর জন্মস্থান কাশ্মীর ও জন্ম সম্ভবত ৯৯০-১০৬৩ খ্রী মধ্যে। তিনি ঔচিত্যকে কাব্যশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন—ঔচিত্যং রসসিদ্ধস্য স্থিরং কাব্যস্য জীবিতম।

খড়ক সিংহ : মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৮৩৯ খ্রী শিখ রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। অযোগ্য শাসক ছিলেন, এবং রাজ্যলাভের এক বছর পরে তাঁর মৃত্যু হলে শিখরাজ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়।

খলজি বংশ : গিয়াসুদ্দিন বলবনের মৃত্যুর পর ১২৮৬ খ্রী তাঁর দুর্বল ও অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের ঘিরে দিল্লীর প্রভাবশালী মহলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ষড়যন্ত্র শুরু হয়। সেই অবস্থায় পাঞ্জাবের শাসক আমির জালালুদ্দিন খলজি ১২৯০ খ্রী দাসবংশের শেষ সুলতান কাইকোবাদকে বন্দী ও নিহত করে স্বয়ং দিল্লীর মসনদ দখল করেন। এইভাবে দাসবংশীয় শাসনের অবসান ও খলজি বংশীয় শাসনের সূচনা হয়।

জালালুদ্দিন খলজি ১২৯০ থেকে ১২৯৬ খ্রী পর্যন্ত দিল্লীর সুলতান ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শান্ত প্রকৃতির, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও মধুর স্বভাবের মানুষ ছিলেন। সে কারণে তাঁর অভ্যুত্থানকালে যাঁরা বিরোধী ছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন।

জালালুদ্দিন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিনকে কারা ও অযোধ্যার শাসক নির্বাচিত করেছিলেন। আলাউদ্দিনের দেবগিরি জয়ের সংবাদ পেয়ে জালালুদ্দিন আলাউদ্দিনকে সংবর্ধনা জানাতে কারায় যান। কিন্তু সেখানে উপস্থিতির অল্পক্ষণ পরেই তিনি আলাউদ্দিন কর্তৃক নিহত হন। আলিঙ্গনকালে আলাউদ্দিন তাঁর পিতৃব্য তথা শ্বশুরকে হত্যা করেন এবং জালালুদ্দিনের অনুগত আরও কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিকে হত্যা করে তিনি দিল্লীর মসনদ দখল করেন।

আলাউদ্দিন খলজির শাসনকাল ১২৯৬-১৩১৫ খ্রী। তিনি যেমন রণকুশল তেমনই দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। আলাউদ্দিনের শাসনকালে মোঙ্গলরা বারবার ভারত আক্রমণ করে এবং সে আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আলাউদ্দিন একটি বিশাল ও সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার ফাঁকে ফাঁকে ঐ বিশাল বাহিনী দিয়ে তিনি উত্তর ভারতে রাজপুতদের পরাজিত করে ও দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য অভিযানে সহায়ক ছিলেন সেনাপতি মালিক কাফুর।

১৩১৬ খ্রী আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর রাজ্যে দারুণ অরাজকতা দেখা দেয়।

মাত্র চার বছরের মধ্যে শিহাবুদ্দিন ওমর, মালিক কাফুর, মোবারক শাহ ও খুসরো খাঁ দিল্লীর মসনদে বসেন, কিন্তু অনতিকালমধ্যেই তাঁরা মসনদ-চ্যুত অথবা নিহত হন। সেই বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার মধ্যে সীমান্ত প্রদেশের শাসক গিয়াসুদ্দিন তোগলক ১৩২০ খ্রী দিল্লীর মসনদ দখল করেন। ফলে দিল্লীতে খলজি শাসনের অবসান ও তোগলক শাসনের সূচনা হয়।

খসরু : মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং মানসিংহের ভাগিনেয় ও আজিজ কোকার জামাতা। সম্রাট আকবরের জীবনের শেষের দিকে যুবরাজ জাহাঙ্গির (তখন নাম ছিল সেলিম) কয়েকবার বিদ্রোহী হওয়ায় সম্রাট আকবর পুত্রকে বঞ্চিত করে পৌত্র খসরুকে উত্তরাধিকারী করার কথা ভাবেন এবং এ ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন জানান মানসিংহ ও আজিজ কোকা। কিন্তু অনুতপ্ত সেলিম পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করায় ও অধিকাংশ পারিষদ সেলিমের দাবি সমর্থন করায় সম্রাট আকবর পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং ১৬০৫ খ্রী সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গির দিল্লীর বাদশাহ হন।

খসরু তখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন ও পাঞ্জাবে পলায়ন করে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি শুরু করেন। কিন্তু ভাইরোয়ালের যুদ্ধে খসরু সম্পূর্ণ পরাস্ত হন এবং কান্দাহারে পলায়নের পথে চন্দ্রভাগা নদীর কাছে ধরা পড়েন। খসরুর বিদ্রোহে সহায়তাকারীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। খসরুকে সমর্থন করার অভিযোগে পঞ্চম শিখগুরু অর্জুন বন্দী হন এবং জেলের ভিতরে অত্যাচারের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। খসরু দীর্ঘকাল বন্দী থাকেন এবং জেলের মধ্যে তাঁকে অন্ধ করা হয়। পরে তিনি কিছুটা দৃষ্টি-শক্তি ফিরে পান, কিন্তু ভ্রাতা খুররমের (পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহান) ষড়যন্ত্রে, ১৬২২খ্রী, দাক্ষিণাত্যে বুরহানপুর নামক স্থানে নিহত হন।

খাকসার আন্দোলন : ইনায়তুল্লাহ্ খাঁ মশরিকি ১৯৩১ খ্রী খাকসার দল নামে একটি সমাজ-সেবী সঙ্ঘ গঠন করেন। লাহোরে খাকসারদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপিত হয় এবং অবিলম্বে সারা ভারতে খাকসার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। উর্দিপরা বেলচাবাহী খাকসারদের কুচকাওয়াজ ভারতের বিভিন্ন স্থানে চাঞ্চল্য জাগায়। লখনৌ শহরে সিয়া-সুন্নি বিরোধের বলপ্রয়োগে নিষ্পত্তি করতে গিয়ে খাকসার নেতা ইনায়েতুল্লাহ ১৯৩৯ খ্রী কয়েকজন অনুচরসহ গ্রেপ্তার হন। তারপর দলে দলে খাকসার স্বেচ্ছাসেবক উত্তর প্রদেশে গিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করে দারুণ রাজ-নৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করেন। অবশেষে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতকে জড়িত করানোর প্রতিবাদে অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলে খাকসার আন্দোলন বন্ধ হয়। পাঞ্জাব সরকারও সে সময় খাকসার আন্দোলন দমনে কঠোর মনোভাব নেন। ঐ সময় সারা ভারতে খাকসার স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার। ১৯৪১ খ্রী খাকসার আন্দোলন আর একবার তীব্র আকার

ধারণ করলে ইংরেজ সরকার সারা ভারতে খাকসার সংগঠন বেআইনী ঘোষণা করেন। তারপরেও ভারতের বিভিন্ন স্থানে মাঝে মাঝে খাকসার তৎপরতা দেখা দেয়। কিন্তু ভারতের মুস্লিম সম্প্রদায়ের উপর মুস্লিম লীগের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাকসার আন্দোলন প্রভাব হারায়।

খাজা শাহ মনসুর ঃ সম্রাট আকবরের রাজদরবারের কর্মচারী। স্বীয় দক্ষতায় ১৫৭৫ খ্রী সম্রাটের অর্থ-সচিবের পদ লাভ করেন। আবুল ফজল তাঁর প্রশংসায় বলেছেন—এমন নিখুঁত হিসাবরক্ষক, পরিশ্রমী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি কমই দেখা যায়। রাজদ্রোহের অপরাধে ১৫৮১ খ্রী খাজা শাহ মনসুরের মৃত্যুদণ্ড হয়।

খান্দেশ ঃ তাপ্তী নদীর অন্তর্দেশে অবস্থিত খান্দেশ তুঘলক সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল। ফিরুজ শাহ তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর নিযুক্ত শাসক, মালিক রাজা ফারুকি দিল্লীর কর্তৃত্ব উপেক্ষা ক'রে নিজেকে খান্দেশের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। তিনি সুশাসক ছিলেন, হিন্দু ও মুস্লিম প্রজাদের সমভাবে দেখতেন। ঐ বংশের রাজা দ্বিতীয় আদিল খাঁর শাসনকালে খান্দেশ রাজ্যের সীমানা গণ্ডোয়ানা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। পরবর্তী কালের শাসকরা অনুল্লেখ্য। ১৬০১ খ্রী মোগল সম্রাট আকবর খান্দেশ জয় করেন। বুরহানপুর ছিল খান্দেশ রাজ্যের রাজধানী।

ঔরংজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে মারাঠা সাম্রাজ্যের পেশোয়া প্রথম বাজিরাও দাক্ষিণাত্যের মোগল সুবাদার হুসেন আলির সঙ্গে চুক্তি ক'রে খান্দেশ মারাঠা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন (১৭১৪ খ্রী)।

খারবেল ঃ বর্তমান ওড়িশা ও অন্ধ্র-প্রদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রাচীন-কালে যে কলিঙ্গ রাজ্য ছিল সেখানে মগধ সাম্রাজ্যের পতনের পর, সম্ভবত খ্রী-পূ প্রথম শতাব্দীতে 'মহামেঘবাহন' নামধারী এক স্থানীয় রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। খারবেল ঐ মহামেঘ-বংশের তৃতীয় রাজা। তাঁর অপর নাম বা উপাধি ছিল 'মহাবিজয়'। ভুবনেশ্বরের অদূরবর্তী খণ্ডগিরি পাহাড়ে হাতীগুম্ফা নামক গুহায় খারবেল সম্পর্কিত একটি প্রশস্তিলিপি পাঠে জানা যায় যে, খারবেল ছিলেন জৈন-ধর্মাবলম্বী এবং জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য তিনি ঐ পাহাড়ের গুহায় একটি আশ্রম নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। খারবেল সুপণ্ডিত, প্রজাপালক ও পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি চব্বিশ বছর বয়সে 'মহারাজ' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন এবং প্রথমে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন রাজ্য আক্রমণ করে কৃষ্ণানদীর সমীপবর্তী ঋষিকনগর অধিকার করেন। তারপর বিদর্ভ, অঙ্গদেশ (পূর্ব বিহার), মগধ প্রভৃতি স্থানেও খারবেলের অভিযান প্রেরিত হয়। মগধের নন্দবংশীয় রাজা মহাপদ্ম ও পরবর্তীকালে সম্রাট অশোক যে কলিঙ্গ দেশ আক্রমণ করেছিলেন তার প্রতিশোধ নিতে খারবেল কয়েক-বার মগধ আক্রমণ করেন। কৃষির জন্য সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, নগর ও পথঘাট

নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কাজের দিকেও খারবেলের দৃষ্টি ছিল।

খালসা : আরবি শব্দ 'খালসা' কথাটির অর্থ পবিত্র ও স্বাধীন। দশম ও শেষ শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ শিখ সম্প্রদায়কে সংস্কারমুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নব আদর্শে দীক্ষিত করেন। গুরু গোবিন্দ সিংহের দীক্ষায় দীক্ষিত শিখরা 'খালাসা' নামে অভিহিত হয়।

পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর দক্ষ শাসকের অভাবে শিখরাজ্য দুর্বল ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। রণজিৎ সিংহের বালকপুত্র দিলীপ সিংহ যখন শিখরাজ্যের সিংহাসনে বসেন তখন রানী ঝিন্দনবাঈ হন তাঁর অভিভাবিকা। কিন্তু রাজ্যের শাসন-দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে লালসিংহ, তেজসিংহ প্রমুখ খালসা নেতাদের হাতে চলে যায়। ক্রমে খালসাদের প্রতাপ এত বৃদ্ধি পায় যে, রানী ঝিন্দন তাদের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে খালসাদের শতদ্রু নদী পার হয়ে শিখ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্ররোচনা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁর আশা ছিল যে, ইংরেজের কাছে পরাজিত হয়ে খালসা-দের শক্তি হ্রাস পাবে এবং তিনি তখন তাদের আয়ত্তে আনতে পারবেন। কিন্তু ঐ প্ররোচনার ফলে যে শিখ যুদ্ধ হয় তাতে শুধু খালসা শক্তিই বিপর্যস্ত হয় না, রানী ঝিন্দনও রাজ্য ত্যাগ করে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হন।

খাসিয়া বিদ্রোহ : আসাম ইংরেজ-অধিকারভুক্ত হওয়ার পর ১৮২৯ খ্রী তিরুত সিং-এর নেতৃত্বে খাসি পাহাড়ের জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঐ বছর ৪ এপ্রিল তারিখে ক্রুদ্ধ খাসিয়া জনতার আক্রমণে দুজন বৃটিশ কর্মচারী নিহত হন। তা ছাড়াও ৬০ জন সরকারি কর্মচারী বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারান এবং নাঙ্‌লো বাংলোটি পুড়িয়ে ফেলা হয়। সেইজন্য ঐ অভ্যুত্থান নাঙ্‌লো হত্যাকাণ্ড নামেও অভিহিত। ইংরেজ সরকার কঠোর হাতে খাসিয়া বিদ্রোহ দমন করেন। দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৮৩৩ খ্রী ১৩ জানুয়ারী তিরুত সিংহ সদলবলে আত্মসমর্পণ করেন।

খিজর খাঁ : দিল্লীর সৈয়দবংশীয় সুলতানির প্রতিষ্ঠাতা; শাসনকাল ১৪১৪-২১ খ্রী। তৈমুর লঙ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আগে ভারতে অধিকৃত অঞ্চলের শাসন দায়িত্ব খিজর খাঁর উপর ন্যস্ত করেন। তোগলক বংশের শেষ সুলতান দৌলতখাঁকে উৎখাত করে খিজর খাঁ দিল্লীর মসনদ দখল করেন।

খিলাফৎ আন্দোলন : খলিফ কথাটির অর্থ উত্তরাধিকারী, প্রতিষ্ঠানটির নাম খিলাফৎ। পয়গম্বর মহম্মদের মৃত্যুর পর ৬৩২ খ্রী থেকে ১৯২২ খ্রী পর্যন্ত মোট ৯৮ জন খলিফা মুস্লিম দুনিয়ার প্রধান রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। পয়গম্বরের পয়গম্বরী ছাড়া অন্য সব দায়িত্ব ও কাজের উত্তরাধিকারী ছিলেন খলিফা।

১৫১২ থেকে ১৯২২ খ্রী পর্যন্ত তুরস্কের সম্রাট ছিলেন মুস্লিম দুনিয়ার খলিফা। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের ভাগ্যবিপর্যয়ের পর খলিফার ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয় এবং ভারতের মুস্লিম সমাজকে তা বিশেষ ভাবে বিক্ষুব্ধ করে।

১৯১৯ খ্রী ১১ নভেম্বর বোম্বাই শহরে সেণ্ট্রাল খিলাফৎ কমিটি গঠিত হয়। ভারতীয় মুস্লিম সমাজের অসন্তোষে সহানুভূতি ও তাঁদের প্রতি সমর্থন জানান লোকমান্য টিলক, মালব্য, মতিলাল নেহরু, গান্ধী প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দ। ১৯২০ খ্রী ১০ মার্চ গান্ধিজি খিলাফৎ দাবির সমর্থনে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী প্রকাশ করেন। ঐ বছর ২০শে মে তারিখে সেণ্ট্রাল খিলাফৎ কনফারেন্সেও বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মৌলানা মহম্মদ আলি, সৌকত আলি, আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খাঁ প্রমুখ জননেতারা।

কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে (১৯২০, সেপ্টেম্বর ৮)। সেই অধিবেশনেই খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন একসঙ্গে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে দুটি আন্দোলন বৎসরাধিক কাল একসঙ্গে চলে। কিন্তু ১৯২২ খ্রী নভেম্বর মাসে কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলে খিলাফৎ আন্দোলনের সার্থকতা লোপ পায়। তুরস্কের শেষ সম্রাট ও খলিফা তুরস্ক ত্যাগ করে সুইজারল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। খিলাফৎ আন্দোলনও সেইসঙ্গে শেষ হয়।

খুসরো খাঁঃ প্রথম জীবনে হিন্দু ছিলেন, পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খলজির পুত্র মুবারক শাহের পার্শ্বচর হন। মুবারক শাহ দিল্লীর সুলতান হলে খুসরো খাঁ ষড়যন্ত্র করে মুবারককে হত্যা করেন ও নিজে মসনদে বসেন। খুসরো ক্ষমতাসীন হওয়ার পর নাকি আবার হিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু ধর্মান্ধ মুস্লিম অভিজাতদের অভ্যুত্থানে খুসরোর সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সীমান্ত প্রদেশের শাসক গাজি তোগলকের নেতৃত্বে যে অভ্যুত্থান হয় তাতেই খুসরো খাঁর মাত্র এক বছর স্থায়ী শাসনের অবসান হয়। ১৩২১ খ্রী খুসরো খাঁ মসনদচ্যুত ও বন্দী হন এবং তারপর তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়

খোদা-ই-খিদমৎগারঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফফর খানের নেতৃত্বে গঠিত অহিংস আদর্শে বিশ্বাসী সমাজসেবী মুক্তিসেনা-বাহিনী। বাহিনীর কুর্তার রং লাল ছিল বলে তারা 'লালকুর্তা' নামেও পরিচিত ছিল। ১৯২৯ খ্রী খোদা-ই-খিদমৎগার বাহিনী গঠিত হয় এবং ১৯৩১ খ্রী ঐ বাহিনী কংগ্রেসের অংশরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৩০-৩২ খ্রী লালকুর্তা বাহিনী আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেয় এবং ইংরেজ সরকারের প্রচণ্ড পীড়ন সত্ত্বেও অহিংস আদর্শে অবিচল থাকে। '৪২ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামেও লালকুর্তা বাহিনী যোগ দেয়। খোদা-ই-খিদমৎগার বাহিনীর সঙ্ঘবদ্ধতা, শৃঙ্খলা, আদর্শনিষ্ঠা এবং ত্যাগ ও দুঃখ বরণের কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায় সংযুক্ত করে।

গঙ্গবংশঃ দাক্ষিণাত্যে দুটি গঙ্গ রাজবংশের শাসনের উল্লেখ পাওয়া যায়। দুটি বংশেরই শাসন আট শত বছর স্থায়ী ছিল। তবে প্রাচ্য গঙ্গ রাজ্য পাশ্চাত্য গঙ্গ রাজ্যের তুলনায় কয়েক শতাব্দী প্রাচীন ও বৃহত্তর ছিল বলে প্রাচ্য গঙ্গবংশীয় শাসন অধিক খ্যাত।

প্রাচ্য গঙ্গ : প্রাচ্য গঙ্গবংশীয় শাসনের সূচনা পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দশকে। বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলম অঞ্চলে গঙ্গ রাজবংশের শাসনের সূচনা থেকে গঙ্গাব্দ প্রবর্তিত হয়। প্রাচ্য গঙ্গ রাজ্যের রাজধানী ছিল কলিঙ্গনগর (বর্তমান মুখলিঙ্গম)। প্রথম কয়েক শতাব্দী গঙ্গরাজ্য ক্ষুদ্র ও অনুল্লেখ্য ছিল। তৃতীয় বজ্রহস্ত (শাসনকাল ১০৩৮-৭০ খ্রী) প্রাচ্য গঙ্গরাজ্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য নৃপতি। তাঁর পুত্র রাজরাজ (শাসনকাল ১০৭০-৭৮) চোল সম্রাট রাজেন্দ্রর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ প্রায় সত্তর বছর (১০৭৮-১১৪৭) রাজত্ব করেন। তিনি পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। তাঁর শাসনকালে গঙ্গরাজ্য দক্ষিণ-পশ্চিমে গোদাবরী থেকে উত্তর-পূর্বে ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি সোম বংশীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রায় সমগ্র ওড়িশা গঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের কাজ তিনি শুরু করেন এবং তা শেষ হয় তাঁর প্রপৌত্র তৃতীয় অনঙ্গভীমের শাসনকালে। তৃতীয় অনঙ্গভীমের আটজন বংশধর পুরুষানুক্রমে গঙ্গরাজ্য শাসন করেন। তার মধ্যে তৃতীয় অনঙ্গভীমের পুত্র প্রথম নরসিংহ (শাসনকাল ১২৩৯-৬৪ খ্রী) পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের বহু স্থান জয় করেন। কোণার্কের সূর্যমন্দির গঙ্গরাজ প্রথম নরসিংহের অনন্য কীর্তি। চতুর্থ ভানু প্রাচ্য গঙ্গবংশের শেষ নৃপতি। ১৪৩৫ খ্রী তাঁর মন্ত্রী কপিলেন্দ্র বা কপিলেশ্বর তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে রাজা হন।

পাশ্চাত্য গঙ্গ : পাশ্চাত্য গঙ্গবংশীয় নৃপতিদের রাজ্য গঙ্গাবাড়ি নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান মহীশূর রাজ্যের একাংশ নিয়ে গঠিত ঐ রাজ্যের রাজধানী ছিল কাবেরী নদীর তীরবর্তী তালকত নগর। প্রথমে পাশ্চাত্য গঙ্গ নৃপতিরা পল্লব, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি রাজ্যের সামন্ত ছিলেন। ঐ বংশের প্রথম পরাক্রান্ত নৃপতি শ্রীপুরুষ কাঞ্চীর পল্লব নৃপতি দ্বিতীয় পরমেশ্বর বর্মাকে পরাজিত ও নিহত করেন। ঐ বংশের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নৃপতির নাম দ্বিতীয় শিবমার, প্রথম পৃথ্বীপতি, দ্বিতীয় বুতুগ প্রভৃতি। চোল রাজাদের আক্রমণে ১৩০৪ খ্রী পাশ্চাত্য গঙ্গরাজ্যের অবসান ঘটে। তবে চোল ও হয়সালদের সামন্তরূপে কয়েকটি ছোট গঙ্গরাজ্য আরও কিছুকাল অস্তিত্ব বজায় রাখে।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১৭৪৯-৯৩খ্রী)ঃ বঙ্গদেশের সুবাদার রেজা খাঁর কর্মচারী ছিলেন। রেজা খাঁর সঙ্গেই কর্মচ্যুত হয়ে কলকাতায় আসেন ও ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্ব কাউন্সিলের দেওয়ান হন। বিপুল বিত্তের অধিকারী গঙ্গাগোবিন্দ পাইকপাড়ার প্রসিদ্ধ সিংহ বংশের আদিপুরুষ।

গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা : ১৮৩২ খ্রী মানভূমের ভূমিজদের বিদ্রোহ গঙ্গা-নারায়ণ হাঙ্গামা নামে খ্যাত। বিদ্রোহের নেতা ছিলেন ঐ এলাকার বরাভূম এলাকার বরাভূম জমিদারির অন্যতম দাবিদার গঙ্গানারায়ণ। তিনি স্থানীয় আদিবাসীদের নিয়ে একটি সৈন্য-বাহিনী গঠন করেন এবং অকস্মাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করে বরাভূম দখল করেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী গঙ্গানারায়ণ ও তাঁর অনু-চরদের পরাস্ত করে ঐ এলাকায় ইংরেজ কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। গঙ্গানারায়ণ সিংভূমে পলায়ন করে পুনরায় অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। কিন্তু খরসোয়ানের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে গঙ্গানারায়ণ পরাস্ত ও নিহত হলে মানভূমের হাঙ্গামার অবসান ঘটে।

গদর পার্টি : ১৯১৩ খ্রী আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সংগঠিত দল। 'গদর' কথাটির অর্থ বিপ্লব। অস্ত্রবলে ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানো ঐ দলের লক্ষ্য ছিল। দলের মুখপত্র 'গদর' পত্রিকায় ভারতে ইংরেজ শাসনের নানা অত্যাচার ও অনাচারের কাহিনী জ্বালাময়ী ভাষায় প্রকাশিত হত। ১৯১৪ খ্রী প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ শুরু হলে গদর পার্টির সদস্যরা জার্মানি ও জাপান প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য নানা-ভাবে চেষ্টা করেন। ১৯১৭ খ্রী আমেরিকা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ঐ দুই দেশের ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন হয় এবং গদর আন্দোলনও দুর্বল হয়ে পড়ে।

গণেশ : পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গণেশ উত্তর বঙ্গে ভাতুরিয়া ও দিনাজপুরের প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। সৈফুদ্দিন হামজা শাহ যখন বাঙলার সুলতান সেই সময় (১৪১১) গণেশ বিদ্রোহী হন এবং উত্তর বঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন শুরু করেন। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন, কি বাঙলার সুলতানের প্রতি নামমাত্র অনুগত ছিলেন সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ এক-মত নন। তিনি কিছুকাল রাজত্ব করার পর পুত্র যদু সেনের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। যদু সেন ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন।

গণ্ডোফার্নেস : ইন্দো-পার্থিয়ান রাজাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজত্বকাল ২০-৪১ খ্রী। তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভারতে পার্থিয়ার উপনিবেশগুলি কয়েকটি অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কুষাণ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নৃপতি বিম কদফেসিস ঐ বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলি জয় করে কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

গভর্নর-জেনারেল : ১৭৭৩ খ্রী লর্ড নর্থের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে বৃটিশ পার্লামেন্টে যে রেগুলেটিং এক্ট পাশ হয় তার বিধিমতো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির গভর্নর পদাধিকারবলে সমগ্র ইংরেজ-অধিকৃত ভারতের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন। সেইমতো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির তৎকালীন গভর্নর

ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন। গভর্নর-জেনারেল হন ইংরেজ-অধিকৃত ভারতের সর্বোচ্চ শাসক এবং তাঁকে শাসনকার্যে সহায়তা করার জন্য একটি চার-সদস্য শাসন-পরিষদ গঠিত হয়।

১৮৫৪ খ্রী বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির (বঙ্গ-বিহার-ওড়িশা-আসাম) জন্য একজন স্বতন্ত্র লেঃ গভর্নর নিযুক্ত হন এবং তখন থেকে গভর্নর-জেনারেল শুধু সর্ব-ভারতীয় শাসনব্যবস্থার ভার-প্রাপ্ত হন।

১৮৫৮ খ্রী মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা অনুসারে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে এবং বৃটিশ রাজকীয় সরকার স্বহস্তে ভারতের শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন থেকে বৃটিশ ভারতের প্রধান শাসক হন একাধারে গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয়, অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি। লর্ড ক্যানিং ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয়।

গান্ধার ঃ বিভিন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতের যে ১৬টি মহাজনপদের (রাজ্য) উল্লেখ পাওয়া যায় গান্ধার তার অন্যতম। গান্ধার রাজ্যটি ছিল কাশ্মীরের একাংশ ও পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ নিয়ে গঠিত। গান্ধারের রাজধানী ছিল তক্ষশিলা (পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি জেলায়)।

গান্ধার শিল্প ঃ কুষাণ বংশীয় রাজাদের শাসনকালে প্রচলিত ভারতের বিশিষ্ট শিল্পরীতি, যা পরবর্তীকালে চীন, জাপান ও মধ্য এশিয়ার শিল্প রীতিকেও প্রভাবিত করে। অবশ্য গান্ধার শিল্পও গ্রীক শিল্প প্রভাবিত। সে কারণে গান্ধার শিল্প "গ্রীকো-বুদ্ধিস্ট" বা "ইন্দো-গ্রীক" শিল্প নামেও অভিহিত। গ্রীক শিল্প-রীতিতে বুদ্ধমূর্তি এবং বুদ্ধ জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর চিত্রাঙ্কন গান্ধার শিল্পের মূলকথা। কুষাণ নৃপতিদের মূর্তিও গান্ধার শিল্পরীতিতে নির্মিত হয়।

গান্ধার শিল্প প্রচলিত হওয়ার আগে বুদ্ধদেবের মূর্তি অঙ্কন বা নির্মাণ অপ্রচলিত ছিল। পদচিহ্ন, বোধিদ্রুম, শূন্য আসন, ছত্র ইত্যাদি দিয়ে ভগবান তথাগতের অস্তিত্ব প্রদর্শিত হত। গ্রীক পদ্ধতিতে গান্ধার শিল্পীরা বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করেন বলে মূর্তিগুলিতে গ্রীক দেবতার গঠন ও অঙ্গভঙ্গী সুস্পষ্ট হয়, তার সঙ্গে ভারতীয় শিল্পমনের প্রভাব একটি অপূর্ব মাধুর্যের সৃষ্টি করে। শিল্প নিদর্শনগুলির অধিকাংশ গান্ধার অঞ্চলে পাওয়া যায় ব'লে তা গান্ধার শিল্প নামে অভিহিত হয়।

গান্ধী, কস্তুরবা (১৮৬৯-১৯৪৪) ঃ মহাত্মা গান্ধীর সহধর্মিণী। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সত্যাগ্রহীদের জননীস্বরূপা ছিলেন কস্তুরবা। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে ও ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গান্ধীজির সব আন্দোলনে কস্তুরবা অংশগ্রহণ করেন এবং সে কারণে বার বার কারারুদ্ধ হন। আগস্ট আন্দোলনের সূচনায় গান্ধিজি ও তিনি একই দিনে গ্রেপ্তার হন এবং বন্দী অবস্থাতেই ১৯৪৪ খ্রী ২২ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়। গান্ধিজির চিন্তাধারায় ও আচরণে কস্তুরবার প্রভাব ছিল সীমাহীন।

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ (১৮৬৯-১৯৪৮) **:** ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা, জাতির জনক-রূপে সম্মানিত। মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন ২ অক্টোবর জাতীয় দিবসরূপে পালিত হয়।

ব্যারিস্টাররূপে গান্ধিজির কর্ম-জীবনের সূচনা। প্রথমাবস্থায় বোম্বাই হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন, পরে রাজকোটে চলে আসেন। সেখান থেকে ১৮৯৩ খ্রী এক মামলার দায়িত্ব নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন। সেখানে বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকারের নানা অন্যায় বিধির প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে গান্ধিজির রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। গান্ধিজির উদ্যোগে ১৮৯৪ খ্রী নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৪ খ্রী তিনি সেখানে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন; প্রথমে নাটাল প্রদেশের ডারবান শহরের অদূরে, পরে ট্রান্সভাল প্রদেশের জোহান্সবার্গ শহরের কাছে দুটি সম-সমাজের আদর্শ অনুসারী আশ্রম স্থাপন করেন। ঐ সময়েই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে অহিংস সত্যাগ্রহের সূচনা করেন। দীর্ঘ আট বছর সংগ্রামের পর তিনি আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের হৃত নাগরিক অধিকার-গুলির কিছু কিছু পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিমধ্যে কয়েকবার স্বদেশে প্রত্যা-বর্তন করলেও, দীর্ঘ একুশ বছর বাদে ১৯১৫ খ্রী স্থায়ীভাবে ভারতে ফিরে আসেন।

এদেশের জাতীয় আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গান্ধিজির বরাবরই কিছু যোগাযোগ ছিল; স্বদেশে স্থায়ীভাবে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯১৬ খ্রী কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন। ঐ সময় বিহারের চম্পারণ জেলায় নীলচাষীদের উপর ভয়ংকর অত্যাচার শুরু হওয়ায় তিনি তার প্রতিকারে অগ্রসর হন। ১৯১৭ খ্রী চম্পারণে পৌঁছানোমাত্র গান্ধিজির উপর নিষে-ধাজ্ঞা জারি করা হয়। সে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গান্ধিজি চম্পারণে সত্যা-গ্রহ শুরু করলে ভারতের রাজনীতিতে নবযুগের সূচনা হয়। প্রায় একই সময় আমেদাবাদে শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থনে ও গুজরাতের খেড়া জেলার কৃষকদের অজন্মার পর খাজনা বন্ধ আন্দোলনের সমর্থনে গান্ধিজি অগ্রসর হন। এইভাবে জাতীয় আন্দোলনকে গান্ধিজি উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে মুক্ত করে দেশের শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তারিত করে দেন।

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গান্ধিজির নেতৃত্বে প্রথম জাতীয় আন্দোলন হয় ১৯২১ খ্রী, সে আন্দোলন 'অসহযোগ আন্দোলন' বা 'নন-কো-অপারেশন মুভমেণ্ট' নামে অভিহিত। ভারতের মুস্লিম সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে ঐ সময় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে খিলাফৎ আন্দোলনকেও সমর্থন জানানো হয়। ১৯২২ খ্রী গান্ধিজি গ্রেফতার হন ও বিচারে তাঁর ছয় বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কিন্তু অসুস্থতার জন্য গান্ধিজি ১৯২৪ খ্রী মুক্তি পান। ১৯২৫ খ্রী

কংগ্রেসের বেলগাঁও অধিবেশনে গান্ধিজি সভাপতি হন।

গান্ধিজির নেতৃত্বে দ্বিতীয় জাতীয় আন্দোলন হয় ১৯৩০ খ্রী, যে আন্দোলন 'আইন অমান্য আন্দোলন' বা 'সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট' নামে অভিহিত। গান্ধিজিসহ সারা ভারতের হাজার হাজার সত্যাগ্রহী সে আন্দোলনে যোগ দেন এবং কারাদণ্ডসহ নানা পুলিশি নির্যাতন অকাতরে সহ্য করেন। ইতিমধ্যে ইংরেজ সরকার আপসে উদ্যোগী হলে কারামুক্ত গান্ধিজি গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৯৩১ খ্রী ১৪ সেপ্টেম্বর লণ্ডনে উপস্থিত হন। কিন্তু গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয় এবং গান্ধিজি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে আবার আন্দোলন শুরু করেন। ফলে আবার গান্ধিজি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন ও সারা দেশ জুড়ে সত্যাগ্রহীদের উপর ইংরেজ সরকারের প্রচণ্ড নির্যাতন শুরু হয়।

গান্ধিজি বন্দী থাকাকালে বৃটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়কে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য উদ্যোগী হলে তার প্রতিবাদে জেলের মধ্যেই গান্ধিজি, ১৯৩২ খ্রী ২০ সেপ্টেম্বর আমৃত্যু অনশন শুরু করেন। গান্ধিজির প্রতিবাদে ও ঐ ব্যাপারে তপশিলি সম্প্রদায়ের নেতা ডঃ আম্বেদ্‌করের সঙ্গে গান্ধিজির একটি আপস হয়ে যাওয়ায় (পুণা চুক্তি) বৃটিশ সরকার সেবারের মতো তপশিলি সম্প্রদায়ের জন্য আসন রক্ষার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। ১৯৩৩ খ্রী ৮ মে গান্ধিজি কারামুক্ত হন এবং ১৯৩৪ খ্রী ৭ এপ্রিল আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। ঐ বছর গান্ধিজি কংগ্রেস সদস্য পদও ত্যাগ করেন এবং সম্পূর্ণরূপে সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আইন অমান্য আন্দোলন শুরুর সময় গান্ধিজি শপথ নিয়েছিলেন, দেশ স্বাধীন না হলে আর তিনি সবরমতী আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করবেন না। সে কারণে তিনি তাঁর নতুন কর্মজীবন শুরুর পূর্বে ওয়ার্ধা শহরের অদূরে সেবাগ্রামে নতুন আশ্রম স্থাপন করেন। তখন থেকে সেবাগ্রাম হয় ভারতের রাজনৈতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র। কারণ গান্ধিজি কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করলেও তাঁরই পরামর্শে ও নির্দেশনায় ঐ প্রতিষ্ঠান চালিত হতে থাকে।

গান্ধিজির নেতৃত্বে বৃহত্তম ও সর্বাধিক শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন হয় ১৯৪২ সালে। ঐ বছর গান্ধিজি দাবি করেন, ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য ইংরেজকে অবিলম্বে ভারত ছেড়ে যেতে হবে। গান্ধিজির 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ধ্বনিতে সারা ভারতের সংগ্রামী জনতা জাগ্রত হয় ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তোলে। সে আন্দোলন ''৪২-এর আন্দোলন,' 'আগস্ট আন্দোলন,' 'ভারত ছাড় আন্দোলন,' 'কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট' ইত্যাদি নামে অভিহিত। আন্দোলন শুরুর আগেই গান্ধিজি ও অন্যান্য জাতীয় নেতারা গ্রেপ্তার হন। তাতে ভারতের জাতীয় আন্দোলন আরও ভয়ংকর রূপ নেয়। ১৯৪৪ খ্রী ৬ মে গান্ধিজি মুক্তিলাভ করেন।

তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়

এবং নেতাজির নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম কাহিনী ভারতের জনগণকে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। ভারতের সৈন্যবাহিনী ও পুলিশ দলও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ওদিকে বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনে ভারতকে স্বাধীনতা দানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শ্রমিক দল বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে এবং ক্ষমতাসীন হওয়ার পরেই তারা ভারতকে স্বাধীনতা দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সেইমতো ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরু হয়। সে আলোচনায় গান্ধিজির ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪৭ খ্রী ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে গান্ধিজি দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সে সময় গান্ধিজির কিছু কিছু উক্তি ও আচরণ উগ্র সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিদের মনোমত হয় না। ফলে তাদেরই আক্রমণে ১৯৪৮ খ্রী ৩০ জানুয়ারি গান্ধিজি নিহত হন।

গায়কোয়াড়ঃ পেশোয়া প্রথম বাজিরাওর মৃত্যুর পর (১৭৭০ খ্রী) মারাঠা সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে বিভিন্ন এলাকার মারাঠা প্রধানরা স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। বরদা রাজ্যে গায়কোয়াড়দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গায়কোয়াড়দের আদি নিবাস পুনা। দামাজি গায়কোয়াড় এই স্বতন্ত্র মারাঠা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মারাঠা যৌথরাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ১৮০৫ খ্রী ২১ এপ্রিল আনন্দরাও গায়কোয়াড় ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হন।

মলহাররাও গায়কোয়াড় যখন বরদার গায়কোয়াড় তখন বরদা রাজ্যে অবস্থানকারী বৃটিশ রেসিডেন্ট কর্নেল ফায়রে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার নানা অভিযোগ আনেন। তারপর মলহাররাও ঐ বৃটিশ রেসিডেন্টের খাদ্যে হীরকচূর্ণ মিশিয়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেন (১৮৭৪ খ্রী নভেম্বর), এই অভিযোগ ওঠে। সে কারণে তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক, ১৮৭৫ খ্রী জানুয়ারী, মলহাররাওকে গ্রেপ্তার করেন। তিনজন ইংরেজ ও তিনজন ভারতীয়কে নিয়ে গঠিত এক কমিশনের উপর গায়কোয়াড়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাংলার প্রধান বিচারপতি হন কমিশনের চেয়ারম্যান। কমিশনের তিন ভারতীয় সদস্য—গোয়ালিয়র ও জয়পুরের মহারাজাদ্বয় ও স্যার দিনকররাও অভিমত দেন যে, মলহাররাওর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হয়নি। তাই তিনজন ইংরেজ বিচারক তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করলেও ইংরেজ সরকার মলহাররাওকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ থেকে মুক্তি দেন। কিন্তু শাসনের অযোগ্যতার অভিযোগে মলহাররাওকে পদচ্যুত করা হয়। এই মামলা হীরকচূর্ণ মামলা নামে খ্যাত।

বরদার পরবর্তী গায়কোয়াড় মনোনীত হন ঐ বংশের সঙ্গে দূর-

সম্পর্কিত বালক সয়জী রাও। তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেন ও তাঁর সুশাসনে বরদা ভারতের অন্যতম প্রগতিশীল রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৩৯ খ্রী সয়জী রাওর মৃত্যু হয়। বরদা বর্তমানে গুজরাত রাজ্যের অন্তর্গত।

গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ: বঙ্গদেশের সুলতান (১৩৯০-১৪১০ খ্রী)। প্রায় স্বাধীন শাসকের মতো বঙ্গদেশ শাসন করতেন। তাঁর রাজত্বকালে বাঙলাদেশের সঙ্গে চীনের দূত বিনিময় হয়। তিনি বিশেষ সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। কবি হাফেজের সঙ্গে তাঁর পত্র-বিনিময় হত।

গিয়াসুদ্দিন বলবন: উলুঘ খাঁ গিয়াসুদ্দিন বলবন জাতিতে তুর্কি। প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন, দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস তাঁকে ক্রয় করেন। পরে যোগ্যতাগুণে ইলতুৎমিসের অনুগ্রহভাজন হন। তাঁর কন্যার সঙ্গে ইলতুৎমিসের পুত্র নাসিরুদ্দিনের বিবাহ হয় এবং নাসিরুদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে বসলে গিয়াসুদ্দিন হন তাঁর প্রধান মন্ত্রী। নাসিরুদ্দিনের শাসনকালে (১২৪৬-৬৬ খ্রী) গিয়াসুদ্দিন ছিলেন রাজ্যের প্রকৃত শাসক এবং নাসিরুদ্দিন অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে গিয়াসুদ্দিন হন পরবর্তী সুলতান। গিয়াসুদ্দিনের শাসনকাল ১২৬৬-৮৭ খ্রী।

গিয়াসুদ্দিন যোগ্য শাসক ছিলেন। নাসিরুদ্দিনের প্রধান উজিররূপেই তিনি উপলব্ধি করেন যে, সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দিল্লীর প্রভাবশালী আমির ওমরাহদের দমন করা প্রয়োজন। এইজন্য স্বয়ং সিংহাসনে বসার পর তিনি একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন এবং তারপর আমির ওমরাহদের জায়গির বাজেয়াপ্ত করে ও বহু প্রভাবশালী ব্যক্তিকে হত্যা করে তিনি তাঁদের সম্পূর্ণ দমন করেন।

মিওয়াটি দস্যুদের ও যুদ অঞ্চলের দুর্ধর্ষ উপজাতীয়দের দমনে বলবন বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তিনি শের খাঁ নামে তাঁর এক আত্মীয়কে নিযুক্ত করেন এবং শের খাঁ সে কাজে বেশ কৃতিত্বও দেখান। জাঠদের দমনেও শের খাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। কিন্তু পরে বলবনই শের খাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। তারপর শের খাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব বলবনের দুই পুত্র মোহম্মদ খাঁ ও বুগরা খাঁর উপর ন্যস্ত হয়।

বলবনের শাসনকালে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা তুঘরিল খাঁ বিদ্রোহী হন। দুবার ব্যর্থ হওয়ার পর বলবন সে বিদ্রোহ দমন করেন এবং তুঘরিল প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তখন বলবনের পুত্র বুগরা খাঁ বাঙলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ওদিকে মোঙ্গলদের দমন করতে গিয়ে তাঁর অপর পুত্র মোহম্মদ খাঁ নিহত হন। তার অল্প পরে গিয়াসুদ্দিনের পুত্রশোকে মৃত্যু হয়।

গিয়াসুদ্দিন তোগলক: দিল্লীর তোগলক সুলতান বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রকৃত নাম গাজি মালিক। খলজি বংশের শেষ সুলতান খসরুকে পরাজিত ও হত্যা করে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গাজি মালিক ১৩২০ খ্রী গিয়াসুদ্দিন তোগলক নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে

বসেন। শাসনকাল ১৩২০--২৫ খ্রী; সুশাসক ছিলেন। রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন ও বিচার ব্যবস্থার উন্নতি করেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি শুধুমাত্র হিন্দুদের প্রতি যে কঠোর বিধি-নিষেধগুলি আরোপ করেন গিয়াসুদ্দিন তোগলকের শাসনকালে তা অনেকটা শিথিল হয়। রাজ্যে কৃষির উন্নতির জন্য গিয়াসুদ্দিন সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করেন।

গিয়াসুদ্দিন বঙ্গদেশে বিদ্রোহ দমন করেন। নাসিরুদ্দিনকে বঙ্গদেশের শাসক নিযুক্ত করে গিয়াসুদ্দিন যখন দিল্লীর পথে অগ্রসর হন তখন তাঁকে সংবর্ধনার জন্য তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জুনা খাঁ একটি তোরণ নির্মাণ করেন। কিন্তু গিয়াসুদ্দিন ঐ তোরণের নিচে আসামাত্র তোরণটি ভেঙে পড়ে এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। এটি সম্ভবত ষড়যন্ত্রের ব্যাপার ছিল। গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পর জুনা খাঁ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন এবং তখন তাঁর নাম হয় মহম্মদ বিন তোগলক।

গীতাঃ মহাকবি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাস বিরচিত মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত ১৮টি অধ্যায়। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে আত্মীয় নিধনে পরাঙ্মুখ অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণর উপদেশ রূপে এই গ্রন্থ রচিত। গ্রন্থে মোট শ্লোক-সংখ্যা সাত শত, এ কারণে গীতার অপর নাম 'সপ্তশতী'। গীতা বিশিষ্ট হিন্দু ধর্মশাস্ত্র এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব এর প্রধান প্রতিপাদ্য। মহাভারতের অংশ এই গ্রন্থের রচনাকাল খ্রী-পূ তিন হাজার থেকে এক হাজার অব্দের মধ্যে কোন এক সময়।

গীতা পৃথিবীর প্রায় সব উল্লেখ-যোগ্য ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ। মোগল সম্রাট আকবরের তত্ত্বাবধানে গীতার উর্দু ভাষায় অনুবাদ হয়। তারও আগে আরবি ভাষায় এবং আরবি থেকে ফারসি ভাষায় গীতা অনূদিত হয়। ইংরেজি ভাষায় গীতার অনুবাদ করেন চার্লস উইলকিন্স, এবং ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর পৃষ্ঠপোষকতায় লণ্ডনে ১৭৮৫ খ্রী সে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। জার্মান ভাষায় গীতার প্রথম অনুবাদ করেন এফ লরিঙ্গর ১৮৭৫ খ্রী; ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন ইউজিন বুর্নুফ ১৮২৫ খ্রী। গ্রীক, লাতিন ইত্যাদি ভাষাতেও গীতা অনূদিত হয়েছে। গীতার ভাষ্যগুলিও বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। শঙ্করাচার্য, শ্রীধর স্বামী, মধুসূদন সরস্বতী, মহাত্মা গান্ধী, বাল গঙ্গাধর টিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মনীষিগণ গীতা-ভাষ্য রচনা করেছেন।

গুজরাতঃ ভারতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এই প্রদেশটি তার অন্যতম প্রাচীন অধিবাসী 'গুর্জর' উপজাতীয়দের নামানুসারে গুজরাত নামে পরিচিতি লাভ করে। গুজরাতের বিভিন্ন স্থানে প্রস্তর যুগের ও পরবর্তী কালের সিন্ধু সভ্যতার নানা নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে গুজরাত মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর গ্রীক, ক্ষত্রপ, গুপ্ত, বাকাটক, কলচুরি, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি বিদেশাগত ও এদেশীয় নানা রাজশক্তি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত গুজরাতের বিভিন্ন অংশ জয় ও

সাময়িকভাবে শাসন করে। ১২৯৭ খ্রী দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খলজির শাসনকালে গুজরাতে মুস্লিম অধিকার কায়েম হয়। পরে তৈমুর লং-এর ভারত আক্রমণকালে দিল্লীর সুলতান শাসন ভেঙে পড়লে, সেই অরাজকতার মধ্যে গুজরাতের শাসনকর্তা জাফর খাঁ (১৪০১-১১) স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারপর দেড় শতাব্দীরও কিছু বেশি স্বাধীন থাকার পর গুজরাত আবার মোগল সম্রাট আকবরের শাসনকালে, ১৫৭২ খ্রী, কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে আসে। ১৭৫৯ খ্রী সুরাটে ইংরেজদের কুঠি স্থাপিত হয়। মোগল সাম্রাজ্যের পতনকালে গুজরাতে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয় এবং সেগুলি ইংরেজ সরকারের বশ্যতা স্বীকার করে। ১৮১৮ খ্রী মধ্যে গুজরাতে সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ আধিপত্য কায়েম হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৬০ খ্রী গুজরাত একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে।

গুজরাতের ভাষা গুজরাতি, গুর্জর অপভ্রংশ থেকে ঐ ভাষার সৃষ্টি। আট শতাব্দী আগে গুজরাতি একটি স্বতন্ত্র ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গুজরাত রাজ্যের আয়তন ১,৯৫,৯৮৪ বর্গকিলোমিটার। রাজধানী গান্ধীনগর।

গুপ্ত সাম্রাজ্য: গুপ্ত সাম্রাজ্যের সূচনাকালের ইতিহাস কিছুই প্রায় জানা যায় না। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি ছোট বড় রাজ্য গড়ে ওঠে। সেইসময়, তৃতীয় শতাব্দীর শেষে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুপ্ত মগধের উপর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি মহারাজা উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র ঘটোৎকচও সিংহাসনে বসার পর মহারাজা উপাধি নেন।

ঘটোৎকচের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত প্রকৃত অর্থে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইতিহাসে 'প্রথম চন্দ্রগুপ্ত' নামে অভিহিত। সম্ভবত ৩৩০ খ্রী সিংহাসনারোহণ করেন ও 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবির রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করে তৎকালীন উত্তর বিহারে অবস্থিত লিচ্ছবি রাজ্যকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন করেন। বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান চন্দ্রগুপ্তর শাসনকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত পিতা চন্দ্রগুপ্তর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন। তিনি ৩১০ খ্রীষ্টাব্দের পর সিংহাসনে বসেন ও ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের আগে মারা যান। তাঁর রাজত্বকালে প্রায় সমগ্র ভারত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অথবা প্রভাবাধীন হয়। তিনি শুধু যে দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট ছিলেন তাই নয়, কবিতা, সঙ্গীত ইত্যাদি ললিতকলারও বিশেষ রসগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তর উত্তরাধিকারী হন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবত পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন না। তাঁর যোগ্যতার জন্য তিনি পিতা কর্তৃক উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ৩৮০-৪১২ খ্রী। পিতার বিশাল

সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যকে আরও বিস্তৃত ও সুসংহত করেন। তাঁর রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন এবং তিনি চন্দ্রগুপ্তর শাসনব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তর শ্রেষ্ঠ কীর্তি শক দমন। ভারতে শক শক্তি নিশ্চিহ্ন করে তিনি শকারি উপাধি ধারণ করেন। সুশাসক ও পরাক্রমশালী সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উপাধিও ধারণ করেন এবং তিনিই সম্ভবত সেই উপকথার বিক্রমাদিত্য, যাঁর সভাকবি ছিলেন মহাকবি কালিদাস।

সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র কুমারগুপ্ত। কুমারগুপ্তর রাজত্বকাল ৪১৪-৫৫ খ্রী। তাঁর রাজত্বের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে তাঁর সময়ে গুপ্ত সামাজ্য যে অটুট ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, যাতে মনে হয় রাজ্যজয়ও করেছিলেন।

কুমারগুপ্তর পর সম্রাট হন তাঁর পুত্র স্কন্দগুপ্ত। রাজত্বকাল ৪৫৫-৬৭; তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। পিতা কুমারগুপ্তর রাজত্বকালেই নর্মদা উপত্যকার পুষ্যমিত্র নামক এক উপজাতির আক্রমণে গুপ্ত সামাজ্য বিপন্ন হয়। তখন যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত সেই আক্রমণ সম্পূর্ণ পরাভূত করেন। তারপর হুনদের উপদ্রব শুরু হয়। স্কন্দগুপ্ত হুনদেরও প্রতিহত করেন। স্কন্দগুপ্তর মৃত্যুর পর বহিরাক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বিরোধে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়।

স্কন্দগুপ্তর পর বুধগুপ্ত, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত, ভানুগুপ্ত ইত্যাদি নামের গুপ্তবংশীয় নৃপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের যোগ্যতা তাঁদের ছিল না। ফলে তোরমান, মিহিরকুল প্রমুখ হুন রাজাদের আক্রমণে ও যশোধর্মন প্রমুখ স্থানীয় নৃপতিদের অভ্যুত্থানে গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়।

গুপ্তবংশীয় রাজারা সম্ভবত জাতিতে বৈশ্য, ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁদের ঔদার্যের অভাব ছিল না। গুপ্ত সাম্রাজ্যই প্রকৃতপক্ষে ভারতের শেষ বৃহৎ হিন্দু সাম্রাজ্য। ফা-হিয়েনের বর্ণনানুসারে, গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল সমৃদ্ধ ও সুশাসিত। আর রাজনৈতিক সংহতি ও সুশাসনের ফলে ভারত সে সময় শিক্ষায়, বিজ্ঞানে, শিল্পকলায় ও বাণিজ্যে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। গুপ্ত শাসনকালেই বিষ্ণু, শিব, সূর্য, পার্বতী, কার্তিকেয়, লক্ষ্মী প্রভৃতির পূজা-অর্চনা প্রচলিত হয়। ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয় এবং বৌদ্ধরা পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে। গুপ্ত রাজাদের শাসনকালে যবদ্বীপ, সুমাত্রা, কম্বোজ প্রভৃতি দূর প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপিত হয়। অজন্টার শিল্পকলা গুপ্তযুগের সৃষ্টি।

গুপ্তাব্দঃ অব্দ-দ্র।

গুরু গোবিন্দ সিংহঃ শিখধর্মের দশম ও শেষ গুরু। অনৈক্য ও আত্মকলহে দুর্বল শিখ সম্প্রদায়কে নব মন্ত্রে দীক্ষিত করে তিনি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী

যোদ্ধৃজাতিতে রূপান্তরিত করেন। তাঁর নেতৃত্বে শিখ সম্প্রদায় মোগল সম্রাট ঔরংজেবের বহু অভিযান প্রতিহত করে। শিখদের সঙ্গে মীমাংসার ইচ্ছায় সম্রাট ঔরংজেব তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে গুরু গোবিন্দ সিংহকে দাক্ষিণাত্যে ডেকে পাঠান। সে ডাকে সাড়া দিয়ে গুরু গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে যান। কিন্তু যাত্রাপথেই তিনি মোগল সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ পান। সে কারণে তিনি স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনে উদ্যোগী হন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি এক গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন (১৭০৮ খ্রী)।

গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখদের সুসংহত ও একটি রণনিপুণ জাতিতে রূপান্তরিত করেন। গুরু গোবিন্দ সিংহের অনুপ্রেরণাতেই পরবর্তীকালে শিখ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। গুরু গোবিন্দ সিংহই শিখ ধর্মাবলম্বীদের কতকগুলি বিধিনিষেধের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করে একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর নির্দেশে শিখরা ধূমপান ত্যাগ করেন এবং কেশ, কচ্ছ, কঙ্কন, কৃপাণ ও কঙ্কতিকা এই পঞ্চ 'ক' ধারণ করেন। গুরু গোবিন্দর পিতা ও নবম শিখগুরু তেগবাহাদুরের সময় পর্যন্ত শিখদের হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরেই একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলে মনে করা হত।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৮): প্রখ্যাত আইনজ্ঞ, ব্যবহারজীবী ও শিক্ষাব্রতী। দীর্ঘকাল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। ১৮৯০ খ্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। তিনিই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রথম ভারতীয় ভাইস চ্যান্সেলর। স্বদেশী আন্দোলনকালে (১৯০৫) জাতীয় আদর্শে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা শুরু হয় গুরুদাস ছিলেন তাঁর অন্যতম অগ্রণী উদ্যোক্তা।

গুরুদিৎ সিংহ: প্রখ্যাত "কোমাগাতা মারু" অভিযাত্রী দলের নেতা। শিখ ধর্মাবলম্বী এই দুঃসাহসী অভিযাত্রী প্রথমে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুরে যান। তারপর কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে "কোমাগাতা মারু" নামক একটি জাপানি জাহাজ ভাড়া করে একদল শিখ নিয়ে ১৯১৪ খ্রী কানাডা অভিমুখে যাত্রা করেন ও ভাঙ্কুবার বন্দরে পৌঁছান। কিন্তু ঐ শিখদের বিপ্লবী 'গদর পার্টির' সদস্য মনে করে কানাডা সরকার তাঁদের অবতরণের অনুমতি দেন না। তখন তাঁরা ঐ জাহাজেই ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন।

ভারতে ইংরেজ সরকারও 'কোমাগাতা মারু'র যাত্রীদের গদর পার্টির সদস্য বলে সন্দেহ করেন ও স্থির করেন যে জাহাজটি ভারতীয় বন্দর স্পর্শ করলেই জাহাজের যাত্রীদের ট্রেনে চাপিয়ে সোজা পাঞ্জাবে পৌঁছিয়ে দেবেন। কিন্তু 'কোমাগাতা মারু'র যাত্রীরা বজবজে অবতরণের পর ইংরেজ সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পায়ে হেঁটে কলকাতার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তখন ইংরেজ সরকারের সৈন্যদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয় এবং সে সংঘর্ষে 'কোমাগাতা মারু'র ১৮ জন যাত্রী ও ইংরেজ সরকারের ৬ জন

প্রহরীর মৃত্যু হয়। বহু যাত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু দলনেতা গুরুদিৎ সিংহ ও আরও উনত্রিশ জন সঙ্গী সেই সংঘর্ষের ফাঁকে পলায়ন করেন। পরে অবশ্য গুরুদিৎ সিংহ গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর বিচার হয়। বিচারে তাঁর সঙ্গে গদর পার্টির সংযোগ প্রমাণ হয় না।

গুর্জর ঃ বহিরাগত একটি যাযাবর জাতি, হূনদের সমকালে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে প্রবেশ করে এবং পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও গুজরাতে বসতি স্থাপন করে। তবে গুর্জররা বহিরাগত নয় এবং তারা ভারতের গুর্জর প্রদেশে-রই (গুজরাত) আদিম অধিবাসী—এমন মতবাদও প্রচলিত আছে। ভারতে প্রথম গুর্জর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে ; ঐ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হরিশ্চন্দ্র। চীনা পরিব্রাজক হিউ এন সাং-এর ভ্রমণ লিপিতে ঐ রাজ্যের উল্লেখ আছে। সম্ভবত হরিশ্চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র প্রথম দদ্দ গুজরাতে রাজ্য বিস্তার করেন। রাজা দ্বিতীয় দদ্দ সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমকালীন। ঐ বংশের শেষ রাজা চতুর্থ জয়ভট চালুক্যরাজের সহায়তায় সিন্ধুদেশে আরব অভিযান প্রতিহত করেন। তারপর চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার প্রভৃতির আক্রমণে গুর্জর রাজ্য লোপ পায়। প্রতিহার গুর্জর জাতিরই একটি শাখা, তাদের রাজ্য ছিল অবন্তি এবং রাজধানী উজ্জয়িনী। ঐ বংশের রাজা নাগভট্টও সিন্ধু আক্রমণকারী আরবদের প্রতিহত করে খ্যাতি অর্জন করেন।

গুর্জর প্রতিহার ঃ বহিরাগত গুর্জর ও রাজপুতানার স্থানীয় অধিবাসীদের একাংশের সংমিশ্রণে গুর্জর প্রতিহার জাতির সৃষ্টি বলে মনে করা হয়। পরবর্তীকালে গুর্জর প্রতিহার একটি রাজপুত উপজাতিরূপে পরিচিতি লাভ করে। গুর্জর প্রতিহারদের প্রথম শক্তিশালী রাজ্য অবন্তি। গুর্জর প্রতিহার নৃপতিদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় নাগভট্ট, বৎসরাজ, প্রথম ও দ্বিতীয় ভোজ, মহেন্দ্রপাল, মহীপাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রথম নাগভট্ট আরবদের সিন্ধু অভিযান প্রতিহত করে খ্যাতি অর্জন করেন। দ্বিতীয় নাগভট্টর শাসনকালে গুর্জর প্রতিহার রাজ্য বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রথম ভোজের পরাক্রমে গুর্জর রাজ্য সাম্রাজ্যের রূপ নেয়। উত্তর ভারতে রাজপুত প্রাধান্য বিস্তারে প্রথম ভোজের ভূমিকা অগ্রগণ্য। ভারতে আরব অভিযান প্রতিরোধে গুর্জর প্রতিহার রাজাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হলেও আরব আক্রমণই গুর্জর প্রতিহার রাজ্য দুর্বল ও পরিশেষে লুপ্ত হওয়ার প্রধান কারণ।

গুলবদন বেগম ঃ মোগল সম্রাট বাবরের কন্যা। জন্ম সম্ভবত ১৫২৩ সালে ও মৃত্যু ১৬০৩ সালে। তিনি সম্রাট আকবরের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট আকবর স্বয়ং তাঁর শবাধার বহন করেন এবং পিতৃষসার আত্মার কল্যাণে অর্থ বিতরণ করেন।

সম্রাট আকবরের অনুরোধে গুলবদন বেগম 'হুমায়ুন-নামা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থটি সম্রাট হুমায়ুনের সর্বাধিক প্রামাণ্য জীবনী।

গুলাব সিং : জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রথম নৃপতি মহারাজা গুলাব সিং ছিলেন ডোগরা রাজপুত বংশীয়। তিনি প্রথমে মহারাজা রণজিৎ সিংহের সামরিক বিভাগের কর্মচারী ছিলেন. পরে স্বীয় প্রতিভাবলে মহারাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রণজিৎ সিংহই তাঁকে ১৮২০ খ্রী জম্মুর রাজা নিযুক্ত করেন। তারপর গুলাব সিং অস্ত্রবলে এক কাশ্মীর উপত্যকা বাদে বর্তমান জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রায় সমগ্র অঞ্চল অধিকার করেন। পরিশেষে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে তিনি শিখদের বিরুদ্ধে ইংরেজ পক্ষকে সাহায্য করলে যুদ্ধজয়ের পর ইংরেজ সরকার সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কাশ্মীর উপত্যকাটি গুলাব সিংকে উপঢৌকন দেন। এইভাবে সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীর মহারাজা গুলাব সিং-এর রাজ্যে পরিণত হয়।

গোকলা : পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাওর মন্ত্রী ছিলেন। স্বাধীনচেতা গোকলা মারাঠা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তার হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারে তৎপর হন। তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে গোকলা বীরের মৃত্যু বরণ করেন।

গোকলা : মোগল সম্রাট ঔরংজেবের অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে মথুরা অঞ্চলের জাঠগণ ১৬৬৯ খ্রী বিদ্রোহী হয়। ঐ বিদ্রোহের নেতা ছিলেন গোকলা। জাঠ বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় এবং গোকলা বন্দী হন। তারপর সপরিবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হন।

গোখলে, গোপালকৃষ্ণ (১৮৬৬-১৯১৫) : জাতীয়তাবাদী নেতা। পুণার ফার্গুসন কলেজের অধ্যাপক রূপে কর্মজীবন শুরু করেন। জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হওয়ার সময় থেকেই তার নেতৃস্থানীয় সদস্য ছিলেন। ১৮৯৭খ্রী ওয়েলবি কমিশনে সাক্ষ্যদানের জন্য লণ্ডনে যান। ভারতে ইংরেজ সরকারের ব্যয় কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিত করা যায় তাই ছিল ঐ কমিশনের সমীক্ষার বিষয়। কমিশনের সম্মুখে গোখলের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ ইংলণ্ড ও ভারতের রাজনৈতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯০৫ খ্রী বারাণসীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গোখলে সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৭ খ্রী সুরাট কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে গোখলে নরমপন্থীদের পক্ষ নেন। ১৯০৮ খ্রী দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে যান ও সেখানে ভারতবাসীদের অভাব অভিযোগের কথা ওজস্বিনী ভাষায় প্রচার করেন। তিনি দীর্ঘকাল কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন।

গান্ধিজির রাজনৈতিক চিন্তাধারায় মহামতি গোখলের বিশেষ প্রভাব ছিল।

গোপবন্ধু দাস (১৮৭৭ ১৯২৮) : ওড়িশার ও ভারতের শ্রদ্ধেয় জননেতা। শিক্ষাব্রতীরূপে জীবনের সূচনা, পরে কংগ্রেসে যোগ দেন ও আইন-সভার সদস্য হন। 'সমাজ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। লালা লাজপত রায়ের আহ্বানে 'লোক-সেবক সমাজ'-এর সহ-সভাপতি পদ গ্রহণ করেন। সুলেখকরূপেও গোপবন্ধু খ্যাত। তাঁর সরল অনাড়ম্বর

সত্যনিষ্ঠ জীবন তৎকালীন সমাজের আদর্শ ছিল।

গোপাল : রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশে প্রায় শতাব্দীকাল ঘোর অরাজকতা চলে। প্রবলের অত্যাচারে দুর্বলের জীবন অসহনীয় হয়। সেই দুর্দিনে দেশকে রক্ষার জন্য বাঙলার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গোপাল নামক এক স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী সামন্তকে ৭৫০ খ্রী বঙ্গদেশের রাজপদে অভিষিক্ত করেন। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পথে এই রাজা নির্বাচন বাঙলা তথা ভারতের ইতিহাসে একটি অভিনব ঘটনা।

গোপাল ও তাঁর বংশধরদের শাসন-কালকে পালবংশীয় শাসন বলা হয়। তবে গোপালের শাসনকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবত ৭৭০ খ্রী পর্যন্ত তিনি বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্যে শান্তিস্থাপন করে তাঁর নির্বাচনের সার্থকতা প্রমাণ করেন। গোপাল সম্ভবত জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। তবে আবুল ফজলের গ্রন্থে পাল রাজাদের কায়স্থ বলা হয়েছে। তাঁরা বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। গোপাল নালন্দায় একটি মঠ স্থাপন করেন।

গোপীনাথ বড়দলৈ (১৮৯০-১৯৫০): আসামের প্রথম কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী, এবং জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নেতা। কলকাতা থেকে আইন ও এম. এ. পাশ করার পর কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। পরে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন এবং সে সময় জাতীয় আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯২২ খ্রী এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৪-৩৮ খ্রী গৌহাটি পৌর-সভার প্রধান ছিলেন। ১৮৩৭ খ্রী আসাম বিধান সভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা হন ও সাদুল্লা মন্ত্রিসভার পতনের পর ১৯৩৮-৩৯ খ্রী আসাম প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। পরে কংগ্রেস নেতৃত্বের নির্দেশে পদত্যাগ করেন ও ১৯৪০ খ্রী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর আবার '৪২-এর আন্দোলনে যোগ দেন ও দু বছর বন্দী থাকেন। ১৯৪৬ খ্রী নির্বাচনে আসামে কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে গোপীনাথ বড়দলৈ আবার মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৪৭ খ্রী দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও গোপীনাথ বড়দলৈ আসামের মুখ্যমন্ত্রী হন ও মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে পদে বহাল থাকেন। জনপ্রিয় নেতা গোপীনাথ বড়দলৈ দেশবাসী দ্বারা "লোকপ্রিয়' আখ্যায় সম্মানিত।

গোবিন্দ, তৃতীয় : রাষ্ট্রকূট বংশীয় নৃপতি, ৭৯৩ খ্রী, পিতা রাজা ধ্রুবর সিংহাসন লাভ করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন না, কিন্তু সন্তানদের মধ্যে যোগ্যতম বলে পিতা কর্তৃক উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। তৃতীয় গোবিন্দ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। সমগ্র দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে তিনি উত্তর ভারত জয়ে অগ্রণী হন। তিনি কান্যকুব্জ জয় করেন এবং গুর্জর প্রতিহারবংশীয় রাজা নাগভট্ট ও পালবংশীয় রাজা ধর্মপাল বিনাযুদ্ধে তৃতীয় গোবিন্দর বশ্যতা স্বীকার করেন। মালব, দক্ষিণ কোশল, কলিঙ্গ প্রভৃতি

রাজ্যও তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। সুদূর সিংহলের রাজাও তৃতীয় গোবিন্দর বশ্যতা স্বীকার করেন। ৮১৪ খ্রী সম্রাট তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যু হয়।

গোয়া: ভারতের একটি প্রাচীন সমৃদ্ধ অঞ্চল। রামায়ণ, মহাভারতেও গোয়ার উল্লেখ আছে। পুরাকালে গোয়া গোয়াপুরী, গোমন্তক প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। পর্তুগীজ শাসক আলবুকার্ক ১৫১০ খ্রী ১০ ফেব্রুয়ারি বিজাপুরের আদিলশাহি সুলতানদের কাছ থেকে গোয়া দখল করেন। পর্তুগীজ অধিকারভুক্ত গোয়ার আয়তন ছিল ১৩৯৪ বর্গমাইল। গোয়ার রাজধানী ছিল নোভা গোয়া এবং গোয়ার গভর্নর ছিলেন ভারতের অন্যান্য পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির গভর্নর-জেনারেল।

১৯৬১ খ্রী ২০ ডিসেম্বর ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গোয়াসহ অপর দুই পর্তুগীজ উপনিবেশ দমন ও দিউকে মুক্ত করে।

গোয়া, দমন ও দিউ বর্তমানে একটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল। মোট আয়তন ৩,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার, রাজধানী পানাজি। গোয়া বোম্বাই শহর থেকে ২০০ মাইল দক্ষিণে, ভারতের পশ্চিম তীরে আরব সাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত, দমন বোম্বাই শহরের ১১০ মাইল উত্তরে ক্যাম্বে উপসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। আর দিউ সমুদ্র পথে বোম্বাই থেকে ২৭৫ মাইল দূরে, সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপের দক্ষিণে, মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। সুতরাং তিনটি প্রাক্তন ক্ষুদ্র পর্তুগীজ উপনিবেশের মধ্যে অনেক ব্যবধান। তবু তারা একটি ইউনিটরূপেই থাকতে চায়। গোয়া-দমন-দিউ বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ৩০।

গোল টেবিল বৈঠক: ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের ১৯৩০-৩২ খ্রী মধ্যে লণ্ডনে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে যে তিন দফা আলোচনা হয় তা গোল টেবিল বৈঠক নামে অভিহিত।

প্রথম গোল টেবিল বৈঠক হয় ১৯৩০ খ্রী ১২ নভেম্বর, চলে ১৯৩১ খ্রী ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ ঐ বৈঠক বর্জন করেন। মোট ৮৯ জন প্রতিনিধি বৈঠকে যোগ দেন। তার মধ্যে ১৬ জন ছিলেন ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি, ৫৭ জন কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং অবশিষ্ট ১৬ জন বৃটিশ সরকারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেস বর্জন করায় প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের বিশেষ গুরুত্ব থাকে না।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক বসে ১৯৩১ খ্রী ৭ সেপ্টেম্বর, চলে ঐ বছরের ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ঐ বৈঠকে বৃটিশ সরকার কংগ্রেসকে যোগ দিতে সম্মত করান এবং শুধু মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। গান্ধিজি ভারতের প্রদেশ ও কেন্দ্র-গুলিতে অবিলম্বে দায়িত্বশীল ও প্রতি-নিধিমূলক সরকার গঠনের দাবি জানান। কিন্তু সে দাবি প্রত্যাখ্যাত

হয় এবং কংগ্রেসের সঙ্গে তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আসন বন্টনের প্রশ্নে গুরুতর মতভেদ দেখা দেয়। গান্ধিজি গোল টেবিল বৈঠক থেকে শূন্যহাতে স্বদেশে ফিরে আসেন ও আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন।

তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক শুরু হয় ১৯৩২ খ্রী ১৭ নভেম্বর, শেষ হয় ঐ বছরের ২৪ ডিসেম্বর। কংগ্রেস ছাড়াই ঐ বৈঠক শুরু হয় এবং দেশীয় রাজন্যবর্গও ঐ বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন। মুস্লিম নেতাদের দাবি মতো ঐ বৈঠকে স্বতন্ত্র সিন্ধুপ্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এবং তৎকালীন ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর ঘোষণা করেন যে, ভারতের প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় আইন-সভায় মুস্লিমদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে।

তিনটি গোল টেবিল বৈঠকে আলোচিত বিষয়সমূহ ও সিদ্ধান্তগুলি ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে বৃটিশ সরকার একটি শ্বেতপত্রে প্রকাশ করেন। ভারতে সাংবিধানিক বিবর্তনের ইতিহাসে গোল টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

গৌড়: গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে বঙ্গদেশে বঙ্গ ও গৌড় নামে দুটি রাজ্যের উদ্ভব হয়। বঙ্গ রাজ্যটি গঠিত হয় পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণ বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণাংশ নিয়ে। আর গৌড় রাজ্যটি গঠিত হয় উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ নিয়ে। সম্ভবত ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে শশাঙ্ক নামে এক বাঙালি সামন্তরাজ স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় রাজ্যে অরাজকতা দেখা দেয়। প্রবলের অত্যাচারে দুর্বলের জীবন অসহনীয় হয়ে ওঠে। সেই অবস্থার প্রতিকার করতে, শশাঙ্কর মৃত্যুর শতাব্দীকাল পরে বঙ্গদেশের জনগণ গোপাল নামে এক প্রতিপত্তিশালী সামন্তকে বঙ্গদেশের রাজা নির্বাচিত করেন (আনুমানিক ৭৫০ খ্রী)।

গৌতমীপুত্র সাতকর্নী: সাতবাহন রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি। তিনি অন্তত চব্বিশ বছর (১০৬-১৩০ খ্রী) রাজত্ব করেন। তাঁর সিংহাসনারোহণের আগে শক আক্রমণে সাতবাহন রাজ্য বিশেষ দুর্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু তিনি শকদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। নাসিকে প্রাপ্ত এক শিলালিপিতে গৌতমীপুত্র সাতকর্নীকে 'শক যবন ও পহ্লব দমনকারী, সাতবাহন বংশের গৌরব পুনরুদ্ধারকারী এবং ক্ষত্রিয় গর্বহারী ব্রাহ্মণ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শক শাসক নহপনকে পরাজিত করা তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের প্রতিও যথেষ্ট সহনশীল ছিলেন।

গ্রন্থসাহেব: শিখ ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। পঞ্চম শিখগুরু অর্জুনদেব ঐ গ্রন্থের সঙ্কলক। সঙ্কলন কাল ১৬০৪, মতান্তরে ১৬০১ খ্রী। ঐ গ্রন্থে সঙ্কলিত বিভিন্ন প্রদেশের সন্ত পদাবলীর রনচাকাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ

থেকে সপ্তদশ শতাব্দী। পরবর্তী কালে নবম গুরু তেগ বাহাদুরের কিছু রচনাও গ্রন্থসাহেবের অন্তর্ভুক্ত হয়। গ্রন্থে সঙ্কলিত পদগুলির রচনার কাল ও স্থান এক নয়। সে কারণে এর মধ্যে হিন্দি, পাঞ্জাবী, গুজরাতি এমন কি আরবি ফারসি প্রভৃতি শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। তবে বিভিন্ন আঞ্চলিক হিন্দির ব্যবহারই সর্বাধিক। সাতজন শিখগুরু ছাড়াও বহু হিন্দু মুস্লিম ভক্তের রচনাও গ্রন্থসাহেবে সঙ্কলিত হয়েছে।

গ্রহবর্মা : মৌখরি বংশের রাজা। থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশীয় রাজা প্রভাকর বর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। মালবরাজ দেবগুপ্তর সঙ্গে যুদ্ধে গ্রহবর্মা নিহত হন ও তাঁর রানী রাজ্যশ্রী বন্দী হন। পরে থানেশ্বরের রাজা ও রাজ্যশ্রীর ভ্রাতা হর্ষবর্ধন রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন। গ্রহবর্মার মৃত্যুর পরেই মৌখরি রাজবংশের অবসান হয়। গ্রহবর্মার রাজ্য হর্ষবর্ধনের রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং গ্রহবর্মার রাজ্যের রাজধানী কনৌজে হর্ষবর্ধন তাঁর রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

গ্রিয়ার্সন : প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রিয়ার্সন বৃটিশ রাজকর্মচারীরূপে এদেশে আসেন ১৮৭৩ খ্রী এবং বিশ বছর পরে ১৮৯৩ খ্রী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। লণ্ডনে অধ্যয়নকালেই তিনি ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা করেন। তারপর বাঙলায় ১৮৭৩ থেকে ৮৮ খ্রী পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি পদে বহাল থাকাকালে পূর্বভারতের বাংলা, হিন্দী, মগধি, মৈথিলি প্রভৃতি ভাষাগুলি বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করেন। উত্তরবঙ্গে অবস্থানকালে তিনি গ্রাম্য কবিদের মুখ থেকে সংগ্রহ ও সংকলিত করেন জনপ্রিয় লোককাব্য 'মাণিকচন্দ্রের গান'। তাঁর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সঙ্কলন বিদ্যাপতির পদাবলী। বিহারে বিভিন্ন ভাষা উপভাষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহকালে বিহারের জনজীবনের বিভিন্ন তথ্যও তিনি সংগ্রহ করেন যা পরবর্তীকালে Bihar Peasant Life নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। সরকারি কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে ১৯০৩ খ্রী গ্রিয়ার্সন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর জীবনের অবশিষ্ট আটত্রিশ বছর তাঁর ভারতের ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণাতেই অতিবাহিত হয়। ঐ সময় কুড়ি খণ্ডে প্রকাশিত হয় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি Linguistic Survey of India, যাতে ভারতের ১৭৯ টি ভাষা ও ৫৪৪ টি উপভাষার বিবরণ, তাদের ব্যাকরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং উৎস ও উদ্ভবের ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকে।

ভারতের বিভিন্ন লুপ্ত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে এবং ভারতের ভাষাগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করার কাজে গ্রিয়ার্সনের অবদান তুলনাহীন। গ্রিয়ার্সনই ভারতের প্রথম ভাষা-মানচিত্র রচয়িতা।

গ্রীক অভিযান, ভারতে : গ্রীসের অন্তর্গত ম্যাসিডনের রাজা সম্রাট আলেকজাণ্ডার বিশ্ববিজয়ে বার হয়ে, পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন স্থান জয়ের পর ৩২৬ খ্রী-পূ ভারতে প্রবেশ করেন।

তাঁর আক্রমণের মুখে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি প্রায় বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করে। তারপর আরও কয়েকটি রাজ্যজয়ের পর সম্রাট আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদীর তীরে উপস্থিত হন। কিন্তু রণক্লান্ত গ্রীক সৈন্যরা আর অগ্রসর হতে না চাইলে আলেকজাণ্ডার বিপাসা নদী অতিক্রম না করেই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে উদ্যোগী হন। কিন্তু স্বদেশে পৌঁছানোর আগেই ৩২৩ খ্রী-পূ সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর পশ্চিম এশিয়া ও ভারতের গ্রীক অধিকৃত অঞ্চলগুলি আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। সিরিয়া ও ভারতের অধিকৃত অঞ্চলগুলির আধিপত্য লাভ করেন সেনাপতি সেলিউকস। কিন্তু মৌর্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে যুদ্ধে সেলিউকস কাবুল, কান্দাহার, মাকরাম ও হিরাট প্রদেশের অধিকার ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

সেলিউকসের দুর্বল বংশধরদের শাসনকালে, বিশেষ করে পৌত্র এন্টিওকসের (২য়) রাজত্বকালে ব্যাকট্রিয়া (বহ্লিক) ও পার্থিয়া (পারস্য) মূল রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ঐ অঞ্চলের গ্রীক শাসকরা ব্যাক্‌ট্রিয় বা বহ্লিক গ্রীক নামে পরিচিতি লাভ করেন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের অবনতির যুগে ব্যাকট্রিয় গ্রীকরাজ ডেমেট্রিয়ূস ভারত আক্রমণ করেন এবং আফগানিস্তানের একাংশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের কিছুটা জয় করেন। আবার ডেমেট্রিয়ুস যখন ভারতে রাজ্য জয়ে ব্যস্ত সে সময় পহ্লব নামে এক যাযাবরজাতি ব্যাকট্রিয়া অধিকার করে নেয়। ফলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগহীন ব্যাকট্রিয় নৃপতিরা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় হয়ে যান।

ভারতে ব্যাকট্রিয় গ্রীক নৃপতিদের মধ্যে মিনান্দারের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজত্বকাল ১৬০-৭০ খ্রী-পূ। ঐ রাজ্যের আর এক উল্লেখযোগ্য রাজা এন্টিয়াল কিডাস। তাঁর রাজধানী ছিল তক্ষশিলা। ভারতের শেষ ব্যাক্‌ট্রিয় গ্রীক নৃপতির নাম হারমাকুস। কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কোজোল কদ্‌ফেসিস ৫০খ্রী-পূ নাগাদ ব্যাকট্রিয় গ্রীকরাজ্য কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ভারতে গ্রীক অভিযান ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গ্রীক অভিযানকাল থেকেই প্রকৃতপক্ষে ভারতে ঐতিহাসিক যুগের সূচনা। গ্রীক শিল্পকলার প্রভাবে ভারতের মুদ্রাগুলি মসৃণ ও সুন্দর হয়। ভারতের চারু ও কারুশিল্প প্রভাবিত হয়, গ্রীক স্থাপত্যের প্রভাবে গড়ে ওঠে গান্ধার ভাস্কর্য শিল্প। মেগাস্থিনিস প্রমুখ গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণী প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অতি মূল্যবান দলিল। ভারতের ধর্ম, এমন কি হিন্দুদের মূর্তিপূজাও গ্রীকদের প্রভাবের ফল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

ঘটোৎকচ : গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুপ্তর পুত্র ও পরবর্তী রাজা। খ্রীষ্টীয় ৩০০ অব্দ নাগাদ ঘটোৎকচ রাজা হন ও মহারাজা উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর রাজ্যকালের ইতিহাস প্রায় সম্পূর্ণই

অজ্ঞাত। খ্রীষ্টীয় ৩২০ অব্দে ঘটোৎকচের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন। চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রকৃত সাম্রাজ্যের রূপ ধারণ করে।

ঘসেটিবেগম : বঙ্গদেশের নবাব আলিবর্দি খাঁর কন্যা ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজেস মহম্মদ খাঁর স্ত্রী। নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ ঢাকার শাসনকর্তা ছিলেন। অপুত্রক আলিবর্দি খাঁ তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র সিরাজুদ্দৌলাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করলে ঘসেটিবেগম তা ভাল-ভাবে গ্রহণ করেন না। সিরাজ তা জানতেন, সে কারণে নওয়াজেস মহম্মদ খাঁর মৃত্যু হলে (১৭৫৫ খ্রী) সিরাজ মাতৃস্বসা ঘসেটিবেগমের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বৈরিতা শুরু করেন। ঘসেটিবেগমও সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্রে ইংরেজের সঙ্গে যোগ দেন। এ ব্যাপারে সংযোগ স্থাপন করেন ঘসেটিবেগমের দেওয়ান রাজা রাজ-বল্লভ। নবাব সিরাজ সেই সময় ঘসেটিবেগমকে বন্দী করেন ও তাঁর ধনরত্ন লুঠ করেন (১৭৫৬ খ্রী)।

ঘসেটির শেষ জীবন মর্মান্তিক। মিরজাফর নবাব হওয়ার পর তাঁর পুত্র মিরনের আদেশে ঘসেটিবেগমকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হয় (১৭৬০ খ্রী)।

ঘুরি বংশ : আফগানিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে হিরাট ও গজনি রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে ঘুর নামে এক রাজ্য ছিল। গজনি ও ঘুর রাজ্যের মধ্যে তীব্র বৈরিতা ছিল এবং একে অপরের উপর কর্তৃত্ব কায়েমের জন্য সর্বদা তৎপর থাকতো। সুলতান মামুদের শাসনকালে ঘুর গজনির কর্তৃত্ব স্বীকারে বাধ্য হয়। কিন্তু তার প্রায় দেড় শ' বছর বাদে, ১১৬০ খ্রী, ঘুরের সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন গজনি রাজ্য আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করে ঐ এলাকায় ঘুর রাজ্যের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ১১৭২ খ্রী আলাউদ্দিন হুসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ ঘুরের সুলতান হন। তিনি ১১৭৩খ্রী তাঁর ভাই মুইজুদ্দিন মহম্মদকে গজনির শাসক নিযুক্ত করেন। মুইজুদ্দিন মহম্মদ 'মহম্মদ ঘুরি' নামে পরিচিত ছিলেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে খুবই সৌহার্দ্য ছিল।

জ্যেষ্ঠের নির্দেশে মহম্মদ ঘুরি ১১৭৫ খ্রী ভারত অভিযান শুরু করেন। তার-পর ১২০২ খ্রী মধ্যে তিনি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে একটি বিশাল রাজ্য গড়ে তোলেন। ১২০৩ খ্রী গিয়া-সুদ্দিনের মৃত্যু হলে মহম্মদ ঘুরি এক সঙ্গে গজনি, ঘুর ও ভারতীয় উপনিবেশ-গুলির অধিপতি হন। ১২০৬ খ্রী একটি বিদ্রোহ দমন করে লাহোর থেকে গজনি প্রত্যাবর্তনের পথে সিন্ধু নদীর তীরে মহম্মদ ঘুরি আততায়ীর হাতে নিহত হন।

মহম্মদ ঘুরি ভারতে প্রথম মুস্লিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু তাঁর কোন পুত্র-সন্তান ছিল না বলে তাঁর সেনাপতি ও বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত শাসকগণ নিজ নিজ প্রভাবাধীন এলাকায় স্বাধীন সুলতানরূপে রাজ্য শাসন শুরু করেন। ভারতের উপনিবেশ-গুলির ভারপ্রাপ্ত শাসক কুতবুদ্দিন আইবেক হন দিল্লীর প্রথম সুলতান। সুতরাং ঘুরি বংশের শাসন স্বল্পস্থায়ী হলেও তার প্রভাব হয় সুদূর প্রসারী।

ঘোষা : বৈদিক যুগের বিদুষী নারী।

চণ্ডীগড় : দেশভাগের পর পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে ভারতের অন্তর্গত পূর্ব পাঞ্জাবের (বর্তমান নাম পাঞ্জাব) রাজধানীরূপে চণ্ডীগড়কে গড়ে তোলা হয়। একটি সুন্দর সুপরিকল্পিত শহর, আয়তন ৩৭·৫ বর্গকিলোমিটার (১৫ বর্গমাইল)। বিখ্যাত ফরাসী স্থপতি লে করবুজিয়ে শহরটির নক্সা প্রস্তুত করেন।

১৯৬৬ সালের নভেম্বর পাঞ্জাব বিভক্ত হয়ে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা নামে দুটি রাজ্যের সৃষ্টি হলে চণ্ডীগড় নিয়ে দুই রাজ্যের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। সেই বিরোধের নিষ্পত্তি করতে চণ্ডীগড়কে উভয় রাজ্যের রাজধানী ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল করার সময় চণ্ডীগড়ের সমীপবর্তী কিছু অঞ্চল তার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ফলে চণ্ডীগড়ের আয়তন হয় ১১৪ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ।

চন্দ্রকেতুগড় : পশ্চিমবঙ্গে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক স্থান। এখানে উৎখননের ফলে গুপ্ত যুগের একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রীষ্টিয় তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীর ও তার পরবর্তীকালের অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন এখানে পাওয়া গেছে।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য : মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। রাজত্বকাল ৩২২-২৯৮ খ্রী-পূ। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে মৃত্যুর সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র গ্রীক অধিকৃত উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তারই সুযোগ নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত তক্ষশিলার কূটনীতিবিদ ব্রাহ্মণ চাণক্যের সহায়তায় ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

চন্দ্রগুপ্তের পিতৃপরিচয় বা বাল্যজীবন সম্পর্কে সুনিশ্চিত কিছু জানা যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি নন্দবংশীয় রাজার ঔরসে শূদ্রাণী মুরার গর্ভজাত সন্তান এবং মুরা থেকেই মৌর্য শব্দের সৃষ্টি। কিন্তু এই অনুমান সত্য না হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। বিভিন্ন প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে মোরিয় নামক যে ক্ষত্রিয় জাতির উল্লেখ আছে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সম্ভবত সেই বংশজাত। তবে চন্দ্রগুপ্ত যে মগধের নন্দরাজাদের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোন কারণে নন্দরাজাদের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হওয়ায় তিনি রাজ্য ত্যাগ করে গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের দরবারে যান ও তাঁকে মগধ রাজ্য আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার তাতে সম্মত হন না। সেকারণে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর চাণক্যের সহায়তায় মগধ অধিকার করেন।

মগধ আক্রমণকালে চন্দ্রগুপ্তের প্রধান সহায়ক হন উত্তর ভারতের শক্তিশালী রাজা পর্বতক, যাঁকে অনেক ঐতিহাসিক আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী পুরু বলে মনে করেন। ৩২১ খ্রী-পূ চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে মগধের নন্দরাজবংশ নিশ্চিহ্ন

হয় এবং চন্দ্রগুপ্তের মিত্র পর্বতকও ঐ যুদ্ধে নিহত হন। পরে ৩০৫ খ্রী-পূ গ্রীক নৃপতি সেলিউকসকে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত হেরাত, কান্দাহার, কাবুল ও বালুচিস্তান অধিকার করেন। পরাজয়ের পর সেলিউকস নিজ কন্যার সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তর বিবাহ দিয়ে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময় মেগাস্থিনিস গ্রীক দূতরূপে চন্দ্রগুপ্তর রাজ্যের রাজধানী পাটলীপুত্রে প্রেরিত হন। মেগাস্থিনিস রচিত 'ইন্ডিকা' নামক গ্রন্থে সম্রাট চন্দ্র-গুপ্তর ব্যক্তিগত জীবন ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়।

চন্দ্রগুপ্তর রাজ্য পূর্বে বঙ্গদেশ থেকে পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বত এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি যেমন পরাক্রম-শালী তেমনই দক্ষ শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনকালে রাজ্যে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করত। তাঁর উদ্যোগে রাজ-ধানী পাটলীপুত্র হয়ে ওঠে একটি বিশাল সুন্দর প্রাসাদ নগরী। তখন পাটলী-পুত্রের লোকসংখ্যা ছিল চার লক্ষ। রাজা ছিলেন রাজ্যের প্রধান শাসক, প্রধান সেনাপতি, প্রধান বিচারপতি ও ধর্মীয় প্রধান এবং সব দায়িত্বই সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে পালন করতেন। চন্দ্রগুপ্ত শিকার ভালবাসতেন এবং বিলাস সামগ্রী ও সুন্দর পোষাকও তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। মেগাস্থিনিসের বর্ণনে আছে, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত দরবারে সব সময় সজ্জিত হয়ে আসতেন।

চব্বিশ বছর রাজত্ব করার পর ২৯৭ খ্রী-পূ সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়। জৈন শাস্ত্রে বর্ণিত কাহিনী অনুসারে জৈন ধর্মাবলম্বী চন্দ্রগুপ্ত স্বেচ্ছায় পুত্র বিন্দুসারকে সিংহাসনে বসিয়ে মহীশূরে চলে যান ও উপবাস করে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান।

চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম: গুপ্ত বংশীয় রাজা ঘটোৎকচের পুত্র, ৩২০ খ্রী সিংহাসনে বসেন ও রাজত্বের সূচনা থেকে গুপ্তাব্দ নামক অব্দ প্রচলিত করেন। চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজবংশীয় কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালের মুদ্রায় কুমারদেবীর প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে।

চন্দ্রগুপ্ত ১৫ বছর রাজত্ব করেন এবং তাঁর শাসনকালেই ক্ষুদ্র গুপ্তরাজ্য বিশাল সাম্রাজ্যের রূপ ধারণ করে; আক্রমণ ও বৈবাহিক মৈত্রী বন্ধনের মাধ্যমে চন্দ্রগুপ্তর রাজ্য বিস্তৃত হয়। বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর প্রথম চন্দ্রগুপ্ত মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন। চন্দ্রগুপ্তের প্রচেষ্টায় গুপ্ত সাম্রাজ্য মগধ থেকে সমগ্র বিহার, অযোধ্যা ও এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

৩৩৫ খ্রী প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন।

চন্দ্রগুপ্ত, দ্বিতীয়: গুপ্ত বংশীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের পুত্র ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী চন্দ্রগুপ্ত ইতিহাসে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও বিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত। তাঁর রাজত্বকাল ৩৮০–৪১৪ খ্রী। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগুপ্ত পাঁচ বছর (৩৭৫-৮০ খ্রী) রাজত্ব করেন বলে কোন কোন ঐতি-

হাসিক অনুমান করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল চৌত্রিশ বছর।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের বিদ্রোহ দমন করেন এবং সিন্ধু নদী অতিক্রম করে বহ্লিক উপজাতীয়দের পরাস্ত করেন। তিনি মালোয়া, গুজরাত ও সৌরাষ্ট্রের সত্রপদের পরাজিত করে ঐ স্থানগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। শক দমন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। চন্দ্রগুপ্তর বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে শক নৃপতি তৃতীয় রুদ্রসিংহ নিহত হন। শকদের পরাজয়ের ফলে ভারতে বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটে এবং সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ঐ যুদ্ধ জয়ের পর শকারি উপাধি গ্রহণ করেন। গুপ্ত সম্রাজ্যের সীমা তখন পশ্চিমে আরবসাগর স্পর্শ করে। তিনি রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য বিনিময় শুরু হয়। পিতামহ প্রথম চন্দ্রগুপ্তর মতো বৈবাহিক মৈত্রীর সাহায্যেও সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি নিজে নাগরাজকন্যা কুবের দেবীকে বিবাহ করেন ও তার ফলে ভারতের পূর্ব সীমান্তে গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে। তারপর নিজ কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে বাকাটক নৃপতি দ্বিতীয় রুদ্রসেনার বিবাহ দিয়ে ঐ রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন। বাকাটক নৃপতি শক দমনে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বিশেষ সহায়ক হন।

তাঁর রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন এবং তিনি সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের শাসন ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ফা-হিয়েনের মতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য ছিল সমৃদ্ধ, সুশাসিত ও শান্তিপূর্ণ। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। মহাকবি কালিদাস সম্ভবত তাঁরই সভাকবি ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শিল্প ও সাহিত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

চন্দ্রভারকার, এন জি (১৮৫৫-১৯২৩): উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা। ১৮৯৭ খ্রী থেকে পরপর দুবার বোমবাই আইন-সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯০০ খ্রী লাহোরে জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। পরের বছর বোম্বাই হাই-কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯১৩ খ্রী বিচারপতি পদ থেকে অবসর নেন ও ইন্দোরে দেওয়ান পদ গ্রহণ করেন।

চম্পারন সত্যাগ্রহ: চম্পারন বিহারের উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি জেলা। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঐ জেলায় ব্যাপক ভাবে নীলের চাষ হত এবং নীলকর সাহেবরা বেঙ্গল টেনান্সি এক্ট বলে জমিদারের কাছ থেকে দীর্ঘ মেয়াদে লীজ নেওয়া জমিতে চাষীদের বিঘাপ্রতি অন্তত তিন কাঠা জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করত। ঐ বাধ্যতামূলক নির্দেশকে বলা হত 'তিন কাঠিয়া'। নীল চাষে চাষীদের কোন লাভ না হলেও তারা নীলকর সাহেবের হুকুম মেনে চলতে বাধ্য হত। কারণ জমিদার, জেলা প্রশাসন ও নীলকর সাহেবদের মিলিত

শক্তির বিরুদ্ধে চাষীদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নীলের কৃত্রিম বিকল্প উদ্ভাবিত হওয়ায় নীলচাষ আর লাভজনক থাকে না। তখন আর এক অন্যায় উপায়ে নীলকররা কৃষকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে থাকে। তারা উচ্চহারে খাজনার বিনিময়ে চাষীদের নীল চাষের বাধ্যতা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা বলে আর ঐ অব্যাহতির অজুহাত দেখিয়ে তারা হাজার হাজার কৃষককে বাড়তি খাজনা দেওয়ার শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করে। ঐভাবে জুলুম চালিয়ে নীলকর সাহেবরা অতিরিক্ত ১২ লক্ষ টাকা আদায় করে। এ ছাড়াও করের নাম ক'রে প্রায় পঞ্চাশ রকম বে-আইনী পদ্ধতিতে নীলকর সাহেবরা চাষীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করত। কৃষকের ঘরবাড়ি, কামারশালা, ঢেঁকি, ঘানি প্রভৃতি সব কিছুই নীলকর সাহেবদের করের বিষয় ছিল। এমনকি বিয়ের জন্যও ট্যাক্স দিতে হ'ত। বস্তুতপক্ষে নীলচাষ বন্ধ হওয়ার পর ঐ লুঠতরাজই নীলকর সাহেবদের জীবিকা হয়ে দাঁড়ায়।

সেই সময় ভারতের রাজনীতিতে গান্ধিজির সদ্য আবির্ভাব ঘটেছে। ১৯১৭ সালে গান্ধিজি যখন লখনৌ কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত সে সময় বিহারের কিছু রাজনৈতিক কর্মী ও চম্পারনের কয়েকজন কৃষক প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করে ঐ অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। গান্ধিজি তখনই তাঁদের চম্পারনে যাওয়ার কথা দেন এবং সেইমত ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে তিনি চম্পারন জেলার সদর মতিহারিতে পৌঁছান। কিন্তু গান্ধিজি স্টেশনে অবতরণ করা মাত্র তাঁর উপর তখনই জেলা ত্যাগের নোটিশ জারি করা হয়। গান্ধিজি সে আদেশ অমান্য করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনীতিতে দারুণ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। তারপর আদালতে হাজির করা হলে গান্ধিজি সেখানে এক অবিস্মরণীয় ভাষণ দেন। পরিস্থিতির চাপে সরকার গান্ধিজিকে মুক্তি দিতে ও চম্পারন জেলায় ঘুরে ঘুরে কৃষকদের অভিযোগ শোনার অনুমতি দিতে বাধ্য হন। তারপর গান্ধিজি চম্পারণ জেলার প্রায় বিশ হাজার চাষীর অভিযোগ শোনেন। শেষ পর্যন্ত সরকার নীল চাষীদের অভিযোগের প্রতিকার অন্বেষণ করে জমিদার, নীলকর, সরকার ও কৃষক প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশনে কৃষকদের প্রতিনিধি হন গান্ধিজি স্বয়ং। পরে কমিশন যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাতে কৃষকদের অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করা হয় এবং বর্ধিত কর হ্রাসের ও কৃষকদের কাছে জোর করে আদায় করা টাকার একাংশ ফিরিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। কমিশনের ঐ সুপারিশ মত সরকার যে নতুন আইন করেন তাতে তিন কাটিয়া প্রথা বাতিল করা হয়। ঐ আইন বলবৎ হওয়ার পর নীলকর সাহেবদের কুঠি বেচে চলে যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না।

চম্পারন সত্যাগ্রহে গান্ধিজির সাফল্য তাঁর রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে বিশেষ

সহায়ক হয়। গান্ধিজির নির্ভীক নেতৃত্বে দেশবাসীর আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং সত্যাগ্রহের শক্তি কতখানি দেশবাসী তাও উপলব্ধি করে।

চষ্টন : উজ্জয়িনীকে কেন্দ্র করে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে, সম্ভবত ৭৮ খ্রী যে শকরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রথম রাজা ছিলেন চষ্টন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে চষ্টনের রাজত্বের সূচনা থেকে শকাব্দ প্রচলিত হয়। তিনি সম্ভবত বত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। চষ্টন প্রতিষ্ঠিত শক রাজ্য প্রায় তিন শতাব্দীকাল স্থায়ী ছিল।

চার্টার এক্ট : ১৭৯৩ খ্রী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার শেষ হলে ভারতের তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্ন-ওয়ালিসের চেষ্টায় ঐ বছরের বৃটিশ পার্লামেণ্টে যে চার্টার আইন অনুমোদিত হয় তার শর্তানুসারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আবার বিশ বছরের জন্য ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। তবে বৃটেনের অন্যান্য প্রভাবশালী বণিক সম্প্রদায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করায় ১৭৯৩ খ্রী চার্টার এক্টে বৃটেনের অন্যান্য বণিকদেরও ভারতে বছরে তিন হাজার টন পরিমাণ পণ্য কেনার সুযোগ দেওয়া হয়।

চার্টার এক্ট ১৮১৩ : প্রথম চার্টার এক্টের মেয়াদ বিশ বছর বাদে শেষ হ'লে ১৮১৩ খ্রী বৃটিশ পার্লামেণ্টে যে নতুন চার্টার এক্ট অনুমোদিত হয় তাতে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার নাকচ হয়। শুধু চীনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আরও বিশ বছর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। ১৮১৩ খ্রী চার্টার এক্টের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। ঐ আইনে ভারতীয়-দের বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতির জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য কলকাতায় একজন বিশপ নিয়োগের ব্যবস্থাও ঐ আইনে থাকে। নতুন আইনে ইংরেজরা এদেশে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ লাভ করলে বৃটিশ পণ্যে দেশ ছেয়ে যায়। ফলে দেশের কুটিরশিল্প, বস্ত্রশিল্প, ধাতু-শিল্প ধীরে ধীরে ধ্বংস হতে থাকে আর দেশীয় শিল্পীরা বৃত্তিচ্যুত হয়ে কৃষিতে আত্মনিয়োগ করে। নামমাত্রমূল্যে এদেশের কাঁচামাল বিদেশে চালান যেতে থাকে এবং সেই কাঁচামাল থেকে উৎপন্ন পণ্যই আবার এদেশে বহুমূল্যে বিক্রয় হতে থাকে। এইভাবে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প, ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রভৃতি সব কিছু বিদেশীদের কুক্ষিগত হয়। আর বিদেশীদের ব্যাঙ্ক, সওদা-গরি অফিস প্রভৃতিতে কাজ করার জন্য স্বল্প বেতনের কর্মচারীর প্রয়োজন হওয়ায় দেশে নতুন এক শিক্ষিত মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হতে থাকে।

চার্টার এক্ট ১৮৩৩ : দ্বিতীয় চার্টার এক্টের মেয়াদ বিশ বছর বাদে শেষ হ'লে ১৮৩৩ খ্রী নতুন যে চার্টার এক্ট বৃটিশ পার্লামেণ্টে পাশ হয় তাতে চীনে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার থেকেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বঞ্চিত করা হয়। ঐসময় কোম্পানির হাত থেকে ভারতের শাসনদায়িত্ব কেড়ে নিয়ে

বৃটিশ সরকারের উপর ন্যস্ত করার দাবিও পার্লামেণ্টে ওঠে। সে দাবি গৃহীত হয় না; তবে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিরূপে কোম্পানি ভারতের শাসন দায়িত্ব নির্বাহ করতে থাকে। তাছাড়া কলকাতাস্থ গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিল কিছু কিছু আইন প্রণয়নের অধিকার লাভ করে। কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যাও বাড়িয়ে পাঁচ করা হয়। ১৮৩৩ খ্রী চার্টার এক্টে ইংরেজ বণিকরা ভারতে জমি কেনার অধিকার পায়। ফলে তখনই এদেশে নীলকর সাহেবরা জমি কিনে নীল চাষ শুরু করে আর সেই সঙ্গে শুরু হয় নীল চাষীদের উপর কল্পনাতীত নির্যাতন।

চার্টার এক্ট ১৮৫৫: এই এক্টেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে শেষ সনদ লাভ করে। এই এক্ট অনুসারে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। বেঙ্গল, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির জন্য লেঃ গভর্নর পদের সৃষ্টি হয়। এই চার্টার এক্টের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার অনেক আগে, ১৮৫৭ খ্রী ভারতে সিপাহি বিদ্রোহ হওয়ায় ১৮৫৮ খ্রী মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাবলে ভারতের শাসন দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ সরকারের উপর ন্যস্ত হয়।

চার্নক, জোব: জন্মকাল বা জীবনের প্রথমদিকের ঘটনাবলী সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। মৃত্যু হয় কলকাতায়, ১৬৯৪ খ্রী ১০ জানুয়ারী। ১৬৫৬ খ্রী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরূপে জোব চার্নকের কর্মজীবনের সূচনা। নবাব ইব্রাহিম খাঁর শাসনকালে, মোগল সম্রাট ঔরংজেবের ফরমানবলে জোব চার্নক ১৬৯০ খ্রী ২৪ আগস্ট কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম নিয়ে কলকাতা শহরের পত্তন করেন। কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি এদেশের বহু আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেন এবং এক হিন্দু বিধবাকে সহমরণ থেকে রক্ষা করে বিবাহ করেন।

চালুক্য বংশ: আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে চালুক্য বংশের বিভিন্ন শাখার শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। চালুক্য বংশের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বাতাপি, বেঙ্গী ও কল্যাণ শাখাত্রয় সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। চালুক্য বংশ চালুক্য, চলিক্য, চল্ক্য প্রভৃতি নামেও পরিচিত ছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বর্তমান মহীশূর প্রদেশে বাতাপি বা বাদামিকে কেন্দ্র করে যে চালুক্য বংশীয় শাসন কায়েম ছিল তা বাতাপির চালুক্য বংশ নামে অভিহিত। ঐ বংশের প্রথম রাজা জয়সিংহ বল্লভ। ঐ বংশের তৃতীয় রাজা প্রথম পুলকেশী পরাক্রান্ত নৃপতি (৫৩৫-৬৬) ছিলেন। তাঁর পুত্র কীর্তিবর্মার সঙ্গে দক্ষিণ কোঙ্কনের মৌর্যদের যুদ্ধ হয়। কীর্তিবর্মার পর রাজা হন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মঙ্গলেশ (৫৯৮-৬১০)। তিনি মহারাষ্ট্র পর্যন্ত চালুক্য আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি তাঁর পুত্রকে উত্তরাধীকার মনোনীত করায় কীর্তিবর্মার পুত্র পুলকেশী বিদ্রোহী হন এবং পিতৃব্য মঙ্গলেশকে হত্যা করে পিতৃ সিংহাসন

লাভ করেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্ব-কালে (৬১০-৪২) চালুক্য আধিপত্য উত্তরে গুজরাতের দক্ষিণাঞ্চল, পশ্চিমে কোঙ্কন, পূর্বে কলিঙ্গ এবং দক্ষিণে বেঙ্গী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। আরও দক্ষিণে সমগ্র পল্লব রাজ্যের উপরও দ্বিতীয় পুলকেশীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশীর দিগ্-বিজয় ও ব্যাপক আধিপত্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ৬৪২ খ্রী পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহবর্মা দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং চালুক্য রাজ্যের রাজধানী বাতাপিও জয় করেন। তারপর দীর্ঘদিন পল্লব ও চালুক্যরাজ্যের যুদ্ধ স্থায়ী হয় এবং শেষ পর্যন্ত ৬৫৫ খ্রী দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবদের বিতাড়িত করে আবার বাতাপি উদ্ধার করেন। তারপরেও পল্লব ও চালুক্য রাজাদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ চলতে থাকে। প্রথম বিক্রমাদিত্যের প্রপৌত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য বাতাপির চালুক্য বংশের শেষ পরাক্রান্ত নৃপতি (৭৩৩-৪৫)। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কীর্তিবর্মার রাজত্ব-কালে (৭৪৫-৫৭) চালুক্য রাজ্য রাষ্ট্রকূটবংশীয় নৃপতি দন্তিদুর্গের করতলগত হয়।

বেঙ্গীর চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন বাতাপির চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুবর্ধন। কৃষ্ণা-গোদাবরী মোহানাঞ্চলে ছিল বেঙ্গী রাজ্য। দ্বিতীয় পুলকেশী ঐ রাজ্য জয়ের পর সেখানে বিষ্ণুবর্ধনকে শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই বেঙ্গীর চালুক্য রাজ্য একটি স্বতন্ত্র রাজ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বংশের নৃপতি বিজয়াদিত্য (৭৯৯-৮৪৭) এবং তাঁর পৌত্র তৃতীয় বিজয়াদিত্য পরাক্রমশালী নৃপতিরূপে খ্যাত।

বাতাপির চালুক্য বংশের পরাক্রম-শালী নৃপতি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের বংশের তৈলপ নামক একশাসক দাক্ষি-ণাত্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কল্যাণের চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বংশের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নৃপতিদের মধ্যে আছেন দ্বিতীয় জয়সিংহ (১০১৫-৪৩), প্রথম সোমেশ্বর আহবমল্ল (১০৪৩-৬৮), ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য(১০৭৬-১১২৬)। ঐ বংশের শেষ নৃপতি তৃতীয় তৈলপের (১১৫১-৫৬)রাজত্বকালে কলচুরি বংশীয় রাজা বিজ্জল চালুক্য রাজ্য অধিকার করেন। পরে তৃতীয় তৈলপের পুত্র চতুর্থ সোমেশ্বরের রাজত্বকালে (১১৮১-১২০০) চালুক্য রাজ্যের কিছুটা পুন-রুদ্ধার হয়।

চালুক্য রাজারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু রাজ্য শাসনের ব্যাপারে ছিলেন সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। দ্বিতীয় পুলকেশীর শাসনকালে চীনা পরিব্রাজক হিউ এন সাং চালুক্য রাজ্য পরিদর্শন করেন এবং দ্বিতীয় পুলকেশীর শাসনের উচ্চ প্রশংসা তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে লিপিবদ্ধ আছে। চালুক্য রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দাক্ষিণাত্যে অনেক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মন্দির নির্মিত হয়। অজন্তা ও এলিফান্টার অনেক গুহাচিত্র চালুক্য রাজাদের শাসনকালে অঙ্কিত হয়।

চাঁদবিবি ঃ চাঁদবিবি ছিলেন বিজাপুরের রানী ও আহম্মদনগরের সুলতান হুসেন নিজাম শাহের কন্যা।

বৈধব্যের পর আহম্মদনগরের সুলতান ভ্রাতা বুরহান-উল-মূলকের কাছে এসে বাস করতে থাকেন। মোগল সম্রাট আকবরের সৈন্যবাহিনী যখন ১৫৯৫ খ্রী আহম্মদনগর রাজ্য আক্রমণ করে তখন চাঁদবিবি ছিলেন ঐ রাজ্যের নাবালক সুলতান তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বাহাদুরের অভিভাবিকা। মোগল সৈন্যদের বিরুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব বুঝে চাঁদবিবি আত্ম-সমর্পণ করেন। কিন্তু পরে আহম্মদ-নগরের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা চাঁদ-বিবিকে উপেক্ষা করে মোগল কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। চাঁদবিবি বিরোধিতা করায় বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা করে। চাঁদবিবির মৃত্যুর পর ১৬০০ খ্রী মোগল-বাহিনী আহম্মদনগর দখল করে। কূটনীতি, প্রশাসনিক দক্ষতা, সমর-কুশলতা প্রভৃতি বিভিন্ন রাজদায়িত্বে চাঁদবিবি ছিলেন বিশেষ পারদর্শিনী।

চিত্তলৈচ-চত্তনার: খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী তামিল কবি। তাঁর প্রধান কাব্য 'মণি-মেকলৈ'।

চিতারাম রাজু: অন্ধ্র প্রদেশের প্রখ্যাত বিপ্লবী। ১৯২২ সালে গোদা-বরী ও বিশাখাপত্তনম জেলার জন-গণের বিদ্রোহের নেতা ছিলেন। সে বিদ্রোহ দমন করতে ইংরেজ সরকারের কয়েক বছর সময় লাগে। ১৯২৫ খ্রী আসাম রাইফেল্‌স-এর সঙ্গে সংঘর্ষকালে চিতারাম রাজু নিহত হন।

চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫): বিশিষ্ট জননায়ক, কবি ও দেশের জন্য সর্বত্যাগী এবং সে কারণে দেশবাসীর কাছে 'দেশবন্ধু' নামে সুপরিচিত। ব্যারিস্টাররূপে কর্মজীবনের সূচনা। আইন ব্যবসায়ে বিপুল খ্যাতি ও বিত্তের অধিকারী হন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং সহস্র সহস্র টাকা আয়ের আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন। তখন থেকে শুরু হয় তাঁর কঠোর কৃচ্ছ্রতাময় জীবন। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয়। মুক্তিলাভের পর ১৯২২ খ্রী দেশবন্ধু কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সেখানে তিনি আইন-সভা বর্জনের বদলে আইন-সভায় প্রবেশ করে ভিতর থেকে ইংরেজ শাসনকে অচল করার প্রস্তাব আনেন। গান্ধিজি তখন বন্দী থাকায় গান্ধি-অনুগামিদের পক্ষে সে প্রস্তাবে সমর্থন জানানো সম্ভব হয় না। তখন গয়াতেই দেশ-বন্ধু 'স্বরাজ্যদল' গঠন করেন এবং কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন-সভায় প্রবেশ করে ইংরেজ শাসনকে অচল করার পক্ষে সারা ভারতে প্রবল জনমত গড়ে তোলেন। ঐ সময় দেশ-বন্ধু কংগ্রেস সভাপতি পদও ত্যাগ করেন। তারপর ১৯২৩ খ্রী দিল্লীতে কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয় তাতে স্বরাজ্যদলের নীতিই অনুমোদন লাভ করে। গান্ধিজিও মুক্তিলাভের পর দেশবন্ধুর নীতি সমর্থন করেন। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ্যদল বিপুল সাফল্য লাভ করে। হিন্দু-মুস্লিমে ঐক্যের আশায় স্বরাজ্যদল ১৯২৩ সালে মুস্লিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যে চুক্তি সম্পাদন করে তা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে অভিহিত।

অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনভ্যস্ত

কৃচ্ছ্রতায় দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং ১৯২৫ খ্রী মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত: গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসন-কালে ১৭৯৩ খ্রী, বাংলা-বিহার-ওড়িশার জমিদারদের যে আইনবলে নিজ নিজ জমির উপর নির্দিষ্ট রাজস্বের বিনিময়ে চিরস্থায়ী মালিকানা স্বীকার করা হয় তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement) নামে অভিহিত। তার আগে জমির উপর জমিদারদের মালি-কানা প্রথমে পাঁচ বছরের জন্য, পরে এক বছরের জন্য অর্পণের ব্যবস্থা প্রচ-লিত ছিল এবং রাজস্বের পরিমাণও সুনির্দিষ্ট ছিল না। ফলে রাজস্ব বাবদ সরকারের আয় ছিল অনির্দিষ্ট ও অনিয়মিত এবং তাতে বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন কালে খুবই অসুবিধা দেখা দিত। ঐ অসুবিধা দূর করার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিস ইংলণ্ডের মতো এ-দেশেও জমিদারদের স্থায়ীভাবে জমির বন্দোবস্ত দানের রীতি প্রবর্তন করেন। ১৭৮৯-৯০ খ্রী লর্ড কর্নওয়ালিস প্রথমে জমিদারদের দশ বছরের জন্য জমির বন্দোবস্ত দেন। ঐ ব্যবস্থা 'দশ সালা বন্দোবস্ত' নামে অভিহিত হয়। কিন্তু বৃটিশ সরকার লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিকল্পনা অনু-মোদন করলে 'দশ সালা বন্দোবস্ত'র মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই, ১৭৯৩ খ্রী, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলবৎ হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজ সরকারের রাজস্বের অনিশ্চয়তা দূর হয়। অনুগত জমিদারদের সমর্থনে এদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। জমিদাররাও জমির উপর স্থায়ী মালিকানা লাভ করায় নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামা-ঞ্চলে কিছু কিছু শিক্ষা সংস্কৃতিরও প্রসার ঘটতে থাকে। কিন্তু জমিদার-দের খাজনা আদায়ের জন্য অত্যধিক পীড়ন ক্রমে প্রজাদের পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে। জমিদারদের পীড়ন এত বৃদ্ধি পায় যে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সর-কারকেই রায়তদের স্বার্থরক্ষা করতে প্রজাস্বত্ব আইন বলবৎ করতে হয়। অলস, বিলাসী জমিদার শ্রেণী সমাজের ভারস্বরূপ হয়ে ওঠে। এ সকল কারণে ইংরেজ শাসনকালেই চিরস্থায়ী বন্দো-বস্ত বিলোপের দাবি ওঠে এবং স্বাধীন ভারতে ঐ ব্যবস্থা বাতিল হয়।

চীন-ভারত যুদ্ধ: স্বাধীন ভারত ও কম্যুনিস্ট চীনের মধ্যে প্রথম দিকে সুসম্পর্কই ছিল। কিন্তু তিব্বতের প্রশ্নে দুই দেশের মধ্যে প্রথম সম্পর্কের অবনতি ঘটে। চীন তিব্বতের উপর বরাবর সার্বভৌমত্বের দাবি জানালেও তিব্বত ছিল স্বয়ংশাসিত এবং দলাই-লামা দেশে বিদেশে তিব্বতের সার্বভৌম রাষ্ট্রপ্রধানরূপেই সম্মানিত ও স্বীকৃত হতেন। ইংরেজ সরকারের উত্তরাধিকারীরূপে ভারত তিব্বতের সঙ্গে কতকগুলি বিশেষ সম্পর্ক রক্ষার অধিকারী ছিল। যেমন, তিব্বতের রাজধানী লাসায় রাজনৈতিক এজেন্ট রাখা, গিয়ান্‌ৎসে ও ইয়াতুং এ বাণিজ্য দূতাবাস রাখা, গিয়ান্‌ৎসে পর্যন্ত বাণিজ্য-

পথে ডাক ও তার ব্যবস্থা সংরক্ষণ করা ও সেই সংরক্ষণ কাজে কিছু সৈন্য মোতায়েন রাখা। কিন্তু চীন ভারতের ঐ উত্তরাধিকার স্বীকার করে না এবং ১৯৫০ সালে তিব্বত আক্রমণ ও অধিকার ক'রে চীন ঐ পার্বত্য রাজ্যটিকে চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ঘোষণা করে। দলাই লামা ক্ষমতাসীন থাকলেও চীনের সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে বাধ্য হন। ফলে ইংরেজ শাসনকালে ভারত ও চীনের মধ্যে তিব্বতের যে অধিকারমুক্ত 'বাফার স্টেট'-এর ভূমিকা ছিল তা লোপ পায় এবং ভারতের তিন হাজার কিলোমিটার উত্তরসীমান্তে চীনের সরাসরি উপস্থিতি নতুন সীমান্ত সমস্যার সৃষ্টি করে। ঐ পরিস্থিতিতে ১৯৫৪ খ্রী ২০ এপ্রিল চীন ও ভারতের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা পঞ্চশীল নামে অভিহিত। ঐ চুক্তিতে ভারত তিব্বত সম্পর্কিত সকল বিশেষ অধিকার ত্যাগ করে।

কিন্তু তিব্বতে কম্যুনিস্ট শাসনের বিধি-ব্যবস্থা তিব্বতের ধর্মগুরু ও শাসকপ্রধান দলাই লামার পক্ষে ক্রমে অসহনীয় হয়ে ওঠে এবং ১৯৫৯ সালে তিনি তিব্বত ত্যাগে বাধ্য হন ও লক্ষাধিক অনুগামী নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। দলাই লামা তখন ছিলেন চীনের অন্যতম উপরাষ্ট্রপতি। তাই তাঁর দেশত্যাগ ও ভারতে আশ্রয় গ্রহণ চীনের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বিশেষ আঘাত হানে। চীনের পক্ষ থেকে প্রচার শুরু হয় যে, একদল তিব্বতী দলাই লামাকে জোর ক'রে ভারতে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু দলাই লামা বারবার বলেন যে, ঐ প্রচার অসত্য এবং তিব্বতের উপর কায়েম করা চীনা শাসনব্যবস্থা অসহনীয় হওয়াতেই তিনি দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। এই বাদানুবাদের ফলে চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের বিশেষ অবনতি ঘটে।

ঐ সময় চীনের পক্ষ থেকে এক মানচিত্র প্রকাশ করা হয় যাতে ভারতের উত্তর সীমান্তে হিমালয় অঞ্চলে ১,৩২,০৯০ বর্গকিলোমিটার ভারতীয় জমি চীনের অংশ বলে দেখানো হয়। ভারত প্রতিবাদ জানালে চীন ঐ মানচিত্র সম্পর্কে নানা অজুহাত দেখায়, কিন্তু মানচিত্রে প্রদর্শিত এলাকা যে চীনের নয় একথাও স্পষ্ট ক'রে বলে না। ভারতের উত্তর সীমান্ত নিয়ে চীন নানা অভিযোগ তোলে, ভারত ও তিব্বতের মধ্যে সীমান্ত নির্ধারক ম্যাকমেহন লাইনকেও সে মানতে চায় না। ঐ বাদানুবাদ ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে চীন ১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ভারতের উত্তর সীমান্ত আক্রমণ করে। যুদ্ধ হয় প্রধানত নেফা (বর্তমান অরুণাচল প্রদেশ) সীমান্তে ও কাশ্মীরের লদাক সীমান্তে। নেফা সীমান্তে ভারতের অতি সামান্য প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি চীনের সুপরিকল্পিত ও অতর্কিত আক্রমণে অচিরেই বিপর্যস্ত হয়। বমডিলার পতন হয় ও সমগ্র আসাম অঞ্চল বিপন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু লদাকের চুসুল অঞ্চলে ভারতীয় বাহিনীর প্রচণ্ড প্রতিরোধে চীনা আক্রমণ কার্যত ব্যর্থ হয়। ২১ নভেম্বর

চীন একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে।

চীন-ভারত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য সিংহল, বর্মা কাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া ঘানা ও মিশর—এই ছয়টি দেশের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়, ঐ প্রস্তাব কলম্বো প্রস্তাব নামে অভিহিত। কারণ উল্লেখিত ছয়টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ১৯৬২ সালে ১০ থেকে ১২ ডিসেম্বর। কলম্বোয় মিলিত হয়ে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ভারত ঐ প্রস্তাব গ্রহণে সম্মতি জানায়, কিন্তু চীন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। বর্তমানে চীনের দখলে লদাক অঞ্চলের ৪৬,২৬০ কিলো-মিটার ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ৫, ১৮০ বর্গকিলোমিটার ভারতীয় জমি আছে।

চেতবংশ : মৌর্যসম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর কলিঙ্গর ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট। সম্ভবত খ্রী-পূ প্রথম শতাব্দীতে চেতবংশের শাসনকালে কলিঙ্গ স্বাধীন রাজ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ঐ বংশের শাসনকালের সামান্য ইতিবৃত্ত হস্তিগুম্ফার শিলালিপিতে পাওয়া যায়। চেতবংশীয় তৃতীয় রাজা খারবেল শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তিনি সম্ভবত উত্তর ভারতের কিছু কিছু স্থান জয় করেন এবং দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন বংশীয় রাজা সাতকর্নীকে পরাজিত করেন। তাঁর রাজ্য দক্ষিণে গোদাবরী নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। রাজধানী ছিল কলিঙ্গ নগর। খারবেলের রাজত্বকালের শেষের দিকের ঘটনাবলী বা তাঁর পরবর্তী রাজাদের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

চেদি : খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতে যে ১৬টি মহাজনপদ ছিল চেদি তার অন্যতম। বর্তমান উত্তর প্রদেশের বুন্দেলখণ্ড ও তার সমীপবর্তী অঞ্চল নিয়ে চেদি রাজ্য গঠিত ছিল। চেদির রাজধানী ছিল ভক্তিমতী।

চেমসফোর্ড, লর্ড : লর্ড চেমস-ফোর্ড ১৯১৫-২১ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন। তাঁর শাসনকালে ইংরেজ সরকার এদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনে চরম নির্যাতন শুরু করে। জালিয়ানওয়ালা-বাগ হত্যাকাণ্ড লর্ড চেমসফোর্ডের শাসনকালের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯১৯ খ্রী রাউলাট আইন পাশ করে এদেশের সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা হয়।

১৯১৭ খ্রী বৃটিশ সরকার ঘোষণা করেন যে, ভারতের শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের ক্রমপর্যায়ে অধিক দায়িত্ব-দান ও ভারতের শাসনব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে গণতান্ত্রিক করে তোলাই হবে বৃটিশ সরকারের নীতি। ফলে ভারত-বাসীর আশা হয় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে বৃটিশ সরকার ভারতের শাসন-সংস্কারে উদ্যোগী হবেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত হয়। সে কারণে ভারতের সর্বত্র বিক্ষোভ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে এবং ইংরেজ সরকারও কঠোর হাতে সে আন্দোলন দমন করেন।

১৯১৯ খ্রী বিক্ষুব্ধ ভারতকে শান্ত

করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার এক শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব ঘোষণা করেন। ঐ শাসনসংস্কার আইন রচিত হয় তৎকালীন ভারতসচিব (সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া) মণ্টেগু ও ভাইসরয় চেমসফোর্ডের রিপোর্টের ভিত্তিতে। সে কারণে ১৯১৯ সালের শাসনসংস্কার 'মণ্টেগু-চেমসফোর্ড' বা আরও সংক্ষেপে 'মণ্ট-ফোর্ড' শাসনসংস্কার নামে অভিহিত হয়।

'মণ্ট-ফোর্ড' শাসনসংস্কারে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সেচ, বিচার, স্বায়ত্বশাসন প্রভৃতি দপ্তরগুলি ভারতীয়দের হাতে ন্যস্ত করা হয় এবং কেন্দ্রে ও প্রদেশ-গুলিতে একই নীতি অনুসরণ করা হয়। অর্থ, স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির দায়িত্ব শাসনপরিষদের শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের হাতে থাকে। এইভাবে শাসনব্যবস্থাকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয় বলে ঐ শাসনব্যবস্থাকে 'দ্বৈত শাসন' (Diarchy) বলা হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করা হয়। নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা মনোনীতদের চেয়ে বেশি করা হয়। ভারতীয় সদস্যদের হাতে ন্যস্ত দপ্তরগুলির ব্যয়বরাদ্দের দাবি আইনসভার অনুমোদনসাপেক্ষ হয়। কিন্তু কেন্দ্রে ভাইসরয়ের এবং প্রদেশ-গুলিতে গভর্নরের আইনসভায় গৃহীত যে কোন প্রস্তাব বাতিলের বিশেষ ক্ষমতা থাকে। সুতরাং 'মণ্ট-ফোর্ড' শাসনসংস্কারে কিছু কিছু গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত হলেও প্রকৃত শাসন দায়িত্ব ইংরেজ সরকারের পদস্থ আমলাদেরই উপর ন্যস্ত থাকে। তাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন জাতীয় নেতা 'মণ্ট-ফোর্ড' শাসনসংস্কারকে স্বাগত জানালেও মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ঐ শাসনসংস্কারকে গ্রহণের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেন। মহাত্মা গান্ধী ঐ আইনে স্বাক্ষর না দেওয়ার জন্য লর্ড চেমসফোর্ডকে অনুরোধ জানান। সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারা-ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়।

চের রাজ্য : কেরলের সুপ্রাচীন রাজ্য এবং চের থেকেই কেরল কথাটির উদ্ভব। ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন এবং মালাবারের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত প্রাচীন চের রাজ্যের সূচনাকালের ইতিহাস সামান্যই জানা যায়। অশোকের লেখপত্রে 'কেরলপুত্র' নামে চের রাজ্যের উল্লেখ আছে।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে কেরলে দ্বিতীয় চের রাজ্য আবার উল্লেখযোগ্য অবস্থা উন্নীত হয়। দ্বিতীয় চের রাজ্যে কুলশেখর উপাধিধারী ১৩ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। আলাউদ্দিন খলজির সেনাপতি মালিক কাফুরের আক্রমণে চের রাজ্য স্বাধীনতা হারায়। রবিবর্মণ কুলশেখর চের রাজ্যের শেষ উল্লেখযোগ্য নৃপতি।

চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) : গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক। দোল-পূর্ণিমায় নবদ্বীপে জন্ম। সুপণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, পিতৃদত্ত নাম বিশ্বম্ভর। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,

সংক্ষেপে চৈতন্য, ভক্তদের কাছে চৈতন্যদেব। শৈশবে তিনি নিমাই নামেও পরিচিত ছিলেন, তাই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি প্রচারিত হওয়ার পর তিনি নিমাই পণ্ডিত ও সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিমাই সন্ন্যাসী নামেও অভিহিত হতেন। গৌর বর্ণ ও রূপলাবণ্যের জন্য তাঁর গৌর, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি নামও প্রচলিত। তাঁর অনুগামী শিষ্যরা তাঁকে প্রভু, মহাপ্রভু বলেও ডাকতেন।

১৫১০ খ্রী নিমাই কাটোয়ায় গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং গুরু কেশব ভারতী শিষ্যের নাম দেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব বঙ্গের বিভিন্ন স্থান, ওড়িশা ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন এবং তাঁর বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ঐ সব স্থানে প্রেমের প্লাবন জাগায়। রাজা-মহারাজা থেকে শুরু করে দীন-দরিদ্র মানুষ চৈতন্যদেবের ভক্ত হন। তাঁর ধর্মে জাতিবর্ণের বিচার ছিল না, বহু মুসলমানও চৈতন্যদেবের ভক্তিভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁর শিষ্য হরিদাস ঠাকুরের জন্ম মুসলমান বংশে। হরিদাসের মৃত্যু হলে চৈতন্যদেব স্বয়ং তাঁর সমাধিতে মাটি দেন ও তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

চৈতন্যদেবের চিন্তা ও ভাবধারা বাংলা সাহিত্য ও দর্শনকে নব ভাবে নব প্রাণে উদ্বুদ্ধ করে। তাই চৈতন্য যুগকে বাঙালির স্বতন্ত্র জাগরণের যুগ বলা যায়। সারা ভারতে সেদিন যে-ভাবে ভক্তিবাদী আন্দোলন জাগ্রত হয় ও ভারতের প্রতিটি ধর্মকে প্রভাবিত করে তাতে চৈতন্যদেবের প্রেমলীলার অবদান অমেয়।

চৈৎসিং : বারাণসীর রাজা ছিলেন। অযোধ্যার নবাব আসফুদ্দৌলা ১৭৭৫ খ্রী বারাণসী রাজ্যটি ইংরেজ সরকারকে দান করেন। কিন্তু বারাণসীর রাজা চৈৎসিং নির্ধারিত বাৎসরিক করদানে সম্মত হওয়ায় ইংরেজ সরকার তাঁকে স্বপদে অধিষ্ঠিত রাখেন। কিন্তু মারাঠা ও ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজ সরকারের অনেক টাকা প্রয়োজন হওয়ায় তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭৮ খ্রী রাজা চৈৎসিং-এর কাছ থেকে অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা আদায় করেন। পরে আরও টাকার প্রয়োজন হলে হেস্টিংস আবার চৈৎসিংকে টাকা দিতে বলেন। চৈৎসিং অক্ষমতা প্রকাশ করলে হেস্টিংস তাঁর উপর পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করেন এবং সে টাকা আদায়ের জন্য নিজে সসৈন্যে বারাণসী উপস্থিত হন। তখন চৈৎসিং বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু দীর্ঘ সংগ্রামের পর তিনি পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। তাঁর সিংহাসন মহীপনারায়ণ নামে তাঁর এক আত্মীয়কে দেওয়া হয়। চৈৎসিং-এর মৃত্যু হয় গোয়ালিয়রে, ১৮১০ সালে। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বিচারকালে চৈৎসিং-এর প্রতি তাঁর অন্যায় আচরণের অভিযোগও আনা হয়।

চোল রাজ্য : দাক্ষিণাত্যে চোল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম করিকাল। বর্তমান তামিলনাড়ুর তঞ্জুর ও তিরুচিরাপল্লী অঞ্চলে চোল রাজ্যের কথা কাত্যায়নের বার্তিক (খ্রী-পূ চতুর্থ শতাব্দী) এবং অশোকের শিলালিপিতেও (খ্রী-পূ

তৃতীয় শতাব্দী) পাওয়া যায়। তবে করিকালের রাজত্বকাল থেকে চোল রাজ্যের ঐতিহাসিক সূচনা। করিকাল পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন এবং তিনি সিংহল রাজ্যও আক্রমণ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে চোল রাজ্য পল্লব রাজ্যের অনুগত সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়।

চোল রাজ্য আবার দশম শতাব্দীর সূচনায় পরান্তকের শাসনকালে (৯০৭-৫৩) স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ চোল রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু পরান্তকের হাতে পরাজিত হন। কিন্তু শেষ জীবনে পরান্তক রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হন এবং রাজ্যের একাংশ রাষ্ট্রকূটদের অধিকারে চলে যায়।

প্রথম রাজরাজ (৯৯৫-১০১৬) ও তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোল (১০১২-৪৪) চোল রাজ্যের দুই শ্রেষ্ঠ নৃপতি। রাজরাজের শাসনকালে চোল রাজ্য তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ দিকের সমগ্র ভূখণ্ডে বিস্তার লাভ করে। বেঙ্গী ও কলিঙ্গ রাজ্য চোল প্রভাবিত হয় এবং সিংহল দ্বীপের উত্তরাংশ চোল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

রাজেন্দ্র চোল ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। দক্ষিণে সিংহল থেকে পূর্বে বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশ পর্যন্ত তাঁর অধিকার বিস্তারিত হয়। রাজেন্দ্র চোল পাণ্ড্য ...ের রাজ্য অধিকার ক'রে সেখানে ...ক শাসক ও রাজ-প্রতিনিধি ...। একমাত্র পশ্চিম চালুক্য- ...সিংহের বিরুদ্ধে অভি- ...েল বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেননি। বঙ্গদেশ ও বিহারে পালবংশীয় নৃপতি মহীপালের শাসনকালে, সম্ভবত ১০২১-২৫ খ্রী মধ্যে, রাজেন্দ্র চোলের অভিযান পরিচালিত হয়। একটি লেখমালা অনুসারে রাজেন্দ্র চোলের শাসনকালে ওড়িশা, দক্ষিণ কোশল (বর্তমান মধ্যপ্রদেশ) ও বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশে চোল সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়। তাঁর সৈন্যবাহিনী বহির্ভারতে সমগ্র সিংহল ছাড়াও মানক্কবারম (নিকোবার), বর্তমান ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার বহু স্থান জয় করে। রাজেন্দ্র চোলের নৌবাহিনী ছিল বিশেষ শক্তিশালী।

রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্র পর পর সিংহাসনে বসেন। ঐ সময় চালুক্য রাজ্যের সঙ্গে বারবার সংঘর্ষে চোল রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৩১০ খ্রী সুলতান আলাউদ্দিনের শাসনকালে তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুরের আক্রমণে চোল রাজ্য স্বাধীনতা হারায়।

চোল রাজারা ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং শিব ও বিষ্ণুর উপাসক। সে কারণে চোল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে তাঞ্জোরে বহু শিব ও বিষ্ণুর মন্দির স্থাপিত হয়। চোল রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল জনপ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা। একেবারে পল্লী অঞ্চল থেকে কেন্দ্রের শাসন ব্যবস্থা জনপ্রতিনিধিদের পরামর্শে পরিচালিত হত। সমগ্র রাজ্য বিভক্ত ছিল কয়েকটি প্রদেশে (মণ্ডলম), প্রদেশগুলি বিভক্ত ছিল বিভাগে (কোট্টম) ও

তার পরে জেলায় (নাড়ু)। জেলা ছিল কতকগুলি গ্রামের (কুরুরম) সমষ্টি। জেলা ও শহর (নগরম) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্বায়ত্তশাসিত ছিল। জমি চাষের জন্য রাজসরকারের উদ্যোগে ব্যাপক জল সেচের ব্যবস্থা ছিল। পথ-ঘাটও ভাল ছিল।

চৌরিচৌরা হত্যাকাণ্ড : মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯২১ সালে দেশে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু ১৯২২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামের উত্তেজিত জনতা থানা আক্রমণ করে সেখানে মোট ২১ জন পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করে। ঐ ঘটনার আটদিন পরে বাতাসে হিংসার গন্ধ পেয়ে গান্ধীজি একক সিদ্ধান্তে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর : ১৭৬৭ খ্রী রবার্ট ক্লাইভের অবসর গ্রহণের পর ভেরেলস্ট বাঙলার গভর্নর হয়ে আসেন। তাঁর দু'বছর কার্যকাল শেষ হলে ১৭৬৯ খ্রী কার্টিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হন। কার্টিয়ারের শাসনকালে বাঙলাদেশে যে সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ হয় তা ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে অভিহিত। দ্বৈত শাসনের ফলে ক্লাইভের আমল থেকে বাংলাদেশে কোম্পানির আমলা ও অনুচরদের অবাধ লুণ্ঠন শুরু হয়; প্রজাদের দুর্দশার শেষ থাকে না। সেই অবস্থায় ১৭৭০ খ্রী (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) অনাবৃষ্টি হওয়ায় সেবারের ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। হীনবল নবাবের কিছুই করার ছিল না, আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিষ্ঠুর সহানুভূতিহীন কর্মচারীরা এদেশের দুর্দশাগ্রস্ত জনগণকে রক্ষার জন্য কিছুই করে না। ফলে বাঙলার গ্রামগুলি শ্মশানে পরিণত হয়। পথে-ঘাটে অগণিত নরনারীর মৃতদেহ পড়ে থাকে। না খেয়ে বা অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বাঙলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারায়।

জগৎগ্রাম : উত্তর প্রদেশের দেরাদুন জেলায় অবস্থিত একটি গ্রাম। উৎখননের ফলে এখানে খ্রী-পূ তৃতীয় শতাব্দীর কয়েকটি ইষ্টক-নির্মিত অশ্বমেধ চৈত্য আবিষ্কৃত হয়। ঐ চৈত্যের বহু ইষ্টকখণ্ডে শীলবর্মা নামে এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি চার-বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন।

জন মার্শাল : গভর্নর-জেনারেল লর্ড কার্জনের শাসনকালে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে জন মার্শাল 'আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া'র প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। মার্শালের তত্ত্বাবধানে প্রথমে দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি উত্তর ভারতের ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো হয়। তারপর সারনাথ, রাজগির, সাঁচি, শ্রাবস্তী, কুশীনগর, নালন্দা, ভীটা প্রভৃতি স্থানে খনন কার্য চালিয়ে তিনি বৌদ্ধ সভ্যতার বহু ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেন। মার্শালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ রা
দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও দয়ারা
সহযোগিতায় ১৯২১ সালে
ও হরপ্পা সভ্যতার জীর্ণে
সালে মর্শাল অবসর গ্রহণ

জম্মু ও কাশ্মীর : ভারতের উত্তরে অবস্থিত অন্যতম অঙ্গরাজ্য। মোট আয়তন ২,২২,২৩৬ বর্গকিলোমিটার। বর্তমানে রাজ্যটির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্তান ও চীনের বেআইনী দখলে আছে। সুদূর অতীতকাল থেকে ১৩৩৯ খ্রী পর্যন্ত কাশ্মীর হিন্দু রাজাদের শাসনাধীন ছিল। কহ্লনের 'রাজ তরঙ্গিনী' গ্রন্থে হিন্দু রাজাদের শাসনের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস মেলে। সম্রাট অশোক (২৭২ খ্রী-পূ), কনিষ্ক (১২০ খ্রী), মিহিরকুল (৫২৮ খ্রী), দুর্লভ বর্ধন (৬২৭ খ্রী), ললিতাদিত্য (৭২৫ খ্রী), শ্রীহর্ষ (৬০৬খ্রী) প্রমুখ হিন্দু নৃপতিগণ কাশ্মীরের শাসকরূপে উল্লেখযোগ্য।

১৩৩৯ খ্রী সুলতান সামসুদ্দিন কাশ্মীর জয় করেন ও সেখানে মুস্লিম যুগের সূচনা হয়। পরে কাশ্মীর মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মোগল শাসন দুর্বল হয়ে পড়লে পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের সৈন্য-দল ও ডোগরা সেনাপতি গোলাব সিং কাশ্মীর জয় করেন এবং পরবর্তীকালে গোলাব সিং জম্মু ও কাশ্মীরের স্বাধীন রাজারূপে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। ১৮৪৬ খ্রী জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

১৯৪৭ খ্রী ১৫ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হলে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য প্রথমে কোনটিতে যোগ দেয় না। কিন্তু ঐ অক্টোবর মাসে পাকিস্তান কাশ্মীর ...দ্দেশ্যে হানাদারদের দিয়ে ... করে এবং হানাদাররা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগরের ২৮ কিলোমিটারের মধ্যে এসে পড়ে। ঐ পরিস্থিতিতে জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা ১৯৪৭ খ্রী ২৬ অক্টোবর ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। তখন থেকে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্য রূপে স্বীকৃত।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে মুসলমান, হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ—এই চার সম্প্রদায়ের লোকেরই সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। রাজ্য-টির প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়ে উত্তরে অবস্থিত লাদাখ অঞ্চলে বৌদ্ধরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ। কাশ্মীর উপত্যকায় মুখ্যত মুসলমান সম্প্রদায়ের বাস। দক্ষিণে জম্মু ও শ্রীনগর উপত্যকায় হিন্দুদের প্রাধান্য। ১৯৭১ সালের লোকগণনা অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীররাজ্যে হিন্দুর সংখ্যা ১৪ লক্ষ, মুস্লিম ৩০ লক্ষ ৪০ হাজার, শিখ ১ লক্ষ ৫ হাজার, বৌদ্ধ ৫৮ হাজার। জম্মু ও কাশ্মীর বিধান-মণ্ডলী দ্বিকক্ষ। বিধানসভার সদস্য-সংখ্যা ৭৬, বিধান পরিষদের ৩৬। জম্মু নগরী শীতকালীন রাজধানী।

জয়চাঁদ : কনৌজের রাঠোর রাজ-পুতবংশীয় শেষ নৃপতি। কথিত আছে, দিল্লীর চৌহানবংশীয় রাজপুত নৃপতি পৃথ্বিরাজ তাঁর কন্যা সংযুক্তাকে (সংযোগিতা) তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করায় জয়চাঁদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, সেই কারণে মহম্মদ ঘুরি যখন পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করেন তখন জয়চাঁদ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকেন। ১১৯২ খ্রী তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ বন্দী ও নিহত

হন। ব্যক্তিগত বিদ্বেষের জন্য জাতীয় কর্তব্য পালন না করার ফল জয়চাঁদ অবিলম্বে উপলব্ধি করেন।১১৯৪ খ্রী জয়চাঁদকে একাই মহম্মদ ঘুরির প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় এবং সে যুদ্ধে তিনি পরাজিতও নিহত হন।

জয়পাল : পাঞ্জাবের শাহিবংশীয় হিন্দু নৃপতি,রাজত্বকাল ৯৬৫-১০০২ খ্রী। তাঁর রাজ্য লামঘান থেকে চন্দ্রভাগা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁরই সমকালে তুর্কিবংশীয় অলপত্‌গিন গজনিতে স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। অলপত্‌গিনের জামাতা (প্রথম জীবনে ক্রীতদাস) সুবক্‌ত্‌গিন ৯৭৭ খ্রী গজনির সিংহাসনে বসার পর জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করেন। ৯৮৬-৮৭ খ্রী সুবক্‌তগিন ও জয়পালের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাতে জয়পাল পরাজিত হন এবং বহু খেসারত ও রাজ্যের একাংশ ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে আসেন। কিন্তু রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পর জয়পাল প্রতিশ্রুতি পালনে অস্বীকার করেন। তখন সুবকৃত্‌গিন আবার জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করেন। উত্তর ভারতের কোন কোন নৃপতির সহায়তা সত্বেও জয়পাল যুদ্ধে পরাজিত হন এবং লামঘান ও পেশোয়ারের মধ্যবর্তী স্থানগুলি সুবকৃত্‌গিনকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

সুবকৃত্‌গিনের পুত্র সুলতান মামুদ সিংহাসনে আরোহণের পর ১০০০ খ্রী সর্বপ্রথম জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করেন। জয়পাল পুনরায় পরাজিত এবং পুত্র-পৌত্রসহ বন্দী হন। কিন্তু বিরাট ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জয়পাল মুক্তি পান। তারপর সুলতান মামুদ জয়পালের রাজ্যের রাজধানী ওয়াইহাও আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করেন। সেই পরাজয়ের লাঞ্ছনায় ও অপমানে জয়পাল ১০০২ খ্রী অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন।

জয়পীড় বিনয়াদিত্য : কাশ্মীরের করকোতা বংশীয় নৃপতি, রাজত্বকাল ৭৭৯-৮১০ খ্রী। জয়পীড় ঐ বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ললিতাদিত্যের পৌত্র। তিনি সম্ভবত কনৌজের এক নৃপতিকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করেন এবং নেপাল ও উত্তরবঙ্গে অভিযান চালান। জয়পীড় বিনয়াদিত্য শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্টপোষক ছিলেন।

জয়নগরের গুপ্ত বংশ : খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জয়নগরে এক গুপ্ত বংশীয় রাজ-শাসনের উল্লেখ মেলে। জনয়গর ছিল বিহারের মুঙ্গের জেলার লক্ষ্মীসরাইর নিকটবর্তী বর্তমান জয়পুর অঞ্চল। ঐ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা যজ্ঞেশ্বর গুপ্ত, তিনি জয় নামেও পরিচিত ছিলেন। যজ্ঞেশ্বর গুপ্তের পর সিংহাসন লাভ করেন দামোদর গুপ্ত, যিনি চামুণ্ডরাজ নামেও পরিচিত ছিলেন। তারপর রাজা হন তাঁর পুত্র দেবগুপ্ত। ঐ রাজবংশ সম্ভবত পালরাজাদের সামন্ত ছিলেন। কারণ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মুঙ্গের ছিল পাল রাজ্যের অংশ। দেবগুপ্তর পর রাজা হন তাঁর পুত্র রাজাদিত্য গুপ্ত এব[illegible] তিনি মহারাজাধিরাজ মহা[illegible] উপাধি গ্রহণ করেন। তা[illegible] সে সময় পাল রাজাদের [illegible]

পাওয়ায় রাজাদিত্যগুপ্ত স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন শুরু করেন।

সম্ভবত মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজির আক্রমণে জয়নগরের গুপ্তরাজ্য স্বাধীনতা হারায়।

জয়াকর এম. আর. (১৮৭৩-১৯৬১): বিশিষ্ট আইনবিদ ও উদারপন্থী রাজনৈতিক নেতা। কেন্দ্রীয় আইন সভায় ১৯২৫-৩০ খ্রী স্বরাজ্যদলের নেতা ছিলেন। গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন। ভারতের বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনকালে ডঃ জয়াকর ও স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু ইংরেজ সরকারের সঙ্গে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সম্মানজনক মীমাংসায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। ডঃ জয়াকর এক সময় ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি ছিলেন।

জাঠ: বর্তমান উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা ও দিল্লী অঞ্চলের অধিবাসী জাঠদের একদা শক্তিশালী যোদ্ধ সম্প্রদায়রূপে খ্যাতি ছিল। জাঠরা ঔরংজেবের শাসনকালে, ১৬৬৯ খ্রী, মথুরা অঞ্চলে বিদ্রোহী হয়, ঐ বিদ্রোহের নেতা ছিলেন গোকলা জাঠ। ঔরংজেব ঐ বিদ্রোহ দমন করেন এবং গোকলাকে সপরিবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন। ১৬৮৮ খ্রী জাঠরা আবার রাজারামের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়। কিন্তু সে বিদ্রোহও ব্যর্থ হয়। তার বিশ বছর পরে জাঠরা আবার ভজু নামক এক নেতার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয় এবং সম্রাট ঔরংজেবের শাসনকালের শেষ দুই বছরে (১৭০৫-০৭) নানাভাবে অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে। তখন আপস হিসাবে ভজুর পুত্র চূড়ামনকে মোগল প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করানো হয়। কিন্তু মোগল বাদশাহ মহম্মদ শাহের শাসনকালে চূড়ামনের সঙ্গে মোগলদের বিরোধ শুরু হয়। তিনি তখন ঠান নামক স্থানে জাঠশক্তি সংহত করতে থাকেন। ১৭১৬ খ্রী তাঁকে দমনের জন্য মোগল সম্রাট জয়সিংহকে পাঠান। জয়সিংহ অবিলম্বে ঠান অবরোধ করেন। কিন্তু দিল্লীর প্রভাবশালী ব্যক্তিরা মুহম্মদ শাহকে জাঠদের সঙ্গে আপস করার পরামর্শ দেন। মুহম্মদ শাহ সেই মতো আপস করলে দিল্লীর অনতিদূরে জাঠরা একটি বৃহৎ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীকালে জাঠ আন্দোলনের নেতা ছিলেন সুরজমল।

জালালুদ্দিন খলজি: দিল্লীর খলজি বংশীয় সুলতানশাহির প্রতিষ্ঠাতা। শাসনকাল ১২৯০-৯৬ খ্রী। দাসবংশীয় শেষ সুলতান কাইকোবাদ ও তাঁর উচ্চাভিলাষী উজির নিজামুদ্দিনের শাসনকালে সাম্রাজ্যে যখন চরম অরাজকতা দেখা দেয় সে সময় জালালুদ্দিন ছিলেন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা। সেই অরাজক অবস্থার অবসান কল্পে জালালুদ্দিন বিদ্রোহী হন এবং দিল্লীর মসনদ অধিকার করেন। এই অভ্যুত্থানের ফলে দাসবংশীয় শাসনের অবসান ও খলজি বংশীয় শাসনের সূচনা হয়।

জালালুদ্দিন যখন দিল্লীর মসনদে বসেন তখনই তাঁর সত্তর বছর বয়স। তার উপর ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, স্নেহপ্রবণ ও নরম প্রকৃতির লোক। এ কারণে তিনি ক্ষমতাসীন হওয়ার অল্প পরেই

আবার রাজ্যে বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের সূচনা হয়।

প্রথমে ১২৯১ খ্রী দাসবংশীয় সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের এক ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক ছজ্জু, পূর্বনাম কিসলু খাঁ, সিংহাসন দখলের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী হন। কিন্তু জালালুদ্দিন সে বিদ্রোহ দমন করেন এবং মালিক ছজ্জু জালালুদ্দিনের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিলে তিনি তাঁকে ক্ষমা করেন ও একটি জায়গির দান করেন। কিন্তু মালিক ছজ্জু পরে আবার বিদ্রোহী হন এবং অযোধ্যার শাসক সে বিদ্রোহে ছজ্জুর পক্ষাবলম্বন করেন। কিন্তু সুলতানের পুত্র আরকলি খাঁ সে বিদ্রোহও দমন করেন। জালালুদ্দিন এবারও ছজ্জুকে ক্ষমা করেন এবং আমির ওমরাহদের সতর্কতা সত্ত্বেও বলেন যে, মুসলমান হয়ে তিনি মুসলমানকে হত্যা করতে পারবেন না। সুলতানের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাজ্যের দস্যু-তস্কররাও তৎপর হয়ে ওঠে। সুলতান তাদেরও সদুপদেশ দিয়ে ছেড়ে দিতেন। তবু সে সময় সিদ্ধি মৌলা নামক এক ফকির দরবেশকে হত্যার আদেশ দিয়ে জালালুদ্দিন বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের বিরাগভাজনও হন।

সুলতান জালালুদ্দিনের পররাষ্ট্রনীতি স্বরাষ্ট্রনীতির মতোই দুর্বল ছিল। তিনি একবার রণথম্বোর জয়ের জন্য সৈন্য পাঠান। কিন্তু জয় সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই সৈন্য প্রত্যাহার করে নেন এই বলে যে, একটি মুসলমানের জীবনের চেয়ে রণথম্বোর দুর্গ বেশি মূল্যবান নয়। তবে মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিরোধে জালালুদ্দিন বিশেষ কৃতিত্ব দেখান।

জালালুদ্দিন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিনকে খুব বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর যোগ্যতার জন্যই তাঁকে কারা ও অযোধ্যার শাসক নিযুক্ত করেন। আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য অভিযানে সাফল্যের সংবাদ পেয়ে সুলতান নিজে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে কারা যান। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী আলাউদ্দিন সেইখানেই তাঁর স্নেহান্ধ পিতৃব্য ও শ্বশুরকে হত্যা করে দিল্লীর মসনদ দখল করেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড: অমৃতসর শহরের পূর্বদিকে অবস্থিত এই উদ্যানটিতে, ১৯১৯ খ্রী ১৩ এপ্রিল, জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে ইংরেজ সরকারের এক সৈন্যদল একটি সভায় সমবেত কয়েক হাজার নিরস্ত্র ও সম্পূর্ণ শান্ত জনতার উপর বেপরোয়া ভাবে গুলী বর্ষণ করে। পূর্বদিনের ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ঐ সভা ডাকা হয়েছিল—এই অভিযোগে ইংরেজ সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঐ হত্যাকাণ্ড চালায়।

কোনভাবে সতর্ক না করে অথবা জনতাকে ছত্রভঙ্গ হওয়ার সুযোগ না দিয়ে সৈন্যদল একটানা দশ মিনিট গুলী চালায়। ফলে, সরকারি হিসাবে, ঘটনাস্থলেই ৩৭৯ জন নিহত ও ১২০০ জন আহত হয়। বে-সরকারি হিসাবে নিহতের সংখ্যা সহস্রাধিক।

জালিয়ানয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সংবাদে সারা ভারত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঐ হত্যাকাণ্ডের

প্রতিবাদে বৃটিশ সরকারের দেওয়া 'নাইট' খেতাব ত্যাগ করেন।

জাহাঙ্গির : মোগল সম্রাট আকবরের পুত্র জাহাঙ্গির ১৫৬৯ খ্রী ফতেপুর সিক্রিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬০৫ খ্রী যখন সম্রাট আকবরের মৃত্যু হয় তখন তিনিই ছিলেন পিতার একমাত্র জীবিত পুত্র। সে কারণে পিতার বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও আকবর তাঁকে ক্ষমা করেন এবং জীবদ্দশাতেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

জাহাঙ্গির ছিলেন সুপণ্ডিত। তিনি আরবি, ফার্সি, তুর্কি ও হিন্দি ভাষা জানতেন। ইতিহাস, ভূগোল, উদ্ভিদ-বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। সঙ্গীত, চিত্র-কলা প্রভৃতিরও তিনি উৎসাহী গুণ-গ্রাহী ছিলেন।

তাঁর শাসনকালে বাংলাদেশে মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, মেবারের রানা অমরসিং মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন (১৬১৫) এবং কাংড়া দুর্গ অধিকৃত হয় (১৬২০)। জাহাঙ্গিরের পুত্র খসরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন এবং সে বিদ্রোহে খসরু পঞ্চম শিখগুরু অর্জুনের সাহায্য লাভ করেন। খসরুর বিদ্রোহ জাহাঙ্গির দমন করেন এবং জাহাঙ্গিরের অপর পুত্র ও উত্তরাধিকারী শাহজাহান (খুরম) ১৬২২ খ্রী, দাক্ষি-ণাত্যে বারহামপুর নামক স্থানে খসরুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। খসরুকে সাহায্য করার অভিযোগে শিখগুরু [illegible]নও জাহাঙ্গিরের আদেশে প্রাণ-[illegible]িত হন।

জাহাঙ্গিরের উপর তাঁর মহিষী নুরজাহানের বিশেষ প্রভাব ছিল। নুরজাহানও জাহাঙ্গিরের অপর মহিষী-জাত পুত্র খুরমের (শাহজাহান) প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন না। সে কারণে কান্দাহার জয়ের জন্য জাহাঙ্গির খুরমকে পাঠাতে চাইলে খুরমের ধারণা হয়, তাঁকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে নুরজাহান তাঁর পিতাকে ঐ পরামর্শ দিয়েছেন। সে কারণে পিতৃ আদেশ অমান্য করে খুরম বিদ্রোহী হন। কিন্তু জাহাঙ্গির সে বিদ্রোহ দমন করেন। তারপর অনুতপ্ত পুত্র দাক্ষিণাত্য থেকে পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে জাহাঙ্গির তাঁকে ক্ষমা করেন।

জাহাঙ্গিরের মৃত্যুর আগেই তাঁর দুই পুত্র খসরু ও পরভেজের মৃত্যু হয়। সে কারণে ১৬২৭ খ্রী জাহাঙ্গিরের মৃত্যু হলে তৃতীয় পুত্র খুরম শাহজাহান নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন।

ধর্মের ব্যাপারে জাহাঙ্গির উদার ছিলেন। শুধু বিদ্রোহী পুত্র খসরুকে সাহায্য করার অভিযোগে শিখগুরু অর্জুনকে হত্যা ক[illegible]র তিনি শিখদের বিরাগভাজন হন। তিনি ন্যায়বিচারক ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি'র সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য সীমাহীন। তাঁর শাসনকালেই 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' ভারতে বাণিজ্যের অনুমতি লাভ করে।

সাম্রাজ্য বিস্তারে জাহাঙ্গির কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মেবার জয়ের জন্য ১৬০৬ খ্রী তিনি দ্বিতীয় পুত্র পরভেজের নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠান। পরভেজ

ব্যর্থ হলে দু'বছর পরে সেনাপতি মহাবৎ খাঁর নেতৃত্বে আর একবার মেবার জয়ের চেষ্টা হয়। সে প্রয়াসও সফল না হওয়ায় পাঁচ বছর পরে ১৬১৩ খ্রী সম্রাটের পুত্র খুরমের নেতৃত্বে একটি বাহিনী আবার মেবার আক্রমণ করে এবং মেবারের রানা অমরসিং সে আক্রমণ প্রতিরোধে অসমর্থ হয়ে নতি স্বীকার করেন। অমরসিং নতি স্বীকার করায় তাঁকে আর সিংহাসনচ্যুত করা হয় না এবং পরবর্তীকালে সম্রাট শাহ্‌জাহানের শাসনকালেও মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে মেবারের সম্পর্ক ভাল ছিল।

সম্রাট আকবরের শাসনকালেই বাঙলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু বাঙলার অভ্যন্তরে বিদ্রোহ অব্যাহত থাকে। সম্রাট জাহাঙ্গির বাঙলার বিদ্রোহ দমন করেন এবং মোগল সেনাপতি ইসলাম খাঁ বাঙলায় পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইরাবতী ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী পাঞ্জাবের কাংড়া অঞ্চলে মোগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্রাট জাহাঙ্গিরের আর একটি কীর্তি।

উত্তর ভারতে বিভিন্ন যুদ্ধে সাফল্যের পর সম্রাট জাহাঙ্গির দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু আহম্মদনগর জয়ের চেষ্টা মালিক অম্বর নামক এক দুর্ধর্ষ হাবসি সেনাপতির বিরোধিতায় বারবার ব্যর্থ হয়। পরিশেষে ১৬১৬ খ্রী যুবরাজ খুরমের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশাল সৈন্যবাহিনীর কাছে মালিক অম্বর পরাজয় স্বীকার করেন। পরে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে মালিক অম্বর ১৬২০ খ্রী আর একবার বিদ্রোহী হলে খুরম আবার তাঁকে পরাজিত করেন। জাহাঙ্গির কান্দাহার পুনর্দখলেরও পরিকল্পনা করেন। কিন্তু যুবরাজ খুরম সন্দেহবশত সে অভিযান পরিচালনায় সম্মত না হওয়ায় কান্দাহার অভিযান স্থগিত রাখতে হয়।

জাহাঙ্গিরের শেষ জীবন সুখের ছিল না। তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রথম দুই পুত্রের মৃত্যু হয়। তৃতীয় পুত্র ও উত্তরাধিকারী খুরম বারবার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ও বিভিন্ন প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকেন। বিশ্বস্ত সেনাপতি মহাবৎ খাঁ একবার বিশ্বাসঘাতকতা করে সম্রাট ও তাঁর মহিষীকে কাবুলের পথে বন্দী করার চেষ্টা করেন। কিন্তু নূরজাহানের বুদ্ধিবলে সম্রাট মুক্তি পান। তারপর মহাবৎ খাঁ দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করে সেখানে বিদ্রোহী যুবরাজ খুরমের সঙ্গে যোগ দেন। ঐ সব বিদ্রোহ ও অশান্তির মধ্যেই সম্রাট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জাহান্দার শাহ (১৭১২-১৩): মোগল সম্রাট প্রথম বাহাদুর শাহর পুত্র জাহান্দার শাহ পিতার মৃত্যুর পর তাঁর তিন ভাইকে পরাজিত ক'রে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। তিনি ছিলেন অত্যাচারী, চরিত্রহীন ও অযোগ্য শাসক। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র এগারো মাস পরে তিনি নিহত হন।

জিন্না, মহম্মদ আলী (১৮৭৬-১৯৪৮): বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা, পাকিস্তানের স্রষ্টা। প্রতিভাবান ছাত্র মাত্র ষোল বছর বয়সে লণ্ডনে ব্যারি...

পড়তে যান ও সেখানে দাদাভাই নৌরজির সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৬ খ্রী দাদাভাই নৌরজির একান্ত সচিব হন। ঐ সময় থেকে কংগ্রেসে গান্ধী-যুগের সূচনার পূর্বে পর্যন্ত জিন্না কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ছিলেন এবং হিন্দু-মুস্লিম ঐক্য ছিল তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রধান লক্ষ্য। অসহ-যোগ আন্দোলনকালে জিন্না কংগ্রেস ত্যাগ করেন ও গান্ধী নীতির সমালোচক হন। তিনি কংগ্রেসকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলতে আরম্ভ করেন ও মুস্লিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে ঝোঁকেন; ১৯৩০ খ্রী গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন। তারপর সাময়িক ভাবে ভারত ত্যাগ করে ১৯৩০-৩৪ খ্রী লণ্ডনে প্রিভি-কাউন্সিলে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন। লণ্ডনে অবস্থানকালেই তিনি মুস্লিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং লীগের আহ্বানে স্বদেশে প্রত্যা-বর্তন করেন। তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন মুস্লিম লীগের অবিসংবাদিত নেতা।

১৯৪০ খ্রী লাহোরে মুস্লিম লীগের অধিবেশনে পাকিস্তান গঠনের দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাব অনুসারেই, বহু আন্দোলন ও রক্তক্ষয়ের পর ১৯৪৭ খ্রী, ১৪-১৫ আগস্ট মধ্য রাত্রে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। জিন্না হন সে রাষ্ট্রের গভর্নর-জেনারেল এবং আমৃত্যু তিনি সে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

জীমূতবাহন : দ্বাদশ শতাব্দীর হিন্দু শাস্ত্রকার। তাঁর 'ধর্মরত্ন' গ্রন্থর একাংশ 'দায়ভাগ' অধ্যায়ে যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার-সূত্র লিখিত আছে সেই অনুসারে সম্প্রতিকাল পর্যন্ত হিন্দু সমাজের একটি বড় অংশের (বিশেষত বাঙলা দেশে) সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারিত হত।

জুনাগড় : গুজরাতের কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে জুনাগড় ছিল একটি ক্ষুদ্র করদ রাজ্য। রাজ্যের রাজা ছিলেন মুস্লিম এবং প্রজারা ছিলেন হিন্দু। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের শর্ত অনুসারে করদ রাজ্যগুলির ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগদানের প্রশ্ন দেখা দিলে জুনাগড়ের মুস্লিম রাজা পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। সঙ্গে সঙ্গে জুনাগড়ের প্রজারা বিদ্রোহী হন এবং বিদ্রোহ এমন ভয়ংকর রূপ নেয় যে জুনাগড়ের রাজা আত্মরক্ষার্থে রাজ্য ত্যাগ ক'রে পাকিস্তানে পলায়ন করেন। সেই অবস্থায় জুনাগড়ের মুস্লিম দেওয়ানের আহ্বানে ১৯৪৭ খ্রী ৯ নভেম্বর ভারত সরকার জুনাগড়ে শান্তি স্থাপন করতে সৈন্য পাঠায়। তারপর ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জুনাগড়ে যে গণভোট হয় তাতে ঐ রাজ্যের প্রজারা ভারতে যোগদানের প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে সমর্থন করে। ১৯৪৯ সালের ২৯শে জানুয়ারি জুনাগড় ভারতে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগ দেয়।

জেরেক্সিস : খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে যে পারসিক অভিযান হয় তার নেতা ছিলেন সাইরাস। জেরেক্সিস সাইরাসের প্রপৌত্র, দরায়ুসের পুত্র। তাঁর সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পারসিক শাসন অক্ষুন্ন ছিল। জেরেক্সিসের সৈন্যবাহিনীতে

অনেক ভারতীয় ছিল এবং গ্রীসের বিরুদ্ধে জেরেক্সিস যে অভিযান পরিচালিত করেন তাতে অনেক ভারতীয় সৈন্য অংশ গ্রহণ করে।

জোগড়া : ওড়িশার গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। প্রাক্‌-খ্রীষ্ট যুগের একটি নগরীর ধ্বংসাবিশেষ এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। নগরীটি কাঁচা ইটের প্রাচীরে ঘেরা ছিল।

ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ : পেশোয়া গঙ্গাধর রাওর অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হলে গভর্নর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসি তাঁর স্বত্ব-বিলোপ নীতি অনুসারে ঝাঁসিকে ইংরেজ সরকারের অধিকারে আনেন। কিন্তু পেশোয়ার বিধবা পত্নী রানী লক্ষ্মীবাঈ ঐ দখল স্বীকার করেন না এবং তাঁর দত্তক পুত্রকে সিংহাসনে বসানোর দাবি জানান। ঐ দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে ঝাঁসির রানী অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন এবং ১৮৫৭ খ্রী সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। তেজস্বিতা ও সাহসিকতার জন্য ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ অনতিবিলম্বে বিদ্রোহের অন্যতম নেত্রীরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। ঝাঁসির রানীর প্রধান পার্শ্বচর ছিলেন তাঁতিয়া টোপি।

১৮৫৭ খ্রী ৫ এপ্রিল ঝাঁসির পতন হলে রানী লক্ষীবাঈ কাল্পিতে এসে তাঁতিয়ার সঙ্গে যোগ দেন। কাল্পির পতন হলে বিদ্রোহীরা গোয়ালিয়র দখল করে। সেখানে ১৮৫৮ খ্রী ১৭ই জুন ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে বিদ্রোহী সিপাহীদের যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় তাতে অংশ গ্রহণ করে ঝাঁসির রানী বীরের মৃত্যু বরণ করেন।

ঝিন্দনবাঈ : পাঞ্জাব কেশরী রনজিৎ সিংহের মহিষী। বালক পুত্র দলীপ সিং ১৮৪৩ খ্রী সিংহাসনারোহণ করলে তিনি তাঁর অভিভাবিকারূপে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। সেই সময় অবাধ্য শিখ সেনাবাহিনীর অরাজকতায় অতিষ্ঠ হয়ে রানীমাতা ঝিন্দন শিখ সেনাবাহিনীকে অমৃতসর সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন করে শতদ্রুর পূর্বপারে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্ররোচিত করেন। শিখ সেনাবাহিনী সেই মতো শতদ্রু নদী অতিক্রম করলে প্রথম শিখ-ইঙ্গ যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে শিখদের পরাজয় হয় এবং রানীমাতা ঝিন্দন নির্বাসিত হন।

টড, জেমস (১৭৮২-১৮৩৫) : ইংরেজ সরকারের সেনা বিভাগের পদস্থ কর্মচারীরূপে জেমস টড ১৭৯৯ খ্রী ভারতে আসেন। ১৮১৮ খ্রী তিনি রাজপুতানায় (বর্তমান রাজস্থান) পোলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হন। সেখানে রাজপুতদের নানা বীরত্ব কাহিনী শুনে তিনি রাজপুত জাতির ইতিহাস রচনায় অনুপ্রাণিত হন। তারপর দীর্ঘ তিন বছরের অনলস সাধনায় ১৮৩২ খ্রী রচিত হয় তাঁর 'এনালস এণ্ড এন্টিকুইটিজ অফ রাজস্থান' গ্রন্থটি। ঐ গ্রন্থে বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠীর বংশ তালিকা, আচার-অনুষ্ঠান, সমাজ জীবন, শাসন ব্যবস্থা ও সংগ্রাম কাহিনী প্রথম সুবিন্যস্তভাবে সঙ্কলিত হয়। পরবর্তীকালে আরও অনুসন্ধান গবেষণায় টড সঙ্কলিত বহু তথ্য ও কাহিনী অসম্পূর্ণ ও ভুল প্রমাণ হলেও রাজপুত ইতিহাস রচনার পথিকৃৎরূপে টডের গৌরব ম্লান হয়নি। টডের রাজপুত কাহিনী একদা ভারতের জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে।

টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ, রাজা (১৮৫৮-৯১): মণিপুরের রাজা কীর্তিচন্দ্রের পুত্র। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন। পরে বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

টিপু সুলতান (১৭৫০-৯৯): মহীশূরের সুলতান হায়দার আলির পুত্র, জন্ম ১৭৫০ খ্রী ১০ নভেম্বর। ১৭৮২ খ্রী পিতার মৃত্যুর পর মহীশূরের সুলতান হন। দ্বিতীয় মহীশূর (ইঙ্গ) যুদ্ধ চলাকালেই পিতার মৃত্যু হয়, সে কারণে সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই টিপুকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। ১৭৮৪ খ্রী ঐ যুদ্ধ শেষ হয় এবং মাঙ্গালোর চুক্তি অনুসারে উভয়পক্ষ পরস্পরের অধিকৃত স্থান প্রত্যর্পণ করে।

কিন্তু তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে টিপু রাজ্যের প্রায় অর্ধেক হারান এবং চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন রক্ষাকল্পে বীরের মৃত্যু বরণ করেন।

টিপু ছিলেন দুঃসাহসী স্বাধীনচেতা বীর। তিনি অনায়াসেই নিজাম ও অন্যান্য বহু নৃপতির মতো ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করে স্বীয় জীবন ও রাজ্যসম্পদ নিরাপদ করতে পারতেন। কিন্তু ইংরেজের বশ্যতা অপেক্ষা মৃত্যু তিনি প্রিয় মনে করেন। টিপু সুশিক্ষিত ও সুলেখক ছিলেন। তিনি ফার্সিভাষায় বই লেখেন। ফার্সি ছাড়াও উর্দু ও কানাড়ি ভাষা তাঁর জানা ছিল। তাঁর গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ভাষায় নানা বিষয়ের বহু বই ছিল। তিনি কূটনীতিতেও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি ফ্রান্স, আফগানিস্তান, তুরস্ক, আরব মরিশাস প্রভৃতি স্থানের শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

তাঁর সুশাসনে মহীশূর রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। টিপু ধর্মপ্রাণ সুন্নি মুসলমান ছিলেন। হিন্দুদের প্রতি টিপুর আচরণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত নন। তবে হিন্দুদের প্রতি তাঁর আচরণ যে সব সময় ভাল ছিল না তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন এবং তাঁর ব্যর্থতার জন্য তিনি নিজে কম দায়ী ছিলেন না।

টিলক, বালগঙ্গাধর (১৮৫৬-১৯২০): বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা, সমাজসংস্কারক, শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক। টিলক বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন উপাধি লাভ করেন, কিন্তু কর্মজীবন শুরু করেন শিক্ষাব্রতীরূপে। পরে জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে সাংবাদিকতা শুরু করেন। তাঁর উদ্যোগে ১৮৮০ খ্রী কেশরী (মারাঠী ভাষায়) ও মারহাট্টা (ইংরেজী ভাষায়) পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কয়েক বছর পরে তিনি ফার্গুসন কলেজে গণিত ও সংস্কৃত সাহিত্যে অধ্যাপনা শুরু করেন। টিলক ইংরেজ সরকারের উদ্যোগে সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না। এ কারণে ১৮৯০ খ্রী তিনি মেয়েদের সম্মতির বয়সবৃদ্ধির প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করেন। ১৮৯৫ খ্রী তিনি দেশে গণপতি ও শিবজি উৎসবের প্রবর্তন করেন। ১৮৯৭ খ্রী রাজদ্রোহের অভিযোগে টিলকের ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কিন্তু ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে তীব্র প্রতিবাদ

হওয়ায় টিলককে কয়েক মাস পরেই মুক্তি দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে টিলক ছিলেন চরমপন্থী এবং আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির বিরোধী। ১৮৮৫ খ্রী জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার দিন থেকে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তিনি সমর্থন করেন। সেই সময় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে টিলকের নেতৃত্বে একটি চরমপন্থী দল গঠিত হয় যার মধ্যে ছিলেন লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে চরমপন্থীদের সঙ্গে নরমপন্থীদের তীব্র বিরোধ ও সংঘর্ষ হওয়ায় সে অধিবেশন পণ্ড হয়ে যায় এবং চরমপন্থীদের সঙ্গে সাময়িকভাবে কংগ্রেসের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। সেদিন কংগ্রেসে নরমপন্থী উপদলের নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল নেহরু, ফিরোজ শাহ মেহতা, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি। ১৯০৬ খ্রী কলকাতা কংগ্রেসে চরমপন্থীদের বিদেশি পণ্য বর্জনের প্রস্তাব নরমপন্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও গৃহীত হয়।

জাতীয় কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার পর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে টিলকের ছয় বছর কারাদণ্ড হয় এবং তাঁকে বর্মার মান্দালয় জেলে পাঠানো হয়। ১৯১৪ খ্রী টিলক মুক্তিলাভ করেন এবং ১৯১৬ খ্রী গঠন করেন 'হোমরুল লীগ' নামক রাজনৈতিক দল। আয়ারল্যাণ্ডের হোমরুল আন্দোলনের আদর্শে টিলক ঐ দল গঠন করেন। ঐ সময় টিলকের উদ্যোগে আবার কংগ্রেসের চরম ও নরম-পন্থী দলের মিলন হয়। টিলক ১৯১৯ সালের 'মণ্ট-ফোর্ড শাসনসংস্কার' সম্পূর্ণ বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন না। ঐ সময় স্যার ভ্যালেণ্টাইন চিরল তাঁর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তার প্রতিবাদে মানহানির মামলা রুজু করার জন্য টিলক ইংলণ্ডে যান এবং সেখানেও ভারতের স্বাধীনতার দাবির সমর্থনে জোর প্রচারকার্য চালান। দেশে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরে,১৯২০ খ্রী ১ আগস্ট লোক--মান্য বালগঙ্গাধর টিলকের মৃত্যু হয়।

ভারততত্ত্বে টিলকের অসামান্য জ্ঞান ছিল। তাঁর গীতাভাষ্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।

টোডরমল : মোগল সম্রাট আকবরের বিশিষ্ট অমাত্য টোডরমল প্রথমে শেরশাহর সরকারে সামান্য কর্মচারীরূপে যোগ দেন। তারপর মোগল সম্রাট আকবরের রাজসভাতেও তিনি প্রথমে কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু প্রশাসনিক দক্ষতা ও সামরিক প্রতিভাবলে অনতিবিলম্বে তিনি সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং প্রধান দেওয়ান ও বকিলপদে উন্নীত হন। মোগল সম্রাটের দরবারে কোন হিন্দু কখনও এত উচ্চপদে নিযুক্ত হননি। টোডরমল ছিলেন কার্যত সম্রাট আকবরের প্রধানমন্ত্রী। সম্রাটের বিভিন্ন সামরিক অভিযান টোডরমলের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। আবার মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কার, ভূমি সংস্কার, প্রশাসনিক সংস্কার প্রভৃতি কাজেও টোডরমল ছিলেন সম্রাট আকবরের মুখ্য উপদেষ্টা।

সম্রাট আকবরের সর্বাধিক বিশ্বস্ত অমাত্য হওয়া সত্ত্বেও টোডরমল ছিলেন

স্বাধীনচেতা ও অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু। মোগল দরবারে যোগদানের পর ১৫৬২ খ্রী টোডরমল উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৫৮৯ খ্রী তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন মুখ্য পার্শ্বচর।

ঠগ, ঠগী : বহু প্রাচীনকাল থেকে এদেশে ঠগ দস্যুদের উপদ্রব ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দিল্লীর সুলতান জালালুদ্দিন খলজি প্রায় এক হাজার ঠগ দস্যু বন্দী করেন। ঠগদের জন্য অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের পথঘাট অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। পথিকদের হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের সর্বস্ব লুঠ করা ও মুহূর্তের মধ্যে লুণ্ঠিত ব্যক্তিকে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে ফেলা ঠগ দস্যুদের তৎপরতার বৈশিষ্ট্য ছিল। গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ঠগদের দমনের উদ্দেশ্যে একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করেন এবং কর্নেল স্লিম্যান ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন। স্লিম্যান কঠোর হাতে ঠগীদমন করে ভারতের পথঘাট বিপন্মুক্ত করেন। ঠগীদমন লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালের অন্যতম কীর্তি।

ঠানা : বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের একটি জেলা ও তার সদর শহরের নাম। ঠানা সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান। খ্রী-পূ তৃতীয় শতাব্দীতে ঠানা মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে অন্ধ্রভৃত্য, চালুক্য প্রভৃতি হিন্দু রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকার পর ঠানা ১৫০০ খ্রী মুস্লিম অধিকারে যায়। ১৫৩৩ খ্রী পর্তুগীজরা ঠানার একাংশ জয় করে। প্রায় দুই শতাব্দী পর্তুগীজ অধিকারে থাকার পর ঠানার একাংশ বেসিন মারাঠাদের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮১৭ খ্রী ঠানা জেলার উত্তরাংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যর অন্তর্ভুক্ত হয়।

ডন সোসাইটি : বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৯০২ খ্রী ডন সোসাইটি গঠিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে সেদিন দেশবাসীর মনে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি যে বিরূপ ভাব দেখা দেয় তার প্রতিকার সাধনই ডন সোসাইটির প্রধান কাজ ছিল। তাছাড়া দেশের যুব সম্প্রদায়ের মনে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগ্রত করা ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবানুগ করা ঐ সোসাইটির কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ডন সোসাইটি সংগঠন হিসাবে মাত্র সাত বছর স্থায়ী ছিল। কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের যুগে দেশের যুব সম্প্রদায়ের মনে স্বদেশী ভাব জাগিয়ে তোলার কাজে ডন সোসাইটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

ডাফরিন, লর্ড : লর্ড ডাফরিন ১৮৮৪-৮৮ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন। উদারনীতির জন্য ডাফরিন জনপ্রিয় হন। তাঁর শাসনকালে ১৮৮৫ খ্রী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়। তাঁর উদ্যোগে বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়। তাঁর চেষ্টায় ভারতে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্র আফগানিস্থান ও রাশিয়ার সম্পর্কের উন্নতি হয়। তিনি সিন্ধিয়াকে গোয়ালিয়র রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন।

লর্ড ডাফরিন ভারত শাসনে উদার নীতির পরিচয় দিলেও তাঁর শাসন-

কালেই ব্রহ্মদেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কয়েকটি দাবি না পূরণ করার জন্য তিনি ব্রহ্মরাজ থিবোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ঐ যুদ্ধ তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ নামে অভিহিত। যুদ্ধে ব্রহ্মরাজের পরাজয় হয় এবং ১৮৮৬ খ্রী ১ জানুয়ারি ব্রহ্মদেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ডালহৌসি, লর্ড: লর্ড ডালহৌসি ১৮৪৮ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছত্রিশ বছর। ভারত শাসনে ও এদেশের বৈষয়িক উন্নয়নে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন বলে তাঁর কার্যকাল শেষ হওয়ার পর পুনরায় তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ও তাঁর শেষের দিকের কার্যকলাপ বৃটিশ সরকারের মনোমত না হওয়ায় ১৮৫৬খ্রী পদত্যাগ করে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৬০ খ্রী মাত্র ৪৮ বছর বয়সে লর্ড ডালহৌসির মৃত্যু হয়: লর্ড ডালহৌসির শাসনকালে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। আফগানিস্তান থেকে ব্রহ্মদেশ, কাশ্মীর থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিশাল ভারতে বৃটিশ শাসনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃত্ব কায়েম হয়। কিন্তু শুধু এই সাম্রাজ্য বিস্তারের সাফল্যের জন্যই নয়, প্রশাসনিক দক্ষতা, অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা ও নানা জনহিতকর স্থায়ী কীর্তির জন্য লর্ড ডালহৌসি ভারত ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তি। লর্ড ডালহৌসির শাসনকালেই ভারতে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়; ১৮৫৩ খ্রী বোম্বাই থেকে ঠানা এবং পরের বছর কলকাতা থেকে রানিগঞ্জ রেলপথ উন্মুক্ত হয়। পূর্তকার্যের জন্য তিনি ভারত সরকারের একটি স্বতন্ত্র দপ্তর স্থাপন করেন এবং সেচের বিস্তারের জন্য গঙ্গাখাল সম্পূর্ণ করেন। সস্তায় ডাক-তারের ব্যবস্থা ঐ সময়েই প্রবর্তিত হয়। শিক্ষা বিস্তারের জন্যও লর্ড ডালহৌসি বিশেষ উদ্যোগী হন। তাঁর শাসনকালে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ও প্রশাসনের কাজে এদেশের লোককে অধিক সংখ্যায় নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী বাছাইয়ের রীতি তিনিই প্রবর্তন করেন। লর্ড ডালহৌসির কর্মতৎপরতা ও সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বৃটিশ সরকার তাঁর কার্যকাল বৃদ্ধি করেন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য দ্বিতীয় দফার কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই তিনি ইংলণ্ড প্রত্যাবর্তন করেন।

অবশ্য লর্ড ডালহৌসির শাসনকালের অত্যল্পকাল পরেই যে এদেশে সিপাহি বিদ্রোহ হয় তার জন্যও লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতি ও অন্যান্য কার্যকলাপ কম দায়ী ছিল না। লর্ড ডালহৌসির শাসনকালে দুটি বড় যুদ্ধ হয়। প্রথমটি দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ, যার ফলে সমগ্র পাঞ্জাব বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয়টি ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ, যার ফলে ইরাবতীর তীর পর্যন্ত ব্রহ্মদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। তাঁর স্বত্ব বিলোপ নীতির ফলে সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, জৈৎপুর ও সম্বলপুর রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বালুচিস্তান, আফগানিস্তানের সঙ্গে সন্ধি করে তিনি

ঐ দুই স্থানে বৃটিশ প্রভাব বৃদ্ধি করেন। কুশাসনের অজুহাতে লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৬ খ্রী অযোধ্যা দখল করেন। নিজাম তাঁর রাজ্যে অবস্থানকারী ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ হয়ে বেরার অঞ্চলটি ইংরেজ সরকারকে ছেড়ে দেন। সিকিমরাজ দুজন ইংরেজকে আটক করায় লর্ড ডালহৌসি ঐ পার্বত্য রাজ্যটির একাংশ দখল করে নেন। নানা অজুহাতে দেশীয় রাজ্যগুলিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে লর্ড ডালহৌসি দেশীয় রাজাদের বিরাগভাজন হন এবং সেই কারণেই দেশীয়নৃপতিদের অনেকে সিপাহিবিদ্রোহ কালে ইংরেজ সরকারেরবিরুদ্ধে যান।

ডিরোজিও, হেনরী লুই ভিভিয়ান (১৮০৯-৩১): বাঙলার নব জাগরণের যুগে ডিরোজিওর ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ডিরোজিও ছিলেন জাতিতে এংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ধর্মবিশ্বাসে প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টান। অতি অল্প বয়সে তিনি ইতিহাস, ইংরেজি সাহিত্য ও দর্শনে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন এবং মাত্র সতের বছর বয়সে, ১৮২৬ খ্রী হিন্দু কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। তাঁর অধ্যাপনার বিষয় ছিল ইতিহাস ও ইংরেজি সাহিত্য। তাঁর গভীর জ্ঞান, বিশ্লেষণী প্রতিভা, বাগ্মিতা ও সহৃদয়তা ছাত্রদের মুগ্ধ করে এবং অবিলম্বে তাঁর সকল কথা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের কাছে বেদবাক্যসম হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ, কুসংস্কার প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি যেমন ছাত্রদের সচেতন করেন, তেমনই তাঁদের মধ্যে দেশাত্ম-বোধ জাগিয়ে তোলেন।

ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় তাঁর উৎসাহী ছাত্ররা স্বাধীনভাবে ও সংস্কার-মুক্ত মনে ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয় আলোচনার জন্য ১৮২৮ খ্রী একাডেমিক এসোসিয়েশন গঠন করেন। ইংরেজ শাসনকালে ভারতীয়দের উদ্যোগে গঠিত সেই প্রথম স্বাধীন সংগঠন। ডিরোজিও সেই সংগঠনের সভাপতি হন এবং তাঁর ছাত্র উমেশচন্দ্র বসু হন সম্পাদক। ঐ সংস্থার বিভিন্ন অধিবেশনে ও ডিরোজিওর বাসভবনে যেসব ছাত্র নিয়মিত যেতেন তাঁদের মধ্যে রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ি, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ কয়েকজন পরবর্তীকালে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ডিরোজিওর ছাত্ররা সে সময় 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিতি লাভ করেন। একাডেমিক এসোসিয়েশন গঠনে‍র দু'বছর পরে, ১৮৩০ খ্রী ডিরোজি[ও]র ছাত্ররা 'পার্থেনন' নামে একটি ইংরে[জি] সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করেন। ঐ পত্রিকায় এ-দেশীয় কুসংস্কার ছাড়াও খ্রীষ্ট ধর্ম ও ইংরেজ শাসনের বিভিন্ন দিকের সমালোচনা করা হত।

ডিরোজিও ছাত্রদের মধ্যে এমন আলোড়ন আনেন যে হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র ও অধ্যাপকদের ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রকাশ্য আলোচনা বন্ধ করতে বাধ্য হন। কিন্তু তাতে ছাত্রদের উৎসাহ উদ্দীপনা আরও বৃদ্ধি পায় এবং মুক্তমনের ছাত্রদের কার্যকলাপ অভিভাবকদের আতঙ্কের বিষয়

হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু অপসৃত হওয়ার আগেই ডিরোজিও পদত্যাগ করেন (১৮৩১ খ্রী ২৫ এপ্রিল)। এর কয়েক মাস পরেই ডিরোজিওর মৃত্যু হয়।

ডেভিড ইয়ুলঃ ভারতের রাজনৈতিক স্বাধিকারের প্রতি সহানুভূতিশীল যেসব ইংরেজ জাতীয় কংগ্রেস গঠনে বিশেষ উৎসাহ দেখান ডেভিড ইয়ুল তাঁদের অন্যতম। তিনি ১৮৮৮ খ্রী এলাহাবাদে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

ডেমেট্রিয়ুস : ব্যাকট্রিয়া বা বাহ্লিক দেশের গ্রীক রাজ্যের রাজা। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ও কুষাণ অভ্যুত্থানের আগে উত্তর ভারতে যখন কোন শক্তিশালী রাজ্য ছিল না সেই সময় ডেমেট্রিয়ুস ভারত আক্রমণ করেন এবং আফগানিস্তানের একাংশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের কিছুটা জয়ে সমর্থ হন। ডেমেট্রিয়ুস যখন ভারত অভিযানে ব্যস্ত সেই সময় পহ্লব নামক এক যাযাবর জাতি ব্যাকট্রিয়া জয় করে নেয়। ফলে ব্যাকট্রিয়ায় গ্রীক আধিপত্যের অবসান ঘটে এবং ডেমেট্রিয়ুস ভারতে অধিকৃত অঞ্চলগুলি শাসন করতে থাকেন। তখন থেকে স্বদেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত গ্রীক রাজারা ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকেন। ভারতে ব্যাকট্রিয় গ্রীক রাজাদের মধ্যে মিনান্দারের নাম উল্লেখযোগ্য।

তক্ষশিলা : একটি সুপ্রাচীন নগরী ও পূর্বগান্ধার রাজ্যের রাজধানী। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে তক্ষশিলা সুপরিচিত নগরী ছিল। তক্ষশিলার সর্বাধিক খ্যাতি ছিল ভারতের প্রাচীনতম বিদ্যাচর্চার কেন্দ্ররূপে। ভগবান বুদ্ধেরও জন্মের আগে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রচারিত ছিল। কোশলরাজ প্রসেনজিত তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারতের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী বাণিজ্যকেন্দ্ররূপেও তক্ষশিলা গুরুত্বপূর্ণ নগরী ছিল। প্রায় তিন হাজার বছর আগের নগরী তক্ষশিলার বাড়ি ঘর খুব উচ্চ মানের ছিল না, কিন্তু নগরবাসীদের যে সমৃদ্ধির অভাব ছিল না তা সেখান থেকে পাওয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা এবং স্বর্ণালঙ্কার থেকে বোঝা যায়। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং দুবার তক্ষশিলা দর্শনে আসেন। তক্ষশিলা বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় অবস্থিত।

তাজমহলঃ মোগল সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তমা মহিষী মমতাজমহলের (আজুমন্দ বানু বেগম) স্মৃতি চিরস্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে তাঁর সমাধির উপর যে সৌধ নির্মিত হয় তাই তাজমহল নামে জগৎখ্যাত। যমুনা নদীর দক্ষিণতীরে নীল আকাশ ও শ্যামল প্রান্তরের পটভূমিকায় শ্বেত মর্মরে নির্মিত অতুলনীয় কারুকার্য-খচিত এই স্মৃতিসৌধটি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তিরূপে স্বীকৃত। তাজমহলের নির্মাণ কাজ সম্ভবত ১৬৩২ খ্রী শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৬৫৩ খ্রী। নির্মাণ ব্যয়ের কোন সুনির্দিষ্ট হিসাব

মেলে না। কারুর মতে ৫০ লক্ষ আবার কোন মতে চার কোটি টাকারও বেশি। সম্রাট শাহজাহান তাজ নির্মাণ কালেই সম্রাজ্ঞী মমতাজের সমাধির পাশে তাঁর সমাধিস্থান নির্দিষ্ট করে রাখেন এবং সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সেইখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ যে জেরোনিমো ভেরোনিও নামক এক ইতালীয়কে তাজের মুখ্য স্থপতি বলেছেন তাঁর সমর্থনে কোন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ নেই। সম্ভবত মধ্য এশিয় স্থপতি ঈশা তাজমহলের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং ভারতের হিন্দু-মুস্লিম শিল্পীরাই তাজের নির্মাতা। তাজের গায়ে যে পত্রপুষ্প অলঙ্করণের কাজ দেখা যায় সেগুলি সম্ভবত কনৌজের হিন্দু কারিগরদের সৃষ্টি।

তাঞ্জোর : বর্তমান তামিলনাড়ু রাজ্যের একটি মন্দিরময় সুপ্রাচীন জেলা ও শহর। সারা জেলায় মন্দিরের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার, এবং সেগুলি পল্লব, চোল, পাণ্ড্য, বিজয়নগর ও নায়ক রাজাদের শাসনকালে নির্মিত হয়। পল্লব (৬০০-৮৫০খ্রী) ও চোল (৮৫০-১১০০ খ্রী) রাজাদের শাসনকালে স্থাপত্যশিল্পে যে দ্রাবিড় রীতি প্রবর্তিত হয় তার নিদর্শন তাঞ্জোরের বহু মন্দিরে পাওয়া যায়। তাঞ্জোরের বৃহত্তম মন্দির বৃহদীশ্বর (শিব) মন্দির একাদশ শতাব্দীতে চোল সম্রাট প্রথম রাজরাজ কর্তৃক নির্মিত হয়।

তাঁতিয়া টোপি : সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম নেতা, প্রকৃত নাম রামচন্দ্র পাণ্ডুরং। জাতিতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। তিনি নানা সাহেবের সঙ্গী ও অনুচর ছিলেন। সিপাহি বিদ্রোহের সময় তিনি একবার ইংরেজ সেনাপতি উইণ্ডহামকে পরাজিত করে কানপুর দখল করেন। পরে সেনাপতি ক্যাম্পবেল তাঁকে পরাজিত করে ১৮৫৭খ্রী ডিসেম্বর মাসে কানপুর পুনর্দখল করেন। তারপর তাঁতিয়া টোপি ঝাঁসির রানীর সহযোগিতায় অগ্রসর হন। গোয়ালিয়রের যুদ্ধে ঝাঁসির রানী পরাজিত ও নিহত হলে তাঁতিয়া রাজপুতানায় পলায়ন করেন। কিন্তু ইংরেজ বাহিনীর উপর তাঁর অতর্কিত আক্রমণ অব্যাহত থাকে। ১৮৫৯খ্রী এপ্রিল মাসে এক সঙ্গীর বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁতিয়া টোপি সেরোন্দর জঙ্গলে বিশ্রামকালে ধৃত হন। বিচারে তাঁতিয়ার ফাঁসি হয় এবং ১৮৫৯ খ্রী ১৫ এপ্রিল সে দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়। প্রকৃত দেশপ্রেমীর মতো তাঁতিয়া নির্ভয়ে মৃত্যু বরণ করেন।

তানসেন : মোগল সম্রাট আকবরের রাজসভায় নবরত্নের অন্যতম তানসেন ছিলেন গোয়ালিয়রের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও সুগায়ক মকরন্দ পাণ্ডের পুত্র। তানসেনের পূর্ব নাম রামতনু। বৃন্দাবনের ভক্ত হরিদাস স্বামীর কাছে তিনি মাত্র দশ বছর বয়সে সঙ্গীতে দীক্ষা নেন এবং সঙ্গীত শিক্ষাই হয় তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা। তিনি যখন গোয়ালিয়রের রানী মৃগনয়নী দেবীর সভাগায়ক, সে সময় রানীর এক মুস্লিম সখীর সঙ্গে, রানীর ইচ্ছানুসারে, মুস্লিম ধর্মানুসারে তাঁর বিবাহ হয় এবং তখন থেকে তিনি তানসেন নামে পরিচিত হন।

তখন তানসেনের সঙ্গীত প্রতিভা সারা ভারতে স্বীকৃত। তানসেন গোয়ালিয়র ত্যাগের পর যান রেওয়ার রাজসভায়। তারপর ১৫৬০ খ্রী মোগল সম্রাট আকবরের আমন্ত্রণে দিল্লীর রাজসভায় যোগ দেন। তানসেন মৃত্যুকাল পর্যন্ত আকবরের সভা গায়ক ছিলেন। দিল্লীর রাজসভায় অবস্থানকালে তানসেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রাগ ও ধ্রুপদগুলি রচনা করেন। ধর্মের ব্যাপারে তানসেন ছিলেন সম্পূর্ণ উদার। বহু হিন্দু দেবদেবীর স্তুতি বিষয়ক রাগরাগিণীও তিনি রচনা করেন। তাঁর তিন পুত্রের নাম ছিল সুরথসেন, তানতরঙ্গ ও বিলাস খাঁ এবং কন্যার নাম সরস্বতী। জামাতা ছিলেন মিশ্রি সিং। তানসেনের পুত্রকন্যাদের মধ্যে বিলাস খাঁ ছিলেন সর্বাধিক সঙ্গীত প্রতিভাসম্পন্ন এবং তিনিও বহু নতুন রাগ সৃষ্টি করেন।

তাবাকৎ-ই-আকবরি : সম্রাট আকবরের রাজদরবারের বিশিষ্ট কর্মচারী ও ঐতিহাসিক নিজামুদ্দিন বক্সি ১৫৯২-৯৩ খ্রী এই গ্রন্থ রচনা করেন। এতে গজনির সুলতানদের ভারত অভিযান থেকে শুরু করে সম্রাট আকবরের শাসনকালের প্রথম ছত্রিশ বছরের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। বাহুল্য ও উচ্ছ্বাসবর্জিত বর্ণনা ও তথ্যনিষ্ঠার জন্য গ্রন্থটি ঐতিহাসিক মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে উল্লেখিত কালের ঘটনাবলী নিয়ে আরও বহু ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

তামিলনাড়ু : ভারতের দক্ষিণ অংশের অন্যতম অঙ্গরাজ্য। আয়তন ১,৩০,০৬৯ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা সাড়ে চার কোটি। তামিলনাড়ু আয়তনে ভারতের একাদশতম রাজ্য ও ভারতের ৪ শতাংশ লোকের বাসভূমি। দ্রাবিড় সংস্কৃতির পীঠস্থান এই রাজ্যটির সভ্যতার ইতিহাস প্রায় ছয় হাজার বছরের প্রাচীন। খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে বর্তমান তামিলনাড়ু অঞ্চলে চোল, পাণ্ড্য ও চের রাজাদের শাসনের গৌরবময় ইতিহাস মেলে। খ্রী-পূ দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইলারা নামে এক চোল নৃপতি সিংহল জয় করেন, তখন থেকেই ঐ দ্বীপের উত্তরাংশে তামিলদের বাস। এক পাণ্ড্য রাজা খ্রী-পূ প্রথম শতাব্দীতে রোম সম্রাট অগস্টাসের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাণ্ড্য রাজাদের শাসনকালে তামিল রাজ্য ছিল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের পর তামিল রাজাদের প্রতিপত্তি হ্রাস পায়।

মধ্যযুগের মুস্লিম শাসন সমগ্র উত্তর ভারতকে প্রভাবিত করলেও দক্ষিণ ভারতে বিশেষত তামিল অঞ্চলে মুস্লিম আধিপত্য কোনদিনই উল্লেখযোগ্য ছিল না। ১৬৩৯ খ্রী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর তামিলনাড়ুতে নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল প্রদেশের কিছু অংশ ও বর্তমান তামিলনাড়ু প্রদেশ নিয়ে গঠিত ছিল মাদ্রাজ প্রদেশ। ভাষার ভিত্তিতে ভারতের রাজ্যগুলি পুনর্গঠিত হলে শুধু তামিলভাষী

অঞ্চলটুকু নিয়ে মাদ্রাজ প্রদেশ গঠিত হয়। ১৯৬৯ সালের ১৪ জানুয়ারি মাদ্রাজ রাজ্যের জনগণের ইচ্ছানুসারে মাদ্রাজ রাজ্যের নাম হয় তামিলনাড়ু। রাজ্যের রাজধানীর নাম মাদ্রাজ থাকে।

তামিলনাড়ু বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ২৩৪।

তাম্রলিপ্ত : পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত, বর্তমান নাম তমলুক। প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত ছিল একটি বড় বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। এই বন্দর দিয়ে সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক হিউ এন সাং স্বদেশ যাত্রা করেন। তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে বঙ্গদেশের বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল।

তারমশিরিন খাঁ : মোঙ্গল নেতা তারমশিরিন ১৩২৮ খ্রী সুলতান মহম্মদ বিন তোগলকের শাসনকালে বিশাল বাহিনী নিয়ে ভারত আক্রমণ করেন ও দ্রুতগতিতে দিল্লীর উপকণ্ঠে পৌঁছান। মহম্মদ বিন তোগলক তখন বিপুল অর্থ দিয়ে তারমশিরিনকে নিরস্ত করেন। কিন্তু অর্থলোলুপ মোঙ্গলরা তারপর বার বার ভারতে হানা দেয়।

তারাবাঈ : শিবজির সৈন্যাধ্যক্ষ হাম্বির রাওর কন্যা ও শিবজির পুত্র রাজারামের স্ত্রী। তাঁদের পুত্র তৃতীয় শিবজি নামে অভিহিত।

মোগল সম্রাট ঔরংজেবের প্রবল বিরোধিতা এবং মারাঠা শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে তারাবাঈ, ১৭০০ খ্রী স্বামীর মৃত্যুর পর, তাঁর চার বছরের শিশু পুত্রের প্রতিনিধিরূপে মারাঠারাজ্য শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রশংসনীয় যোগ্যতার সঙ্গে সাত বছর সে দায়িত্ব প্রায় একক হস্তে পালন করেন। মুখ্যত তাঁর সাহস, কূটনীতি ও রণনীতির জন্য মোগল সম্রাট ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযান উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। তবে তারাবাঈ ক্ষমতালোভী ছিলেন এবং শম্ভুজির পুত্র শাহুর সিংহাসনে ন্যায্য অধিকার তিনি অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত মারাঠা শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৮৬ বছর বয়সে তারাবাঈয়ের মৃত্যু হয়।

তিতুমির : চব্বিশ পরগণা জেলার হায়দরপুর গ্রামে ১৭৮২ খ্রী তিতুমিরের জন্ম হয়। প্রথম জীবনে দাঙ্গায় লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে কারাদণ্ড হয়। মুক্তির পর মক্কায় যান এবং সেখানে ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তার পর দেশে প্রত্যাবর্তন করে ওয়াহাবি আন্দোলনের আদর্শ অনুসারে কৃষক আন্দোলন শুরু করেন। ঐ সময় জমিদারদের সঙ্গে তিতুমিরের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ কৃষকদের বারবার সংঘর্ষ হয়। এক জমিদার নিহত হন এবং বসিরহাটের এক দারোগা তিতুমিরকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে প্রাণ হারান। তারপর তিতুমির নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন এবং নারিকেলবেড়িয়ায় নিজ সৈন্যবাহিনীর নিরাপত্তার জন্য তিনি একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। তিতুমির বাহিনীর দাপটে

চব্বিশ পরগণা ও নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

ঐ সময় ইংরেজ সরকারের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক। তিতুমিরের ক্রমবর্ধমান শক্তির কথা তাঁর কানে পৌঁছালে তিনি তিতুমিরকে দমনের জন্য কামান-গোলাগুলিসহ এক সৈন্যবাহিনী পাঠান। ঐ সৈন্য-বাহিনীর আক্রমণে তিতুমিরের বাঁশের কেল্লা বিধ্বস্ত হয় এবং তিতুমির নিহত হন। এইভাবে তিতুমিরের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়।

তুকারাম : মহারাষ্ট্রীয় সন্ত ও কবি। ১৬০৮ খ্রী জন্ম এবং মাত্র ৪১ বছর জীবিত ছিলেন। সহজ সরল ভাষায় ধর্মের বাণী প্রচার ছিল তুকারামের বৈশিষ্ট্য। তিনি ঐশ শক্তিকে জননী-রূপে কল্পনা করেন।

তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি : মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরের ব্যক্তিগত জীবনের বহু কাহিনী ও তাঁর শাসনকালের নানা তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ। সম্রাট জাহাঙ্গির স্বয়ং এই গ্রন্থের রচয়িতা। সম্রাটের সিংহাসনারোহণ থেকে শুরু করে দ্বাদশ বর্ষ শাসনকালের বিভিন্ন ঘটনা সম্রাট স্বয়ং লেখেন। পরে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় তিনি মুতামদ খাঁকে দিয়ে তাঁর শাসনের উনিশ বছর পর্যন্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করান। সম্রাট জাহাঙ্গিরের মৃত্যুর পর তাঁর শাসনের শেষ কয় বছরের ইতিহাস ঐ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ও সংযোজিত করেন ঐতিহাসিক মুহম্মদ হাদি।

সহজ সুন্দর ভাষায় লেখা এই গ্রন্থটি সম্রাট জাহাঙ্গিরের শাসনকালের সর্বাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ। তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামরিক তৎপরতা ছাড়াও তৎকালীন সামাজিক,সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের নানা তথ্য এই গ্রন্থে মিলে।

তোগলক বংশ : খলজি বংশের শেষ শাসকদের আমলে রাজ্যে চরম অরাজকতা দেখা দেয় এবং দিল্লীর সুলতানশাহির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। সেই সময় সীমান্ত প্রদেশের শাসক গিয়াসুদ্দিন তোগলক বিদ্রোহী হন এবং খলজি বংশের শেষ শাসক খুসরো খাঁকে মসনদচ্যুত করে দিল্লীর শাসন ক্ষমতা দখল করেন। এইভাবে খলজি শাসনের অবসান ও তোগলক বংশের শাসনের সূচনা হয়। তোগলক বংশের শাসন স্থায়ী ছিল ১৩২০ থেকে ১৪১৪ খ্রী পর্যন্ত।

তোগলক বংশীয় শাসনের প্রতি-ষ্ঠাতা গিয়াসুদ্দিন তোগলকের শাসন-কাল মাত্র পাঁচ বছর। বঙ্গদেশে সফল অভিযান শেষ করে যখন তিনি রাজ-ধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন সে সময় তাঁর পুত্র জুনা খাঁ তাঁর সংবর্ধনার্থে এক বিশাল মঞ্চ নির্মাণ করেন। কিন্তু গিয়াসুদ্দিন সে মঞ্চে ওঠার পরেই সেটি রহস্যজনক ভাবে ভেঙে পড়ে এবং তাতেই গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যু হয়। এটি অবশ্য একটি ষড়যন্ত্রের ব্যাপার কিনা তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র জুনা খাঁ সুলতান হন এবং তার নাম হয় মহম্মদ বিন তোগলক। তিনি ছাব্বিশ বছর (১৩২৫-৫১) সুলতান ছিলেন এবং রাজ্য শাসনকালে নানা

পরিকল্পনা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে এমন সব কাজ করেন যার ফলে সমগ্র রাজ্যে কল্পনাতীত বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয় এবং রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁর সব অদ্ভুত কার্যকলাপের জন্য তিনি 'পাগলা রাজা' নামে খ্যাত হন। তাঁর শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা—দোয়াব অঞ্চলে খাজনা বৃদ্ধি, যার ফলে সে অঞ্চলের প্রজাদের অশেষ লাঞ্ছনা ঘটে ; দিল্লী থেকে দাক্ষিণাত্যে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর এবং জনগণের বহু ক্লেশ এবং দুর্গতির পর সে সিদ্ধান্ত বদল করে আবার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন ; তামার প্রতীক মুদ্রা প্রচলনের ব্যর্থ প্রয়াস ; টাকা দিয়ে মোঙ্গল আক্রমণকারীদের ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা এবং বিশ্ব বিজয়ের সাধ মেটাতে সামরিক খাতে বিপুল ব্যয় বৃদ্ধি করে রাজ্যকে প্রায় দেউলিয়া করা।

মহম্মদ বিন তোগলকের কোন পুত্র না থাকায় তাঁর এক পিতৃব্যপুত্র ফিরোজশাহ তোগলককে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয়। ফিরোজশাহর শাসনকাল ১৩৫১-৮৮ খ্রী। তাঁর সাঁইত্রিশ বছর শাসনকালে তিনি রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির শাসক, সে কারণে রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে যে সব বিদ্রোহী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তাদের সকলকে তিনি দমনে অপারগ হন। বঙ্গদেশে বিদ্রোহ দমনের জন্য তাঁর দুটি অভিযানই ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় ব্যর্থ অভিযানের শেষে, ১৩৬০ খ্রী, তিনি জাজপুর (ওড়িশার অন্তর্গত) আক্রমণ করেন ও পুরীর মন্দির বিগ্রহসহ ধ্বংস করেন। ১৩৬২-৬৩ খ্রী তিনি সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করেন এবং বহু ক্ষয়ক্ষতির পর সেখানকার বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হন। মহম্মদ বিন তোগলকের আমলেই দাক্ষিণাত্য বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীন হয়ে যায়। সে অঞ্চল পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা ফিরোজশাহ করেন নি।

ফৌজদারি আইন সংস্কারে, মুদ্রানীতির পুনর্বিন্যাসে, কৃষির উন্নয়নে এবং বিভিন্ন নগরী ও প্রাসাদ নির্মাণে ফিরোজ শাহ কৃতিত্ব দেখান। তিনি শিক্ষা-সংস্কৃতিরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

১৩৮৮ খ্রী ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তোগলক বংশের আরও কয়েকজন সুলতান ১৪১২ খ্রী পর্যন্ত দিল্লীর মসনদে বসেন। ফিরোজের পর সুলতান হন তাঁর পৌত্র দ্বিতীয় তোগলক শাহ (১৩৮৮-৮৯)। চরিত্রহীন, মদ্যপ ও কুশাসক ঐ সুলতানের শাসনকাল একবছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি দিল্লীর প্রভাবশালী আমিরদের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। তারপর তাঁর এক জ্ঞাতিভাই আবু বকর সুলতান হন, কিন্তু তাঁর শাসনকালও বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই শেষ হয়। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে সুলতান হন ফিরোজ শাহ তোগলকের কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহম্মদ (১৩৯০-৯৪)। চার বছর বাদে তাঁর মৃত্যু হলে সুলতান হন পুত্র হুমায়ুন। কিন্তু শাসনকাল একবছর পূর্ণ হওয়ার আগেই এক বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে হুমায়ুন নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর দিল্লীর মসনদের দুই দাবিদার হুমায়ুনের ছোট ভাই মামুদ (১৩৯৪-৯৮)

ও ফিরোজ শাহ তোগলকের পৌত্র নসরৎ শাহর-মধ্যে চার বছর ধরে তীব্র বিবাদ চলে। আর সেই বিবাদ ও সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে জৌনপুর, গুজরাত, মালোয়া, খান্দেশ প্রভৃতি প্রদেশগুলি স্বাধীন হয়ে যায়। সেই সময় তৈমুরলঙ দিল্লী আক্রমণ করলে (১৩৯৮) দুই দাবিদারই প্রাণভয়ে দিল্লী থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু তৈমুর দিল্লী ত্যাগ করলে মামুদ আবার দিল্লীর মসনদ দখল করেন এবং একটানা চোদ্দ বছর, ১৪১২ খ্রী পর্যন্ত দিল্লীর সুলতান থাকেন। তারপর মামুদের মৃত্যু হলে দিল্লীর প্রভাবশালী আমির ওমরাহরা দৌলত খাঁকে সিংহাসনে বসান। দৌলত খাঁ দু'বছর পরে (১৪১২-১৪) তৈমুরের ভারতীয় উপনিবেশের প্রতিনিধি খিজর খাঁ কর্তৃক মসনদচ্যুত হন। দৌলত খাঁর সিংহাসনচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে তোগলক বংশীয় শাসনের অবসান ও সৈয়দ বংশীয় সুলতানির সূচনা হয়।

তোরমান: গুপ্তবংশীয় সম্রাট কুমারগুপ্তের শাসনকালে, ৪৮৪ খ্রী ভারতে হুনদের যে অভিযান হয় তার নেতা ছিলেন তোরমান। তোরমানের নেতৃত্বে হুনরা পাঞ্জাব, রাজপুতানা, সিন্ধু, মালব প্রভৃতি স্থান জয় করে। তারপর 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করে হুন দলপতি তোরমান ঐ সব অধিকৃত এলাকায় শাসন কার্য শুরু করেন। ৫১১ খ্রী তোরমানের মৃত্যু হয় (হুন আক্রমণ-দ্র.)।

তেগবাহাদুর: শিখ সম্প্রদায়ের নবম গুরু, জন্ম ১৬২২ খ্রী। তেগবাহাদুরের স্বাধীন কার্যকলাপ মোগল সম্রাট ঔরংজেবের পছন্দ না হওয়ায় তিনি তেগবাহাদুরকে দিল্লীতে ডেকে পাঠান। তেগবাহাদুর দিল্লী গেলে মোগল সম্রাট তাঁকে বন্দী করেন, কিন্তু জয়পুরের রাজার মধ্যস্থতায় তেগবাহাদুর মুক্তি পান। তারপর জয়পুরের রাজার আসাম অভিযানকালে তেগবাহাদুর তাঁর সঙ্গী হন। সেই সময় ১৬৬৬ খ্রী পাটনায় তেগবাহাদুরের পুত্র, শিখ সম্প্রদায়ের দশম ও শেষ ধর্মগুরু, গোবিন্দ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন।

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের জোর করে ধর্মান্তরিত করার প্রতিবাদ করার জন্য তেগবাহাদুর আবার মোগল সম্রাটের বিরাগভাজন হন। ঐ সময় মোগল সম্রাট আবার তাঁকে ডেকে পাঠালে পুত্র গোবিন্দ সিংহকে দশম ধর্মগুরু মনোনীত করে তিনি দিল্লী যাত্রা করেন। সেইখানে ঔরংজেব তাঁকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বললে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তার জন্য তাঁকে অশেষ নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। গুরু তেগবাহাদুরের এই আত্মদান শিখজাতিকে বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ করে এবং দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে শিখ সম্প্রদায়কে নবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। অবিলম্বে শিখ জাতি একটি অনুপ্রাণিত যোদ্ধৃজাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

তেলেঙ্গানা: অন্ধ্র প্রদেশের যে নয়টি জেলা ১৯৫৬ খ্রী নভেম্বর মাসে রাজ্য পুনর্গঠনের পূর্বে হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাদের মিলিত

এলাকাকে তেলেঙ্গানা বা তেলিঙ্গানা বলা হয়। একাদশ শতাব্দীর উৎকল-রাজ উদ্যোৎকেশরীর সময়ের একটি লিপিতে তিলিঙ্গ দেশের উল্লেখ আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে তেলেঙ্গানা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আইন-ই-আকবরীতে তেলেঙ্গানা বা তেলঙ্গ সুবার উল্লেখ আছে।

তৈমুরলঙ: মধ্য এশিয়ায় সমরখন্দ থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী কেশ নামক ছোট শহরে ১৩৩৬ খ্রী আমির তৈমুরের জন্ম হয়। শৈশবে তাঁর একটি পা খোঁড়া হয়ে যায় বলে তিনি তৈমুরলঙ নামে অভিহিত হন। পিতা আমির তুরঘের মৃত্যুর পর তিনি চুঘাতি তুর্কি সম্প্রদায়ের নেতা হন এবং অনতি-বিলম্বে পারস্য, তুর্কিস্তান, মেসোপটামিয়া জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধী-শ্বর হন। ১৩৯৮ খ্রী ৬২ বছর বয়সে তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন। তখন দিল্লীর মসনদে ছিলেন তোগলক বংশের শেষ সুলতান মামুদ শাহ। রণকুশল দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা তৈমুরকে বাধাদানের ক্ষমতা দিল্লীর দুর্বল সুলতানের ছিল না। তৈমুর প্রায় বিনা বাধায় দিল্লী পৌঁছান এবং প্রায় তিনমাস ধরে অবাধ হত্যা ও লুণ্ঠনের পর বিপুল ধনসম্পদ নিয়ে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তার আগে তিনি খিজর খাঁকে তাঁর লাহোর, মুল-তান প্রভৃতি পাঞ্জাবের অধিকৃত স্থান-গুলিতে শাসক নিযুক্ত করেন। তৈমুরের হত্যা ও লুণ্ঠনের ফলে অচিরে উত্তর ভারতে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ও তোগলকবংশীয় সুলতানশাহির শেষ দিন ঘনিয়ে আসে।

ত্রিপুরা: পূর্বভারতের একটি রাজ্য। রাজ্যটির সূচনাকালের ইতিহাস অস্পষ্ট। গৌড়রাজের সহায়তায় রত্নফা নামক রাজা সম্ভবত সর্বপ্রথম স্বাধীন রাজা-রূপে ত্রিপুরা শাসন করেন। তখন থেকে ত্রিপুরার রাজার উপাধি হয় মাণিক্য। ধন্যমাণিক্য (১৪৬৩-১৫১৫) যখন ত্রিপুরার রাজা তখন বঙ্গদেশের সুলতান হুসেনশাহর সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়। সেই সময় ত্রিপুরা রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীকালে ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিজয়-মাণিক্য, অমরমাণিক্য প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের নবাব সুজাউদ্দিনের শাসনকালে ত্রিপুরা স্বতন্ত্ররাজ্য থাকলেও তার স্বাধীনতা হ্রাস পায়। সে সময় ত্রিপুরার নাম বদল করে রোসেনাবাদ রাখা হয়। নবাব আলিবর্দি খাঁ ত্রিপুরা জয় করেন। পলাশির যুদ্ধে বঙ্গদেশের নবাব পরাজিত ও শক্তিহীন হয়ে পড়লে ত্রিপুরা আবার স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে আত্ম-প্রকাশ করে।

পরবর্তীকালে ত্রিপুরা ইংরেজ সর-কারের বশ্যতা স্বীকার করলেও ত্রিপুরার সঙ্গে ইংরেজ সরকারের কোনদিন কোন সন্ধি হয়নি। ত্রিপুরার রাজা অধীনতা-মূলক মিত্রতা বা অনুরূপ কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেননি এবং ইংরেজদের কোন করও ত্রিপুরাকে দিতে হত না। ১৮৭১ খ্রী ইংরেজ সরকার ত্রিপুরায় একজন পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত করেন। কিন্তু মাত্র সাত বছর বাদে সে ব্যবস্থা পরিবর্তন করা হয়। তখন থেকে পার্শ্ব-বর্তী ত্রিপুরা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হন ত্রিপুরা রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেন্ট।

বর্তমানে ত্রিপুরা ভারতের পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন একটি রাজ্য।

ত্রিম্বকজি: ত্রিম্বকজি ছিলেন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাওর মন্ত্রী। একজন স্বাধীনচেতা দক্ষ-প্রশাসক ও দুঃসাহসী কূটনীতিবিদরূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। বেসিনের চুক্তিতে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও যে ইংরেজের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হন তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ত্রিম্বকজি তৎপর হন। মারাঠা শক্তি পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি হোলকার, সিন্ধিয়া, ভোঁসলে ও পেশোয়াকে ঐক্যবদ্ধ করেন। ইংরেজ অনুগত বরদার গাইকোয়াড়ের দেওয়ান পুনায় এলে ত্রিম্বকজির ষড়যন্ত্রে নিহত হন। ঐ ঘটনার পর পুনাস্থ বৃটিশ রেসিডেণ্ট এলফিনস্টোন ত্রিম্বকজিকে এক দুর্গে বন্দী করেন। কিন্তু বাজিরাওর সহায়তায় ত্রিম্বকজি সে দুর্গ থেকে পলায়ন করেন এবং পূর্বের মতোই মারাঠা শক্তি সংহত করার কাজে লিপ্ত থাকেন।

কিন্তু ১৮১৭-১৮ খ্রী তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয় হয় এবং ত্রিম্বকজিও ইংরেজ সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন। তারপর ত্রিম্বকজি সারা জীবন চুনার দুর্গে বন্দী থাকেন।

ত্রিলোচন পাল: উত্তর পাঞ্জাবের হিন্দু শাহিবংশীয় নৃপতি, আনন্দ পালের পুত্র। ১০১৪ খ্রী পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন। কাশ্মীরের যুদ্ধে ত্রিলোচন পাল সুলতান মামুদের কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন। ১০১৯ খ্রী সুলতান মামুদের আর এক অভিযান কালে রাহুত নদীর (রামগঙ্গা) তীরে এক খণ্ডযুদ্ধে ত্রিলোচন পাল পুনরায় পরাজিত হন এবং তার কিছু পরে ১০২১-২২ খ্রী তাঁর অনুগামীদের হাতে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র ভীম পাল সিংহাসনে বসেন। ভীম পাল শাহিবংশের শেষ নৃপতি। তাঁর মৃত্যু হয় ১০২৩ খ্রী।

থানেশ্বর: বর্তমান হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান। পূর্ব নাম স্থানীশ্বর, মহাভারত ও বামনপুরাণে হিন্দুর তীর্থক্ষেত্ররূপে তার উল্লেখ আছে। পঞ্চম শতাব্দীর শেষে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর সূচনায় থানেশ্বরকে কেন্দ্র করে পুষ্যভূতি রাজ বংশের শাসনের সূত্রপাত হয়। পরে ঐ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট হর্ষবর্ধন থানেশ্বর থেকে কনৌজে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু থানেশ্বর যে হর্ষবর্ধনের শাসনকালেও সমৃদ্ধ শহর ছিল তা হিউ-এন সাং এর বিবরণী পাঠে জানা যায়।

১০১৪ খ্রী সুলতান মামুদ থানেশ্বর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন এবং যাওয়ার সময় চক্রস্বামীর মন্দিরের বিগ্রহটি গজনিতে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে থানেশ্বর শিখদের অধিকারে যায় এবং পরিশেষে যায় ইংরেজ শাসনাধীনে।

থিব: উত্তর ব্রহ্মের রাজা, শাসনকাল ১৮৭৮-৮৫ খ্রী। বাণিজ্যিক অধিকার নিয়ে ভারতস্থ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে বিরোধ হ'লে, ১৮৮৫ খ্রী গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ডাফারিনের শাসনকালে ইংরেজ সরকারের সৈন্যদল থিবের রাজ্য আক্রমণ করে। পক্ষকাল পরে থিব আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। ১৮৮৬ খ্রী সূচনায় সমগ্র উত্তরব্রহ্ম ইংরেজ

অধিকারভুক্ত হয়। রাজা থিব ও তাঁর পত্নী ভারতের রত্নগিরিতে নির্বাসিত হন। নির্বাসনকালেই ১৮১৬খ্রী থিবের মৃত্যু হয়।

দণ্ডী : অলঙ্কার শাস্ত্রের ইতিহাসে চিরন্তন আলঙ্কারিকরূপে সম্মানিত। 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থের রচয়িতা। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের লোক

দন্তিদুর্গ : দাক্ষিণাত্যে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্রকূট রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনের হাত থেকে তিনি মহারাষ্ট্র ছিনিয়ে নেন এবং সেখানেই রাষ্ট্রকূট রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দন্তিদুর্গ সম্ভবত কাঞ্চি, কলিঙ্গ, দক্ষিণ কোশল, মালব প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন।

দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৭-৮৩) : গুজরাতের কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে জন্ম, পূর্ব নাম মূলশঙ্কর। যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং নানা স্থানে ঘুরে ও নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে জ্ঞানার্জন করেন। ১৮৭৫ খ্রী তাঁর উদ্যোগে বোম্বাই শহরে 'আর্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। দু বছর পরে লাহোরে আর্য সমাজের একটি শাখা স্থাপিত হয় এবং তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। বৈদিক ধর্মপ্রচার, জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরোধিতা এবং হিন্দু সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণ আর্য সমাজের মুখ্য কর্মসূচী ছিল। দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর কুসংস্কারমুক্ত মন ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার জন্য গোঁড়া হিন্দু সমাজের বিরাগভাজন হন এবং তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। ভারতের জাতীয় চেতনা পুনরুজ্জীবনে দয়ানন্দ সরস্বতী ও আর্যসমাজের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

দরায়ুস : পারস্যসম্রাট সাইরাসের পৌত্র দরায়ুস (প্রথম) খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে গান্ধার ও সিন্ধু উপত্যকা জয় করে পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। পারস্যের তৎকালীন বহু লেখায় গান্ধার ও সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসী-দের পারস্যসম্রাটের প্রজা ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ এলাকা ছিল পারস্য-সাম্রাজ্যের বিংশতিতম সত্রপ (প্রদেশ) ও সর্বাধিক জনবহুল এলাকা।

ভারতে গ্রীক সম্রাট আলেক-জাণ্ডারের অভিযানকালে পারস্যসাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। সে সময় দরায়ুস (তৃতীয়) গ্রীক সম্রাটের অগ্রগতি প্রতিরোধকল্পে যে সৈন্যবাহিনীর সমা-বেশ করেন তাতে অনেক ভারতীয় সৈন্য ছিল (পারসিক অভিযান দ্র)।

দলীপ সিংহ : পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৪৩ খ্রী মহারাজ রণজিৎ সিংহ প্রতিষ্ঠিত শিখ রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চার বছর ছিল বলে মাতা ঝিন্দনবাঈ অভিভাবিকারূপে রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনায় দায়িত্ব নেন। দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের পর ১৮৪৯ খ্রী লর্ড ডালহৌসি সমগ্র পাঞ্জাব অধিকার করলে মাত্র সাড়ে দশ বছর বয়সে দলীপ রাজ্যচ্যুত হন। ইংরেজ সরকার তাঁকে দশ লক্ষ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করেন।

দশসালা বন্দোবস্ত ঃ লর্ড কর্নওয়া-লিশ কর্তৃক ১৭৮৯ খ্রী বঙ্গ-বিহার-ওড়িশায় প্রবর্তিত দশ বছর মেয়াদি

ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা। কিন্তু চার বছর পরেই, ১৭৯৩ খ্রী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে জমির উপর জমিদারের স্থায়ী মালিকানাস্বত্ব স্বীকৃত হওয়ায় দশসালা বন্দোবস্ত আইন প্রত্যাহৃত হয়।

(চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্র)

দাউদ খাঁ কররানি : বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন আফগান সুলতান, রাজত্বকাল ১৫৭২-৭৬ খ্রী। অত্যন্ত অত্যাচারী, নিষ্ঠুর ও উদ্ধত স্বভাবের লোক ছিলেন। নিজ মসনদ নিরাপদ করার জন্য মসনদের সম্ভাব্য দাবিদার সব আত্মীয়কে হত্যা করেন। দাউদ খাঁ রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন ও উত্তর প্রদেশের মোগল শাসিত অঞ্চল জামানিয়া আক্রমণ করেন। তাঁর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে মোগল সম্রাট আকবর স্বয়ং সসৈন্যে অগ্রসর হন এবং হাজিপুর ও পাটনা জয় করেন (১৫৭৪ খ্রী)। নিরুপায় দাউদ নৌকা-যোগে পলায়ন করে প্রথমে বঙ্গদেশে আসেন, তারপর পশ্চাদ্ধাবিত হয়ে ওড়িশায় পলায়ন করেন। পরে দাউদের সঙ্গে মোগলদের যে সন্ধি হয় তাতে দাউদ বঙ্গদেশের অধিকার ত্যাগ করেন। বিনিময়ে মোগল সম্রাট ওড়িশায় দাউদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেন।

পরে মোগল অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে দাউদ আর একবার বঙ্গদেশ জয়ের চেষ্টা করেন কিন্তু রাজমহলের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন (১৫৭৬)। তাঁর মৃত্যুর ফলে বঙ্গদেশে দু'শ বছরের বেশি স্থায়ী সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে।

দাদরা ও নগর হাভেলি : দুটি ক্ষুদ্র প্রাক্তন পর্তুগীজ উপনিবেশ। ছিট তালুক দুটি অপর প্রাক্তন পর্তুগীজ উপনিবেশ দমন-এর প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আয়তন ১৮৯ বর্গ মাইল। রাজধানী সিলভাসা। ছিট তালুকটির জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ১৯৫৪ খ্রী ১০ অক্টোবর স্বাধীন সরকার গঠন করেন। ১৯৬১ খ্রী ১১ আগস্ট দাদরা নগর হাভেলি ভারতে একটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা লাভ করে।

দাদাভাই নৌরজি : ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগের নেতা। বোম্বাইর পার্শি পুরোহিত বংশে জন্ম। শিক্ষাব্রতীরূপে কর্মজীবনের সূচনা করেন। পরে ১৮৫৬ খ্রী ইংলণ্ডে যান এবং সেখানে রাজনীতিতে যোগ দেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে ১৮৮৩ খ্রী কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধি-বেশনে সভাপতিত্ব করেন। আবার ইংলণ্ডে যান ও ১৮৯২ খ্রী লিবারেল দলের প্রার্থীরূপে বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনিই বৃটিশ পার্লামেন্টের ভারতের প্রথম সদস্য। ১৮৯৩ খ্রী লাহোরে এবং ১৯০৬ খ্রী কলকাতার জাতীয় কংগ্রেসের অধি-বেশনে সভাপতিত্ব করেন। কলকাতার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনিই প্রথম 'স্বরাজ' জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন।

দারা সিকোহ (১৬১৫-৫৯) : মোগল সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ-পুত্র। শাহজাহানের শাসনকালে তিনি মুলতান, কাবুল, পাঞ্জাব, গুজরাত, এলাহাবাদ ও বিহারের শাসকরূপে

যোগ্যতার পরিচয় দেন। কিন্তু তিনি শাহজাহানের বিশেষ প্রিয় ছিলেন বলে সম্রাট বেশি সময় তাঁকে নিজের কাছে রাখতেন। দারা ছিলেন তাঁর পিতামহ সম্রাট আকবরের মতো উদার ও ন্যায়পরায়ণ, তদুপরি বিশেষ বিদ্যোৎসাহী। তিনি গীতা ও উপনিষদ ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন এবং ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে অনেকগুলি মৌল গ্রন্থ রচনা করেন। অধ্যয়ন ও লিখনে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন বলে সেদিন রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিরাপদ করার জন্য যে কূটবুদ্ধি ও রণকুশলতার প্রয়োজন ছিল তা আয়ত্তে আনার অবকাশ দারা পাননি। ফলে সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর ১৬৫৭ খ্রী তাঁর চার পুত্রের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যে সংগ্রাম শুরু হয় তাতে দারা পরাস্ত হন। তৃতীয় ভ্রাতা ঔরংজেব সিংহাসন দখল করার পর ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে দারাকে হত্যা করেন।

দাসবংশ (১২০৬-৯০): তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভের পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে ১২৯২ খ্রী মহম্মদ ঘুরি কুতবুদ্দিন আইবককে দিল্লীর শাসক নিযুক্ত করে যান। তারপর ১২০৬ খ্রী নিঃসন্তান অবস্থায় মহম্মদ ঘুরি নিহত হলে কুতবুদ্দিন স্বাধীন সুলতান-রূপে শাসন কার্য শুরু করেন। কুতব ছিলেন মহম্মদ ঘুরির ক্রীতদাস, পরবর্তী-কালে স্বীয় প্রতিভা ও যোগ্যতাবলে তিনি মহম্মদ ঘুরির আস্থা অর্জন করেন ও উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হন।

কুতবুদ্দিন প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন বলেই তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসনকালকে দাসবংশীয় শাসন বলা হয়। দাসবংশীয় শাসকদের আরও কয়েকজন প্রথম জীবনে ক্রীত-দাস ছিলেন।

স্বাধীন সুলতানরূপে কুতবুদ্দিনের শাসনকাল মাত্র চার বছর। ১২১০ খ্রী কুতবের মৃত্যু হলে তাঁর অযোগ্য পুত্র আরামশাহ দিল্লীর মসনদে বসেন। আরামশাহর অযোগ্যতার জন্য চারি-দিকে বিদ্রোহ দেখা দিলে অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য দিল্লীর প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এক বছরের মধ্যেই আরাম-শাহকে গদিচ্যুত করে কুতবুদ্দিনের জামাতা আলতামাস বা ইলতুৎমিসকে দিল্লীর সুলতান করেন। ইলতুৎমিসও প্রথম জীবনে কুতবের ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু যোগ্যতার জন্য কুতবের স্নেহানুকূল্য লাভ করেন ও কুতবের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ইলতুৎ-মিস দাসবংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান। ইলতুৎমিসের শাসনকালে (১২১১-৩৫) পশ্চিমে সিন্ধু পাঞ্জাব থেকে পূর্বে বঙ্গ-দেশ পর্যন্ত দিল্লীর সুলতানি শাসন বিস্তৃতি লাভ করে। উদ্ধত আমির ওমরাহদের উপরেও সুলতানের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ইলতুৎমিসের পুত্রদের মধ্যে কেউ যোগ্য শাসক না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা সুলতানা রাজিয়া নিজেকে পিতার উত্তরাধিকারিনী বলে ঘোষণা করেন। সিংহাসনে বসার পর রাজিয়াকে বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। দিল্লীর প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাঁকে গদিচ্যুত করে ইলতুৎমিসের

দ্বিতীয় পুত্র রুকনুদ্দিনকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু রুকনুদ্দিন উচ্ছৃঙ্খল ও অযোগ্য শাসক হওয়ায় তাঁর সমর্থকরাই তাঁকে বিতাড়িত করে আবার রাজিয়াকে সুলতানা নিযুক্ত করেন। কিন্তু রাজিয়ার শাসনকাল মাত্র চার বছর স্থায়ী হয়। ১২৪০ খ্রী সরহিন্দের শাসনকর্তা ইক্তিয়ারউদ্দিন আলতুনিয়াকে দমন করতে গিয়ে সুলতানা রাজিয়া নিজেই পরাজিত ও বন্দী হন। সেই অবকাশে রাজিয়ার আর এক ভাই মুইজুদ্দিন বাহ্‌রাম দিল্লীর মসনদে বসেন। ওদিকে রাজিয়া ইক্তিয়ারউদ্দিন আলতুনিয়াকে বিবাহ করে দিল্লীর মসনদ উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু মুইজুদ্দিন তাঁদের উভয়কেই পরাজিত ও বন্দী করেন। পরে তাঁদের হত্যা করা হয়।

মুইজুদ্দিনের পর রুকনুদ্দিনের পুত্র আলাউদ্দিন মাসুদশাহ, তারপর ইলতুৎমিসের পুত্র নাসিরুদ্দিন দিল্লীর সুলতান হন। নাসিরুদ্দিন ছিলেন শান্ত, উদার, ন্যায়পরায়ণ, ধর্মভীরু প্রকৃতির লোক। শাসনকার্যে তাঁর সামান্যই আগ্রহ ছিল। সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনের জন্য তিনি ইতিহাসে 'ফকির রাজা' নামে অভিহিত। নাসিরুদ্দিনের শাসনকাল ১২৪৬-৬৬ খ্রী। তিনি নামেই সুলতান ছিলেন। তাঁর মন্ত্রী ও ব্যক্তিগত সম্পর্কে শ্বশুর গিয়াসুদ্দিন বলবনই ছিলেন রাজ্যের প্রকৃত শাসক। নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর বলবন স্বয়ং দিল্লীর মসনদে বসেন এবং দক্ষতার সঙ্গে বিশ বছর (১২৬৬-৮৬) শাসনকার্য পরিচালনা করেন। বলবনও প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন।

বলবনের মৃত্যুর পর দাসবংশীয় সুলতানশাহির গৌরব ও মর্যাদার অবসান ঘটে। বলবনের জীবদ্দশাতেই মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধকালে তাঁর পুত্র মুহম্মদের মৃত্যু হয়। সে কারণে বলবন তাঁর পৌত্র কাই-খসরুকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। কিন্তু দিল্লীর প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বলবনের পৌত্র কাই-খসরুর বদলে বুঘরা খাঁর পুত্র কাই কোবাদকে সুলতান মনোনীত করেন।

কাইকোবাদ ছিলেন চরিত্রহীন, মদ্যপ ও সর্বপ্রকারের শালীনতাবর্জিত। ফলে দিল্লীর দরবারে দারুণ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। সেই অরাজকতার মধ্যে পাঞ্জাবের শাসক জালালুদ্দিন খলজি বিদ্রোহী হন এবং ১২৯০ খ্রী কাইকোবাদকে বন্দী ও নিহত করে দিল্লীর মসনদ দখল করেন। এইভাবে দাশবংশীয় সুলতানির অবসান ও খলজি বংশীয় সুলতানির সূচনা হয়।

দাহির ঃ ভারতে আরব অভিযানকালে দাহির সিন্ধুর রাজা ছিলেন। খলিফ ওমর ও তাঁর প্রতিনিধি ইরাকের শাসক হজ্জাজকে সিংহলের রাজা যে আট জাহাজ বোঝাই উপঢৌকন পাঠান তা দেবল বন্দরে (বর্তমান করাচি) লুণ্ঠিত হওয়ায় হজ্জাজ রাজা দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু দাহির জানান যে দেবল বন্দর তাঁর রাজ্য সীমানার অভ্যন্তরে নয়, সে কারণে জলদস্যুদের কাজের দায়িত্ব তিনি নিতে পারবেন না। তখন দাহিরের বিরুদ্ধে হজ্জাজ সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু দাহিরের প্রতিরোধে প্রথম আরব অভিযান ব্যর্থ হয়।

তারপর ৭১২ খ্রী হজ্জাজ আবার দাহিরের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। এবার আরব সৈন্যবাহিনী ছিল অনেক বেশি সুসজ্জিত ও শক্তিশালী এবং আক্রমণের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন হজ্জাজের ভ্রাতুষ্পুত্র তথা জামাতা মহম্মদ বিন কাশিম। সে আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি রাজা দাহিরের ছিল না। তবু তিনি যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ হারান। রাজা দাহির ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং সীমিত সামর্থ্য সত্ত্বেও সাহসী যোদ্ধা। তাঁর মৃত্যুর পর মহিষী পনিবাঈ ও পুত্র জয়সিংহ রাওয়ার দুর্গে আশ্রয় নেন ও সেখান থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যান। সে দুর্গের পতন হলে রানী পনিবাঈ ও আরও অনেক নারী একসঙ্গে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। তারপর আলোর ও মুলতান দুর্গের পতন হলে দাহিরের সমগ্র রাজ্য মহম্মদ বিন কাশিমের অধিকারভুক্ত হয়। এইভাবে অষ্টম শতাব্দীর সূচনায় ভারতে প্রথম মুস্লিম রাজ্য গড়ে ওঠে।

দিদ্দা: খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কাশ্মীর রাজ্যের রানী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা রূপে রাজ্য শাসন শুরু করেন। রাজ-অভিভাবিকা থাকা কালে তিনি নাকি তাঁর প্রতিটি পুত্রকে, সাবালক হয়ে সিংহাসন দাবি করার আগেই, হত্যা করেন।

দিন-ই-ইলাহি: মোগল সম্রাট আকবর ১৫৮১ খ্রী দিন-ই-ইলাহি বা তাওহিদ-ই-ইলাহি ধর্মের প্রবর্তন করেন। ভারতের সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য একটি জাতীয় ধর্মরূপে দিন-ই-ইলাহি মতবাদ প্রচারিত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের একত্র খানাপিনা ও সামাজিক জীবনে সর্বজনীন আচরণের উপর দিন-ই-ইলাহি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে দিন-ই-ইলাহি ধর্মের সার কথা ও বিভিন্ন আচরণবিধি লিপিবদ্ধ আছে।

এই ধর্মের কতকগুলি নির্দেশে মুস্লিম ধর্মকে আঘাত করা হয়েছিল, সেকারণে মুস্লিম ধর্মাবলম্বীদের মনে দিন-ই-ইলাহি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আবার মূলত মুস্লিম ধর্মের কাঠামোর উপরেই দিন-ই-ইলাহি ধর্ম গড়ে ওঠে বলে হিন্দুদেরও ঐ ধর্ম আকৃষ্ট করতে পারেনি। একমাত্র বীরবল ছাড়া কোন হিন্দু দিন-ই-ইলাহি ধর্ম গ্রহণ করেন নি। সম্রাটের ইচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর দুই বিশিষ্ট হিন্দু সভাসদ রাজা ভগবান দাস ও মানসিংহ ঐ ধর্ম গ্রহণ করেন নি। রাজদরবারের বাইরে ঐ ধর্মের কথা অল্প সংখ্যক লোকের কাছেই পৌঁচেছিল এবং সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পরেই দিন-ই-ইলাহি লুপ্ত হয়। দিন-ই-ইলাহি ব্যর্থ হলেও ঐ ধর্মীয় মতবাদের মধ্য দিয়ে সম্রাট আকবরের যে সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় মেলে তার ঐতিহাসিক মূল্য সীমাহীন।

দিনেমার, ভারতে: ডেনমার্কের অধিবাসীরা ভারতে দিনেমার নামে পরিচিত। ডেনমার্কে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয় ১৬১৬ খ্রী। ঐ কোম্পানি ১৬২০ খ্রী ত্রাঙ্কোবারে ও

১৭৫৫ খ্রী শ্রীরামপুরে কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু দিনেমার বণিকরা ভারতে আগত অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিশেষ সুবিধা করতে পারে না। সে কারণে ১৮৪৫ খ্রী তাদের কারখানা ও কুঠি ইংরেজদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে তারা ভারত ত্যাগ করে।

দিব্যোক : দিব্যোক অথবা দিব্য কৈবর্ত নেতারূপে খ্যাত। পাল রাজা দ্বিতীয় মহীপালের শাসনকালে উত্তর-বঙ্গে যে প্রচণ্ড প্রজা বিদ্রোহ হয় দিব্যোক তার নেতা ছিলেন। ঐ বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে দ্বিতীয় মহী-পাল নিহত হন (১০৭৫ খ্রী)। বিদ্রোহে জয়ী দিব্যোক উত্তরবঙ্গের একাংশের শাসক হন। তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁর ভ্রাতা রুদ্রোক এবং তারপরে ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মহী-পালের ছোট ভাই রামপাল ভীমকে পরাজিত ও বন্দী করে পূর্বপরাজয়ের প্রতিশোধ নেন এবং উত্তর ও পূর্ববঙ্গ এবং আসামের কিছু অংশ পুনরুদ্ধার করেন।

সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিতম কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল উত্তরবঙ্গে দিব্যোকের নেতৃত্বে প্রজাবিদ্রোহ।

দিল্লী : তোমরবংশীয় রাজপুত নৃপতি প্রথম অনঙ্গপাল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতা-ব্দীর মধ্যভাগে, পরবর্তীকালে নির্মিত কুতবমিনারের কাছে, লালকোট দুর্গ নির্মাণ করে দিল্লী নগরীর পত্তন করেন। পরবর্তীকালে, সম্ভবতঃ ১১৬৩ খ্রী, চৌহানবংশীয় রাজপুত নৃপতি বিগ্রহ রায় তোমরবংশীয় নৃপতি দ্বিতীয় অনঙ্গ-পালের কাছ থেকে দিল্লী নগর জয় করেন। তারপর বিগ্রহ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী পৃথ্বীরাজ চৌহান দিল্লী নগরকে সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করেন। পৃথ্বীরাজ রাজপুত স্থাপত্যের আদর্শে দিল্লীতে ২৭টি হিন্দু মন্দির নির্মাণ করেন।

১১৯২ খ্রী তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরি পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত ও নিহত করে দিল্লী দখল করেন। তারপর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কালে মহম্মদ ঘুরি তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর কুতবুদ্দিন আইবককে দিল্লীর সুলতান নিযুক্ত করে যান। কুতব পৃথ্বীরাজ নির্মিত হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করে সেই উপাদানেই মেহেরৌলির কাছে কুবাত উল ইসলাম নামে এক মসজিদ নির্মাণ করেন। ১১৯৯ খ্রী কুতব মিনার নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং তা শেষ হয় তাঁর জামাতা ও উত্তরাধিকারী ইলতুৎমিসের শাসনকালে।

সুলতানশাহির সূচনা থেকে মোগল রাজত্বের শেষ পর্যন্ত দিল্লী ছিল ভারতের রাজধানী। পরে ইংরেজ সরকারও ১৯১১ খ্রী কলকাতা থেকে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং স্বাধীন ভারতেও দিল্লী ভারতের রাজধানী থাকে।

অবশ্য মুস্লিম শাসনকালে দিল্লী একদা দীর্ঘ সময়ের জন্য রাজধানীর মর্যাদা হারায়। ১৫০৩ খ্রী লোদী বংশীয় সুলতান সিকন্দার দিল্লী থেকে আগ্রায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং ১৫২৬ খ্রী বাবর দিল্লী জয় করে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করলেও

তিনি দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন না। জাহাঙ্গিরের শাসনকাল পর্যন্ত আগ্রা ছিল মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী। তারপর শাহজাহান আবার দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সম্রাট শাহজাহান ১৬৩৯ খ্রী দিল্লীর লাল কেল্লা নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ঔরংজেবের শাসনকালে দিল্লীর আরও উন্নতি হয়। তখন দিল্লীর লোকসংখ্যা ছিল দুই লক্ষ।

১৭৩৭ খ্রী মারাঠারা দিল্লী আক্রমণ করে। তার দুবছর বাদে, ১৭৩৯ খ্রী নাদির শাহর আক্রমণে দিল্লী নগর বিধ্বস্ত হয়। ১৮০৩ খ্রী মারাঠাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে দিল্লীর মোগল সম্রাটকে রক্ষা করতে ইংরেজ সৈন্য-বাহিনী দিল্লী প্রবেশ করে। ১৮৬৭ খ্রী দিল্লী কলকাতার মধ্যে রেল সংযোগ স্থাপিত হয় এবং ইংরেজ সরকারের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় ১৯১১ খ্রী ১২ ডিসেম্বর। তারপর ১৯৪৭ খ্রী ১৫আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে দিল্লী হয় ভারতের রাজধানী।

দিল্লী দরবার : ১৯১১ খ্রী ১২ ডিসেম্বর দিল্লীতে এই দরবার অনুষ্ঠিত হয়। সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী ঐ দরবারে উপস্থিত ছিলেন। দিল্লী দরবারে সম্রাটের ঘোষণায় দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। ঐ ঘোষণায় বঙ্গভঙ্গ রদের ও ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরের কথা বলা হয়।

দীনশা এদুলজি ওয়াচা (১৮৪৪—১৯৩৬) : পার্শি সম্প্রদায়ভুক্ত উদার-নৈতিক জাতীয়তাবাদী নেতা। জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হওয়ার দিন থেকে তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯০১ খ্রী কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন।

দুর্গাবতী : গণ্ডোয়ানা রাজ্যের রাজমাতা। ১৫৬৪ খ্রী মোগল সম্রাট আকবর যখন গণ্ডোয়ানা আক্রমণ করেন, রানী দুর্গাবতী ছিলেন সে রাজ্যের নাবালক রাজা, তাঁর পুত্র নারায়ণের অভিভাবিকা। মোগলদের প্রচণ্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে রানী দুর্গাবতী রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন। বীরাঙ্গনা মাতার পুত্র নারায়ণও রণক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু বরণ করেন।

দুর্লভবর্ধন : সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। কারকোতা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং দুর্লভবর্ধনের রাজত্বকালে কাশ্মীর পরিদর্শন করেন ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় ঐ বংশের শ্রে নৃপতি।

নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে কারকোতা বংশীয় শাসনের অবসান ঘটে এবং উৎপল বংশীয় শাসনের সূচনা হয়।

দেবগিরির যাদব বংশ : কল্যাণীর চালুক্য রাজ্যের সামন্ত দেবগিরির যাদব নৃপতিরা চালুক্য রাজারা শক্তিহীন হওয়ার পর দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে স্বাধীন নৃপতিরূপে রাজ্যশাসন শুরু করেন। শেষ চালুক্য নৃপতি চতুর্থ সোমেশ্বরকে ১১৯০ খ্রী পরাজিত করে স্বাধীন যাদব বংশের প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চম বিল্লম নাসিক থেকে দেবগিরি (খান্দেশ) পর্যন্ত স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

কৃষ্ণা নদীর উত্তরে অবস্থিত ঐ রাজ্যের রাজধানী ছিল দেবগিরি।

ঐ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নৃপতি সিংহন (রাজত্বকাল ১২১০-৪৭) হয়সাল নৃপতি দ্বিতীয় বল্লালকে পরাজিত করে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণেও রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি মালব, গুজরাত ও অন্ধ্রের শাসকদের বিরুদ্ধেও সফল যুদ্ধ পরিচালনা করে রাজ্যের সীমানা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

দেবগিরির যাদব বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য নৃপতি রামচন্দ্র (রাজত্বকাল ১২৭১-১৩০৯)। তাঁর রাজত্বকালেই দক্ষিণ ভারতে প্রথম মুস্লিম অভিযান পরিচালিত হয়। আলাউদ্দিন খলজি (তখন তিনি কারার শাসক) অতর্কিতে দেবগিরি আক্রমণ করে (১২৯৪ খ্রী) রামচন্দ্রকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন। সে বার রামচন্দ্র অব্যাহতি পান। কিন্তু ১৩০৭ খ্রী আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর আবার দেবগিরি আক্রমণ করেন ও রামচন্দ্রকে বন্দী করে দিল্লী নিয়ে যান। কিন্তু আলাউদ্দিন তাঁর প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করেন এবং রামচন্দ্রও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন।

১৩০৯ খ্রী রামচন্দ্রর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র শঙ্কর রাজাসনে বসেই সুলতান আলাউদ্দিনকে করদান বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে ১৩১২ খ্রী আলাউদ্দিনের সেনাবাহিনী আবার দেবগিরি আক্রমণ করে। যুদ্ধে শঙ্কর নিহত হন এবং দেবগিরি রাজ্য খলজি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দেবগিরির যাদব নৃপতিরা শিল্প ও সাহিত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের শাসনকালে দক্ষিণ ভারতে অনেকগুলি সুন্দর মন্দির নির্মিত হয় এবং বিভিন্ন শাস্ত্রবিষয়ে নানা গ্রন্থ রচিত হয়। ধর্মশাস্ত্র রচয়িতা হিমাদ্রি এবং মারাঠি ভাষায় গীতা ভাষ্যকার জ্ঞানেশ্বর রামচন্দ্রর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

দেবপাল : বঙ্গদেশের পালবংশীয় নৃপতি, ধর্মপালের পুত্র। রাজত্বকাল ৮১০-৫০ খ্রী। তিনি পিতার মতোই পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। উৎকলরাজ জয়পাল ও প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা প্রলম্ভ দেবপালের কাছে নতি স্বীকার করেন। দেবপালের সার্বভৌম কর্তৃত্ব উত্তরে আসাম থেকে কাশ্মীর এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট নৃপতি প্রথম অমোঘবর্ষ দেবপালের কাছে পরাজিত হন।

আরব পরিব্রাজক সুলেমানের বর্ণনানুসারে দেবপালের সৈন্যবাহিনী ছিল বিশাল। তিনি পাল নৃপতিকে বিশেষ শক্তিশালী বলে বর্ণনা করেছেন। যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিহার স্থাপনের উদ্দেশ্যে দেবপালের কাছে পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেন এবং দেবপালও সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি বহির্বিশ্বে প্রচারিত হয়।

দেবরায়, দ্বিতীয় : বিজয়নগর রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি। শাসনকাল ১৪১৯-৪৯ খ্রী। তাঁর পূর্বে ঐ রাজ্যে দেবরায় নামে আর একজন রাজা ছিলেন।

দেবরায় প্রতিবেশী বাহমনি রাজ্যের

সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেন। তাঁর শাসনকালে নিকলো কন্তি নামে একজন ইতালিয় পরিব্রাজক ও আবদুর রাজাক নামে এক পারসিক দূত বিজয়নগর রাজ্য পরিদর্শনে আসেন। তাঁরা উভয়েই বিজয়নগরের সমৃদ্ধি, শান্তি-শৃঙ্খলা ও শাসকদের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির উচ্চ প্রশংসা করেন।

দেশাই, ভুলাভাই-জীবনজী (১৮৭৭-১৯৪৬): বোম্বাই হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ীরূপে কর্মজীবনের সূচনা, পরে বোম্বাই হাইকোর্টের এড্ভোকেট-জেনারেল হন। ১৯১৮ খ্রী বার্দোলির কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করেন। '৩২ খ্রী আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। মুক্তির পর কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন। তিনি দীর্ঘদিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, স্থিরবুদ্ধির রাজনীতিজ্ঞ, সুবক্তা ও দক্ষ পার্লমেণ্টারিয়ানরূপে ভুলাভাইর খ্যাতি ছিল।

১৯৪৫ খ্রী আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান সেনাপতিদের যে লাল কেল্লায় বিচার হয় তাতে ভুলাভাই দেশাই বন্দী সেনাপতিদের পক্ষ সমর্থন করেন। সে সময় ভুলাভাইর ভাষণগুলিতে তাঁর সুনিপুণ আইনজ্ঞান ও অপূর্ব দেশাত্মবোধের পরিচয় মেলে।

দোস্ত মহম্মদ: আফগানিস্তানের আমির। গভর্নর-জেনারেল লর্ড অক্ল্যাণ্ডের শাসনকালে ভারতের ইংরেজ সরকারের সঙ্গে দোস্ত মহম্মদ মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের দখল থেকে পেশোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে আফগানিস্তানকে ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে দোস্ত মহম্মদ মৈত্রী স্থাপন করতে চাওয়ায় ইংরেজ সরকার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ রণজিৎ সিংহ ইংরেজদের অধিক নির্ভরযোগ্য মিত্র ছিলেন। এরপর দোস্ত মহম্মদের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং লর্ড অক্ল্যাণ্ড দোস্ত মহম্মদকে পদচ্যুত করে ইংরেজের অনুগত শাহসুজাকে আফগানিস্তানের আমির বলে ঘোষণা করেন। ঐ সময় ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আফগানিস্তানের যে যুদ্ধ হয় তা প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ নামে অভিহিত। যুদ্ধে পরাজিত দোস্ত মহম্মদকে বন্দী করে কলকাতায় আনা হয়।

কিন্তু আফগানিস্তানের জনগণের প্রচণ্ড বিক্ষোভে বহু ইংরেজ কর্মচারী ও সৈন্য নিহত হলে আফগানিস্তানস্থ বৃটিশ রেসিডেণ্ট মেকনাটেন দোস্ত মহম্মদকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন এবং আফগানিস্তান থেকে সমস্ত বৃটিশ সৈন্য প্রত্যাহার করে আফগানিস্তানের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন।

দোস্ত মহম্মদ মুক্তি পাওয়া সত্ত্বেও ইংরেজদের সঙ্গে আফগানদের সম্পর্কের উন্নতি হয়নি। লর্ড এলেনবরা যখন ভারতের গভর্নর-জেনারেল সেই সময় আফগানিস্তানের অধিবাসীরা ইংরেজের তাঁবেদার শাহসুজাকে হত্যা করে এবং দোস্ত মহম্মদকে পুনরায় আমির পদে অধিষ্ঠিত করে। গভর্নর-জেনারেল স্যার জন লরেন্সের শাসনকালে (১৮৬৪-৬৯) দোস্ত মহম্মদের মৃত্যু হলে আফ-

গানিস্তানে আবার বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয় (লর্ড অকল্যাণ্ড ও লর্ড এলেনবরা-দ্র)।

দ্য আলমেদিয়া : ভারতে পর্তুগীজ উপনিবেশের প্রথম গভর্নর দ্য আলমেদিয়ার শাসনকাল ১৫০৫-৯ খ্রী। উত্তর আফ্রিকার মূরদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালিত করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন ও সে কারণে পর্তুগালের প্রথম রাজপ্রতিনিধিরূপে তিনি ভারতে প্রেরিত হন। পর্তুগীজ বণিকদের ভারতে আগমনের ফলে মিশরের ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ১৫০৭ খ্রী মিশর ও গুজরাতের এক মিলিত নৌবহর দিউর অদূরে দ্য আলমেদিয়ার নৌবহরকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করে। ঐ আক্রমণে আলমেদিয়ার পুত্র নিহত হয়। কিন্তু পরের বছরেই আলমেদিয়া ঐ পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন ও ভারতের উপকূলবর্তী আরব সাগরে পর্তুগীজ আধিপত্য সুদৃঢ় করেন।

দ্যুপ্লেক্স : ফরাসি সেনাপতি যোশেফ দ্যুপ্লেক্স চন্দননগরে গভর্নর নিযুক্ত হয়ে ১৭৩১ খ্রী প্রথম ভারতে আসেন। তারপর ১৭৪২ খ্রী তিনি অপর ফরাসি উপনিবেশ পণ্ডিচেরির গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন একাধারে দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ, সমরকুশল সেনাপতি এবং প্রকৃত দেশপ্রেমী। মাইলাপুরের যুদ্ধে (১৭৪৬ খ্রী) দ্যুপ্লেক্সের নেতৃত্বে মাত্র পাঁচ শ ফরাসি সৈন্য কর্ণাটের নবাব আনোয়ারুদ্দিনের দশ হাজার সৈন্যকে পরাস্ত করে।

ত্রিচিনাপল্লীতে লর্ড ক্লাইভের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দ্যুপ্লেক্স স্বদেশের সহযোগিতার অভাবে দারুণ অর্থসঙ্কটে পড়েন। সে অবস্থায় তিনি নিজ অর্থব্যয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তাঁর পরাজয় ও ব্যর্থতার পর দক্ষিণ ভারতে ফরাসি কর্তৃত্বের অবসান ঘটে ও ইংরেজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসি কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ১৭৫৪ খ্রী দ্যুপ্লেক্স স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

দ্রাবিড় : আড়াই হাজার বছর আগে আর্যরা যখন ভারতে প্রবেশ করে তখন দ্রাবিড়রা ছিল এদেশের সর্বাধিক সভ্য জাতি। তারা যুদ্ধবিদ্যাতেও বিশেষ পারদর্শী ছিল। আর্যদের সঙ্গে দ্রাবিড়দের দীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনী বেদ ও বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থে লিখিত আছে। আর্যদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য দ্রাবিড়রা উত্তর ভারত থেকে পশ্চাদপসরণ করে এবং দক্ষিণ ভারতে গড়ে ওঠে তাদের স্থায়ী সভ্যতা।

বৈদিক যুগে দ্রাবিড়রা নানা ধাতুর ব্যবহার জানত এবং ধাতুনির্মিত তৈজসপত্র ব্যবহার করত। তাদের কৃষিপদ্ধতি বিশেষ উন্নত ছিল এবং নদীকে তারা সেচ ও পরিবহনের কাজে ব্যবহার করত। দেশবিদেশের সঙ্গে দ্রাবিড়দের বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল। ভারত থেকে তারা হাতীর দাঁত, কাঠ, মসলিন প্রভৃতি পণ্য বিদেশে রপ্তানি করত। সূর্য, সর্প, বৃক্ষ, মাতৃদেবী প্রভৃতি দ্রাবিড়দের পূজ্য ছিল।

দ্রাবিড়রা ছোট ছোট গ্রাম ও জনপদে বাস করত। বহু দ্রাবিড় সমাজ ছিল মাতৃপ্রধান। দক্ষিণ ভারতে আর্য-সভ্যতা উপেক্ষা করে আজও

দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু বৈশিষ্ট্য বজায় আছে, যা দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তিরই সাক্ষ্য বহন করে। ঋগ্‌বেদে আর্যরা স্থানীয় অধিবাসীদের 'দস্যু' বলে বর্ণনা করেছে, সম্ভবত তার দ্বারা দ্রাবিড়দেরই বোঝানো হয়েছে।

দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬): ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিশিষ্ট ভারতীয়। দেশে শিক্ষাবিস্তারে ও ভারতের শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের যোগ্য দায়িত্ব দেওয়ার দাবিতে দ্বারকানাথ অগ্রণী ভূমিকা নেন। ১৮৪২ খ্রী ইংলণ্ডে যান এবং যাওয়ার পথে মহামান্য পোপের সঙ্গে দেখা করেন। লণ্ডনে মহারানী ভিক্টোরিয়ার নিকট-সংস্পর্শে আসেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে ফ্রান্সের সম্রাট লুই ফিলিপের সঙ্গে দেখা করেন। ১৮৪৫ খ্রী আবার ইংলণ্ডে যাওয়ার পথে ইতালির রাজার সঙ্গে দেখা করেন। বিলাসবহুল-জীবনযাপনের জন্য তিনি ইউরোপের সম্ভ্রান্ত মহলে 'প্রিন্স' নামে অভিহিত হতেন। পরাধীন ভারতের আত্মবিশ্বাস উজ্জীবনে প্রিন্স দ্বারকানাথের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

দ্বারসমুদ্রের হয়সাল বংশ: হয়সাল বংশীয় নৃপতিরা প্রথমে চোল রাজাদের অধীনে মহীশূরে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের সামন্ত ছিলেন। পরে চোল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিষ্ণুবর্ধন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তাঁর রাজ্যের রাজধানী হয় দ্বারসমুদ্র। তাঁর রাজত্বকালে (১১১০-৫২) হয়সাল রাজ্য প্রায় সমগ্র মহীশূর ও তার সমীপবর্তী অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি চোল, পাণ্ড্য, কদম্ব প্রভৃতি রাজাকে পরাজিত করে কৃষ্ণানদীর তীর পর্যন্ত রাজ্যের সীমানা বিস্তারিত করেন। একমাত্র চালুক্য নৃপতি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য বিষ্ণুবর্ধনের আক্রমণ প্রতিরোধে সমর্থ হন। বিষ্ণুবর্ধন সাধক রামানুজের সংস্পর্শে এসে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন।

বিষ্ণুবর্ধনের পৌত্র দ্বিতীয় বীরবল্লাল (১১৭৩-১২২০) চালুক্যরাজ চতুর্থ সোমেশ্বরকে পরাজিত করেন। দেবগিরির যাদব নৃপতি পঞ্চম বিল্লমও তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেন।

পরবর্তী হয়সাল রাজারা দুর্বল ও অনুল্লেখ্য। শেষ হয়সাল নৃপতি তৃতীয় বীরবল্লাল মুস্লিম আক্রমণের ফলে রাজ্যচ্যুত হন। দক্ষিণ ভারতে বহু সুন্দর মন্দির হয়সাল নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়।

দ্বৈত শাসন: ১৭৬৫ খ্রী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী লাভ করলে পূর্বভারতের এই অঞ্চলে যে শাসন ব্যবস্থা চালু হয় তা দ্বৈত শাসন নামে অভিহিত। প্রশাসনিক দায়িত্ব থাকে নবাবের হাতে, কিন্তু রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের পূর্ণ কর্তৃত্ব পায় কোম্পানি। ফলে নবাবের হাতে থাকে ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বমুক্ত অবাধ ক্ষমতা। ঐ সুযোগে কোম্পানির লোকেরা রাজস্ব আদায়ের নামে কার্যত অবাধ লুণ্ঠন শুরু করে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঐ অব্যবস্থা ও লুণ্ঠনের অনিবার্য পরিণতি।

ধননন্দ: নন্দবংশীয় শেষ রাজা, গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের ভারত

আক্রমণকালে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিভিন্ন বৌদ্ধ ও গ্রীক লেখক ধননন্দকে শক্তিশালী রাজা বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু নন্দবংশীয় রাজারা সম্ভবত নীচ বংশজাত বলে প্রজাদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন না। তদুপরি ধননন্দ তাঁর স্বার্থসঙ্কীর্ণতার জন্য প্রজাদের আরও বেশি বিরাগভাজন হন। ধননন্দকে উৎখাত করেন মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত।

ধর্মপাল: পালবংশীয় রাজা, গোপালের উত্তরাধিকারী। রাজত্বকাল ৭৭০-৮১০ খ্রী। ধর্মপালের পরাক্রমে পালরাজ্য একটি সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়। তিনি কনৌজের রাজা ইন্দ্ররাজকে পরাজিত করে তাঁর অনুগত চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে বসান। চক্রায়ুধের অভিষেককালে ভোজ, মাৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার ও কিরার রাজা উপস্থিত ছিলেন। গান্ধার, মদ্র ও কুরু ছিল পাঞ্জাবের অন্তর্গত, মাৎস্য ছিল রাজস্থানের জয়পুর অঞ্চলে; যবন সম্ভবত ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোন ক্ষুদ্র আরব রাজ্য; যদু ছিল বর্তমান পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও গুজরাতের অংশ নিয়ে গঠিত রাজ্য; ভোজ ছিল মধ্যপ্রদেশে। ঐ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অতগুলি রাজার একটি সামন্ত রাজার অভিষেকে উপস্থিত থাকায় মনে হয় যে, ঐ রাজ্যগুলি কোন না কোন-ভাবে রাজা ধর্মপালের প্রতি অনুগত ছিল। বঙ্গ ও বিহার সেদিন সম্পূর্ণরূপে পালরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ধর্মপালের সার্বভৌম অধিকারে-প্রথম প্রচণ্ড আঘাত হানেন প্রতিহার রাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট। তিনি ধর্মপালের অনুগত রাজা চক্রায়ুধকে যুদ্ধে পরাজিত ও বিতাড়িত করে কনৌজ জয় করেন। তারপর ধর্মপালকেও বর্তমান মুঙ্গেরের নিকটবর্তী এক স্থানে যুদ্ধে পরাজিত করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূট নৃপতি তৃতীয় গোবিন্দ সে সময় প্রতিহার রাজ্য আক্রমণ করলে ধর্মপাল শেষ পর্যন্ত রক্ষা পান। তবে ধর্মপালকে রাষ্ট্রকূট নৃপতি তৃতীয় গোবিন্দের আনুগত্য স্বীকার করতে হয়।

ধর্মপাল পালবংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্যকে তিনি বিশাল সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী ছিলেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মগধে বিক্রমশীলা মহা-বিহার-বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হয়। তিনি ওদন্তপুরী মহাবিহার ও সোমপুরী মহাবিহার নামে আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। অতীশ দীপঙ্কর ওদন্ত-পুরী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে 'শ্রীজ্ঞান' উপাধি লাভ করেন। সোমপুরী মহা-বিহারের ভগ্নাবশেষ সম্প্রতি রাজশাহি জেলায় আবিষ্কৃত হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও ধর্মপাল হিন্দুদের প্রতি উদার ছিলেন।

ধর্মরাজিকা: তক্ষশিলার সন্নিকটে আবিষ্কৃত একটি অতি প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার। সম্ভবত সম্রাট অশোকের শাসনকালে ঐ বৌদ্ধ বিহারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে কয়েকবার বিহারটি সংস্কার হয়; শেষ সংস্কার হয় কণিষ্ক যুগে।

নজমুদ্দৌলা: মিরজাফরের পুত্র।

মিরজাফরের মৃত্যুর পর বাঙলার নবাব হন ও মাত্র এক বছর সে পদে বহাল থাকেন (১৭৬৫-৬৬)। তাঁর নবাবির আমলে লর্ড ক্লাইভ দিল্লীর বাদশাহ শাহআলমের কাছ থেকে বছরে ২৬ লক্ষ টাকা করদানের বিনিময়ে বাঙলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি, অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেন। আর রাজকার্য পরিচালনার জন্য নবাবকে বছরে ৫৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য কোম্পানি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে নবাবের কোন এক্তিয়ার থাকে না। নবাব নজমুদ্দৌলার শাসনকালে বাঙলার প্রকৃত শাসন দায়িত্ব এইভাবে ইংরেজদের হাতে চলে যায়। দুর্বল ক্ষমতাহীন নবাব কোম্পানির হাতের পুতুলে পরিণত হয়। রাজস্ব আদায়ের নামে কোম্পানি সারা দেশ জুড়ে অবাধ লুণ্ঠন শুরু করে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঐ লুণ্ঠন ও অরাজকতারই অনিবার্য পরিণতি।

নন্দকুমার, মহারাজা: বীরভূম জেলার ভদ্রপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে নন্দকুমারের জন্ম। নবাব আলিবর্দি খাঁর শাসনকালে একজন আমিনরূপে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। পরে সিরাজদৌলার আমলে আরও পদোন্নতি হয় এবং সিরাজবিরোধী ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে লর্ড ক্লাইভের আনুকূল্য লাভ করেন। মিরজাফর নবাব হলে নন্দকুমার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে নদীয়া ও বর্ধমান জেলায় রাজস্ব আদায়ের ভার পান। ঐ রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারেই পরে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয় এবং গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর প্রতি বিরূপ হন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দুর্নীতি ও অত্যাচারের কাহিনী সে সময় বিলাতে পৌঁছায় এবং বৃটিশ সরকার গভর্নর-জেনারেলের অবাধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি কাউন্সিল গঠন করেন। ঐ কাউন্সিলের সদস্যদের কাছে নন্দকুমার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও ওয়ারেন হেস্টিংসের নানা দুর্নীতির কথা প্রকাশ করে দিলে হেস্টিংস নন্দকুমারের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হন ও প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ খোঁজেন। এর পরেই নন্দকুমারকে একটি জালিয়াতির মামলায় জড়িত করা হয়। তখন এদেশে কোম্পানির সরকার ইংলণ্ডের দণ্ডবিধি অনুসারে চালিত হত এবং ইংলণ্ডের আইনে জালিয়াতি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ ছিল। কলকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পে ছিলেন হেস্টিংসের বিশেষ বন্ধু। সে কারণে নন্দকুমারকে অপরাধী সাব্যস্ত করা বিশেষ কঠিন হয় না। জালিয়াতির অভিযোগে নন্দকুমারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং ১৭৭৫ খ্রী ৫ আগস্ট নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। নন্দকুমারের ফাঁসিকে পরবর্তীকালের দেশী-বিদেশী ঐতিহাসিকগণ "বিচারের নামে হত্যাকাণ্ড" বলে অভিহিত করেছেন।

নন্দবংশ: মহাপদ্ম নন্দ এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। শিশুনাগ বংশীয় রাজা কালাশোককে হত্যা করে তিনি মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। মহাপদ্ম (যিনি উগ্রসেন নামেও পরিচিত)

সম্ভবত শূদ্র মাতার গর্ভজাত।

মহাপদ্ম নন্দের পরাক্রমে মগধ সাম্রাজ্য বিশাল রূপ ধারণ করে। সম্ভবত সমগ্র উত্তর ভারত, পূর্বে কলিঙ্গ দেশ ও দক্ষিণে কুন্তল (বর্তমান মহারাষ্ট্র ও মহীশূরের একাংশ) পর্যন্ত নন্দ সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। মোট নয় জন নন্দবংশীয় রাজা মগধের সিংহাসনে বসেন। কথিত আছে, মহাপদ্ম নন্দের আট পুত্র পর পর মগধের রাজা হন। তাঁদের মধ্যে ধননন্দ সর্বাধিক পরাক্রমশালী ছিলেন। ধননন্দ গ্রীকসম্রাট আলেকজাণ্ডারের সমকালীন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ধননন্দর বিশাল সামরিক বাহিনীর সংবাদ পেয়েই সম্রাট আলেকজাণ্ডার তাঁর ক্লান্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে আর অগ্রসর হননি।

নন্দ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল ও স্থায়িত্বের মেয়াদ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত নন। সম্ভবত ৩৭৫ খ্রী-পূ বা তার কাছাকাছি কোন সময়ে নন্দ বংশের শাসন শুরু হয় এবং ৩২০ খ্রী-পূ বা তার কাছাকাছি কোন সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত কূটবুদ্ধি চাণক্যের সহায়তায় নন্দবংশীয় শাসনের অবসান ঘটান। ভারতে ঐতিহাসিক যুগের সূচনায় নন্দ সাম্রাজ্যই প্রথম বিশাল সাম্রাজ্যের রূপ ধারণ করে। নন্দ সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য ছিল।

নন্দিবর্মন : কাঞ্চির পল্লব নৃপতি। রাজ্যের অভিজাত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে নন্দিবর্মন রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর রাজত্বকাল ৭৩৪-৭৯৭ খ্রী।

নবদ্বীপ : নবদ্বীপ পশ্চিমবঙ্গের একটি সুপ্রাচীন শহর। সম্ভবত সেনবংশীয় রাজাদের সময় নবদ্বীপ শহরের পত্তন হয় এবং এই শহর ছিল লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী। ১২০৩ খ্রী মহম্মদ ঘুরির সহচর বখ্‌তিয়ার খলজি মাত্র সতের জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বণিকের ছদ্মবেশে অতর্কিতে এই শহর আক্রমণ ও জয় করেন। বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে চলে যান।

প্রাচীন নবদ্বীপ শহরের ভৌগোলিক অবস্থিতি বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন গঙ্গার গতি পরিবর্তনের ফলে আদি নবদ্বীপ লুপ্ত হয় ও তার পশ্চিম তীরে নতুন নবদ্বীপ গড়ে ওঠে। অনেকের অনুমান বর্তমান মায়াপুর প্রাচীনকালে নবদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবক্তা শ্রীচৈতন্য মায়াপুরেই জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু নৃপতি ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অর্থানুকূল্যে গঙ্গাতীরবর্তী নবদ্বীপ সুপ্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন ও নব্যন্যায়ের চর্চাকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চার জন্যও নবদ্বীপের বিশেষ খ্যাতি ছিল। নবদ্বীপে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে হলায়ুধ, পশুপতি, শূলপাণি উদয়াচার্য, নব্যন্যায়ের পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম, তাঁর শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি, স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত রঘুনন্দন স্মার্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির কাছে তর্কে পক্ষধর মিশ্রর পরাজয়ের কাহিনী সুবিদিত। কিন্তু নবদ্বীপের

সর্বাধিক খ্যাতি শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি-রূপে। ১৪৮৫ খ্রী শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। সে কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে নবদ্বীপ মহাতীর্থক্ষেত্র।

নব মুসলমান : দিল্লীর খলজি বংশীয় সুলতান আলাউদ্দিনের শাসন-কালে মোঙ্গলরা পর পর কয়েকবার ভারত আক্রমণ করে। কিন্তু আলা-উদ্দিনের রণকুশলতায় তারা প্রতিবারই পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত বহু মোঙ্গল মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে দিল্লীর আশে পাশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তারা নব মুসলমান নামে পরিচিত হয়। আলাউদ্দিন কিন্তু তাদের সন্দেহের চোখেই দেখতেন এবং কোন দায়িত্ব-পূর্ণ পদে তাদের নিয়োগ করা হত না। ফলে নব মুসলমানরাও আলাউদ্দিন বিরোধী বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হত। আলাউদ্দিনের শাসনকালে শেষের দিকে নব মুসলমানরা সুলতানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু ষড়যন্ত্র বেশিদূর অগ্রসর হওয়ার আগেই ফাঁস হয়ে যায়। তখন আলাউদ্দিন দিল্লীর আশে পাশে বসবাসকারী সব নব মুসলমানকে হত্যার নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশের ফলে প্রায় ত্রিশ হাজার নব মুসলমানের মৃত্যু হয়।

নবাব সৈয়দ মহম্মদ বাহাদুর : জাতীয়তাবাদী নেতা। ১৮৯৮ খ্রী থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ১৯১৩ খ্রী কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। পরের বছর কং-গ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে তিনি ও এন সুব্বারাও পানতু কংগ্রেসের দুই সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন।

নয়পাল : পালবংশীয় নৃপতি প্রথম মহীপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন এবং ১০৩৮-৫৪ খ্রী রাজত্ব করেন। তাঁর শাসনকালে কলচুরি বংশীয় চেদি-রাজ কর্ণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করে প্রথমে সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু নয়পাল শেষ পর্যন্ত সে আক্রমণ প্রতিরোধে সমর্থ হন। প্রখ্যাত বৌদ্ধ তত্ত্বাচার্য অতীশ দীপঙ্কর নয়পালের গুরু ছিলেন এবং নয়পালের অনুরোধে তিনি বিক্রম-শীল মহাবিহারের আচার্যপদ গ্রহণ করেন। নয়পাল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দু ধর্মেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর শাসনকালেই গয়ায় সুপ্রসিদ্ধ গদাধরের মন্দির স্থাপিত হয়।

নরেন্দ্র মণ্ডল : ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার আইন বলবৎ হওয়ার পরেই বৃটিশ সরকার দেশীয় রাজন্যবর্গের স্বার্থ-রক্ষার জন্য 'চেম্বার অফ প্রিন্সেজ' গঠন করেন। ১৯২১ সালে ঐ চেম্বার গঠিত হয়। ভারতে ঐ চেম্বার 'নরেন্দ্র মণ্ডল' নামে অভিহিত হয়।

নরেন্দ্র মণ্ডল গঠিত হয় ১২০ জন সদস্য নিয়ে। তার মধ্যে ১২ জন ১২৭টি দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করতেন, অবশিষ্ট ১০৮ জন ছিলেন নিজ নিজ রাজ্যের প্রতিনিধি। নরেন্দ্র মণ্ডলের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হ'ত বছরে একবার এবং তাতে সভাপতিত্ব করতেন বড়লাট। দেশীয় রাজন্যবর্গের স্বার্থ-রক্ষার জন্য নরেন্দ্র মণ্ডল গঠিত হয়। বিভিন্ন গোল টেবিল বৈঠকে ও বৃটিশ সরকারের সঙ্গে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় দেশীয় রাজ্য-

গুলির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করতেন নরেন্দ্র মণ্ডলের নেতৃস্থানীয় সদস্যরা।

নরিম্যান, কে. এফ. (১৮৮৫-১৯৩৯): বোম্বাইয়ের এক পার্শি পরিবারে জন্ম, জাতীয়তাবাদী নেতা। ১৯২৫ খ্রী বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন ও স্বরাজ্য দলের বোম্বাই প্রাদেশিক শাখা সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২৮ খ্রী কংগ্রেসে যোগ দেন, পরের বছর নিখিল ভারত যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৫ খ্রী বোম্বাই পৌরসভার মেয়র হন। নরিম্যান বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে যোগদানের জন্য কয়েকবার কারাবরণ করেন।

নর্থব্রুক, লর্ড: লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭২-৭৬ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন। তাঁর শাসনকালে বরদায় বৃটিশ রেসিডেন্টের সন্দেহজনক মৃত্যু হলে তিনি তৎকালীন গাইকোয়ারকে পদচ্যুত করেন। তাঁর শাসনকালে সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অফ ওয়েলস্ রূপে ভারত পরিদর্শনে আসেন।

নসরৎ শাহ: বঙ্গদেশের সুলতান ছিলেন (১৫১৯-৩২)। তাঁর শাসনকালে পর্তুগীজরা প্রথম বঙ্গদেশে আসে। সে সময় বঙ্গদেশের সীমা তিরহুত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি তাঁর পিতা হুসেন শাহর মতো উদার ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ১৫৩২ খ্রী খুল্লতাত গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ তাঁকে হত্যা করে বঙ্গদেশের সুলতান হন (১৫৩২-৩৮)।

নহপন: পশ্চিম-দক্ষিণ ভারতে নাসিক অঞ্চলে শক রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি। বিভিন্ন মুদ্রা ও শিলা-উল্লেখিত সব তারিখ অনুসারে নহপনের রাজত্বকাল ১১৯-২৭ খ্রী। তিনি মহারাষ্ট্র, মালব অধিকারের পর 'মহা-ক্ষত্রপ' উপাধি গ্রহণ করেন। মহারাষ্ট্র, কাথিয়াওয়াড়, ব্রোচ, সোপারা, মালব ও আজমিড় তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি সম্ভবত সাতবাহন রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাস্ত হন ও তার ফলে রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশ হারান।

নাগপুর: বর্তমানে মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক শহর। মধ্যযুগে নাগপুর গোণ্ডরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় হলে নাগপুর ভোঁসলাদের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮১৭ খ্রী মারাঠারা ইংরেজদের কাছে পরাজিত হলে নাগপুর বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। নাগ নদীর তীরবর্তী বলে শহরটির নাম নাগপুর।

নাগবংশ: কুশাণবংশীয় শাসনের অবসানের পর খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর ও মধ্য ভারতে দুটি নাগবংশীয় শাসনের কথা জানা যায়। তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল কিনা তা জানা যায় না। এক নাগবংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল মথুরা, অপর রাজ্যটির রাজধানী ছিল পদ্মাবতী (বর্তমান মধ্যপ্রদেশে)। পদ্মাবতীর নাগবংশীয় রাজাদের অন্যতম ভবনাগ বাকাটক নৃপতিদের মিত্র ছিলেন। গুপ্ত-বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নাগবংশীয় রাজাদের রাজ্যগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

নাগা: ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে

মণিপুর রাজ্যের পাশে নাগাদের বাস। কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্য নাগারা একটি খণ্ডজাতিরূপে পরিগণিত হলেও প্রকৃতপক্ষে নাগা খণ্ডজাতি অঙ্গামি, আও, সেমা প্রমুখ ১৭টি উপজাতির সমষ্টি। প্রত্যেক উপজাতির ভাষা আলাদা ও পরস্পরের অজানা। উপ-জাতিগুলির সামাজিক আচার-আচরণও ভিন্ন। নাগারা উপাধিস্বরূপ নিজ নিজ উপজাতির নাম ব্যবহার করে ; যেমন শিলু আও, হাকিসে সেমা প্রভৃতি। এখন নাগাদের মধ্যে একটি ভাষা ও সব উপজাতির সমন্বয়ে একটি খণ্ডজাতি গড়ে তোলার চেষ্টা চলেছে।

ইংরেজ শাসনাধীনে আসার আগে নাগাদের ইতিহাস অস্পষ্ট। ইংরেজ শাসিত মণিপুর, কাছাড় প্রভৃতি স্থানে নাগারা এসে হানা দিত বলে নাগাদের দমনের উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার ১৮৩৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দমধ্যে সমগ্র নাগা অঞ্চল দখল করে।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর নাগা-দের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী প্রবল-ভাবে দেখা দেয়। নাগাদের একাংশ ফিজোর নেতৃত্বে স্বাধীন নাগা রাজ্যেরও দাবি জানাতে থাকে। অবশেষে অধি-কাংশ নাগার ইচ্ছানুসারে ভারত সর-কার আসাম রাজ্যের 'নাগা হিলস' জেলা ও নেফার টুয়েনসাং এলাকা নিয়ে ১৯৫৭ খ্রী, 'নাগাল্যাণ্ড' বা 'নাগাভূমি' নামে একটি পৃথক রাজ্য গঠন করেন।

নাগাভূমি : ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ভারতের অঙ্গরাজ্য। আয়তন ১৬,৫৭২ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ ১৭ হাজার। রাজ-ধানী কোহিমা।

১৯৫৭ সালে নাগাভূমি গঠিত হলেও তখন তা ছিল কেন্দ্র-শাসিত রাজ্য। একটি অঙ্গরাজ্য রূপে নাগাভূমির প্রতিষ্ঠা ১৯৬৩ খ্রী ১ ডিসেম্বর।

৬০ জন সদস্য নিয়ে নাগাভূমির বিধানসভা গঠিত।

নাগার্জুন : আচার্য নাগার্জুন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ বংশজাত হলেও পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। নাগার্জুন একাধারে ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন বলে যে কাহিনী প্রচারিত আছে তা সম্ভবত সত্য নয়। বিভিন্ন শাস্ত্রে পণ্ডিত কয়েক-জন নাগার্জুন সম্ভবত বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হন।

নাদির শাহ : পারস্যের রাজা। ১৭৩৯ খ্রী মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহর শাসনকালে ভারত আক্রমণ করেন। মহম্মদ শাহ পানিপথের কাছে কর্নাল নামক স্থানে নাদির শাহর বাহিনীকে বাধা দিতে গিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরণের প্রতিশ্রুতি পেয়ে নাদির শাহ অস্ত্র সংবরণ করেন এবং প্রতিশ্রুত টাকা আদায়ের জন্য দিল্লী আসেন। নাদির শাহর দিল্লী অবস্থানকালে হঠাৎ গুজব রটে যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সে কথা শোনা মাত্র দিল্লীর অধিবাসীরা নাদির শাহর কয়েকশত অনুচর ও সৈন্যকে হত্যা করে। তখন ক্রুদ্ধ নাদির শাহ সেই হত্যার প্রতিশোধ নিতে

কয়েক দিনের মধ্যে দিল্লীর প্রায় বিশ হাজার লোককে হত্যা করেন।

দুই মাস দিল্লী অবস্থানের পর নাদির শাহ পারস্য প্রত্যাবর্তন কালে সঙ্গে নিয়ে যান প্রায় সত্তর কোটি টাকার মণি-মাণিক্য ও মূল্যবান সম্পদ, যার মধ্যে কোহিনুর হীরকখণ্ড ও শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসনও ছিল। নাদির শাহর আক্রমণে ও লুণ্ঠনে ভেঙে পড়া মোগল সাম্রাজ্যের দৈন্য ও দুর্বলতা সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়ে পড়ে। ফলে ভারতে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

নানকদেব (১৪৬৯-১৫৩৮): লাহোরের তালবন্দী গ্রামে (বর্তমান নাম নানকানা) গুরু নানকের জন্ম। নানকদেব শিখ ধর্মের প্রবক্তা ও প্রচারক। 'শিখ' কথাটির অর্থ শিষ্য। তাঁর মন ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, সে কারণে হিন্দু মুস্লিম সকলেই নানকদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সর্বধর্ম সমন্বয়ের জন্য গুরু নানকের ভূমিকা ছিল অনন্য।

গুরু নানক রচিত ও 'গ্রন্থসাহেব' -এ সঙ্কলিত স্তবগুলি পাঞ্জাবী সাহিত্যের প্রথম রচনা বলে বিবেচিত হয়।

নানা ফড়নবিশ : মারাঠা রাষ্ট্রনায়ক। পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব রাওর আমলে তিনিই ছিলেন মারাঠা রাজ্যের প্রকৃত শাসক। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের পক্ষ নিয়ে মহীশূর রাজ্যের একাংশ মারাঠা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। নিজামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নানা ফড়নবিশ ১৭৯৫ খ্রী হায়দরাবাদের বহু স্থান মারাঠাদের দখলে আনেন।

মাধব রাওর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বাজিরাও পেশোয়া হলে নানা ফড়নবিশের দুর্দিন শুরু হয়। পুনায় মারাঠাদের প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত নানা ফড়নবিশ কারারুদ্ধ হন। ১৮০০ খ্রী নানা ফড়নবিশের মৃত্যু হয়।

চিৎপাবনবংশীয় ব্রাহ্মণ নানা ফড়নবিশ তাঁর কূটনীতি ও কঠোরতার জন্য খ্যাত ছিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা তাঁকে মারাঠা মেকিয়াভেলি বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি ক্ষমতাসীন থাকাকালে পেশোয়া মাধব রাও তাঁর হাতের পুতুলে পরিণত হন। নানা ফড়নবিশের ক্ষমতাচ্যুতি ও মৃত্যুর পর মারাঠা রাজ্য নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে। পরিশেষে দ্বিতীয় বাজিরাও ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করেন।

নানাসাহেব : সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক, প্রকৃত নাম ধুন্ধুপন্থ। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাওর দত্তক পুত্র নানা দ্বিতীয় বাজিরাওর মৃত্যুর পর লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতি অনুসারে পেন্সন লাভের সুযোগ হারান। সে কারণে নানাসাহেব ইংরেজ সরকারের প্রতি দারুণ ক্ষুব্ধ হন। ১৮৫৭ খ্রী ভারতীয় সিপাহিরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে নানা সে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ঐ সময় নানার নামে নানা নিষ্ঠুরতার কাহিনী প্রচারিত হয়। কানপুরে অবরুদ্ধ পাঁচ শতাধিক ইংরেজ নরনারীকে উদ্ধারের আশ্বাস দিয়ে তিনি তাদের কয়েকটি নৌকায় তোলেন। কিন্তু নৌকাগুলি মাঝ নদীতে এলে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলীবর্ষণ করে ঐ শ্বেতাঙ্গ

শরনার্থীদের প্রত্যেককে হত্যা করা হয়।

বিদ্রোহকালে কানপুরের সিপাহিদের নেতা ছিলেন নানাসাহেব এবং তাঁর প্রধান সহকারী ছিলেন তাঁতিয়া টোপি। তাঁতিয়ার সহায়তায় কানপুর সাময়িকভাবে ইংরেজ শাসনমুক্ত হলে নানা নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু স্যার কলিন ক্যাম্পবেলের নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্যরা ১৮৫৭ খ্রী ডিসেম্বর মাসে কানপুর পুনরধিকার করলে নানাসাহেব নেপালে পলায়ন করেন এবং সম্ভবত সেইখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

নালন্দা : বর্তমান বিহারের পাটনা জেলার অন্তর্গত। রাজগৃহের অদূরে এই সুপ্রাচীন স্থানটিতে একটি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। নালন্দা ছিল মহাযানী বৌদ্ধ দর্শনের ও শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন সাং এখানে কয়েকবছর অধ্যয়ন করেন। তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল দশ হাজার।

বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থাপনকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত নন। হিউ-এন সাং-এর বিবরণীতে আছে, ধর্ম ছাড়াও রসায়ন, গণিত, আয়ুর্বেদ, ন্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হত। শিক্ষা ছিল অবৈতনিক, রাজা ও ধনী ব্যক্তিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতেন। হিউ-এন সাং-এর সময় শীলভদ্র নামে এক মহাপণ্ডিত বাঙালি ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল গ্রন্থাগার ছিল। মুসলমান আক্রমণের কালেও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিদেশী আক্রমণে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুপ্তরাজাদের অনেক শীলমোহর পাওয়া যাওয়ায় ঐতিহাসিকদের অনেকে মনে করেন, গুপ্তরাজাদের শাসনকালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

নাসিরুদ্দিন : দিল্লীর দাসবংশীয় সুলতান, শাসনকাল ১২৪৬-৬৬ খ্রী। সুলতান ইলতুৎমিসের পুত্র ও সুলতানা রাজিয়ার অনুজ। রাজিয়ার সিংহাসনচ্যুতির পর তাঁর অপর ভাই মইজুদ্দিন বাহরাম দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন। মইজুদ্দিনের পর সুলতান হন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ। সে সময় রাজ্যে দারুণ অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তা দেখা দিলে দিল্লীর প্রভাবশালী মহল মাসুদ শাহকে অপসৃত করে নাসিরুদ্দিনকে সিংহাসনে বসান।

ধার্মিক, উদার, ন্যায়পরায়ণ সুলতানরূপে নাসিরুদ্দিন সুখ্যাত। মসনদের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না এবং তিনি দীন ফকিরের মতো দিনযাপন করতেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি উলুঘ খাঁর মতো একজন যোগ্য ব্যক্তিকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পান। উলুঘ খাঁ ছিলেন নাসিরুদ্দিনের শ্বশুর। নাসিরুদ্দিনের বিশ বছর শাসনকাল প্রকৃতপক্ষে উলুঘ খাঁরই শাসনকাল এবং নাসিরুদ্দিন অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে উলুঘ খাঁই পরবর্তী সুলতান হন। তখন তাঁর নাম হয় গিয়াসুদ্দিন বলবন।

নীল বিদ্রোহ : নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৮৫৯ খ্রী বাংলাদেশের নীল উৎপাদক জেলাগুলিতে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। হিন্দু-মুস্লিম রায়তরা মিলিতভাবে ঐ বিদ্রোহে যোগ দেয়। রায়তদের নেতা ছিলেন যশোর জেলার দুই বিশ্বাস ভ্রাতা—নবীনমাধব ও বেণীমাধব, নদীয়ার মেঘানা সর্দার, হুগলির বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দার প্রভৃতি। নীল বিদ্রোহীরা জলে-স্থলে অত্যাচারী সাহেবদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। অগণিত নীলবিদ্রোহী সেদিন নীলকর সাহেব ও ইংরেজ সরকারের গুলীতে প্রাণ হারান, কিন্তু বিদ্রোহ তাতে আরও তীব্র হয়। বিভিন্ন ইংরেজি ও এদেশীয় পত্রিকায় নীলকর সাহেবদের ভয়াবহ অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হতে থাকে। ইংরেজ মিশনারি ফাদার লং ১৮৬১ খ্রী দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে কারাবরণ করেন। দীনবন্ধুর ইংরেজিতে অনূদিত 'নীলদর্পণ' নাটক ও ফাদার লং-এর কারাবাস সেদিন ইংলণ্ডের জনমতকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে।

ভারত ও ইংলণ্ডে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে ঐ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে বৃটিশ সরকার ১৮৬৩খ্রী নীলকর সাহেবদের প্রধান হাতিয়ার 'ইণ্ডিগো কন্ট্রাক্টস এক্ট' বাতিল করে দেন। ফলে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার হ্রাস পায়। পরে নীলের কৃত্রিম বিকল্প উদ্ভাবিত হওয়ায় ১৮৯২ খ্রী থেকে এদেশে নীলচাষ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়।

নূরজাহান : মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরের প্রধানা মহিষী। পূর্ব নাম মেহেরুন্নিসা। তিনি ছিলেন পারশিক পিতা-মাতার সন্তান ও পরমা সুন্দরী। তাঁর প্রথম স্বামী শের আফগান বঙ্গদেশের বর্ধমান অঞ্চলের জাগিরদার ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে বিদ্রোহী হলে মোগল সৈন্যবাহিনীর হাতে পরাজিত ও নিহত হন এবং মেহেরুন্নিসাকে বন্দী করে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জাহাঙ্গির তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৬১১ খ্রী জাহাঙ্গিরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর মেহেরুন্নিসার নাম হয় নূরজাহান অর্থাৎ জগতের আলো।

১৬২৭ খ্রী জাহাঙ্গিরের মৃত্যু পর্যন্ত মোগল দরবারে নূরজাহানের প্রভাব ছিল সীমাহীন। নূরজাহানের পিতা ইতমদুদ্দৌলা কার্যত জাহাঙ্গিরের প্রধান-মন্ত্রী হন এবং নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁ হন রাজদরবারের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি। নূরজাহানের প্রথম বিবাহের কন্যা লাদিলা বেগমের সঙ্গে বিবাহ হয় জাহাঙ্গিরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়রের এবং ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা মমতাজের সঙ্গে বিবাহ হয় জাহাঙ্গিরের তৃতীয় পুত্র খুর্‌রমের (পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহান)। এইভাবে নূরজাহানকে কেন্দ্র করে জাহাঙ্গিরের দরবারে একটি প্রভাবশালী মহল গড়ে ওঠে। নূরজাহান ছিলেন অতীব বুদ্ধিমতী। একদা জাহাঙ্গির ও নূরজাহান কাবুল যাওয়ার পথে বিদ্রোহীসেনাপতি মহাবৎ খাঁর হাতে বন্দী হন। কিন্তু নূরজাহানের বুদ্ধিবলে তাঁরা মুক্তি পান।

খুররমের সঙ্গে পরবর্তীকালে বিমাতা নূরজাহানের সম্পর্ক খারাপ হয়। ফলে খুররম যখন পিতার সিংহাসনে বসেন নূরজাহানকে খুবই অসম্মানের মধ্যে দিন যাপন করতে হয়। ১৬৪৭ খ্রী নূরজাহানের মৃত্যু হয়।

নেহেরু, জওহরলাল (১৮৮৯-১৯৬৪): ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রনায়ক ও স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। ১৯১২ খ্রী এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যরিস্টাররূপে কর্মজীবনের সূচনা করেন। তারপর ১৯২০-২১ খ্রী গান্ধিজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে পিতা মতিলাল ও পুত্র জওহরলাল আইন ব্যবসা ত্যাগ করে ঐ আন্দোলনে যোগ দেন ও কারাবরণ করেন। ১৯২৩ খ্রী কারামুক্ত হয়ে জওহরলাল কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ঐ সময় স্বরাজ্য দল গঠন করলে মতিলাল স্বরাজ্য দলে যোগ দেন, কিন্তু জওহরলাল মহাত্মা-দেশবন্ধু মত-বিরোধে নিরপেক্ষ থাকেন। ১৯২৭ খ্রী জওহরলালের উদ্যোগে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯২৮ খ্রী সাইমন কমিশন-বিরোধী বিক্ষোভে জওহরলাল পুলিশের লাঠিতে আহত হন। ঐ বছর কলকাতায় মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে সুভাষচন্দ্র বসু প্রকাশ্য অধিবেশনে যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলেন তা জওহরলাল কর্তৃক সমর্থিত হয়।

১৯২৯ খ্রী কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে মনোনীত সভাপতি মহাত্মা গান্ধী সভাপতিত্ব না করায় জওহরলাল ঐ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তারপর দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে জওহরলাল কংগ্রেসের ১ ৩৬ খ্রী লখ্‌নৌ অধিবেশনে ও ১৯৩৭ খ্রী ফৈজপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৮ খ্রী সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালে যে জাতীয় প্লানিং কমিটি গঠন করেন জওহরলাল হন তার সভাপতি। পরের বছর সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের যখন বিরোধ দেখা দেয় জওহরলাল সে সময় নিরপেক্ষ ছিলেন।

জাতীয় আন্দোলনকালে ভারতের স্বাধীনতার দাবির সমর্থনে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জওহরলাল কয়েক বার ইউরোপ সফরে যান। ১৯২৭ খ্রী মস্কো সফরকালে তিনি সমাজবাদের আদর্শ ও চিন্তাধারায় বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন এবং জাতীয় কংগ্রেসকেও সেই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে উদ্যোগী হন। ১৯৪০ খ্রী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদানের জন্য জওহরলালের চার বছর কারাদণ্ড হয়। কিন্তু ১৯৪১ খ্রী ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পান। মধ্যে ১৯৩৯ খ্রী তিনি চীন সফরে গিয়েছিলেন।

১৯৪২ খ্রী আগস্ট মাসে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হওয়ার প্রাক-মুহূর্তে গান্ধিজিসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জওহরলাল গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৪৫ খ্রী জুন মাস পর্যন্ত আমেদনগর দুর্গে বন্দী থাকেন। ইতিমধ্যে বৃটেনে শ্রমিক দল বিপুল গণ সমর্থনে ক্ষমতাসীন হওয়ার পরেই ভারতের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে স্বাধীনতার প্রস্তাব নিয়ে

আলোচনায় উদ্যোগী হন। সেই আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য জওহরলালসহ সকল কংগ্রেস নেতাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুস্লিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে স্বাধীনতার প্রশ্নে নানা মতভেদ ও বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও বৃটিশ সরকারের স্বাধীনতার প্রস্তাব ধীরে ধীরে কার্যকর হতে থাকে এবং ১৯৪৬ খ্রী ২রা সেপ্টেম্বর ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের আমন্ত্রণে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দেন। জওহরলাল হন ঐ অন্তবর্তীকালীন সরকারের সহ-সভাপতি। ঐ বছর ২৬ অক্টোবর মুস্লিম লীগের পাঁচজন সদস্য অন্তবর্তীকালীন সরকারে যোগ দেন। কিন্তু পাকিস্তান গঠনের প্রশ্নে কংগ্রেস-লীগ আপস কিছুতেই সম্ভব হয় না। ফলে মুস্লিমলীগ সদস্যরা অন্তবর্তীকালীন সরকার ত্যাগ করেন এবং গণপরিষদও বর্জন করেন। ১৯৪৭ খ্রী লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় নিযুক্ত হন এবং ক্ষমতা গ্রহণের পরেই লর্ড মাউন্টব্যাটেন যে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব দেন তা মেনে নিতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও আর আপত্তি করেন না।

১৯৪৭ খ্রী ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হলে জওহরলাল নেহরু হন ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং আমৃত্যু তিনি সে পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। নেহরুর নেতৃত্বে ভারত একটি সুসংহত, ধর্মনিরপেক্ষ, আধুনিক রাষ্ট্ররূপে গড়ে ওঠে।

নেহরু, মতিলাল (১৮৬১-১৯৩১) : এলাহাবাদ কোর্টের আইনজীবী (ভকিল) রূপে কর্মজীবনের সূচনা করেন। স্বীয় প্রতিভাবলে মতিলাল অনতিবিলম্বে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইন ব্যবসায়ীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৮৫ খ্রী থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মতিলালের সংযোগ ছিল, তবে মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসার পূর্বে পর্যন্ত সে যোগসূত্র ক্ষীণ ছিল। ১৯১৯ খ্রী কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে মতিলাল সভাপতি নির্বাচিত হন। পরের বছর কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব সমর্থন করেন। তারপর যুক্তপ্রদেশ কাউন্সিলের সদস্য পদ ও বিপুল আয়ের আইনব্যবসা ত্যাগ করে মতিলাল অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন।

পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য দল গঠন করলে তিনি তাতে যোগ দেন ও ১৯২৩ খ্রী কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। সে সময় মতিলাল একটানা ছয় বছর বিরোধী দলের নেতা ছিলেন। ১৯২৮ খ্রী মতিলাল আবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের জন্য তিনি বারবার কারারুদ্ধ হন ও দেশের জন্য সর্বস্ব পণের এক উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেন। যাঁর ভোগ ও বিলাসিতার কাহিনী লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হত, ত্যাগ ও দুঃখ বরণের মাধ্যমে তিনি সারা দেশের মানুষকে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে মুগ্ধ করেন। একদা তিনি, তাঁর সহধর্মিণী স্বরূপরাণী, পুত্র জওহরলাল, পুত্রবধূ কমলাদেবী ও আরও বহু আত্মীয়-স্বজন একসঙ্গে কারান্তরালে প্রেরিত হন।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের জন্য কারারুদ্ধ হওয়ার পর মতিলালের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু সে ভগ্নস্বাস্থ্য আর উদ্ধার হয় না। পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে মতিলাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি সুপরিচিত পরিবারের তিন পুরুষ ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে একাগ্রচিত্তে যোগদানের দৃষ্টান্ত আর নাই। মতিলাল ও তাঁর সহধর্মিণী, পুত্র ও পুত্রবধূ, দুই কন্যা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও কৃষ্ণা হাতী সিং, একমাত্র পৌত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ-দানের জন্য সকলেই কারারুদ্ধ হয়েছেন ও নানাভাবে দুঃখবরণ করেছেন। নেহরু পরিবারের এই ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল অনুপ্রেরণা ছিল মতিলালের অনন্য ব্যক্তিত্ব ও অকৃপণ আত্মদান।

নেহরু রিপোর্ট: সাইমন কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় ভারতের নেতৃবৃন্দ যখন সাইমন কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন তখন বৃটিশ সরকার ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে কোন সংবিধান রচনায় সমর্থ হ'লে বৃটিশ সরকার তা মেনে নেবেন। বৃটিশ সরকারের সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ভারতের সকল দলের নেতৃবৃন্দ দিল্লীতে এক সভায় সমবেত হন। সেই সভায় মতিলাল নেহরুকে সভাপতি করে একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটি ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় আহূত এক জাতীয় সম্মেলনে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। ঐ রিপোর্টই নেহরু রিপোর্ট নামে খ্যাত।

নেহরু রিপোর্টে যে সংবিধান প্রস্তাবিত হয় তাতে বলা হয়, ভারত হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। মুস্লিম সংখ্যালঘু প্রদেশে মুস্লিমদের জন্য ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হিন্দুদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও নির্বাচন হবে সকল সম্প্রদায়ের মিলিত ভোটে। খসড়া সংবিধানে ভারতকে 'ডোমিনিয়ন-স্ট্যাটাস' দানের প্রস্তাব করা হয়।

কলকাতায় সর্বদল জাতীয় সম্মেলনে মহম্মদ আলি জিন্নার বিরোধিতার জন্য নেহরু রিপোর্ট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়া সম্ভব হয় না।

পঞ্চকাব্যম: খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তামিল ভাষায় রচিত পাঁচটি বিস্তৃত বর্ণনামূলক কাব্য। তামিল সাহিত্যে এই পাঁচটি কাব্যকে মহাকাব্য বলা হয়। তামিল সাহিত্যকে তখন 'সংগম' সাহিত্য বলা হত। কাব্যগুলিতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর তামিলনাডের জনজীবন ও সমাজজীবনের সুন্দর ছবি পাওয়া যায়।

পঞ্চতন্ত্র: বালক শিক্ষার্থীদের গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সুপ্রাচীন-কালে রচিত কাহিনীর সমষ্টি। কাহিনী-কার বা রচনাকাল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছু জানা যায় না। তবে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের সময় থেকে পঞ্চতন্ত্র মূলগ্রন্থ রচনার সময়কাল সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করা যায়। পহ্লবী ভাষায়

পঞ্চতন্ত্র ৫০৭ খ্রী অনূদিত হয়েছিল; সুতরাং মূলগ্রন্থ নিঃসন্দেহে তারও পূর্বে রচিত হয়। পঞ্চতন্ত্র কাহিনীগুলি সারা ভারতেই জনপ্রিয়। বাঙলায় পঞ্চতন্ত্র 'হিতোপদেশ' নামে অভিহিত।

পঞ্চাশের মন্বন্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ (১৯৪৩ খ্রী), বাঙলাদেশে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় তা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে অভিহিত। লর্ড লিনলিথগো তখন এদেশে ইংরেজ সরকারের গভর্নর-জেনারেল।

ঐ দুর্ভিক্ষে প্রায় দশলক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর এমন লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ভারতে আর হয়নি। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোকদের রক্ষার জন্য ঐ সময় শহর গ্রামে অগণিত লঙ্গরখানা খোলা হয় ও রেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকার খাদ্যশস্যের ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি করায় চাষীরা প্রলুব্ধ হয়ে সঞ্চিত খাদ্যশস্য সরকারকে বিক্রি করে দেয়। আর পরের বছর ফসল ভাল না হওয়ায় কৃষকদের অনশনে মৃত্যু ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। যুদ্ধের জন্য বাইরে থেকেও যথেষ্ট খাদ্য আনা সম্ভব হয় না। এ সকল কারণে পঞ্চাশের মন্বন্তরকে 'মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ' বলা হয়।

পট্টদকল : বর্তমান মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত বিজাপুর জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। বাদামির চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের শাসনকালে স্থানটি বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল ও পুণ্যক্ষেত্র বলে বিবেচিত হত। দক্ষিণের কাশী নামে খ্যাত এই স্থানে বিভিন্ন রাজবংশের নৃপতিদের অভিষেক হত। মন্দিরময় এই স্থানটি এখনও হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র। এখানকার প্রাচীনতম মন্দির 'সঙ্গমেশ্বর মন্দির' চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্য (৬৯৬-৭৩৩ খ্রী) কর্তৃক নির্মিত হয়।

পণ্ডিচেরি : একটি প্রাক্তন ফরাসি উপনিবেশ। বর্তমানে অপর দুই প্রাক্তন ফরাসি উপনিবেশ মাহে ও কারিকল সহ পণ্ডিচেরি ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও কেরল রাজ্যের উপকূলে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত ঐ প্রাক্তন ফরাসি উপনিবেশগুলি নিয়ে গঠিত পণ্ডিচেরি রাজ্যটির মোট আয়তন ১৮৫ বর্গমাইল (২৭৯ বর্গ কিলোমিটার)। পণ্ডিচেরি রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান শহর। পণ্ডিচেরি বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ৩০।

১৬৭৪ খ্রী ফরাসি উপনিবেশীদের পক্ষে ফ্রাঙ্কো মার্টিন গিঞ্জির রাজার কাছ থেকে পণ্ডিচেরি কিনে নিয়ে ভারতে প্রথম ফরাসি উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৬৯৩ খ্রী ওলন্দাজরা একবার পণ্ডিচেরি দখল করে এবং ইংরেজরা মোট চারবার ঐ উপনিবেশটি অবরুদ্ধ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পণ্ডিচেরি ১৮১৬ খ্রী থেকে ১৯৫৬ খ্রী ১ নভেম্বর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে ফরাসিদের অধিকারে থাকে। শেষোক্ত তারিখে ফরাসি সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে ব্যবস্থাক্রমে পণ্ডিচেরিসহ দক্ষিণ ভারতের অপর ফরাসি উপনিবেশগুলি স্বাধীন ভারতের অঙ্গীভূত হয়। সাধক শ্রীঅরবিন্দের সাধনক্ষেত্ররূপে পণ্ডিচেরি খ্যাত।

পতঞ্জলি : খ্রী-পূ দ্বিতীয় শতাব্দীতে, বর্তমান উত্তর প্রদেশের পাণ্ডা নামক

স্থানে পতঞ্জলির জন্ম। তিনি গোণিকা-পুত্র, গোনর্দীয় ও চূর্ণিকৃৎ নামেও উল্লেখিত। পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্য-কাররূপে পতঞ্জলি খ্যাত।

পদ্মসম্ভব: খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বৌদ্ধ আচার্য। তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন।

পদ্মিনী: রাজপুতানার মেবার রাজ্যের রানা রতন সিংহের মহিষী। পদ্মিনীর অসামান্য রূপের কথা শুনে খলজি বংশীয় দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন মেবার রাজ্যের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেন। দীর্ঘ সংগ্রামের পর আলাউদ্দিন চিতোর জয় করেন কিন্তু পদ্মিনীকে জয় করা সুলতানের পক্ষে সম্ভব হয় না। পরাজয় সুনিশ্চিত জানা মাত্র পদ্মিনী ও আরও অনেক রাজপুত রমণী আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করেন।

সুলতান আলাউদ্দিন ১৩০৩ খ্রী চিতোর জয় করেন। কিন্তু পদ্মিনী কাহিনীর সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক তথ্য মেলে না। তবে বিভিন্ন নাটকে উল্লেখিত ও চারণদের মুখে ব্যাপকভাবে প্রচারিত এই কাহিনী সত্য বলেই মনে করা হয়।

পন্থ, গোবিন্দবল্লভ: (১৮৮৭-১৯৬০) জাতীয়তাবাদী নেতা। ১৯০৯ খ্রী কংগ্রেসে যোগ দেন ও ১৯২৩ খ্রী স্বরাজ্য দলের প্রার্থীরূপে যুক্তপ্রদেশ (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে বহুবার কারা-বরণ করেন। যুক্তপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রথমে ১৯৩৭-৩৯ সালে, পরে আবার ১৯৪৬-৫৫ সালে। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভায় যোগ দেন ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার প্রাপ্ত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত পন্থজি সে পদে বহাল ছিলেন।

পরমানন্দ, ভাই: বিশিষ্ট মুক্তি-সংগ্রামী ও সমাজ সংস্কারক। পাঞ্জাবে অধ্যাপনাকালে রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। আর্য সমাজের আদর্শ প্রচার-কল্পে আমেরিকা যান ও সেখানে গদর পার্টির সংস্পর্শে আসেন। তারপর ১৯১৩ খ্রী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে ইংরেজ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। ১৯১৪ খ্রী ভাই পরমানন্দকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়। মুক্তির পর কংগ্রেসে যোগ দেন এবং ১৯৩১ ও ১৯৩৪ খ্রী কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। পরে কংগ্রেসের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় কংগ্রেস ত্যাগ করে হিন্দুমহা-সভায় যোগ দেন। ১৯৪৫ খ্রী সত্তর বছর বয়সে ভাই পরমানন্দের মৃত্যু হয়।

পরমার বংশ: রাজপুত জাতি-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পরমারগণ বর্তমান গুজরাত রাজ্যের একাংশে নবম শতাব্দীতে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে পরমার রাজ্য উজ্জয়িনী, ধারা, মণ্ডপিকা প্রভৃতি স্থানে বিস্তার লাভ করে। ঐ বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য নৃপতি বৈরিসিংহ দশম শতাব্দীর সূচনায় রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরমার নৃপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বাক্‌পতি মুঞ্জ। কর্নাটের চালুক্য বংশীয় নৃপতি দ্বিতীয় তৈলপ সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চলেছিল। ঐ যুদ্ধে চালুক্য নৃপতি

বারবার পরাজিত হলেও পরিশেষে বাক্‌পতি অতর্কিতে ধরা পড়েন ও শত্রুর হাতে নিহত হন। পরমার বংশীয় আর এক নৃপতি ভোজ (১০০০-৫৫) বিদ্যোৎসাহী ও পরাক্রমশালী নৃপতি হিসাবে খ্যাত। তিনি পরমার রাজ্য বিস্তৃত করেন কিন্তু পরিশেষে কলচুরি-রাজ কর্ণের হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পরমার রাজ্য কয়েকবার মুস্লিম আক্রমণের সম্মুখীন হয় এবং সুলতান আলাউদ্দিন পরমার রাজ্যটিকে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। বিদ্যা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক-রূপে পরমার নৃপতিরা খ্যাত।

পরাগল খাঁ : বঙ্গদেশের সুলতান হুসেন শাহর আমলে চট্টগ্রামের লস্কর অর্থাৎ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। পরাগল খাঁ উদার ও বিদ্যোৎসাহীরূপে খ্যাত। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের একাংশ বাংলায় অনুবাদ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা ভাষায় প্রথম অনূদিত ঐ মহা-ভারতের নাম 'পাণ্ডব বিজয়'।

পর্তুগীজ, ভারতে : ইউরোপীয়-দের মধ্যে পর্তুগীজরাই প্রথম জলপথে ভারতে আসে। পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা ১৪৯৮ খ্রী ২০ মে তারিখে সমুদ্রপথে কালিকটে পৌঁছান। তার-পর ঐ পথে দলে দলে পর্তুগীজ বণিকরা ভারতে আসতে থাকে। কালিকট ও কোচিন রাজের দ্বন্দ্বে পর্তুগীজরা কোচিনরাজের পক্ষ নেয় এবং ঐ সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ কোচিন ও কানানোরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি পায়।

১৫০৯ খ্রী আলবুকার্ক পর্তুগীজ বাণিজ্যকুঠিগুলির গভর্নর হয়ে এদেশে আসেন এবং তাঁর উদ্যোগে গোয়া, দমন, দিউ, বোম্বাই, সলসেট বেসিন, চৌহল ও বঙ্গদেশের হুগলীতে পর্তুগীজ বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। ১৫১০ খ্রী আলবুকার্ক গোয়া দখল করেন। তারপর দিউ ও দমন পর্তুগীজ অধিকারে যায় যথাক্রমে ১৫৩৪ ও ১৫৫৯ খ্রী। পরবর্তীকালে দাদরা ও নগরহাভেলি নামে দুটি ছিট তালুক পর্তুগীজদের অধিকারভুক্ত হয় এবং ছিট তালুক দুটি দমন প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে গোয়া দমন দিউ একই গভর্নর-জেনা-রেলের শাসনাধীনে আনা হয়।

মোগল সম্রাট শাহজাহানের শাসন-কালে বঙ্গদেশের হুগলী অঞ্চলে পর্তু-গীজদের অত্যাচার অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্রাটের আদেশে তাদের বঙ্গদেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। লুণ্ঠন দাসব্যবসায় প্রভৃতির দিকেই পর্তুগীজদের আগ্রহ বেশি ছিল। তার পর পরবর্তীকালে আসা ইংরেজ ফরাসিদের তুলনায় হীনবল হওয়ায় পর্তুগীজদের পক্ষে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার আর সম্ভব হয় না। পশ্চিম ভারতের উপকূলবর্তী কয়েকটি ক্ষুদ্র উপনিবেশেই ভারতে পর্তুগীজ সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ থাকে। ১৯৫৪ খ্রী ১০ অক্টোবর দাদরা ও নগরহাভেলির জনগণ বিদ্রোহী হয়ে সেখানে একটি স্বাধীন সরকার কায়েম করে। পর-বর্তীকালে ঐ ছিট তালুক দুটি একত্রে একটি কেন্দ্র শাসিত এলাকার মর্যাদা লাভ করে।

১৯৬১ খ্রী ২০ ডিসেম্বর ভারতের সৈন্যবাহিনী ভারতস্থ পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিকে পর্তুগালের অধিকারমুক্ত করে। গোয়া-দমন-দিউ এখন ভারতের আর একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল।

পলাশীর যুদ্ধ: ১৭৪০ খ্রী আলিবর্দি খাঁ যখন বঙ্গদেশের নবাব হন তখন হুগলী নদীর উপকূলে ও কাশিমবাজারে ইংরেজ বণিকদের প্রচুর প্রভাব প্রতিপত্তি। নবাব উপলব্ধি করেন যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ইংরেজ বণিকরা শুধু বাণিজ্যেই বেশি দিন সন্তুষ্ট থাকবে না, বাংলার উপর তারা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্যও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আর ইংরেজরা তখন নৌবলে ও সমরসজ্জায় এমনই শক্তিশালী যে তাদের সমূলে উৎখাত করা নবাবের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। তাই নবাব আলিবর্দি বল প্রয়োগের বদলে তোষণ করে ইংরেজদের সংযত রাখতে সচেষ্ট হন।

আলিবর্দির পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলা যখন ১৭৫৬ খ্রী নবাব হন তখন ইংরেজ বণিকরা তাঁকে প্রকাশ্যেই উপেক্ষা করতে থাকে। চিরাচরিত প্রথা উপেক্ষা করে তারা নতুন নবাবকে কোন উপঢৌকন পাঠায় না। তার উপর নবাবের শত্রু রাজবল্লভের (সিরাজের মসনদ লাভে ক্ষুব্ধ মাতৃস্বসা ঘসেটি বেগমের দেওয়ান) পুত্র কৃষ্ণদাস প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে ঢাকা থেকে পালিয়ে ইংরেজদের আশ্রয় নিলে, নবাবের অনুরোধ সত্ত্বেও ইংরেজরা তাকে প্রত্যর্পণ করে না। তারপরেই নবাবের অনুমতির অপেক্ষা না রেখে ইংরেজরা কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণ শুরু করেন। ঘসেটি বেগম, রাজবল্লভ প্রভৃতির সঙ্গে দল বেঁধে সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্রও ইংরেজদের চলতে থাকে। নবাব তা বুঝতে পারেন এবং সে কারণে তিনি ইংরেজদের দুর্গ নির্মাণ বন্ধের নির্দেশ দেন। ইংরেজ সে নির্দেশ অমান্য করলে সিরাজ স্বয়ং বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কলকাতায় এসে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ আক্রমণ করেন। ইংরেজরা তখন কলকাতা ত্যাগ করে ফলতায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। সিরাজ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দখল করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ সিরাজ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছালে সেখান থেকে রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াটসনের নেতৃত্বে একদল ইংরেজ সৈন্য ও একটি ইংরেজ নৌবহর বঙ্গোপসাগর দিয়ে সরাসরি কলকাতায় পৌঁছিয়েই ফোর্ট উইলিয়ম পুনর্দখল করে। তারপর সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের একটা সাময়িক সমঝোতা হয় এবং আলিনগরের সন্ধি অনুসারে সিরাজ ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার স্বীকার করে নেন। ইংরেজরা সিরাজকে নবাব বলে স্বীকার করে নেয়, কিন্তু এটা বোঝে যে স্বাধীনচেতা সিরাজকে নবাব পদে অধিষ্ঠিত রাখা তাদের স্বার্থের পক্ষে নিরাপদ হবে না। তাই ঘসেটি বেগম, রাজবল্লভ প্রভৃতির উদ্যোগে মুর্শিদাবাদে যে সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র চলছিল ইংরেজ বণিকরা তাতে যোগ দেয়।

নবাব আলিবর্দির ভগ্নীপতি মির-

জাফর ছিলেন নবাবের সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। মসনদের লোভে তিনি সিরাজ-বিরোধী চক্রান্তে যোগ দিলেন। ক্রমে জগৎ শেঠ, ইয়ারলতিফ খাঁ, রায়দুর্লভ প্রমুখ নবাব দরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্রে সামিল হলেন, ইংরেজের পক্ষে রবার্ট ক্লাইভ হলেন ষড়যন্ত্রের নায়ক। স্থির হল সিরাজ অপসৃত হলে মিরজাফর হবেন বাঙলার নবাব এবং ইংরেজরা পাবে প্রচুর ধন-সম্পদ। ইংরেজ স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসিরা যাতে নবাবের সাহায্যে অগ্রসর হতে না পারে তার জন্য ক্লাইভ ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগর দখল করে নিয়ে বঙ্গদেশ থেকে ফরাসিদের সাময়িকভাবে বিতাড়িত করেন।

এর অল্পকাল পরেই ১৭৫৭ খ্রী ২৩ জুন গঙ্গানদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সিরাজের যুদ্ধ হয়। ষড়যন্ত্রের ব্যবস্থা মতো নবাবের প্রধান সেনাপতি মিরজাফর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকায় সন্ধ্যার মধ্যেই সিরাজের পরাজয় হয়। নবাবের পক্ষে মিরমদন, মোহনলাল প্রমুখ সেনাপতিরা প্রাণপণে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও সিরাজের পক্ষে পরাজয় এড়ানো সম্ভব হয় না। পরাজয় নিশ্চিত বুঝে সিরাজ পলায়নের চেষ্টা করেন কিন্তু পথেই ধৃত হয়ে বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে আনীত হন। সেখানে মিরজাফরের নির্দেশে তাঁর পুত্র মিরন সিরাজকে হত্যা করে। পূর্ব ব্যবস্থামতো মিরজাফর বাঙলার নবাব হন। মিরজাফরকে সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ রবার্ট ক্লাইভ ও তাঁর সঙ্গীরা প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করেন। বাঙলার শাসনব্যবস্থার উপর ইংরেজদের প্রভাব দুর্নিবার হয় এবং নবাব তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হন।

তবে পলাশীর যুদ্ধকে একদা যতটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ব'লে মনে করা হত প্রকৃতপক্ষে তার রাজনৈতিক তাৎপর্য ততটা বেশি ছিল না। পলাশীর যুদ্ধেই ভারতের ভাগ্যসূর্য অস্তমিত হয় বলে মনে করার কোন কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধ একটি খণ্ডযুদ্ধের অতিরিক্ত কিছুই ছিল না। মুর্শিদাবাদের মসনদ মুর্শিদাবাদের রাজপরিবারেরই দখলে থাকে এবং সারা ভারত ইংরেজ শাসনে আসতে আরও একশ বছর সময় লাগে। পলাশির যুদ্ধের পরেও সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির জোরে বঙ্গদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করা সম্ভব ছিল এবং মিরজাফরের পরবর্তী নবাব মিরকাশিম সেভাবে চেষ্টাও করেন। মিরকাশিমের পরাজয়ের পর (১৭৬৪) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন মোগল দরবারের ফর্মানবলে বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করে (১৭৬৫) ও পুনরায় নবাবপদে অধিষ্ঠিত মিরজাফর ও তাঁর বংশধরদের হাতে নামমাত্র প্রশাসনিক ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে তখনই প্রকৃতপক্ষে বাংলা-বিহার-ওড়িশায় ইংরেজ কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

পল্লব বংশ: দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন শাসনের পতনের পর পল্লব রাজ্য সর্বাধিক শক্তিশালী হয়। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে (খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর

মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ) দক্ষিণ ভারতে পল্লব শাসন কায়েম ছিল। বর্তমান মাদ্রাজ, আর্কট, ত্রিচিনাপল্লী ও তাঞ্জোর পল্লব রাজ্যর অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য স্থানেও পল্লবদের প্রভাব অনুল্লেখ্য ছিল না। বাদামি (বাতাপি) এলোরা ও কাঞ্চিতে পল্লববংশীয় নৃপতিদের কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল।

কাঞ্চির পল্লব রাজ্যের বিশিষ্ট নৃপতি বিষ্ণুগোপ ৩৪৬ খ্রী দাক্ষিণাত্যে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের অভিযান প্রতিরোধের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। বিষ্ণুগোপের পর আড়াই শতাব্দীকালের মধ্যে কোনো পল্লব নৃপতির উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরবর্তী পল্লব শাসনের গৌরবময় ইতিহাসের সূচনা করেন সিংহবিষ্ণু (শাসনকাল ৫৭৫-৬০০ খ্রী)। তিনি তিনটি তামিলরাজ্য চের, চোল ও পাণ্ড্যকে পর্যুদস্ত করেন। সিংহলেও তাঁর অভিযান পরিচালিত হয়। তিনি সম্ভবত বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন।

সিংহবিষ্ণুর পুত্র মহেন্দ্রবর্মণ সিংহাসনে বসার পর চালুক্য নৃপতিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হন এবং সম্ভবত দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাজিত হন। তবে দ্বিতীয় পুলকেশী কাঞ্চি জয় করতে পারেননি। মহেন্দ্রবর্মণ প্রথমে জৈন ছিলেন, পরে শিবের উপাসক হন ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ ভারতের শিল্পরীতিতে মহেন্দ্রবর্মণের দান অসামান্য। পাথর কেটে মন্দির নির্মাণ পদ্ধতি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত হয়। চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি শিল্পকলাও মহেন্দ্রবর্মণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

মহেন্দ্রবর্মণের পুত্র নরসিংহবর্মণ (শাসনকাল ৬২৫-৪৫) পল্লব রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। তিনি ৬৪২ খ্রী চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করে চালুক্য রাজ্যের রাজধানী বাতাপি অধিকার করেন ও পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং সম্ভবত ৬৪২ খ্রী কাঞ্চি নগর পরিদর্শন করেন। নরসিংহবর্মণও বহু মন্দির নির্মাণ করেন এবং মহাবলীপুরম নগরীর পত্তন করেন।

নরসিংহবর্মণের মৃত্যুর পর দুর্বল উত্তরাধিকারীদের শাসনকালে পল্লবদের শক্তি দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। ৮৯১ খ্রী পল্লব বংশের শেষ নৃপতি অপরাজিতকে পরাজিত ও নিহত করে চোলরাজ আদিত্য পল্লব রাজ্য জয় করেন। তারপরেও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পল্লব বংশীয় রাজাদের শাসনাধীন কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য বর্তমান মহীশূর রাজ্যের চিত্রদুর্গ জেলা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে টিকে ছিল। তবে ঐ রাজ্যগুলি কাডব, নোলম্বপল্লব প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল।

পল্লব রাজবংশের ইতিহাস সুস্পষ্ট নয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তাঁরা বিদেশাগত, সম্ভবত পার্শিয়ানদের একটি শাখা। কিন্তু অপর ঐতিহাসিক-মতে পল্লবরা দক্ষিণ ভারতেরই লোক এবং সম্ভবত সাতবাহন বংশের শাসনকালে তাঁদের সামন্ত ছিলেন। পরে সাতবাহনেরা দুর্বল হয়ে পড়লে পল্লবরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু পল্লবরা

নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি করতেন ও তাঁরা সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাতে তাঁদের উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং উত্তর ভারতীয়দের সঙ্গে পল্লব নৃপতিদের বিশেষ কোন পার্থক্য দেখেননি। আবার দক্ষিণ ভারতের কোন কোন প্রত্নলেখে পল্লবরাজাদের ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু পল্লবরা যাই হন, তাঁরা যে সুশাসক ও শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক যথার্থ নৃপতি ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। দক্ষিণ ভারতে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্পের কৃতিত্ব পল্লবদের। তাঁদের শাসনকালে দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃত ভাষা সর্বাধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ঐ ভাষায় বহু গ্রন্থও রচিত হয়। পল্লবরাজ্যের রাজধানী কাঞ্চি ছিল শিক্ষার পীঠস্থান। পল্লব নৃপতিদেরও কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত ও সুলেখক ছিলেন। কৃষির উন্নতির জন্য সেচব্যবস্থার প্রসার, পথ-ঘাট নির্মাণ প্রভৃতিও পল্লবরাজাদের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব; হিউ-এন-সাং পল্লবরাজ্যের মাটিকে স্বর্ণপ্রসূ বলে বর্ণনা করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ : ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হওয়ার তিনদিন পরে, র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের পরিকল্পনা-মতো বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। বঙ্গদেশের দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব-পাকিস্তান, যা পরে (১৯৭১ খ্রী ১৬ ডিসেম্বর) পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বঙ্গদেশের পশ্চিমের এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে গঠিত হয় ভারতের অন্যতম অঙ্গ-রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৫০ সালে দেশীয় রাজ্য কোচবিহার একটি জেলা রূপে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫০ সালে ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়। তারপর ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ মতো পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারের বাংলাভাষী জেলা মানভূমের সদর মহকুমাটি, শুধু চাস ও চন্দনকোয়াড়ি থানা বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। আর উত্তর বঙ্গের তিনটি বিচ্ছিন্ন জেলার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাকি অংশের সংযোগ ঘটাতে পুর্নিয়া জেলার ইসলামপুর মহকুমাটি পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অংশ করা হয়। এইসব সংযুক্তির ফলে, হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম বঙ্গের আয়তন হয় ৮৭,৮৫৩ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা সাড়ে চারকোটি। রাজ্যের রাজধানী কলকাতা বিশ্বের বৃহৎ দশটি নগরের একটি।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ২৯২। পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন ৪২ জন সদস্য।

পাইক বিদ্রোহ : ওড়িশার বিভিন্ন রাজ্যের পদাতিক সৈন্যরা পাইক নামে অভিহিত ছিল। তারা স্বাভাবিক অবস্থায় কৃষিকর্মে লিপ্ত থাকত, কিন্তু রাজ্যের কোনরকম বিপদ হলেই রাজ-সরকারের আহ্বানে অস্ত্র ধারণ করত। পাইকদের কোন বেতন ছিল না, তার বদলে তারা নিষ্কর জমি ভোগ করত। কিন্তু ১৮০৩ খ্রী ওড়িশা ইংরেজ সর-

কারের শাসনাধীনে আসার পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নতুন ভূমিব্যবস্থার ফলে পাইকরা তাদের জমির উপর অধিকার হারায়। অন্যান্য কারণেও তাদের দুর্দশা চরমে পৌঁছায়। ঐ দুর্দশা ও অসন্তোষের চূড়ান্ত পরিণতি রূপে ১৮১৭খ্রী ওড়িশায় পাইক বিদ্রোহ শুরু হয়।

খুর্দার রাজা মুকুন্দদেব ও তাঁর সেনাপতি জগবন্ধু বিদ্যাধর পাইক বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দেন। অত্যাচারিত কৃষক ও আদিবাসীরাও ঐ বিদ্রোহের সামিল হয়। তবে ইংরেজ সরকার বলপ্রয়োগ করে অনতিবিলম্বে পাইক বিদ্রোহ দমন করেন।

পাক-ভারত যুদ্ধ: দেশ ভাগ হওয়ার পর, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে তিন বার বড় রকমের যুদ্ধ হয়েছে। প্রথম যুদ্ধ হয় দেশ ভাগের অব্যবহিত পরে যখন পাকিস্থান হানাদারের ছদ্মবেশে সৈন্য পাঠিয়ে জোর করে উত্তর ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যটি দখলের চেষ্টা করে। তখন ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত ছিল না। তারই সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান যত শীঘ্র সম্ভব জম্মু ও কাশ্মীর দখল করে নিতে তৎপর হয়। পাক হানাদাররা যখন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগর থেকে কয়েক মাইল মাত্র দূরে, সেই সময় ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর, ঐ রাজ্যের রাজা ভারত ইউনিয়নে যোগদানের জন্য স্বাক্ষর দিলে তা শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে ঐ রাজ্যের মুস্লিম ও হিন্দু জনগণের বিরাট অংশের সমর্থন লাভ করে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজার অনুমোদন ও জনগণের বিপুল সমর্থন পাওয়া মাত্র ভারত ২৭ অক্টোবর বিমানযোগে শ্রীনগরের সৈন্য পাঠায় ও পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। ৩১ অক্টোবর শেখ আবদুল্লাকে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। পাক হানাদারদের পিছু হটিয়ে দিয়ে ভারত ঐ বছরই ৩১ ডিসেম্বর, পাকিস্তানকে আক্রমণ থেকে বিরত করার জন্য রাষ্ট্র সঙ্ঘের স্বস্তি পরিষদের কাছে আবেদন জানায়। ঐ আবেদন অনুসারে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠার তৎপরতা শুরু হয় ও বহু ব্যর্থ আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পাকিস্তানের দখলে থাকা অংশটুকু তখন থেকে 'আজাদ কাশ্মীর' নামের অভিহিত হতে থাকে।

পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের দ্বিতীয় বার যুদ্ধ বাধে ১৯৬৫ সালের ২৭ আগস্ট। সেবারেও যুদ্ধের কারণ কাশ্মীর। ঐ বছর ৫ আগস্ট হঠাৎ ধরা পড়ে যে, বহু পাক সৈন্য নানা ছদ্মবেশে কাশ্মীরে ঢুকে পড়েছে। জানা মাত্র ভারতের প্রতিরক্ষাবাহিনী প্রায় তিন হাজার পাক সৈন্যকে আটক করে। এই গোপন অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় পাকিস্তান ২৭ আগস্ট প্রকাশ্যে যুদ্ধ বিরতি সীমানা লঙ্ঘন করে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৬৫ সালের ১ ডিসেম্বর বিরাট পাক বাহিনী প্যাটন ট্যাঙ্ক ও স্যাবার জেট বিমান

নিয়ে ভারতের উপর আক্রমণ শুরু করে। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। তিনি পাকিস্তানী আক্রমণের সফল মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন স্থান দিয়ে পাকিস্তানকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। ভারতের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণে পাকিস্তানের অগণিত প্যাটন ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত হয় ও ধরা পড়ে। ভারতীয় বাহিনী লাহোর ও শিয়ালকোট দখলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়ে পাক পাঞ্জাবের অভ্যন্তরে ইছোগিল খালের ধারে পৌঁছায়। পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলিতে ভারতীয় বিমানবহর বোমা বর্ষণ করে আসে। ঐ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বস্তি পরিষদ ভারত ও পাকিস্তানের কাছে যুদ্ধ বিরতির আবেদন জানায় ও সেই মতো ২৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বিরতি হয়।

ঐ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের উদ্যোগে তাসখন্দে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর এক বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে উভয় দেশের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন শর্ত সম্বলিত যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তা তাসখন্দ চুক্তি নামে খ্যাত। চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরে ১৯৬৬ সালের ১১ জানুয়ারি রাত্রি ১টায় তাসখন্দেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তাসখন্দ চুক্তির শর্ত অনুসারে পাকিস্তান ও ভারতের ফৌজ নতুন দখল করা জমি ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধ বিরতি সীমানায় চলে আসে।

পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে তৃতীয় বার যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর। তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। পূর্ব পাকিস্তানে তখন অস্থায়ী স্বাধীন বাংলা দেশ সরকার গঠিত হয়েছে এবং বাংলা দেশের মুক্তি ফৌজের সঙ্গে পাক সৈন্যদের চলেছে তীব্র লড়াই। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় এক কোটি হিন্দু-মুসলমান তখন সীমানা পেরিয়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। সে কারণে ভারতের পক্ষ থেকে তখন পাকিস্তানের কাছে অবিলম্বে বাংলাদেশের যুদ্ধ মিটিয়ে এক কোটি আশ্রয়প্রার্থীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবি জানানো হচ্ছিল। অপর দিকে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বিদ্রোহীদের অর্থ অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে শক্তি যোগানোর অভিযোগ আনছিল। ঐ অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের মধ্যে ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ব্যাপকভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বোমা বর্ষণ করে। সেদিন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কলকাতায় এক জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। ঐ দিনই নয়া দিল্লিতে ফিরে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের অঘোষিত যুদ্ধ ঘোষণার মোকাবিলায় ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত।

৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানায় ও ভারত-বাংলাদেশের যুক্ত বাহিনী ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর

হয়। ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানেও শিয়ালকোট অঞ্চলে ভারতীয় ফৌজ পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখলে আনে। ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পাক বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ-জেঃ এ. কে. নিয়াজি ভারতের প্রধান সেনাপতি জেঃ মানেক শাহর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করলে ঐ দিনই আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়।

বাংলাদেশের যুদ্ধ শেষ হলে ১৬ ডিসেম্বর রাত্রে ভারতের পক্ষ থেকে এক তরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হয়। ফলে ১৭ ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানেও ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের দুই সপ্তাহের যুদ্ধ শেষ হয়।

পাকিস্তান : ভারতে বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় দুটি স্বতন্ত্র জাতি (nation), এবং সে কারণে ভারত স্বাধীন হলে সেখানে দুটি জাতির পক্ষে একসঙ্গে বাস করা সম্ভব নয়—এই তত্ত্ব উদ্ভাবন করে মুস্লিম লীগ ভারতের মুস্লিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পাকিস্তান নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবি তোলে। ১৯৪০ খ্রী লাহোরে মুস্লিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেস ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দলগুলি কখনও মুস্লিম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্বকে যুক্তিবহ বলে স্বীকার করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তান দাবির সমর্থনে ভারতের মুস্লিম জনসাধারণের দাবি এত তীব্র হয়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত ভারতের অঙ্গচ্ছেদ করে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে মেনে নিতে হয়। ১৯৪৭ খ্রী ১৪ আগস্ট, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা লাভের একদিন আগে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

এক হাজার মাইলের ব্যবধানে ভারতের দুই মুস্লিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তানের দুই অংশ পশ্চিম অংশ পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব। অংশ পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিতি লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তান গঠিত হয় পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশ নিয়ে। চিত্রল, বাহাওয়ালপুর, প্রমুখ এগারোটি দেশীয় রাজ্যও পশ্চিম পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তন হয় ৩,১০,৪০৩ বর্গমাইল (৮,০৩,৯৪৪ বর্গ কিলোমিটার)। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয় পূর্ববঙ্গ ও আসামের শ্রীহট্ট জেলা নিয়ে। পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন হয় ৫৫,১২৬ বর্গ মাইল (১,৪২,৭৭৭ বর্গ কিলোমিটার)। পূর্ব পাকিস্তান আয়তনে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় এক ষষ্ঠাংশ হলেও জনসংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তানই হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৬১ সালের জন-গণনা অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানের লোক সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৫ লক্ষ ও পশ্চিম পাকিস্তানের ৪ কোটি ৩০ লক্ষ। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ কিছুতে মানতে পারে না, ফলে দুই অংশের মধ্যে বিরোধ অনিবার্য হয়। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণক্ষেত্র একটি উপনিবেশে পরিণত হয়েছে এমন অভিযোগও পূর্ব পাকিস্তানীদের পক্ষ থেকে উঠতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণ ও অত্যাচার অসহনীয় হয়ে ওঠায় পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহী পূর্ব-পাকিস্তানীরা 'স্বাধীন বাংলাদেশ' সরকার গঠন করেন। ১৯৭১ খ্রী ৬ ডিসেম্বর ভারত ঐ সরকারকে স্বীকৃতি জানায়। তারপর ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তি সেনারা মিলিত শক্তিতে পাকসামরিক বাহিনীকে পরাস্ত করে। পূর্ব পাকিস্তানের মৃত্যু হয় ও তার মৃত্যুক্ষণে জন্ম লাভ করে স্বাধীন বাংলা দেশ।

বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পাকিস্তানের আয়তন হয় ৮,০৩,৯৪৪ বর্গ কিলোমিটার। রাজধানী ইসলামাবাদ। লোকসংখ্যা ('৭১ সালে) ৭ কোটি ২৬ লক্ষ।

পাঞ্চাল : খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতে যে ১৬টি মহাজনপদ (রাজ্য) ছিল, পাঞ্চাল তার অন্যতম। বর্তমান উত্তর প্রদেশের রোহিলাখণ্ড ও তার সীমান্তবর্তী অঞ্চল নিয়ে পাঞ্চাল মহাজনপদ-গঠিত ছিল। গঙ্গা নদী পাঞ্চাল রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল। উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র নগর ও দক্ষিণ ভাগের রাজধানী ছিল কাম্পিল্য।

পাঞ্জাব (১) : পঞ্চনদীর দেশ পাঞ্জাব প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার লীলাক্ষেত্র। হিন্দু যুগের শেষে পাঞ্জাবে মুস্লিম শাসন শুরু হয়। তারপর মহারাজ রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গড়ে ওঠে শিখ রাজ্য। একদা সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীরসহ খাইবার গিরিসঙ্কট পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত শিখ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের শেষে সমগ্র পাঞ্জাব ১৮৪৯ খ্রী বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৪৭ খ্রী ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত হয়। পশ্চিম অংশ যায় পাকিস্তানে এবং পূর্ব অংশ ভারতের একটি রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। পাতিয়ালা, কর্পূরতল, পাতৌদি প্রমুখ ছোটবড় অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য ভারতের অংশ পাঞ্জাবের অন্তর্ভূত হয়।

পরে পাঞ্জাবের পাঞ্জাবী ও হিন্দী ভাষীদের মধ্যে নানা কারণে বিরোধ দেখা দেওয়ায় পাঞ্জাবকে আবার খণ্ডিত করে হরিয়ানা রাজ্যের সৃষ্টি করা হয়। ১৯৬৬ খ্রী ১ নভেম্বর ভারতের অন্যতম রাজ্যরূপে হরিয়ানা আত্মপ্রকাশ করে। অপর অংশ পাঞ্জাব নামেই পরিচিত থাকে। বর্তমান পাঞ্জাব রাজ্যের আয়তন ৫০,৩৭৬ বর্গ কিলোমিটার। রাজধানী চণ্ডিগড়। লোকসংখ্যা ১ কোটি ৩৬ লক্ষ। বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ১০৪।

পাঞ্জাব (২) : স্বাধীনতার পূর্বদিনে ভারত দ্বিখণ্ডিত হ'লে পাঞ্জাব প্রদেশ-টিও ধর্মের ভিত্তিতে দুভাগ হয়। পূর্বের এক তৃতীয়াংশ ভারতের অন্তর্গত হয় ও মুস্লিম-প্রধান দুই তৃতীয়াংশ হয় পাকিস্তানের অন্তর্গত। পূর্বে প্রদেশটিকে পশ্চিম পাঞ্জাব বলা হ'ত এখন বলা হয় পাঞ্জাব। রাজধানী লাহোর প্রাচীন শহর। মহারাজা রণজিৎ সিংহের বিশাল শিখ সাম্রাজ্যেরও রাজধানী ছিল লাহোর। পাকিস্তানের সর্বাধিক জন-বহুল ও বৃহত্তম প্রদেশ হওয়ায় পাকি-

স্তানের রাজনীতিতে পাঞ্জাবের প্রভাব সর্বাধিক।

পাটলিপুত্র : গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে, বর্তমান বিহার রাজ্যের রাজধানী পাটনা শহর ও তার সমীপবর্তী অঞ্চলে, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে পাটলিপুত্র নগরের পত্তন হয়। নৃপতি বিম্বিসারের বংশধর ও তৎকালে মগধের রাজা উদয়বর্ধন পাটলিপুত্র নগরের প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনিই মগধের রাজধানী রাজগৃহ থেকে স্থানান্তরিত করে পাটলিপুত্রে আনেন। তারপর প্রায় হাজার বছর ধরে পাটলিপুত্র মগধ রাজ্যের রাজধানী ছিল।

প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরের সমৃদ্ধি ও বিশালতার সুন্দর বর্ণনা গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে লিপিবদ্ধ আছে। খ্রী-পূ চতুর্থ শতাব্দীর সম্রাট মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে মেগাস্থিনিস দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। তাঁর সময়ে পাটলিপুত্র নগর নয় মাইল দীর্ঘ ও দেড় মাইল প্রস্থ ছিল। নগরটি ছিল সুরম্য, সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধ। মেগাস্থিনিসের পর প্রায় নয়শ বছর বাদে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন পাটলিপুত্র নগরীর প্রাসাদের সারি ও সমৃদ্ধি দেখে একইভাবে বিস্মিত হন। কিন্তু আরও দু'শ বছর বাদে অপর চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন সাং ভারত ভ্রমণে এসে পাটলিপুত্র নগরীকে বিধ্বস্ত ও অরণ্যপরিবৃত দেখেন। সম্ভবত ঐ দুই শতাব্দীর ব্যবধানে বৈদেশিক আক্রমণে পাটলিপুত্রের ঐ দুর্দশা হয়। পরে পাল রাজাদের শাসনকালে খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে পাটলিপুত্র নগরকে আবার নতুনভাবে গড়ে তোলা হয়।

শের শাহের শাসনকালে পাটলিপুত্র নগরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাটনা শহরের পুনরুজ্জীবন হয়। শের শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় পাটনা বৃহৎ শহরে পরিণত হয়। মোগল যুগেও পাটনা উল্লেখযোগ্য শহর ছিল। ১৭০৪ খ্রী মোগল সম্রাট ঔরংজেবের পৌত্র আজিমুশ্‌শান তাঁর নিজ নামানুসারে পাটনা শহরের নাম রাখেন আজিমাবাদ, কিন্তু সে নাম স্থায়ী হয় না। ১৬৬৯ খ্রী পাটনায় শিখ ধর্মের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্ম হয়। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে ১৯৬৯ খ্রী গুরু গোবিন্দ সিংহের ত্রিশত জন্ম বার্ষিকী দিবসে পাটনা শহরের নাম পাটনা সাহিব রাখা হয়।

পাণিনি : সংস্কৃত ভাষায় নিয়ন্ত্রক 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থের প্রণেতা, প্রখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনির জন্মকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। খ্রী-পূ সপ্তম শতাব্দী থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন সময়ে, বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শলাতুর গ্রামে পাণিনির জন্ম হয়। শলাতুরে জন্ম বলে পাণিনি বহুক্ষেত্রে শলাতুরিয় নামেও উল্লেখিত হয়েছেন। ভাষ্যকার পতঞ্জলি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের সঙ্গে মহাসাগরের তুলনা করেছেন।

শুধু ব্যাকরণ হিসাবে নয়, পাণিনির যুগের সমাজ চিত্ররূপে অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের মূল্য সীমাহীন।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি : পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত এই স্থানটিতে

খনন কার্য চালিয়ে অস্ত্র,মৃৎপ্রাপ্ত প্রভৃতি বহু সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক সামগ্রী পাওয়া গেছে। সম্ভবত এগুলি চার হাজার বছর আগের সভ্যতার নিদর্শন।

পাণ্ড্য রাজ্য ঃ পাণ্ড্য রাজ্যের সূচনার ইতিহাস স্পষ্ট নয়। দাক্ষিণাত্যে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে পাণ্ড্য রাজ্য সুসংহত হয়। পাণ্ড্যরাজ্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য নৃপতি কাডুঙ্গন। অষ্টম শতাব্দীতে চোল ও চের রাজ্য জয় করে পাণ্ড্য রাজ্য বিস্তার লাভ করে। পাণ্ড্যরাজ শ্রীবল্লভ (৮১৫-৬২) চোল, পল্লব, গঙ্গ এমনকি সিংহল রাজ্যের বিরুদ্ধেও সফল অভিযান চালান। তবে পল্লবরাজ অপরাজিতবর্মণ সম্ভবত ৮৮০ খ্রী পাণ্ড্যরাজ বীরগুণবর্মনকে পরাজিত করেন। তারপর চোলরাজ প্রথম পরান্তকের কাছে পাণ্ড্যরাজ দ্বিতীয় রাজসিংহ পরাজিত হয়ে সিংহলে পলায়ন করলে পাণ্ড্য রাজ্য চোল অধিকারে চলে যায়। তারপর প্রায় তিন শ বছর পাণ্ড্য রাজ্য চোল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কিন্তু চোল রাজারা দুর্বল হয়ে পড়লে পাণ্ড্য রাজ্য আবার স্বাধীন হয়। পাণ্ড্য রাজ্য দ্বিতীয়বার প্রতিষ্ঠিত করেন মারবর্মণ সুন্দর পাণ্ড্য (১২১৬-৩৮)। ঐ বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি জাতবর্মণ সুন্দর পাণ্ড্যর নেতৃত্বে (শাসনকাল ১২৫১-৬৮) পাণ্ড্যরাজ্য সমৃদ্ধিও বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি চোল, চের, হয়সাল, কাকতিয় এমনকি সিংহলরাজকেও পরাজিত করেন। তাঁর শাসনকালে পাণ্ড্য রাজ্য সিংহল থেকে নেল্লোর ও কুডাপ্পা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

প্রখ্যাত পর্যটক মার্কো পোলো ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে পাণ্ড্য রাজ্য পরিদর্শন করেন। তাঁর ভ্রমণলিপিতে পাণ্ড্য রাজ্যের শাসনব্যবস্থা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। মার্কো পোলো পাণ্ড্য রাজাদের বিপুল বিত্তের অধিকারী বলে বর্ণনা করেছেন। মার্কো পোলোর বর্ণনার সত্যতা সমকালীন মুস্লিম লেখক ওয়াসাফ-এর ভ্রমণলিপিতে প্রমাণিত হয়।

উত্তরাধিকার নিয়ে পাণ্ড্য রাজ্যে যখন অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয় তখন তাদের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সেনাপতি মালিক কাফুর ১৩১২ খ্রী পাণ্ড্য রাজ্য আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করেন।

পাদশাহ্‌নামা : মোগল সম্রাট শাহজাহানের শাসনকালের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ইতিহাস। সম্রাট শাহ্‌জাহানের নির্দেশে আবদুল হামিদ লাহোরি এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে সম্রাট শাহজাহানের সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিস্তারিত ও তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা আছে। আবদুল হামিদ লাহোরির মৃত্যুর পর তাঁর ছাত্র মুহম্মদ ওয়ারিস গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেন। তিনি গ্রন্থটির শেষে সম্রাট শাহজাহানের সময়ের পণ্ডিত, কবি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামের তালিকা সংযুক্ত করেন।

পানিপথের যুদ্ধ, প্রথম : দিল্লীর তিপ্পান্ন মাইল উত্তরে অবস্থিত পানিপথের রণক্ষেত্রে, দিল্লীর শেষ সুলতা

ইব্রাহিম লোদি ও ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তা পানিপথের প্রথম যুদ্ধ নামে অভিহিত। ১৫২৬ খ্রী, ২০ এপ্রিল বাবর কামান বন্দুক ও বারো হাজার সৈন্য নিয়ে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হলে আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদি প্রায় এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে তাঁকে বাধা দিতে অগ্রসর হন এবং পানিপথের রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। বাবরের সঙ্গে কামান ও বন্দুক থাকায় বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়েও ইব্রাহিম লোদি প্রাণ হারান এবং বাবর দিল্লী ও আগ্রা জয় করে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

প্রথম পানিপথের যুদ্ধের ফল—দিল্লীতে সুলতানি শাসনের অবসান ও ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। ভারতে আফগান বংশীয় শাসনের সমূহ সম্ভাবনাও এই যুদ্ধের ফলে লোপ পায়।

দ্বিতীয় যুদ্ধ: পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় মোগল সিংহাসনের নাবালক উত্তরাধিকারী আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ ও শূর বংশীয় আফগান সুলতান মহম্মদ আদিল শাহর কার্যত স্বাধীন মন্ত্রী হিমুর মধ্যে। আদিল শাহ তাঁর হিন্দু মন্ত্রী হিমুর সাহায্যে দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি জয় করে ভারতে আফগানপ্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। কিন্তু হিমু ঐসব স্থান জয়ের পর স্বাধীন ভাবে শাসনকার্য চালাতে থাকেন। ওদিকে মোগলরাও দিল্লী, আগ্রা পুনরধিকারের জন্য তৎপর হয়।

সম্রাট আকবরের মোগল বাহিনী বৈরাম খাঁর নেতৃত্বে দিল্লী জয়ের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব থেকে যাত্রা করলে পানিপথের রণক্ষেত্রে হিমুর বিশাল বাহিনীর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হয় ১৫৫৬ খ্রী, ৫ নভেম্বর। হিমু হস্তিপৃষ্ঠে বসে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু অকস্মাৎ একটি তীরের আঘাতে তিনি ধরাশায়ী হন এবং সেনাপতির পতনে হিমুর সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়। বিজয়ী মোগল বাহিনী দিল্লী ও আগ্রায় প্রবেশ করে।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়, পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে সে ভিত্তি আরও দৃঢ় হয় এবং ভারতে মোগল শক্তির আর কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না।

তৃতীয় যুদ্ধ: পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয় ১৭৬১ খ্রী, ১৪ জানুয়ারী। যুদ্ধ হয় আহমদ শাহ আবদালির (দুর্রানি) সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মারাঠাদের। ঐ যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি ছিন্নভিন্ন হয় এবং ভারতে মারাঠা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা চিরতরে লোপ পায়।

নাদির শাহর বিশ্বস্ত অনুচর আহমদ শাহ আবদালি নাদির শাহর মৃত্যুর পর আফগানিস্তানে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর ১৭৪৮—৬৭ খ্রী মধ্যে ভারতে কয়েক বার অভিযান চালিয়ে আহমদ শাহ পেশোয়ার, কাশ্মীর, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থান জয় করেন। পরে নিজপুত্র তৈমুরকে পাঞ্জাবের শাসক নিযুক্ত করে তিনি স্বরাজ্যে ফিরে আসেন। ঐ সময় মারাঠা সাম্রাজ্যও উত্তর ভারতে বিস্তৃতি লাভ করে এবং পেশোয়া বালাজি

বাজিরাওর ভাই রঘুনাথ রাও তৈমুরকে বিতাড়িত করে পাঞ্জাব অধিকার করেন। এতে আহমদ শাহ আবদালি ক্রুদ্ধ হয়ে আবার ভারত অভিযান শুরু করেন।

মারাঠাদের উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার রাজপুত, জাঠ প্রভৃতি উত্তর ভারতীয় শক্তিগুলির মনঃপূত ছিল না। ফলে আহমদ শাহর আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজপুত ও জাঠ নৃপতিরা কেউই মারাঠাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন না। অপর দিকে উত্তর ভারতের মুস্লিম নৃপতিরা আহমদ শাহর পক্ষে যোগ দেন। তবু সদাশিব রাও ভাওর নেতৃত্বে মারাঠা বাহিনী বিপুল বিক্রমে পানিপথের প্রান্তরে আহমদ শাহ আবদালির শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। আহমদ শাহ আবদালির সৈন্য সংখ্যা ছিল ষাট হাজার, অপর পক্ষে মারাঠাদের ছিল পঁয়তাল্লিশ হাজার। ভোরে যুদ্ধ শুরু হয় এবং অপরাহ্ন তিনটায় মারাঠাদের শোচনীয় পরাজয়ের মধ্যে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। সদাশিব রাও ভাও, পেশোয়া বালাজি বাজিরাওর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বাস রাও প্রমুখ মারাঠা সেনাপতিরা যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই প্রাণ হারান। নানা ফড়নবিশ, মহাদজি সিন্ধিয়া প্রমুখ কয়েক জন সেনাপতি কোনক্রমে রক্ষা পান। মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে সেদিন আত্মীয় বিয়োগ-বেদনায় ক্রন্দনের রোল ওঠে।

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠা শক্তি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও মারাঠা সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হওয়ায় ভারতে ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে আর কোন বড় বাধা থাকে না।

পারশিক অভিযান: খ্রী পূ ষষ্ঠ শতব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পারস্য সম্রাট সাইরাস (রাজত্বকাল ৫৫৮–৫৩০ খ্রী পূ) ভারতের অন্যতম মহাজনপদ গান্ধার আক্রমণ করেন। সে আক্রমণের ফলা-ফল সম্পর্কে সুনিশ্চিত কিছু জানা যায় না। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস, টেসিয়াসের মতে সাইরাস গান্ধার জয় করেন, এবং টেসিয়াস আরও বলেন যে, গান্ধার জয়ের পরেই সে রাজ্যের জনৈক সৈনিকের হাতে সাইরাস নিহত হন। কিন্তু ঐতিহাসিক নিয়ারকাসের মতে সাইরাসের ভারত অভিযান ব্যর্থ হয়। সাইরাস সম্ভবত সিন্ধু ও কাবুল নদীর মধ্যবর্তী স্থান স্বীয় অধিকারে আনেন।

সাইরাসের পৌত্র দরায়ুসের ভারত আক্রমণের কাহিনী আরও বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। হেরোডোটা-সের মতে গান্ধার তখন পারশিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারত (রাজপুতানার মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত সিন্ধু উপত্যকা) তখন পারশিক সাম্রাজ্যের বিংশতিতম সত্রপ (প্রদেশ) হিসাবে পরিগণিত হত। এই সত্রপ থেকে সে সময় প্রায় আড়াই কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হত।

দরায়ুসের পুত্র জেরেক্সিস ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পারশিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখেন। জেরেক্সিস যখন গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন তখন তাঁর বাহিনীতে বহু ভারতীয় সৈন্য ছিল।

গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের

ভারত আক্রমণকালে ভারতে পারশিক শাসন খুবই দুর্বল ছিল এবং সেকারণে তৎকালীন পারশিক সম্রাট তৃতীয় দরায়ুস সহজেই আলেকজাণ্ডারের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। ৩৩০ খ্রী পূ নাগাদ ভারতে পারশিক শাসনের অবসান ঘটে।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রায় দুই শতাব্দীর পারশিক শাসনের প্রভাব ভারতীয় ভাষা, লেখমালা, শিল্প ও ভাস্কর্যে পরিলক্ষিত হয়। ভারতের খরোষ্ঠি লেখমালা পারশিক প্রভাবিত। সম্রাট অশোকের সমকালীন মিনার, শিলালিপি ও বিভিন্ন শব্দে পারশিক প্রভাব সুস্পষ্ট। মৌর্য রাজসভাতেও কিছু কিছু পারশিক অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। উত্তর মৌর্য যুগে শক শাসকরা পারশিক শব্দ 'সত্রপ' প্রাদেশিক শাসন অর্থে ব্যবহৃত করেন।

পার্থিয়া: আনুমানিক ২৫০ খ্রী পূ পার্থিয়া স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান পারস্য, হেরাত, সমরকন্দ, খাজিম প্রভৃতি স্থান নিয়ে ঐ রাজ্য গঠিত হয়। ঐ রাজ্যের নৃপতি মিত্রাদেতিস ভারত আক্রমণ করেন এবং সিন্ধু নদীর মধ্যবর্তী স্থান তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীকালের অন্যতম ইন্দো-পার্থিয়ান নৃপতি গণ্ডোফরেসের সময় ভারতে পার্থিয়ার অধিকার সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেই ভারতস্থ পার্থিয়া রাজ্যের (ইন্দো-পার্থিয়া) পতন শুরু হয় এবং ক্রমে ক্রমে ইন্দো-পার্থিয়া কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পার্শি, ভারতে: আরবরা ৬৪১ খ্রী পারস্য জয় করে এবং সেখানকার অধিবাসীদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে থাকে। সে সময় পারস্যের অধিকাংশ লোক ছিল জরথুষ্ট্র প্রবর্তিত ধর্মে বিশ্বাসী। তাদের ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দাবেস্তা' এবং উপাস্য দেবতা আহুর-মাজদা; প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মধ্যে অগ্নি তাদের কাছে সর্বাধিক পবিত্র।

জরথুষ্ট্রর অগ্রগামী বলে তারা জরথুষ্ট্রীয় নামেই পরিচিত ছিল। ঐ জরথুষ্ট্রীয়দের একাংশ ধর্মত্যাগ অপেক্ষা দেশত্যাগ শ্রেয় মনে করে এবং সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে তাদের দেশত্যাগ শুরু হয়। প্রথমে একদল পৌঁছায় গুজরাতের উপকূলে দিউ নামক স্থানে এবং সেখানকার রাজা জয়দেব তাদের বসবাসের জন্য স্থান দেন। জরথুষ্ট্রীয়রা পারস্যের লোক বলে ভারতে তারা পার্শি নামেই পরিচিতি লাভ করে এবং এখনও তাদের পার্শিই বলা হয়, যদি ধর্মাবলম্বী হিসাবে তারা আজও জরথুষ্ট্রীয়। গুজরাতের উপকূল থেকে ধীরে ধীরে পার্শিদের উপনিবেশ মহারাষ্ট্র অঞ্চলে বিস্তৃত হতে থাকে এবং ক্রমে মহারাষ্ট্রই হয় পার্শিদের প্রধান বাসস্থান। বর্তমানে সারা ভারতে পার্শির সংখ্যা লক্ষাধিক। ভারতে বসবাসকারীরা ভারতকে তাদের মাতৃভূমি জ্ঞান করে। শিল্পে, বাণিজ্যে, শিক্ষাক্ষেত্রে, রাজনীতিতে পার্শিদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। জামসেদজি টাটার মতো শিল্পপতি, দাদাভাই নৌরজি, ফিরোজ শাহ মেহতার মতো রাজনৈতিক নেতা পার্শি সম্প্রদায় থেকেই

ভারত লাভ করেছে। পার্শি সম্প্রদায়-ভুক্ত জেনারেল মানেক শ ভারতের প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ক্রীড়াক্ষেত্রেও পার্শিদের অবদান উল্লেখযোগ্য।

পার্শ্বনাথ : জৈন ধর্মগুরু, আবির্ভাব-কাল খ্রী পূ অষ্টম শতাব্দী, পরেশনাথ নামেও অভিহিত, ইনি বারাণসীর রাজপুত্র ছিলেন, ত্রিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের আড়াই শ বছর পরে জৈন ধর্মের ২৪তম ও শেষ ধর্মগুরু মহাবীর জন্ম গ্রহণ করেন।

পালবংশ ঃ রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশে প্রায় শতাব্দীকাল দারুণ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা চলে। প্রবলের উৎপীড়নে দুর্বলের জীবন অসহনীয় হয়। নানা বিদেশী জাতির বঙ্গদেশ আক্রমণের আশঙ্কাও প্রবল হয়। সেই অনিশ্চিত ও অরাজক অবস্থার অবসান-কল্পে বঙ্গদেশের তৎকালীন প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তিগণ সমবেতভাবে গোপাল নামক এক স্থানীয় প্রভাবশালী সামন্ত-কে বঙ্গদেশের রাজা নির্বাচিত করেন। সম্ভবত ৭৫০ খ্রী গোপাল বঙ্গদেশের রাজা হন। উত্তর বঙ্গের এক বৌদ্ধ পরিবারে গোপালের জন্ম। তবে আবুল ফজলের রচনায় পালবংশীয় রাজাদের কায়স্থ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

বঙ্গদেশে শান্তি স্থাপন করে গোপাল যোগ্যতার পরিচয় দেন। তিনি সম্ভবত ৭৭০ খ্রী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল সিংহাসনে বসেন। তিনি পালবংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতিরূপে বিবেচিত। পরাক্রমশালী ধর্মপাল কনৌজের রাজা ইন্দ্ররাজকে পরাজিত করে তাঁর অনুগত চক্রায়ুধকে সে রাজ্যের রাজা করেন। চক্রায়ুধের অভিষেককালে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার ও কিরাত রাজ্যের রাজারা উপস্থিত ছিলেন। ঐসব রাজ্যের রাজা ধর্মপালের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। বঙ্গ-দেশ ও বিহার প্রত্যক্ষ ভাবে ধর্মপালের শাসনাধীন ছিল। ধর্মপাল অবশ্য প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টর কাছে, বর্তমান মুঙ্গেরের নিকটবর্তী এক স্থানে খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হন। নাগভট্ট কনৌজও জয় করে নেন এবং কনৌজের রাজা ধর্মপালের অনুগত চক্রায়ুধ রাজ্য-ত্যাগ করে ধর্মপালের কাছে আশ্রয় নেন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দর সহায়তায় ধর্মপাল প্রতিহাররাজ নাগভট্টর আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং ঐ সাহায্যের শর্তরূপে ধর্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দর আনুগত্য স্বীকার করেন।

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল পরাক্রম-শালী নৃপতি ছিলেন এবং তাঁর পরাক্রমে পালরাজ্যের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার হয় এবং রাজ্যের সীমানাও বিস্তার লাভ করে। দেবপালের শাসনকাল ৮১০-৮৫০ খ্রী। তিনি প্রাগজ্যোতিষ, উৎকল, হুন, গুর্জর ও দ্রাবিড় রাজ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমে সুদূর কম্বোজ রাজ্য দেবপাল জয় করেন বলে মনে করা হয়। আরব পর্যটক

সুলেমান দেবপালকে খুব শক্তিশালী রাজা বলে বর্ণনা করেছেন।

দেবপালের পর থেকেই পাল-বংশের অবনতির সূচনা হয়। দেব-পালের পর একে একে রাজা হন বিগ্রহপাল (৮৫০-৫৪), নারায়ণপাল (৮৫৪-৯০৮), রাজ্যপাল (৯০৮-৯৪০), দ্বিতীয় গোপাল (৯৪০-৯৬০), দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (৯৬০-৮৮); এই বিগ্রহপালের রাজত্বকালেই পালরাজ্যের অস্তিত্ব প্রায় লুপ্ত হয়।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল অর্ধশতাব্দীকাল (৯৮৮-১০৩৮) রাজত্ব করেন এবং পাল রাজ্যের হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারে তৎপর হন। মহীপালের পর রাজত্ব করেন নয়পাল। নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল পাল বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা (রাজত্বকাল ১০৫৪-৭০)। তাঁর রাজত্বকালে, সম্ভবত ১০৬৮ খ্রী চালুক্য রাজা প্রথম সোমেশ্বর বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওড়িশার সোমবংশীয় শাসক মহাশিব গুপ্ত যযাতিও বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। তারপর পালরাজ্য কয়েক অংশে বিভক্ত হয়ে যায় এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। ঐ অরাজক অবস্থার মধ্যে উত্তর বঙ্গে দ্বিতীয় মহীপালের (শাসনকাল ১০৭০-৭৫) শাসনের অবসান ঘটিয়ে দিব্য বা দিব্যোক নামক এক শক্তিশালী কৈবর্ত-প্রধান ক্ষমতাসীন হন। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হন। পরে দিব্যর উত্তরাধিকারী ভীমকে পরাজিত ও নিহত করে দ্বিতীয় মহীপালের ভাই রামপাল পালরাজ্যের কিছুটা পুনরুদ্ধার করেন। রামপালের সভাপতি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিত' কাব্যে কৈবর্তরাজ দিব্যর রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও তার ধ্বংসে রাজা রামপালের ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে। রামপাল উত্তর বঙ্গে কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বঙ্গ ও আসামে তাঁর শক্তি বিস্তার করেন, তারপর কলিঙ্গ অভিমুখে অগ্রসর হন। কলিঙ্গ জয়ের পথে রামপালকে পূর্ব বঙ্গ রাজ্যের রাজা অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গর প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়। অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল রাজত্বের পর রামপাল পরলোক গমন করেন। রামপালের মৃত্যুর পর যথাক্রমে কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল ও মদনপাল রাজা হন। মদনপালের রাজত্বকাল ১১৪৪-৭২ খ্রী। তিনিই পালবংশের শেষ রাজা। তাঁর শাসনকালে বিজয় সেন পশ্চিম বঙ্গে সেন বংশীয় শাসনের সূচনা করেন। পরে বিজয় সেন মদনপালকে উত্তর বঙ্গ থেকেও উৎখাত করলে বিহারে ১১৬১ খ্রী মদনপালের রাজ্য বজায় থাকে। মদনপালের মৃত্যুর সঙ্গে চার শ বছরের (৭৫০—১১৬১) পাল রাজ্যের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে।

পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙলার নিজস্ব শিল্প ও স্থাপত্যরীতি বিশিষ্টতা লাভ করে। পালরাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কম্বোজ, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ রাজবংশগুলির সঙ্গে পাল রাজাদের সংযোগ স্থাপিত হয়। সেই সুযোগে বাঙলার স্থাপত্য শিল্পকলা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে প্রভাবিত করে। পাল রাজারা শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি করেন এবং বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী বিহারের (বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানরূপে যেগুলির আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল। পাল রাজাদের শাসন-কালেই যে বাংলা ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা-রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক 'চর্যাগীতি' আবিষ্কৃত হওয়ার পর সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। রাজা শশাঙ্কর রাজত্বকালে বাঙলাদেশ ও জাতির যে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সূচনা হয় পাল রাজাদের শাসনকালে তা একটি সুনিশ্চিত পরিণতি লাভ করে।

পালকুরিকি সোমনাথ: ত্রয়োদশ শতাব্দীর তেলুগু কবি। তেলেগু ভাষা ও সাহিত্যকে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব মুক্ত করার কাজে তিনি প্রয়াসী হন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'পণ্ডিতা-রাধ্য চরিত্রম', 'বাসব পুরাণ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পাহাড়পুর: পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশ) রাজশাহি জেলার অন্তর্গত। প্রাচীন নাম সোমপুর। এখানে উৎখননের ফলে একটি বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। মন্দিরের প্রদক্ষিণ পথের প্রাচীর গাত্রে বহু মাটির ফলকে বহু হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি, জীবজন্তু প্রভৃতির চিত্র পাওয়া গেছে। উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত একটি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যে মন্দিরটি অবস্থিত ছিল। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে পাল-রাজা ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দিরটি নির্মিত হয়।

পিটের ভারত শাসন আইন: উইলিয়ম পিটের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ব্রিটিশ সরকার ১৭৮৪ খ্রীঃ যে ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করেন তা 'পিটস ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' বা 'পিটের ভারত শাসন আইন' নামে খ্যাত। ঐ আইন অনুসারে গভর্নর-জেনারেলের কাউ-ন্সিলের সদস্যসংখ্যা চার থেকে কমিয়ে তিন করা হয় এবং ঐ তিনজনের একজন হন পদাধিকারবলে ভারতস্থ ব্রিটিশ সরকারের সৈন্যাধ্যক্ষ। স্থির হয় যে, কাউন্সিলে মতভেদের ফলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে গভর্নর-জেনারেল কাস্টিং ভোট প্রয়োগ করে তাঁর সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারবেন। আরও স্থির হয় যে, কোম্পানির ডাইরেক্টর সভার অনুমতি ছাড়া গভর্নর-জেনারেল বা তাঁর কাউন্সিল কোন দেশীয় রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারবেন না। বোম্বাই বা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির শাসন ব্যবস্থার উপর গভর্নর-জেনারেলের আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লণ্ডনস্থ কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা আরও সীমিত করার জন্য ছয় জন সদস্য নিয়ে একটি 'বোর্ড অফ কণ্ট্রোল' গঠিত হয়। এই ভাবে কোম্পানির ক্ষমতা সীমিত করে ব্রিটিশ সরকার আরও বেশি ভারতের শাসন দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন। 'পিটস ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' দেশীয় নৃপতিদের সঙ্গে ভারতের ইংরেজ সরকারের সম্পর্কের উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখে।

পিঠির সেন বংশ : পিঠিতে (বর্তমান গয়া অঞ্চল) এক সেন বংশীয় শাসনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ বংশের মাত্র দুজন রাজার নাম মেলে। তাঁরা হলেন বুদ্ধসেন ও তাঁর পুত্র জয়সেন। তাঁদের রাজত্বকাল ছিল সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ।

পিণ্ডারী : ভারতের একদল দুর্ধর্ষ দস্যু পিণ্ডারী নামে পরিচিত ছিল। গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ময়রা ঐ দস্যু-দলকে দমন করেন। বিভিন্ন জাতির কর্মহীন সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিদের নিয়ে ঐ দস্যুদল গঠিত হয়। তারা রাজ-পুতনা, মধ্য-ভারত ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে লুঠতরাজ চালাত। পরে ইংরেজ শাসিত এলাকায় তাদের হামলা শুরু হলে লর্ড ময়রা ১৮১২-১৩ সালে ঐ দস্যুদলকে দমন করেন।

পুরাণ : আর্য ভারতের ধর্মগ্রন্থ। ভারতে হিন্দু সভ্যতার বহু তথ্য পুরাণ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ঐতিহাসিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ বিষ্ণু পুরাণ, বায়ু পুরাণ, মৎস পুরাণ, ও ব্রহ্ম পুরাণ। বিষ্ণু পুরাণ মৌর্যযুগের, মৎস পুরাণ অন্ধ্ররাজ্যের, বায়ু পুরাণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল।

বিভিন্ন পুরাণ পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত তার মধ্যে পঞ্চম খণ্ড বংশচরিত যা ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ে বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। বংশচরিতে আছে হিন্দু যুগের শাসন ব্যবস্থা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজচরিত্র সম্পর্কে নানা তথ্য ও কাহিনী।

পুরুরাজ্য : গ্রীক সম্রাট আলেক-জাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে উত্তর ভারতে ঝিলম ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যে পুরুরাজ্য অবস্থিত ছিল। পুরুরাজ্য ছিল উর্বরা ও সমৃদ্ধ, নগর ও জনপদের সংখ্যা ছিল তিন শত। অস্ত্রবলেও পুরুরাজ্য দুর্বল ছিল না। পঞ্চাশ হাজার পদাতিক, তিন হাজার অশ্বারোহী, এক হাজার রথ ও শতাধিক হাতি ছিল তার প্রতিরক্ষা বাহিনীতে। ভারতে অভিযানকালে আলেকজাণ্ডার পুরুরাজের কাছেই প্রথম প্রবল বাধার সম্মুখীন হন।

তক্ষশিলার রাজা অম্ভি আলেক-জাণ্ডারের কাছে আত্মসমর্পণ করা সত্ত্বেও পুরুরাজ বিচলিত হন না এবং সম্রাট আলেকজাণ্ডারকে বাধা দানের জন্য প্রস্তুত হন। ঝিলম নদীর দক্ষিণ তীরে পুরুরাজ যেখানে সৈন্য বাহিনী নিয়ে আলেকজান্ডারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তার ষোল মাইল উত্তরে রাত্রের অন্ধকারে আলেকজাণ্ডার ঝিলম নদী অতিক্রম করেন এবং তাঁকে ঐ পথের সন্ধান দেন তক্ষশিলার রাজা অম্ভি। ঐ অতর্কিত আক্রমণের জন্য পুরুরাজ প্রস্তুত ছিলেন না এবং আলেক-জাণ্ডারের মতো সামরিক প্রতিভাও তাঁর ছিল না। কিন্তু পুরুরাজ ছিলেন সাহসী বীর, তাই সৈন্য বাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও নিজে ক্ষত-বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন না। আহত অবস্থায় পুরুরাজ বন্দী হন। কিন্তু তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট আলেকজাণ্ডার তাঁকে মুক্তি দেন ও

তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন। এমন কি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে সম্রাট আলেকজাণ্ডার তাঁর অধিকৃত স্থানগুলির কিছু অংশের শাসন দায়িত্ব পুরুরাজের উপর ন্যস্ত করে যান।

পুলকেশী : চালুক্য বংশীয় রাজা প্রথম পুলকেশীর শাসনকালে (৫৩৫-৬৬ খ্রী) চালক্য রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর শাসনকালে চালুক্য রাজ্যের রাজধানী হয় বাদামি অথবা বাতাপি। সে কারণে পুলকেশীর রাজবংশ বাতাপির চালুক্য বংশ নামে পরিচিত হয়।

প্রথম পুলকেশীর পৌত্র দ্বিতীয় পুলকেশী বাতাপির চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। তিনি উত্তর কানাড়ার কদম্ব, মহীশূরের গঙ্গ ও উত্তর কোঙ্কনের মৌর্য নৃপতিদের পরাজিত করে চালুক্য রাজ্যের কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করেন। দক্ষিণ গুজরাতের লাট, এবং মালব ও ব্রোচের গুর্জর রাজ্যও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। মহাকোশল ও কলিঙ্গর রাজারাও দ্বিতীয় পুলকেশীর পরাক্রম অনুভব করেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন সাং চালুক্য রাজ্য পরিদর্শন করেন এবং দ্বিতীয় পুলকেশীর শাসন-দক্ষতায় মুগ্ধ হন। দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রতি প্রজাপুঞ্জের সশ্রদ্ধ আনুগত্যের কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় পুলকেশী সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমকালীন এবং তাঁদের রাজত্বকালও প্রায় সমান। দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্ব-কাল ৬০৮-৪২খ্রী এবং হর্ষবর্ধনের রাজত্ব-কাল ৬০৩-৪৭ খ্রী। দ্বিতীয় পুলকেশীর শাসনকালে চালুক্য রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করলেও দ্বিতীয় পুলকেশীর শেষ জীবন সুখের ছিল না। পল্লবরাজ নরসিং বর্মণের আক্রমণে দ্বিতীয় পুলকেশী পরাজিত ও নিহত হন।

পুষ্যভূতি বংশ : খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে থানেশ্বর নামক স্থানে পুষ্যভূতি বংশের শাসনের সূচনা হয়। তখন রাজ্যটি ছিল ক্ষুদ্র ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। গুপ্ত বংশের সঙ্গেও পুষ্যভূতি বংশের নিকট সম্পর্ক ছিল। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যখন একের পর এক স্বাধীন রাজ্য আত্মপ্রকাশ করতে থাকে তখন পুষ্যভূতি বংশের নেতৃত্বে থানেশ্বরও একই পথ অনুসরণ করে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে ও সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে থানেশ্বর স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পুষ্যভূতি বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য নৃপতি প্রভাকরবর্ধন। হূন আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে যখন ভারতের বিভিন্ন রাজশক্তি ঐক্যবদ্ধ হয় প্রভাকরবর্ধনও তাতে যোগ দেন এবং জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্য-বর্ধনকে যুদ্ধে পাঠান।

প্রভাকরবর্ধনের পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে বসেন (৬০৫ খ্রী)। কিন্তু রাজ্যলাভের এক বছরের মধ্যে রাজ্যবর্ধন গৌড়রাজ শশাঙ্কের হাতে নিহত হন। তখন রাজা হন রাজ্য-বর্ধনের অনুজ হর্ষবর্ধন। হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের পুষ্যভূতিবংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন সাং-এর বিবরণীতে ও বান-ভট্টের 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে হর্ষবর্ধনের

রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যশাসনের কাহিনী জানা যায়। ছয় বছর অবিরাম সংগ্রামের শেষে হর্ষবর্ধন যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন তা পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদী থেকে পশ্চিমে পূর্ব-পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তর ও দক্ষিণে সীমানা ছিল হিমালয় পর্বত ও নর্মদা নদী। নেপাল ও কাশ্মীরের সঙ্গেও সম্রাট হর্ষ-বর্ধনের সম্পর্ক ভাল ছিল। সুশাসক হিসাবেও হর্ষ খ্যাত ছিলেন। হর্ষ প্রথম জীবনে হিন্দু ছিলেন এবং শিব ও সূর্য ছিল তাঁর উপাস্য দেবতা। পরে, বোধহয় রাজ্যশ্রীর প্রভাবে হর্ষ বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরিব্রাজক হিউ-এন সাংও হয়তো তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর সম্রাট হর্ষবর্ধন সম্রাট অশোক ও সম্রাট কণিষ্কের মতো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। শিক্ষা সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায়ও হর্ষ যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। একচল্লিশ বছর রাজ্য শাসনের পর ৬৪৭ খ্রী হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরেই পুষ্যভূতি বংশের শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতে আবার অগণিত ছোট বড় রাজ্যের সৃষ্টি হয়।

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ : ইনি মৌর্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। পুষ্যমিত্র ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ ও বৃহদ্রথের প্রধান সেনাপতি। পুষ্যমিত্রের অভ্যু-ত্থানকে কোন কোন ঐতিহাসিক বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুত্থান বলে বর্ণনা করেছেন। বহু বৌদ্ধগ্রন্থে পুষ্যমিত্রকে বৌদ্ধধর্ম বিরোধী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পুষ্যমিত্রের রাজ্য পাটলিপুত্র থেকে নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং অযোধ্যা বিদিশা প্রভৃতি নগরী সে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পুষ্যমিত্র ছত্রিশ বছর রাজত্ব করেন (খ্রী পূ ১৮৭-১৫১)। প্রখ্যাত ভাষ্য-কার পতঞ্জলি তাঁর সমকালীন ছিলেন। পুষ্যমিত্র সম্ভবত বেরার পুনরধিকার ও গ্রীক আক্রমণ প্রতিহত করার পর অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। দুর্বল মৌর্য শাসকদের শাসনকালে ভারতে যে অরাজকতা দেখা দেয় পুষ্যমিত্রের শাসনকালে তার বহু পরিমাণে অবসান ঘটে।

পৃথ্বীরাজ চৌহান : দিল্লী, আজমির ও বর্তমান রাজস্থানের বিস্তীর্ণ অংশের রাজা পৃথ্বীরাজ ১১৬২-৬৫ খ্রী মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৭৭ খ্রী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। অত অল্প বয়সে সিংহাসনে বসেও মাত্র দশ বছরের মধ্যে পৃথ্বীরাজ আলোয়ার বুন্দেলখণ্ড ও গুজরাতের রাজাদের পরাজিত করে তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন। ১১৯০ খ্রী মহম্মদ ঘুরি পৃথ্বীরাজ্যের অংশ ভাতিন্দা জয় করলে পৃথ্বীরাজ বিপুল বাহিনী নিয়ে মহম্মদ ঘুরির আক্রমণের সম্মুখীন হন ও তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১) মহম্মদ ঘুরিকে পরাজিত করেন। সে সময় সব রাজপুত শক্তি ঐক্যবদ্ধ হলে ঘুরিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও বিতাড়িত করা সম্ভব হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পৃথ্বীরাজের রাজ্য

আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কনৌজের রাজপুত নৃপতি জয়চাঁদ সম্পূর্ণ নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকেন। পরের বছর আরও বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে মহম্মদ ঘুরি আবার যখন তরাইনের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন সেবারও পৃথ্বীরাজকে একক শক্তিতে সে আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে, ১১৯২ খ্রী, পৃথ্বীরাজ প্রচণ্ড যুদ্ধের পর পরাজিত ও নিহত হন।

কাহিনী প্রচারিত আছে যে, কনৌজরাজ জয়চাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর কন্যা সংযুক্তাকে (সংযোগিতা) বিবাহ করায় জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের প্রতি বিরূপ হন এবং সেই কারণেই পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নীরব থাকেন। কিন্তু বহুল প্রচারিত ঐ কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত নন।

প্যাটেল, বল্লভভাই (১৮৭৫ ১৯৫০): জাতীয় আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা। পেশায় ব্যারিস্টার ছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকালে আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন। বর্দোলির কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন ও নির্ভীক নেতৃত্বের জন্য সারা ভারতে 'সর্দার' আখ্যায় অভিনন্দিত হন। ১৯৩১ খ্রী জাতীয় কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের জন্য সর্দার প্যাটেল বারবার গ্রেফতার হন ও কয়েকবছর কারারুদ্ধ থাকেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হন। পাঁচশত দেশীয় রাজ্যকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীরূপে সর্দার প্যাটেলের অনন্যকীর্তি। প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদের নিজাম জনগণের ইচ্ছা উপেক্ষা করে হায়দরাবাদকে ভারতীয় ইউনিয়নের বাইরে রাখার চেষ্টা করলে সর্দার প্যাটেলের দৃঢ়তায় তা ব্যর্থ হয়। অনমনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী সর্দার প্যাটেল ভারতীয় রাজনীতিতে 'লৌহ মানব' নামে পরিচিত ছিলেন।

প্যাটেল, বিঠলভাই (১৮৭৩—১৯৩৩): বিশিষ্ট জননেতা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অগ্রজ। ব্যারিস্টাররূপে কর্মজীবনের সূচনা করেন, পরে রাজনীতিতে প্রবেশ করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য ও পরে স্পীকাররূপে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন। আইন ব্যবসায়ে যে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন তার অধিকাংশই দেশের কাজে ব্যয় করেন। স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য শেষ জীবনে ইউরোপে বাস করেন ও সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ইউরোপে সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন এবং সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও আদর্শনিষ্ঠা তাঁকে মুগ্ধ করে। বিদেশে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার কার্য চালানোর জন্য তিনি তাঁর উইলে একটি বড় অঙ্কের টাকা সুভাষচন্দ্রকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে যান।

প্রস্তর যুগ, ভারতে: ভারতের প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগকে প্রত্নপ্রস্তর

ও নব্যপ্রস্তর—এই দুই যুগে ভাগ করা হয়। প্রত্নপ্রস্তর যুগের মানুষদের ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্রগুলি শানিত ছিল না, এবং তাদের হাতলগুলি ছিল কাঠের অথবা পশুর হাড়ের। ঐসব অস্ত্র পশু শিকার, কাঠকাটা, পেটানো অথবা মাটি খোঁড়ার কাজে ব্যবহৃত হ'ত। প্রত্নপ্রস্তর যুগের মানুষরা ফসল ফলাতে জানত না তাই গাছের ফল ও বনের পশুর সন্ধানে তারা যাযাবরের জীবন যাপন করত। কোন ধাতুর ব্যবহারও তাদের অজানা ছিল। প্রত্ন-প্রস্তর যুগের কোন মাটির পাত্রেরও সন্ধান মেলেনি। সম্ভবত আগুনও ছিল তাদের অনায়ত্ত। স্বভাবতই পশু-জীবনের সঙ্গে সেদিনের মনুষ্যজীবনের পার্থক্য অতি সামান্যই ছিল। মনুষ্য-গোষ্ঠী হিসাবে ভারতের প্রত্নপ্রস্তর যুগের মানুষরা ছিল নেগ্রিটো গোষ্ঠীর, হ্রস্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, চাপা নাক ও কোঁকড়া চুল। ঐ যুগের মানুষের প্রায় নিখাদ রূপ এখন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে মেলে। তামিলনাড়ুর চিংলিপুট জেলায়, উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলায় ও গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলে প্রত্নপ্রস্তর যুগের কিছু কিছু অস্ত্রের নিদর্শন মিলেছে।

নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষদের ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্রগুলি ছিল শানিত, সুগঠিত ও বৈচিত্র্যময়। তারা জমিতে ফসল ফলাতে শিখেছিল তাই খাদ্যের সন্ধানে তারা আর ঘুরে বেড়াত না। ফলে নব্যপ্রস্তর যুগে ভারতে স্থায়ী জনপদ গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। গরু ছাগল প্রভৃতি বনের পশুও তাদের বশে এসেছিল। অন্য কোন ধাতুর ব্যবহার না জানলেও সোনার ব্যবহার তারা শিখেছিল। কুমোরের চাকাও ঐ সময় উদ্ভাবিত হয়,ফলে নানা ধরনের মাটির পাত্রও তারা ব্যবহার করত। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে নব্যপ্রস্তর যুগের নানা নিদর্শনের সন্ধান মিলেছে। ক্রমে ক্রমে তারা নৌকা তৈরি ক'রে জলে অধিকার বিস্তার করে। তুলা থেকে সুতো তৈরি ক'রে কাপড় বোনার বিদ্যাও নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষের আয়ত্তে আসে।

প্রত্ন ও নব্যপ্রস্তর যুগের মধ্যে কয়েক হাজার বছরের ব্যবধান। আবার নব্যপ্রস্তর যুগেরও কয়েক হাজার বছর পরে মানুষ লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার শেখে। বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার ও লিখন বিদ্যা ভারতীয়দের আয়ত্ত হওয়ার কাল থেকেই ঋগবেদের যুগের সূচনা বলা যায়।

প্রকাশম, টি (১৮৬৯-১৯৫৬) মাদ্রাজ প্রদেশের (বর্তমানে অন্ধ্র-রাজ্যের) অন্তর্গত ভেলোর জেলায় টি. প্রকাশমের জন্ম। ব্যারিস্টাররূপে কর্মজীবনের সূচনা করেন কিন্তু ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের জন্য বারবার কারারুদ্ধ হন। ১৯২৬-৩০ সালে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭-৩৯ সালে শ্রীরাজা-গোপালাচারীর নেতৃত্বে গঠিত মাদ্রাজ মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। পরে ১৯৪৬-৪৭ সালে মাদ্রাজ মন্ত্রিসভার প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯৫০ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করেন, আবার ৫৩ সালে ফিরে আসেন

ও ঐ বছর ১ অক্টোবর নব-গঠিত অন্ধ্র-প্রদেশের প্রথম মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রজাতন্ত্র, ভারতেঃ ভারতে প্রজা-শাসিত রাষ্ট্রের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। খ্রী পূ ৬৫০-৩২৫ অব্দের মধ্যে উত্তর ভারতে অন্তত দশটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল। তার মধ্যে কপিলাবস্তুর শাক্য, কুশীনগরের মল্ল, পাওয়া ও বৈশালির লিচ্ছবি রাজ্য বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ঐ রাজ্যগুলি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হত। রাজ্যগুলি যখন ছোট ছিল তখন রাজ্যের সকল প্রজাই প্রতিনিধিসভার সদস্য বিবেচিত হতেন। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণকালে উত্তর-পূর্ব ভারতে অনেক প্রজাশাসিত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রজাতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় আদর্শরূপে গ্রহণকরে। সেইমতো সংবিধান রচিত হয় এবং ১৯৫০ খ্রী ২৬ জানুয়ারী ভারত নিজেকে সার্বভৌম গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করে।

প্রতাপ সিং কায়রোঁ (১৯০১-৬৫): যুক্তরাষ্ট্রে মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে গদর পার্টির সংস্পর্শে আসেন; ১৯২৯ খ্রী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৪১-৫০ খ্রী পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন। বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে যোগদানের জন্য বহুবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৭-৪৯ ও ১৯৫২-৫৬ খ্রী পাঞ্জাব মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৫৬ খ্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৬৪ খ্রী পর্যন্ত প্রতাপ সিং কায়রোঁ পাঞ্জাব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ঐ বছরে এক তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। তার অল্পকাল পরেই তিনি আততায়ীর আক্রমণে নিহত হন।

প্রতাপ সিংহ, রানা (১৫৪০-৯৭ খ্রী): মেবারের শিশোদিয়া বংশীয় রাজপুত রাজা; রানা প্রতাপ নামে ইতিহাসখ্যাত। ১৫৭২ খ্রী যখন পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন, তার চার বছর আগে পিতা উদয়সিংহ মোগলসম্রাট আকবরের কাছে মেবারের রাজধানী চিতোর হারান। রানা প্রতাপের সমকালীন সব রাজপুত নৃপতিই আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু রানা প্রতাপ মোগল সম্রাটের বশ্যতার প্রস্তাব বারবার প্রত্যাখ্যান করেন এবং নানা প্রতিকূল-তার মধ্যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চিতোর উদ্ধারের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যান।

মোগল পক্ষের সন্ধির প্রস্তাব রানা প্রতাপ তিন বার প্রত্যাখ্যান করলে অম্বরের রাজপুত রাজা মানসিংহের সেনাপতিত্বে এক বিশাল মোগল বাহিনী ১৫৭৬ খ্রী রানা প্রতাপের রাজ্য আক্রমণ করে। হলদিঘাটের (গোগুণ্ডা) যুদ্ধে সামান্য শক্তি নিয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে সংগ্রাম করেও রানা প্রতাপ পরাজিত হলেন। প্রায় সমগ্র মেবার রাজ্য তখন মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়

এবং রানা প্রতাপ আরাবল্লির পর্বতারণ্যে আশ্রয় নেন। তারপর রানা প্রতাপ সীমাহীন দুঃখকষ্টের মধ্যেও শুধু মাত্র ভিল অনুচরদের নিয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। সম্রাট আকবর প্রতাপ সিংহকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে পরপর শাহবাজ খাঁ, আবদার রহিম খাঁ ও রাজা জগন্নাথের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী পাঠান। কিন্তু তাঁদের সকল অভিযান ব্যর্থ হয়।

অবশেষে রানা প্রতাপের বিরামহীন সংগ্রাম কিছুটা সফল হয়। মোগল সম্রাট অন্যত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকার সুযোগে রানা প্রতাপ ১৫৮৫-৯৭ খ্রী মধ্যে তাঁর হৃতরাজ্যের অনেকটা পুনরুদ্ধার করেন। শুধুমাত্র চিতোর ও মণ্ডলগড় ছাড়া মেবারের সবটুকু রানা প্রতাপের অধিকারে আসে। মাত্র সাতান্ন বছর বয়সে রণক্লান্ত রানা প্রতাপের মৃত্যু হয়।

প্রতাপাদিত্য রায় : মোগল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গিরের শাসনকালে বঙ্গদেশে বারভূঁইয়া নামক সামন্তদের মধ্যে যে কয়জন বীরত্বের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন প্রতাপাদিত্য রায় তাঁদের অন্যতম। পিতার মৃত্যুর পর তিনি যশোর, খুলনা ও বাখরগঞ্জের এক বিস্তীর্ণ এলাকায় স্বাধীন রাজার মতো শাসনকার্য চালাতে থাকেন এবং দিল্লীর সম্রাটকে করদান বন্ধ করেন। ইছামতী ও যমুনা নদীর সঙ্গমে অবস্থিত ধূমঘাট ছিল তাঁর রাজ্যের রাজধানী। পর্তুগীজ নাবিকদের সহায়তায় প্রতাপাদিত্য একটি নৌবাহিনীও গঠন করেন।

কিন্তু মোগল সম্রাট জাহাঙ্গির প্রেরিত বাহিনীর কাছে প্রথমে তাঁর পুত্র উদয়াদিত্য সালকার নৌযুদ্ধে ও পরে তিনি স্বয়ং মগরাঘাটের যুদ্ধে (১৬১২ খ্রী) পরাজিত হন। বন্দী অবস্থায় দিল্লী যাওয়ার পথে কাশীতে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়।

প্রদেশ : ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ভারত এগারোটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলির নাম ছিল আসাম, বঙ্গদেশ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশা। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল তখন পাঁচ শতাধিক দেশীয় রাজার শাসনাধীন ছিল। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জম্মু ও কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, ঢেনকানল, ময়ূরভঞ্জ, কোচবিহার, ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি। ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্বদিনে, ১৯৪৭ খ্রী, ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশ সম্পূর্ণ এবং বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবের অর্ধাংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশিষ্ট প্রদেশগুলি এবং পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাব ভারতের অভ্যন্তরে থাকে। একমাত্র আসামের শ্রীহট্ট জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পাঁচ শতাধিক দেশীয় রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবি ওঠায় মুখ্যত ভাষার ভিত্তিতে ভারতের প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে পুনর্গঠিত

করা হয়। যেমন কোচবিহার পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়, ঢেনকানল, ময়ূরভঞ্জ প্রমুখ ২৩টি দেশীয় রাজ্য ওড়িশার অঙ্গীভূত হয়, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও সমীপবর্তী অন্যান্য মালয়লমভাষী অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় কেরল। ভাষার ভিত্তিতে মাদ্রাজকে বিভক্ত করে মাদ্রাজ ও অন্ধ্র প্রদেশ গঠন করা হয়, বোম্বাই বিভক্ত হয়ে মহারাষ্ট্র ও গুজরাত গঠিত হয় এবং সৌরাষ্ট্রের দুই শতাধিক ছোট বড় দেশীয় রাজ্য গুজরাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইভাবে পুনর্গঠিত প্রদেশগুলিকে ভারতের সংবিধানে রাজ্য (state) আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যদিও কয়েকটি রাজ্য এখনও প্রদেশ নামেই অভিহিত। যেমন, অন্ধ্রপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ। ইংরেজ শাসনাধীন যুক্তপ্রদেশের নতুন নাম হয়েছে উত্তর প্রদেশ। মাদ্রাজ আরও পরে হয়েছে তামিলনাড়ু। মহীশূর রাজ্য হয়েছে কর্নাটক।

প্রধানমন্ত্রী : ১৯৩৫ খ্রী ভারত আইন (India Act, 1935) অনুসারে ১৯৩৭ খ্রী ভারতের ১১টি ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশে নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভা ও দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তখন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত। যেমন বঙ্গদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন এ. কে. ফজলুল হক, আসামের হন গোপীনাথ বরদলৈ, মাদ্রাজের হন শ্রীরাজাগোপালচারী, বোম্বাইয়ের হন বি. জি. খের, ওড়িশার হন শ্রীবিশ্বনাথ দাস। তখন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন ভাইসরয়, কোন দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা কেন্দ্রে ছিল না। কিন্তু ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রধান প্রধানমন্ত্রী নামে আখ্যায়িত হতে থাকায় নতুন সংবিধানে রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রধানকে মুখ্যমন্ত্রী বলা হয়।

জহরলাল নেহরু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। দেশ স্বাধীন হওয়ার দিন তিনি প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত (২৭শে মে ১৯৬৪) সে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন শ্রীগুলজারিলাল নন্দ (২৭ মে-৯ জুন, ১৯৬৪), তারপর প্রধানমন্ত্রী হন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বকাল ৯ জুন, ১৯৬৪-১১ জানুয়ারী. ১৯৬৬, তাসখন্দে ভারত-পাকিস্তান শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিতে যান, সেইখানেই শাস্ত্রীজির অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। শাস্ত্রীজির মৃত্যুর পর শ্রীগুলজারিলাল নন্দ আবার অস্থায়ীভাবে ১৪ দিনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তারপর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ২৪ জানুয়ারী, ১৯৬৬ থেকে ভারতের প্রধান মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত আছেন।

প্রভাকরবর্ধন : খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর সূচনায় পূর্বপাঞ্জাবের থানেশ্বর নামক স্থানে পুষ্যভূতি বংশের যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় প্রভাকরবর্ধন তার প্রথম উল্লেখযোগ রাজা। তিনি ছিলেন আদিত্যবর্ধনের পুত্র। তিনি গুর্জরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং মালব

ও গুজরাত পর্যন্ত তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়। গুপ্তবংশীয় রাজা মহাসেনগুপ্ত ও প্রভাকরবর্ধন সমকালীন। শেষের দিকের গুপ্তবংশীয় সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে ভারতের অনেক রাজ্যের মতো পুষ্যভূতি রাজ্যের উদ্ভব হলেও মহাসেনগুপ্তের সঙ্গে প্রভাকরবর্ধনের সম্পর্ক ভাল ছিল। কনৌজের মৌখরি বংশীয় রাজা গ্রহবর্মনের সঙ্গে নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়ে প্রভাকর বর্ধন উভয় রাজ্যকে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ করেন। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন।

প্রভাবতী গুপ্ত : গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা। বাকাটক বংশীয় নৃপতি রুদ্রসেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। রুদ্রসেনের রাজ্য বর্তমান মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্র প্রদেশের উত্তর ভাগ নিয়ে গঠিত ছিল। রুদ্র-সেনের অকাল মৃত্যু হলে রানী প্রভা-বতী নাবালক পুত্রের অভিভাবিকারূপে দক্ষতার সঙ্গে রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। রানী প্রভাবতীর বিভিন্ন সনন্দ ও ঘোষণাপত্র পাঠে বোঝা যায় যে সে সময় বাকাটক রাজ্যের উপর গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিশেষ প্রভাব ছিল।

প্রসেনজিত : খ্রী পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে, বুদ্ধদেবের সমকালে, প্রসেনজিত কোশলের রাজা ছিলেন। কোশল তখন ছিল ষোড়শ মহাজন-পদের অন্যতম। প্রসেনজিতের ভগ্নী কোশলদেবীর সঙ্গে মগধের রাজা বিম্বিসারের বিবাহ হয়। প্রসেনজিত রাজা হওয়ার আগেই কাশী কোশল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, সে কারণে প্রসেনজিত কাশীরাজ নামেও অভি-হিত। ভগবান বুদ্ধের পিতা, কপিলা-বস্তুর রাজা শুদ্ধোদনও কোশলরাজ প্রসেনজিতের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন।

মগধরাজ বিম্বিসারের অপর মহিষী, মিথিলার রাজকন্যার গর্ভজাত পুত্র অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করলে বিম্বিসারের প্রথমা মহিষী, কোশলরাজ প্রসেন-জিতের ভগ্নী কোশলদেবী দুঃখে আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনার পর প্রসেনজিতের সঙ্গে অজাতশত্রুর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হয়। পরিশেষে প্রসেন-জিতের কন্যা বাজিরার সঙ্গে অজাত-শত্রুর বিবাহ হয়ে সে যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়।

প্রসেনজিত ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ না করলেও ভগবান বুদ্ধের বিশেষ অনুগত ছিলেন। বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থে প্রসেনজিতের সঙ্গে বুদ্ধদেবের নিকট সম্পর্কের উল্লেখ আছে। প্রসেনজিতের শেষ জীবন সুখের ছিল না। পুত্র বিরুদক বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে রাজ্যচ্যুত করেন। তিনি অজাতশত্রুর রাজ্যে আশ্রয় নেন ও সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। অজাতশত্রু রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শ্বশুরের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

প্রিন্সেপ, জেমস (১৭৯৯-১৮৩৯): প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ। কর্মজীবনে প্রিন্সেপ ছিলেন কলকাতা টাঁকশালের

প্রধান নিরীক্ষক। এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারিরূপে তিনি এদেশের সমগ্র প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ সুসংবদ্ধ করেন। তাঁর প্রধান কীর্তি প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার। তাঁর কঠোর অধ্যবসায়ে সাঁচিস্তূপের ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধার হওয়ায় সম্রাট অশোকের শাসনকালের ইতিহাস প্রথম বিস্তারিতভাবে জানা যায়। খরোষ্ঠি লিপির পাঠোদ্ধারেও প্রিন্সেপের অবদান উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কেও তিনি নানা তত্ত্ব ও তথ্যের উদ্‌ঘাটন করেন। ভারতে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার সূচনা করেন জেমস প্রিন্সেপ।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১—৩২ : ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে প্রথম নারী শহিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে প্রীতিলতা চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর গুলীতে একজন ইংরেজ কর্মচারি নিহত হওয়ার পর আত্মগোপন করেন। আত্মগোপনকালে দলনেতা সূর্যসেনের নির্দেশে তিনি কয়েকজনের সঙ্গে ১৯৩২ খ্রী, ২৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের পাহাড়তলিতে শ্বেতাঙ্গদের রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণ করেন। বিপ্লবীদের আক্রমণে ক্লাবের একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। ঐ সংঘর্ষকালে প্রীতিলতা আহত হওয়ায় বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

ফইজি : মোগল সম্রাট আকবরের সভাকবি ফাইজি ছিলেন সম্রাটের অন্যতম বিশিষ্ট সভাসদ্ আবুল ফজলের অগ্রজ। পারসিক পণ্ডিত শেখ মুবারকের পুত্র ফইজিই প্রথম মোগল সম্রাটের দরবারে সম্মানিত আসন লাভ করেন, তারপর তিনি তাঁর অনুজ আবুল ফজলকে মোগল দরবারে নিয়ে আসেন। ফইজি ফারসি, আরবি ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। শতাধিক গ্রন্থের প্রণেতা ফইজি রামায়ণ, মহাভারত ও গীতা মূল সংস্কৃত থেকে ফারসি ভাষায় অনূদিত করেন। শিয়া মতাবলম্বী ফইজি ও আবুল ফজল আকবরের ধর্মমতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। ১৫৯৫ খ্রী ফইজির মৃত্যু বৃদ্ধ আকবরের পক্ষে বিশেষ শোকের কারণ হয়।

ফজলুল হক, এ.কে.(১৮৭৩-১৯৬২)- এম. এ ও ল পাশ করার পর প্রথমে কিছুদিন কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন, তারপর সরকারী কাজে যোগ দেন (১৯০৬-১২) চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে ফিরে আসেন ও ১৯১৩খ্রী বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য হন। দেশ বিভাগ পর্যন্ত তিনি ঐ সভার সদস্য ছিলেন। মধ্যে দু বছর (১৯৩৪-৩৬) কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য হন। মুস্লিম লীগের প্রতিষ্ঠাকাল (১৯০৬) থেকে তার সক্রিয় সমর্থক, ১৯১৬-২১ খ্রী সারা ভারত মুস্লিম লীগের সভাপতি। ১৯১৭ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন, ১৯২০ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের মেদিনীপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৪ সালে কংগ্রেস ত্যাগ ক'রে বঙ্গদেশের শিক্ষামন্ত্রী হন। ১৯৩০-৩৩ সালে লণ্ডনে তিনটি গোল টেবিল বৈঠকে ভারতের মুস্লিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-

রূপে যোগ দেন। মুস্লিম লীগ নেতাদের সঙ্গে মতবিরোধ হলে, ১৯২৯ সালে লীগের সংস্পর্শ ত্যাগ ক'রে 'কৃষক-প্রজা সমিতি' গঠন করেন। 'কৃষক-প্রজা সমিতি'র প্রধান দাবি ছিল জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুস্লিম লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিনকে পরাজিত করে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। কিন্তু কংগ্রেস তাঁর সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনে সম্মত না হওয়ায় হক-সাহেব মুস্লিম লীগের সঙ্গে জোট বাঁধেন। লীগের সঙ্গে মতবিরোধ হলে হক-নাজিম মন্ত্রিসভার পতন হয় (১৯৩৭-৪১)। তারপর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় তিনি দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা (১৯৪১-৪৩) গঠন করেন। ১৯৪৬ সালে হক সাহেব আবার লীগে যোগ দেন ও দেশ ভাগের পর ঢাকায় চলে যান। সেখানেও তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত হন।

বঙ্গদেশ ও ভারতের রাজনীতিতে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানের ভাঙাগড়ার ইতিহাসে ফজলুক হকের ভূমিকা ছিল অসাধারণ।

ফতেপুর সিক্রি : বর্তমান উত্তর প্রদেশের আগ্রা জেলায় আগ্রা শহরের অদূরে, মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে ফতেপুর সিক্রি নগরীর পত্তন করেন আকবর। ১৫৬৯ খ্রী নগরীটির নির্মাণ কার্য শুরু হয় এবং শেষ হয় পাঁচ বছর বাদে। কিন্তু রাজধানী হিসাবে ফতেপুর সিক্রি অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় চৌদ্দ বছর বাদে শহরটি পরিত্যক্ত হয়। এখন ফতেপুর সিক্রির ঐতিহাসিক মূল্যের অতিরিক্ত কিছু নেই। সেখানকার বিশাল প্রাসাদ, তোরণ ও দুর্গগুলি লাল বেলে পাথরে নির্মিত। ফতেপুর সিক্রির স্থাপত্যশিল্পে ও শিল্পকলায় হিন্দু-প্রভাব লক্ষণীয়।

ফরাসি, ভারতে : ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চতুর্দশ লুইর রাজত্বকালে ফরাসি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়। ভারতে জলপথে ব্যবসাবাণিজ্য করতে এসে ফরাসি বণিকরা সুরাটে ১৬৬৮ খ্রী প্রথম কুঠি স্থাপন করে। তারপর ১৬৬৮ খ্রী মসুলিপত্তমে, ১৬৭৩ খ্রী পণ্ডিচেরিতে ও ১৬৯০ খ্রী চন্দননগরে ফরাসি কুঠি স্থাপিত হয়। ফরাসি বণিকরা বিশেষ রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য লাভ না করলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকদের সঙ্গে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়েই এদেশে বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। কিন্তু পর পর তিনটি কর্নাটক যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হওয়ার পর ফরাসিদের এদেশে রাজ্য বিস্তারের সমূহ সম্ভাবনা লোপ পায়। ১৭৯৩ খ্রী ভারতের সব কটি ফরাসি উপনিবেশ ইংরেজদের অধিকারে যায়। কিন্তু ১৮১৫ খ্রী ভিয়েনা চুক্তির শর্ত অনুসারে ফরাসিরা তাদের উপনিবেশগুলি ফিরে পায়। ফরাসি উপনিবেশ বলতে ছিল বঙ্গদেশে চন্দননগর, বর্তমান তামিলনাড়ুর উপকূলে পণ্ডিচেরি ও কারিকল, কেরলের উপ-

কূলে মাহে ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে ইয়ানাম।

১৯৫৪ খ্রী নভেম্বর মাসে ফরাসি উপনিবেশগুলি ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। চন্দননগর বর্তমানে বঙ্গদেশের অন্তর্গত হুগলী জেলার একটি মহকুমা এবং দক্ষিণ ভারতের সবকটি প্রাক্তন ফরাসি উপনিবেশ নিয়ে গঠিত হয়েছে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল, পণ্ডিচেরি। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের দিনে রাজনৈতিক কর্মীদের আশ্রয়স্থল রূপে ফরাসি উপনিবেশগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ফারুকশিয়ার (১৭১৩-১৯): মোগল বাদশাহ জাহান্দার সাহকে হত্যা করে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফারুকশিয়ার মসনদ দখল করেন। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছর। তিনি সুদর্শন পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর শাসনযোগ্যতা ছিল না এবং সাহসেরও অভাব ছিল।

তাঁর শাসনকালে শিখ বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় এবং শিখনেতা বান্দা সহ কয়েক শত শিখ ১৭১৬ খ্রী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

ফারুকশিয়ার সে সময়ে মোগল রাজ দরবারে বিশেষ প্রভাবশালী সৈয়দ ভ্রাতাদের প্রভাব লোপের জন্য তৎপর হন। কিন্তু তাঁর সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তিনিই সিংহাসনচ্যুত হন। পরে তাঁকে অন্ধ করে ও নানাভাবে কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হয়।

ফরোয়ার্ড ব্লক: কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সংগ্রামী শক্তিগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৯ খ্রী ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ছোট বড় অনেক দল ও বিশিষ্ট নেতা সেদিন ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন। দু'বছর পরে সুভাষচন্দ্র বসুর দেশ ত্যাগের ফলে ফরোয়ার্ড ব্লকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়। তারপর '৪২-এর আগস্ট আন্দোলন শুরু হলে নেতাজি সুভাষ দূরপ্রাচ্য থেকে জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক ভাষণে বলেন যে কংগ্রেস নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ায় ফরোয়ার্ড ব্লকের ঐতিহাসিক প্রয়োজন শেষ হয়েছে। তারপর থেকেই সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে ফরোয়ার্ড ব্লকের গুরুত্ব হ্রাস পায়।

ফা-হিয়েন: চীনা পরিব্রাজক। ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিপূত তীর্থক্ষেত্রগুলি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে, গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে ৩৯৯ খ্রী ফা-হিয়েন ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন ও ৪০৫ খ্রী ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি ছয় বছর এদেশে ছিলেন, তারপর সিংহল, যবদ্বীপ, সুমাত্রা সফর করে ৪১৪ খ্রী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতে অবস্থানকালে ফা-হিয়েন পেশোয়ার, তক্ষশিলা, মথুরা, কপিলাবস্তু, বোধগয়া, সারনাথ, কুশীনগর ও পাটলিপুত্র পরিদর্শন করেন। পাটলিপুত্রে তিন বছর অবস্থানকালে তিনি তাঁর ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। তাতে গুপ্তযুগীয় ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাধারণ অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা মেলে।

ফা-হিয়েন গুপ্ত শাসনের উচ্ছ্বসিত

প্রশংসা করেন। ধর্ম বিষয়ে গুপ্ত সম্রাটদের ঔদার্যে তিনি মুগ্ধ হন। সমগ্র রাষ্ট্রে তিনি শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেন। ফা-হিয়েনের ভ্রমণ-লিপি ভারতের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ও প্রামাণ্য দলিল।

ফিনিস, কর্নেল : ইংরেজ সেনাপতি। ১৮৫৭ খ্রী ১০ মে মিরাটের সামরিক শিবিরে ভারতীয় সিপাহিদের হাতে নিহত হলে সিপাহি বিদ্রোহের আগুন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কর্নেল ফিনিসের মৃত্যু সিপাহি বিদ্রোহের সূচনার অব্যবহিত কারণ।

ফিরোজ শাহ তোগলক : দিল্লীর তোগলক বংশীয় তৃতীয় সুলতান, শাসনকাল ১৩৫১-৮৮ খ্রী। মহম্মদ বিন তোগলকের কোন পুত্র না থাকায় দিল্লীর প্রভাবশালী আমির ওমরাহ্‌দের সিদ্ধান্তক্রমে ফিরোজ শাহ সুলতানের মসনদে বসেন। তিনি ছিলেন মহম্মদ বিন তোগলকের পিতৃব্য-পুত্র। তাঁর মা ছিলেন হিন্দুরমণী। সুলতান পদ গ্রহণের পর ফিরোজ রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন, কিন্তু চারিদিকে বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান দমনের জন্য প্রয়োজনীয় রণ-কুশলতা ও শাসন দক্ষতা ফিরোজের ছিল না।

মহম্মদ তোগলকের শাসনকালে, ১৩৩৮খ্রী বঙ্গদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ফিরোজ বঙ্গদেশ পুনর্জয়ের উদ্দেশ্যে ১৩৫৩ খ্রী সৈন্যবাহিনী পাঠান ও বঙ্গদেশের শাসক হাজি ইলিয়াসকে বন্দী করেন। কিন্তু সুনিশ্চিত জয়ের মুখে ফিরোজ হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দেন, কারণ দুর্গে বন্দী নারীদের কান্না নাকি তাঁকে অভিভূত করে। দক্ষিণ ভারতের যে সব রাজ্য মহম্মদ তোগলকের শাসনকালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন হয়ে যায় সেগুলি পুনর্জয়ের কোন চেষ্টা সুলতান ফিরোজ করেননি। কেবলমাত্র সিন্ধু প্রদেশের বিদ্রোহ তিনি বিপুল ক্ষয়ক্ষতির পর দমনে সমর্থ হন।

প্রজাপালনের দিকে ফিরোজের দৃষ্টি ছিল। তিনি করের বোঝা লাঘব করেন। মহম্মদ তোগলকের আমলে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে যে ঋণ বিতরণ করা হয় ফিরোজ তা পুনরাদায়ের নির্দেশ বাতিল করে দেন। কৃষির উন্নতির জন্য তিনি সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করেন। তাঁর সময়ে যমুনা নদী থেকে কাটা একটি খাল এখনও পাঞ্জাবের (বর্তমান হরিয়ানা) কর্ণাল ও হিসার অঞ্চলে সেচের জল সরবরাহ করে। তিনি ফৌজদারি দণ্ডবিধির সংশোধন করেন। ফিরোজ শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে হিন্দুদের প্রতি ফিরোজের মনোভাব খুবই অনুদার ছিল। তিনি পুরীর মন্দির, পাঞ্জাবে জ্বালামুখির মন্দির ইত্যাদি বহু ধর্মস্থান বিধ্বস্ত করেন।

১৩৮৮খ্রী ফিরোজ শাহ তোগলকের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় তোগলক শাহ সিংহাসনে বসেন।

ফিরোজ শাহ মেহ্‌তা (১৮৪৫—১৯১৫) : পার্শি সম্প্রদায়ভুক্ত জাতীয়তাবাদী নেতা এবং জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৮৯০ খ্রী কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবে-

শনে সভাপতিত্ব করেন। ব্যক্তিগত জীবনে সফল ব্যারিস্টার। দীর্ঘকাল বো ম্বা ই পৌরসভার মেয়র, বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভা ও কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন।

ফেরদুনজা: ১৮৩৮ খ্রী বাঙলা-বিহার-ওড়িশার নবাব হন। তিনিই শেষ নবাব। তাঁর সময়ে বৃটিশ সরকারের এক ঘোষণায় বাঙলা-বিহার-ওড়িশার নবাবকে মুর্শিদাবাদের নবাব আখ্যা দেওয়া হয়। ১৮৮১ খ্রী নবাব ফেরদুনজার মৃত্যু হয়।

ফেরিস্তা, মহম্মদ কাশিম (১৫৭০-১৬১২): বি শি ষ্ট ঐতিহাসিক। কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলবর্তী অস্ট্রাবাদ নামক স্থানে জন্ম। ১৫৮২ খ্রী পিতার সঙ্গে ভারতে আসেন এবং ১৫৮৯ খ্রী বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের দরবারে কাজ পান। সুলতানের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ফেরিস্তা ফারসি ভাষায় তারিখ-ই-ফেরিস্তা নামে ই তি হা স গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ ইতিহাস গ্রন্থে কাশ্মীর থেকে দাক্ষিণাত্য ও গুজরাত থেকে বাঙলার তৎকালীন রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি ছাড়াও নানা খুঁটিনাটি তথ্যের বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের ভা র তে র ইতিহাস হিসাবে ফেরিস্তার গ্রন্থটির মূল্য সীমাহীন।

বংশ বা বৎস: খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর ও মধ্য ভারতে যে ষোলটি মহাজনপদ (রাজ্য) ছিল বংশ বা বৎস তার অন্যতম। রাজ্যটি ছিল যমুনা নদীর তীরে অবন্তী রাজ্যের উত্তর-পূর্বে। রাজ্যটির রাজধানী ছিল কৌশম্বী (বর্তমান এলাহাবাদ শহরের কাছে)।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪): কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট, প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। তাঁর রচিত 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত একদা মুক্তিযুদ্ধে সমগ্র জাতিকে অনুপ্রাণিত করে। 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়ে দেশের অগণিত সন্তান কারারুদ্ধ হয়, হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করে। স্বাধীনতার পর 'বন্দে মাতরম' অন্যতম জাতীয় ধ্বনি এবং "বন্দে মাতরম" সঙ্গীত অন্যতম জাতীয় সঙ্গীতরূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

বঙ্গ: গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙলা অঞ্চলে বঙ্গ ও গৌড় নামে দুটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গরাজ্য গড়ে ওঠে পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশ নিয়ে। গোপচন্দ্র নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বঙ্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলে অনুমান করা হয়। ফরিদপুর ও বর্ধমান জেলার কয়েকস্থানে যে সব শিলালিপি পাওয়া গেছে তাতে বঙ্গদেশের গোপচন্দ্র ছাড়াও ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব নামে দুজন রাজার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐসব রাজাদের শাসনকাল বা তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বঙ্গের রাজারা "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করতেন। ঐ রাজবংশের সন্তান শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন। বঙ্গরাজ্য সম্ভবত ষষ্ঠ

শতাব্দীর শেষে রাজা জ্যেষ্ঠভদ্রের শাসনকালে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের কাছে স্বাধীনতা হারায় ও কামরূপের সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়।

সপ্তম শতাব্দীর সূচনায় গৌড়রাজ শশাঙ্ক কামরূপের রাজা সুস্থিতবর্মাকে পরাজিত করে বঙ্গ ও গৌড়কে সংযুক্ত করেন। প্রারম্ভে গৌড় রাজ্য শুধু বর্তমান মালদা-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে সীমিত ছিল। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে মহাপরাক্রান্ত রাজা শশাঙ্কের চেষ্টায় গৌড় পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে একটি শক্তিশালী রাজ্যরূপে গড়ে ওঠে। তারপর কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মাকে পরাজিত করে তিনি বঙ্গকে স্বাধীন করেন এবং বঙ্গ ও গৌড় সংযুক্ত হয়ে বাঙলা অঞ্চলে প্রথম একটি শক্তিশালী রাজ্যরূপে গড়ে ওঠে। ওড়িশারও একটি অংশ শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিহার ও উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত রাজা শশাঙ্কের প্রভাব বিস্তারিত হয়।

কিন্তু শশাঙ্কের মৃত্যুর পর পূর্বভারতের এই অঞ্চলে আবার অরাজকতা দেখা দেয়। শতাব্দীকাল এইভাবে চলার পর বাঙলার জনগণ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গোপাল নামক এক শক্তিশালী সামন্তকে রাজা মনোনীত করেন এবং বাংলায় পাল রাজাদের শাসন শুরু হয়। পালবংশের শাসনকালে বাংলা ভাষা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তা একাদশ শতাব্দীর রচনা 'চর্যাপদ' আবিষ্কৃত হওয়ার পর সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। রাজা শশাঙ্কের নেতৃত্বে সপ্তম শতাব্দীর সূচনায় বঙ্গভূমির যে স্বাতন্ত্র্যের সূচনা, পালরাজাদের শাসনকালে তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে বলা যায়।

পালবংশীয় রাজা মদনপালের শাসনকালে (১১৪৩) বঙ্গদেশে সেন রাজাদের আবির্ভাব হয় এবং পালবংশের অবসান ও সেনবংশের শাসনের সূচনা হয়। দিল্লী বিজয়ী গজনির সুলতান মহম্মদ ঘুরির অন্যতম সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি মাত্র আঠারো জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বণিকের ছদ্মবেশে বঙ্গদেশে প্রবেশ করেন। লক্ষ্মণসেন তখন নবদ্বীপে ছিলেন। অরক্ষিত শহর আক্রান্ত হওয়ায় লক্ষ্মণসেন কোন রকম প্রতিরোধের চেষ্টা না করে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন (১২০৩ খ্রী)। পূর্ববঙ্গে সেন বংশীয় শাসন আরও কিছুকাল অক্ষুণ্ণ থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে মুস্লিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতানযুগে বঙ্গদেশের মুস্লিম শাসকরা দিল্লীর প্রতি অনুগত থাকলেও সুযোগ পেলেই বিদ্রোহী হতেন। ১৫৭৬ খ্রীঃ সম্রাট আকবরের শাসনকালে বঙ্গদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার সম্রাট ঔরংজেবের মৃত্যুর (১৭০৭ খ্রী) পর মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়লে বাঙলা-বিহার-ওড়িশার সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁ নবাব পদবী নিয়ে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন শুরু করেন এবং মুর্শিদাবাদ হয় তাঁর রাজ্যের রাজধানী।

নবাব সিরাজুদ্দৌলার শাসনকালে বঙ্গদেশ ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়।

নবাব সিরাজ পলাশির যুদ্ধে (১৭৫৭) পরাজিত ও পরে নিহত হন। তারপর মিরজাফর নবাব হন এবং নবাব পদ দীর্ঘ দিন বজায় থাকে যদিও নবাবের হাতে কোন ক্ষমতা থাকে না। ইংরেজ সরকারের অধীনে বঙ্গদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি হয় এবং কলকাতা হয় বঙ্গদেশ তথা ইংরেজ শাসিত সমগ্র ভারতের রাজধানী।

বঙ্গদেশ, বিহার, ওড়িশা ও ছোটনাগপুর নিয়ে গঠিত একটি বিশাল প্রদেশ একজন লেঃ গভর্নরের দ্বারা ভালভাবে শাসিত হওয়া সম্ভব নয় বিবেচনা করে ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রী বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করেন। পূর্বভাগের নাম হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম এবং পশ্চিমভাগের নাম হয় বঙ্গদেশ। কিন্তু বঙ্গদেশের জনগণ ঐ বিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করায় ১৯১২ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। কিন্তু ঐ সঙ্গেই কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় এবং বিহার ওড়িশা বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি বঙ্গভাষী অঞ্চলগুলিও ঐ সময় বিহারের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কাছাড় ও শ্রীহট্ট যায় আসামে।

তারপর ১৯৪৭ খ্রী বঙ্গদেশ আবার দ্বিখণ্ডিত হয়। স্বাধীনতার প্রাক্‌-মুহূর্তে বঙ্গদেশের মুস্লিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ও আসামের শ্রীহট্ট জেলা নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান। অবশিষ্ট বঙ্গদেশের নাম হয় পশ্চিমবঙ্গ।

পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে ১৯৭১ খ্রী ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন দেশরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতার পর তার নাম হয় বাংলাদেশ।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন: বঙ্গদেশ বিহার, ওড়িশা ও ছোটনাগপুর নিয়ে গঠিত একটি বিশাল প্রদেশ একজন লেঃ গর্ভনরের পক্ষে ভালভাবে শাসন করা সম্ভব নয়—এ অভিমত ইংরেজ শাসকরা মাঝে মাঝেই প্রকাশ করতেন। ১৯০৩ খ্রী লেঃ গভর্নর এনড্রু ফ্রেজার বড়লাট লর্ড কার্জনকে পুনরায় ঐ প্রস্তাব দিলে তিনি জনমতের চিন্তা না করেই তাতে সম্মতি দেন। তারপর বৃটিশ সরকারের অনুমোদনক্রমে, ১৯০৫ খ্রী ১৬ অক্টোবর বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। পূর্বভাগে পড়ে ঢাকা, রাজশাহি, চট্টগ্রাম বিভাগ এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় আসাম। ঐ প্রদেশের নাম হয় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম'। অপরদিকে প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগ এবং বিহার, ওড়িশা ও ছোটনাগপুর নিয়ে গঠিত প্রদেশের নাম হয় বঙ্গদেশ। বিভাগের ফলে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' হয় মুস্লিম প্রধান আর বঙ্গদেশ হয় অবাঙালি প্রধান।

শাসনের সুবিধার যুক্তিতে বঙ্গ দ্বিখণ্ডিত করা হলেও বাঙালীর জাতীয় চেতনা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় ঐ বিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং ভঙ্গবঙ্গ যুক্ত করার দাবিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয়। যে সব মুস্লিম নেতা বঙ্গ বিভাগের প্রতিবাদে আন্দোলন করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবদুল রসুল, আবদুল হালিম গজনভি, লিয়াকৎ হোসেন

প্রভৃতি। (বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, বিপিন পাল ও সুন্দরীমোহন দাশ। আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচী ছিল বিদেশী পণ্য বর্জন, স্বদেশী শিল্পপণ্যের ব্যবহার ও প্রচার ও জাতীয় ভাবাদর্শের উন্মেষ সাধন। ঐ সময়েই প্রথম 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি উচ্চারিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথের নানা দেশাত্মবোধক গানে বাঙলার শহর-গ্রাম মুখরিত হয়ে ওঠে।) স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্যে বাঙালি মনীষীদের উদ্যোগে জাতীয় মেডিকাল কলেজ, জাতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রভৃতি গড়ে ওঠে। (ক্রমে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের রূপ নেয়। বাঙলার 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'নবশক্তি', 'বন্দে মাতরম্' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিপ্লবের বাণী প্রচারিত হতে থাকে। ইংরেজ সরকার প্রকাশ্য আন্দোলন দমনে তৎপর হলে আন্দোলন গুপ্ত সন্ত্রাসের পথ নেয়। মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি ১৯০৮ খ্রী মৃত্যুবরণ করেন। ঐ বছরেই বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বসু, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ অনেকে গ্রেপ্তার হন। বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্রতাই ইংরেজ সরকারকে শেষ পর্যন্ত বঙ্গ বিভাগ বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করে। দিল্লী দরবারের ঘোষণা অনুসারে ১৯১২ খ্রী ১ জানুয়ারী ভঙ্গ বঙ্গ আবার যুক্ত হয়।) তবে বিহার, ওড়িশা ও ছোটনাগপুর বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই ভারতে ইংরেজ শাসনকালে প্রথম বৃহৎ জাতীয় আন্দোলন।

বঙ্গে নবাব শাসন : ১৭০৬ খ্রী দেওয়ান মুর্শিদ কুলি খাঁ মোগল সম্রাট ঔরংজেব কর্তৃক বাঙলা-বিহার-ওড়িশার সুবাদার নিযুক্ত হন। ঔরংজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পর মুর্শিদ কুলি খাঁ স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন শুরু করেন এবং মুর্শিদাবাদ হয় তাঁর রাজ্যের রাজধানী। ১৭২৫ খ্রী মুর্শিদ কুলি খাঁর মৃত্যু হলে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দৌলা বাংলার নবাব হন। ১৭৩৯ খ্রী সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ মসনদে বসেন। কিন্তু মাত্র এক বছর পরে তিনি তাঁর বিশিষ্ট কর্মচারী আলিবর্দি খাঁর হাতে নিহত হন। বিদ্রোহী আলিবর্দি খাঁ গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করে ১৭৪১ খ্রী বাংলা-বিহার-ওড়িশার নবাব হন।

● নবাব আলিবর্দি খাঁর কোন পুত্র না থাকায় তিনি তাঁর দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলাকে পরবর্তী নবাব মনোনীত করে যান। কিন্তু ১৭৫৬ খ্রী নবাবি লাভের পরেই সিরাজ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বলি হন। ঐ ষড়যন্ত্রকারীদের সহায়তায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ বণিকরা লর্ড ক্লাইভের নেতৃত্বে পলাশির যুদ্ধে সিরাজকে পরাজিত করেন। পলায়নকালে সিরাজ ধৃত ও

নিহত হন (১৭৫৭)। সিরাজের পর নবাব হন মিরজাফর। কিন্তু তিনি নামে মাত্র নবাব থাকেন, প্রকৃত রাজ-শক্তি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতি-নিধিদের হাতে চলে যায়। ১৭৬০ খ্রী মিরজাফরকে অপসারিত করে ইংরেজরা মিরকাশিমকে নবাব করেন। কিন্তু মিরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ শুরু হয় এবং পরপর তিনটি যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর মিরকাশিম রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করেন। মিরকাশিম অপসৃত হওয়ার পর মিরজাফর আবার নবাবি লাভ করেন ও ১৭৬৫ খ্রী মৃত্যু পর্যন্ত সে পদে বহাল থাকেন। মির-জাফরের মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্র নজমতুদ্দৌলা (১৭৬৫-৬৬), সৈফতুদ্দৌলা (১৭৬৬-৭০) ও মোবারকদ্দৌলা (১৭৭০-৯৩) নবাব হন। মুর্শিদাবাদের হাজার-দুয়ারি নির্মিত হয় নবাব হুমায়ুনজার (১৮২৪-৩৮) আমলে। হুমায়ুনজার পুত্র ফেরদুনজা বাঙলা-বিহার-ওড়িশার শেষ নবাব। ঐ সময় বৃটিশ সরকারের এক ঘোষণায় বাঙলা-বিহার-ওড়িশার নবাবকে 'মুর্শিদাবাদের নবাব' আখ্যা দেওয়া হয়।

বঙ্গে সুলতান শাসন: মহম্মদ ঘুরির অনুচর ইখতিয়ারুদ্দিন মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজি পূর্ব-ভারতে তুর্কি আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে বিহার জয় করেন ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় (সম্ভবত ১২০০ খ্রী) লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে অতর্কিতে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। রাজা লক্ষ্মণসেন তখন নবদ্বীপে অব-স্থান করছিলেন; বখ্‌তিয়ার খলজি বণিকের ছদ্মবেশে ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে শহরে প্রবেশ করেন ও অরক্ষিত শহরের উপর আক্রমণ চালান। নিরুপায় লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। পূর্ববঙ্গে সেন রাজত্ব আরও প্রায় শতাব্দীকাল অক্ষুণ্ণ থাকে।

বখতিয়ার নবদ্বীপ জয়ের পর সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করেন, তারপর উত্তরবঙ্গে অগ্রসর হয়ে গৌড় জয় করেন। ১২০৩ খ্রী মধ্যে সমগ্র পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ বখ্‌তিয়ারের অধিকারভুক্ত হয়। তারপর বখতিয়ার খলজি দিল্লীর সুলতান কুতবুদ্দিনের কাছ থেকে বাঙলার সুলতানরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। বর্তমান দিনাজ-পুর শহরের নিকটবর্তী দেবকোট হয় বখতিয়ারের রাজধানী। কিন্তু ১২০৬খ্রী বখতিয়ার তাঁর পার্শ্বচর আলি মর্দান খলজি কর্তৃক নিহত হন এবং আলি দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন সুলতানরূপে বঙ্গদেশ শাসন শুরু করেন।

কিন্তু আলি মর্দান ছিলেন অত্যন্ত অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর শাসক। সে কারণে বঙ্গদেশের মুস্লিম অভিজাতদের একাংশ বিদ্রোহী হয়ে আলি মর্দানকে মসনদচ্যুত ও নিহত করেন (১২১২ খ্রী)। তারপর ঐ অভিজাত ব্যক্তিদের সমর্থনে সুলতান হন গিয়াসুদ্দিন খলজি। তাঁর শাসন-কাল ১২১৩-২৭ খ্রী। তিনি দেবকোট থেকে গৌড়-লাখনৌটিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

ওদিকে বঙ্গদেশের উপর দিল্লীর কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১২১২ খ্রী দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস এক বিরাট বাহিনী নিয়ে বঙ্গদেশে আসেন।

সুলতান গিয়াসুদ্দিন বিনা বাধায় নতি স্বীকার করেন ও দিল্লীর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেন। কিন্তু ইলতুৎমিস দিল্লী প্রত্যাবর্তন করা মাত্র গিয়াসুদ্দিন আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বিহার জয় করে নেন। ফলে ইলতুৎমিসের পুত্র, অযোধ্যার শাসক নাসিরুদ্দিন মাহমুদ আবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন এবং সে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে গিয়াসুদ্দিন নিহত হন (১২২৭)। নাসিরুদ্দিন মাহমুদ তখন স্বয়ং বঙ্গদেশের শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরে ১২২৯ খ্রী নাসিরুদ্দিনের মৃত্যু হয়। সেই সুযোগে বখ্‌তিয়ার খলজির এক অনুচর ইখতিয়ারুদ্দিন বলকা খলজি ক্ষমতা দখল করেন ও নিজেকে বঙ্গদেশের স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। সুতরাং ইখতিয়ারুদ্দিনকে দমন করতে দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস ১২৩০-৩১ খ্রী আবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন এবং সে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে ইখতিয়ারুদ্দিন নিহত হন। বঙ্গদেশ আবার দিল্লীর শাসনাধীন হয় এবং মালিক আলাউদ্দিন জানি বঙ্গদেশের শাসক নিযুক্ত হন।

কিন্তু ইলতুৎমিসের মৃত্যুর (১২৩৬) পর মালিক আলাউদ্দিন জানির উত্তরাধিকারী ইজুদ্দিন তুগরল তুঘন খাঁ আবার দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। পরন্তু, সুলতানা রাজিয়া দিল্লীর মসনদে বসার ফলে যে অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হয় তার সুযোগ নিয়ে তুঘন খাঁ অযোধ্যা জয় করেন।

গিয়াসুদ্দিন বলবন যখন দিল্লীর সুলতান তখন বঙ্গদেশের শাসক ছিলেন জালালুদ্দিন মাসুদ জানি; স্বাধীন শাসকের মতো তিনি শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী মুঘিসুদ্দিন উজবক অযোধ্যা জয় করেন এবং স্বাধীন রাজার মতো নিজ নামে মুদ্রা প্রচলিত করেন। কামরূপ অভিযানকালে ১২৫৭ খ্রী মুঘিসুদ্দিন নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর বঙ্গদেশের উপর আবার দিল্লীর কর্তৃত্ব কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১২৫৯ খ্রী কারার শাসক আরসলান খাঁ বঙ্গদেশ জয় করেন ও দিল্লীকে উপেক্ষা করে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তাঁর পুত্র তাতার খাঁও স্বাধীনভাবে বঙ্গদেশ শাসন করেন।

সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন ১২৬৮ খ্রী তুঘরল খাঁকে বঙ্গদেশের শাসক নিযুক্ত করেন। উচ্চাভিলাষী তুঘরল খাঁ প্রথমে সুশাসনের দ্বারা প্রজাদের প্রিয় হন এবং বৃদ্ধ সুলতান গিয়াসুদ্দিন যখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল অভিযান প্রতিরোধে ব্যস্ত সেইসময় তুঘরল খাঁ দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করে নিজেকে বঙ্গদেশের স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘরল খাঁকে দমনের জন্য, ১২৭৮ খ্রী পর পর দুটি বাহিনী পাঠান। কিন্তু দুবারই তুঘরল তাদের পরাজিত করেন। তখন গিয়াসুদ্দিন স্বয়ং তুঘরলকে দমনের জন্য অগ্রসর হন এবং অভিযানের নেতৃত্ব করেন সুলতানের পুত্র বুঘরা খাঁ। তুঘরল তখন ওড়িশা অভিমুখে পলায়ন করেন, কিন্তু পথে

জাজনগরে নিহত হন। তারপর বলবনের সৈন্যবাহিনী তুঘরলের অনুগামীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে। বাঙলার বিদ্রোহ দমন করে সুলতান গিয়াসুদ্দিন ১২৮২ খ্রী দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

গিয়াসুদ্দিনের পুত্র বুঘরা খাঁ ও তাঁর পুত্র রুকনুদ্দিন কাইকাস স্বাধীন সুলতানের মতো বঙ্গদেশ শাসন করেন। তারপর সুলতান হন সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ, যিনি প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। ১৩২২ খ্রী পর্যন্ত তিনি বঙ্গদেশের সুলতান ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিন পুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ শুরু হলে সেই সুযোগে দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক ১৩২৪ খ্রী বঙ্গদেশ জয়ে অগ্রসর হন। কিন্তু সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহর দ্বিতীয় পুত্র নাসিরুদ্দিন সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলককে উত্তর বিহারের এক রণাঙ্গনে পরাজিত ও বন্দী করেন এবং বন্দী অবস্থায় সুলতানকে দিল্লী পাঠানো হয়। নাসিরুদ্দিনকে উত্তরবঙ্গের স্বাধীন সুলতান বলে মেনে নেওয়া হয় এবং লাখনৌটি হয় তাঁর রাজ্যের রাজধানী।

দিল্লীর সুলতান ফিরোজ তোগলক তাঁর শাসনকালে দুবার বঙ্গদেশকে অধিকারে আনার চেষ্টা করেন। ১৩৫৩-৫৪ খ্রী তাঁর প্রথম অভিযান প্রেরিত হয় সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহর বিরুদ্ধে। সে অভিযান ব্যর্থ হলে সুলতান দিল্লী ফিরে যেতে বাধ্য হন। ১৩৫৯ খ্রী আবার ইলিয়াস শাহর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়। কিন্তু ইলিয়াস শাহর পুত্র সিকন্দার কৌশলে সুলতান ফিরোজকে একডালার দুর্গে বন্দী করেন। শেষ পর্যন্ত আপস হয় এবং বঙ্গদেশের সুলতানের স্বাধীনতা দিল্লীর স্বীকৃতি লাভ করে।

ইলিয়াস শাহর পর সুলতান হন সিকন্দার শাহ। তিনি সুশাসক ছিলেন এবং তাঁর শাসনকালে বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দিন আজম শাহও সুশাসকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর শাসনকাল ১৩৮৯-১৪১০ খ্রী।

ঐ সময় উত্তরবঙ্গে রাজা গণেশ নামে এক প্রভাবশালী হিন্দু সামন্তের অভ্যুত্থান ঘটে এবং তিনি উত্তরবঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন শুরু করেন। কিন্তু তাঁর পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ নাম নিয়ে পিতার উত্তরাধিকারী হন। জালালুদ্দিনের শাসনকাল ১৪১৫-৩১ খ্রী। তাঁর পুত্র নিহত হলে রাজা গণেশের বংশ লোপ পায় এবং ইলিয়াস শাহর বংশধররা আবার বাঙলার মসনদ লাভ করেন। সেই সময় বাঙলায় ব্যাপক অরাজকতা দেখা দেয় ও হাবসীদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

হাবসী-অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে বাঙলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন হুসেন শাহ। তাঁর শাসনকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রী। হুসেন শাহর আমলে বাঙলার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতি হয়; ঐ সময়েই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহও যোগ্য শাসক ছিলেন। নসরৎ শাহের শাসনকালে বাঙলায় পর্তুগীজদের আগমন হয়। নসরৎ

শাহের উত্তরাধিকারী গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহ (শাসনকাল ১৫৩৩-৩৮ খ্রী) বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন সুলতান। এই সময় শের শাহ বঙ্গদেশ জয় করে তার উপর দিল্লীর কর্তৃত্ব কায়েম করেন। ১৫৭৬ খ্রী সম্রাট আকবরের শাসনকালে বঙ্গদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বজ্জি বা বৃজি যৌথরাষ্ট্র : বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'অঙ্গোত্তর নিকায়' ও জৈন ধর্মগ্রন্থ 'ভগবতী সূত্র'তে খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতে যে ষোলটি মহাজনপদের উল্লেখ আছে বজ্জি বা বৃজি যৌথরাষ্ট্র তার অন্যতম। উত্তর বিহারে অবস্থিত ঐ যৌথ রাজ্যটির অন্তর্ভুক্ত ছিল বজ্জি, বিদেহান, লিচ্ছবি ও জ্ঞাত্রিকা উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি। যৌথ রাজ্যটির রাজধানী ছিল বৈশালী। বজ্জি ও লিচ্ছবিদেরও রাজধানী ছিল বৈশালী। বিদেহানদের রাজধানী ছিল মিথিলা। লিচ্ছবিরা সম্ভবত মঙ্গোল জাতীয় ছিল। জ্ঞাত্রিকা উপজাতীয়দের মধ্যে জৈন ধর্মগুরু মহাবীরের জন্ম হয়।

বদরুদ্দিন তায়েবজি (১৮৪৪-১৯০৯) : বোম্বাই হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার, জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও তার তৃতীয় সভাপতি। জাতীয়তাবাদী নেতা, ভারতীয় মুস্লিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে ও কুসংস্কার দূর করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন। ১৮৯৫ খ্রী বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি হন।

বর্মন বংশ : চন্দ্রবংশের পতনের পর একাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে পূর্ববঙ্গে বর্মন বংশের শাসন কায়েম হয়। বর্মন রাজারা ছিলেন যাদব বংশীয়। ঐ বংশের প্রাচীনতম যে রাজার উল্লেখ মেলে তার নাম বজ্রবর্মন। সম্ভবত তাঁরই নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে বর্মন বংশের শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বজ্রবর্মন রাজবংশজাত ছিলেন কিনা জানা যায় না। ঐ বংশের অন্যান্য রাজাদের মধ্যে সামলবর্মন ও ভোজবর্মনের নাম উল্লেখযোগ্য। সামলবর্মনের অনেক রানীর মধ্যে প্রধান ছিলেন মালব্যদেবী। তাঁর পুত্র ভোজবর্মন পিতার মৃত্যুর পর পাঁচ বছর রাজত্ব করেন। বর্মনদের রাজ্যের রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। ভোজবর্মন কিংবা তাঁর পুত্র দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে সেন বংশীয় রাজা বিজয়সেন কর্তৃক পরাজিত ও রাজ্যহারা হন। তারপর বর্মন রাজবংশ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

বৈদিক ব্রাহ্মণদের কুলপঞ্জিতে লিখিত আছে যে রাজা সামলবর্মনের শাসনকালে ১০৮৯ খ্রী তাঁদের পূর্বপুরুষেরা বঙ্গদেশে এসে বসতি স্থাপন করেন।

বলবন্ত রায় মেহতা (১৮৯৯-১৯৬৫) : সৌরাষ্ট্রে জন্ম, অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। মুক্তি আন্দোলনে যোগদানের জন্য বহুবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৬৩-৬৫ গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালেই বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।

বল্লালসেন : বঙ্গদেশের সেন বংশীয় রাজা, বিজয়সেনের পুত্র। রাজত্বকাল ১১৫৯-৮৫ খ্রী। সমগ্র বঙ্গদেশ ও উত্তর বিহার তাঁর শাসনাধীন ছিল। রাজ্য

বিস্তার অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও সামাজিক স্থিতি রক্ষার দিকে বল্লালসেন অধিক দৃষ্টি দেন। তিনি সুপরিচিত ও সুলেখক ছিলেন, 'দান সাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' গ্রন্থ দুটি তাঁর রচনা। বল্লালসেন বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক। বঙ্গদেশ থেকে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির পর হিন্দু সম্প্রদায়কে সুসংহত করার জন্য বল্লালসেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন।

বশিষ্ঠপুত্র পুলমায়ি : সাতবাহন রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি গৌতমীপুত্র সাতকর্নীর মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর রাজত্বকাল ১৩০-৫৪ খ্রী। তাঁর শাসনকালে সমগ্র অন্ধ্র-প্রদেশের উপর সাতবাহন রাজাদের শাসন কায়েম হয়। তিনি শক-রাজ রুদ্রদমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হন। পরে রুদ্রদমনের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ও উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

বাংলাদেশ : ভারতের স্বাধীনতার পূর্বদিনে, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট, ভারতের অঙ্গচ্ছেদ ক'রে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান ছিল দুটি অংশে বিভক্ত, যার মাঝে ছিল ভারত রাষ্ট্রের প্রায় হাজার মাইলের ব্যবধান। পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয় পূর্ববঙ্গ ও আসামের শ্রীহট্ট জেলা নিয়ে যার আয়তন ৫৫,১২৬ বর্গ মাইল (১,৪২,-৭৭৭ বর্গ কিলোমিটার)। ১৯৬১ সালের গণনা অনুসারে লোকসংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৫ লক্ষ। এবং সকলেই বাঙালি। অপরদিকে পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কয়েকটি দেশীয় রাজ্য নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তান আয়তনে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বড় হলেও তার লোকসংখ্যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে অনেক কম। গণ-তন্ত্রের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে পাকিস্তানের রাজনীতিতে পূর্ব পাকি-স্তানেরই আধিপত্য হওয়ার কথা। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, পূর্বপাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। রাজনীতি ও জাতীয় অর্থনীতির সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হ'ত পশ্চিম পাকিস্তানে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে তা মেনে নিতে হ'ত। স্বভাবতই স্বার্থের ব্যবধান পাকিস্তানের দুই খণ্ডের মধ্যে হাজার মাইলের ব্যবধানের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে। বহু বিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের পর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিদ্রোহী হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরই পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহীরা স্বাধীন বাংলা-দেশ সরকার গঠন করেন এবং ভারত ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ঐ সরকারকে স্বীকৃতি জানায়। তারপর বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মিলিত বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের রণাঙ্গনে পাক ফৌজকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাকাটক রাজ্য মধ্য ভারতের বাকাটকরা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

সম্ভবত বুন্দেলখণ্ড তাদের আদি বাসভূমি। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে বাকাটক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বিন্ধ্যশক্তি ঐ রাজ্যের ও ঐ রাজবংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য নৃপতি। ঐ বংশের অন্যতম রাজা প্রথম পৃথ্বীসেন সম্ভবত গুপ্তবংশীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক। সে সময় বাকাটক রাজ্য-বুন্দেলখণ্ড থেকে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে বাকাটক নৃপতি দ্বিতীয় রুদ্রসেনের বিবাহ হয়। রুদ্রসেনের অকাল মৃত্যু হলে নাবালক পুত্রের অভিভাবকরূপে প্রভাবতী গুপ্ত রাজ্য শাসন করতে থাকেন। সেই সময় বাকাটক রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। বাকাটক রাজ্যের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা হরিসেন। তিনি পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজ্যের আক্রমণে বাকাটক রাজ্যের অবসান ঘটে।

বানগড়ঃ দিনাজপুরের অন্তর্গত একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান। ১৯৩৭ খ্রী সেখানে খনন কার্য চালিয়ে শুঙ্গ যুগ থেকে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত বিভিন্ন কালের বহু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা হয়।

বাবরঃ ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জা হি রু দ্দি ন মহম্মদ বাবর তুর্কিস্থানের ফরগনা রাজ্যে ১৪৮৩ খ্রী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার দিক থেকে তৈমুর ও মাতার দিক থেকে চেঙ্গিস এই দুই দুর্ধর্ষ বীরের বংসধর ছিলেন। তাঁর বাবা ওমর শেখ মির্জা ফরগণা রাজ্যের আমির ছিলেন। ১৪৯৪ খ্রী পিতার মৃত্যু হলে মাত্র এগার বছর বয়সে বাবর পিতার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। অল্প বয়স্ক বালক সিংহাসনে বসায় স্বভাবতই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। কিন্তু তিনি দক্ষতার সঙ্গে সে সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেন এবং মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে সমরখন্দ জয়ের কৃতিত্ব দেখান। কিন্তু সমরখন্দ জয়ের সময় আত্মীয়দের ষড়যন্ত্রে ও বিদ্রোহে তিনি ফরগণার কর্তৃত্ব হারান। আবার সেই বিদ্রোহ দমন করতে এলে সমরখন্দও তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। ফলে কিছুদিন রাজ্যহারা, আশ্রয়হারা অবস্থায় বাবরকে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে হয়। ঐ দুঃখভোগ ও কষ্ট স্বীকার বাবরকে তাঁর পরবর্তী জীবনের উপযোগী করে তুলতে বিশেষ সহায়ক হয়।

ঐ সময় কাবুল রাজ্যে গোলযোগ দেখা দিলে তার সুযোগ নিয়ে ১৫০৪খ্রী বাবর অল্পসংখ্যক সৈন্যের সহায়তায় কাবুল জয় করেন ও সেখানকার আমির পদে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তারপরেই বাবরের মনে ভারত জয়ের ইচ্ছা জাগে। তখন দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদি। তৈমুরের বংশধররূপে বাবর পাঞ্জাব তাঁরই প্রাপ্য বলে মনে করতেন। সে কারণে সুলতান ইব্রাহিমের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদি এবং ইব্রাহিমের পিতৃব্য আলম খাঁ লোদী দিল্লীর সিংহাসন জয়ের জন্য বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করা মাত্র বাবর সসৈন্যে ১৫২৫ খ্রী ভারত অভি-

মুখে অগ্রসর হন ও বিনা বাধায় লাহোর জয় করেন। কিন্তু বাবর তাঁর আমন্ত্রণকারীদের সাহায্য করার চেয়ে রাজ্য জয়ের কাজে বেশী তৎপর দেখে দৌলত খাঁ লোদি ও আলম খাঁ লোদি বাবরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ফলে বাধ্য হয়েই বাবরকে তখন লাহোর ত্যাগ করে কাবুলে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। কিন্তু পরের বছর, ১৫২৬ খ্রী কামান-বন্দুকে সজ্জিত বারো হাজার সৈন্যসহ তিনি পুনরায় ভারতে প্রবেশ করেন ও দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। সুলতান ইব্রাহিম লোদি সেই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন। পাণিপথে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎকার হয় এবং সেখানে দিল্লীর শেষ সুলতান ও ভারতের প্রথম মোগল বাদশাহের মধ্যে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় তা পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ নামে অভিহিত।

ইব্রাহিম লোদী যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ হারান এবং বাবর দিল্লী ও আগ্রা জয় করে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। বছর অতিক্রান্ত না হতেই বাবরের সার্বভৌম কর্তৃত্ব আটক থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। দক্ষিণে বাবরের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয় গোয়ালিয়র পর্যন্ত। ঐ সব রাজ্যজয়ের যুদ্ধে বাবরের পুত্র হুমায়ুন বিশেষ দক্ষতা দেখান। বাবরকে সর্বাধিক কঠোর সংগ্রাম করতে হয় মেবারের রানা সংগ্রাম (সঙ্গ) সিংহের বিরুদ্ধে। ১৫২৭ খ্রী খানুয়ার যুদ্ধে বাবর রানা সঙ্গকে পরাজিত করেন। তারপর ১৫২৯ খ্রী গোগরার যুদ্ধে বাংলা ও বিহারের আফগান শাসকদের পরাজিত করে বাবর বাঙলা পর্যন্ত মোগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু অধিকৃত রাজ্যগুলি সুসংহত করার আগেই ১৫৩০ খ্রী, মাত্র ৪৭ বছর বয়সে বাবরের মৃত্যু হয়।

'বাবর' কথাটির অর্থ সিংহ। বাবর প্রকৃতই সিংহের মতো বিক্রমশালী পুরুষ ছিলেন। যেমন ছিল তাঁর উদ্যম ও কর্মশক্তি তেমনই ছিল তাঁর সাহস ও রণকুশলতা। বাবর উচ্চ শিক্ষিতও ছিলেন। তিনি ফার্সি ও তুর্কি ভাষায় সমান দক্ষতায় লিখতে পারতেন। তাঁর তুর্কি ভাষায় লেখা আত্মজীবনী একটি উচ্চমানের সাহিত্যকর্ম ও তৎকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি।

বাবরনামা : ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের আত্মজীবনী। বাবর তাঁর জীবনের বিভিন্ন অবকাশে এই গ্রন্থ রচনা করেন। তুর্কিভাষায় লেখা গ্রন্থটি পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। প্রথম গ্রন্থটির ফার্সিভাষায় অনুবাদ করেন বৈরাম খাঁর পুত্র, সম্রাট আকবরের সভাসদ অবদুল রেহমান খান-খানান, ১৫৮৯-৯০ সালে। তারপর এটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। গ্রন্থটির প্রথম ইংরেজি অনুবাদ হয় ১৮২৬ সালে।

সুমধুর ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় লেখা এই গ্রন্থটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনীরূপে স্বীকৃত। এতে শাসক,যোদ্ধা এবং সর্বোপরি মানুষরূপে বাবরের একটি সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থে বাবর তাঁর চরিত্রের দুর্বলতা ও ত্রুটি-

বিচ্যুতিগুলি অকপটে স্বীকার করেছেন। গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য সীমাহীন।

বাবা গুরদিৎ সিংহ (১৮৫৯-১৯৫৪): বিপ্লবী গদর পার্টির অন্যতম নেতা। কোমাগাতা মারু জাহাজে তিন শতাধিক শিখকে নিয়ে কানাডায় প্রবেশের চেষ্টা করেন। সেখানে ব্যর্থ হলে হংকঙে আসেন। হংকঙেও প্রবেশের অনুমতি না পেলে কলকাতা বন্দরে ফিরে আসেন। সে সময় বজবজে ইংরেজ সরকারের সৈন্যদের সঙ্গে ঐ প্রত্যাগত শিখদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। কয়েকজন শিখ হতাহত ও বন্দী হন, কিন্তু গুরদিৎ সিং কিছু সঙ্গীসহ পলায়নে সমর্থ হন। পরে গুরদিৎ সিং কংগ্রেসে যোগ দেন।

বামন: আচার্য বামন অলঙ্কার শাস্ত্রের বিশিষ্ট পণ্ডিত। তাঁর বিশিষ্ট উক্তি—রীতিরাত্মা কাব্যস্য। তিনি আলঙ্কারিক উদ্ভটের সমকালীন। বামনের আবির্ভাবকাল ৭৫০-৮০০ খ্রী মধ্যে।

বারোভুঁইয়া: মোগল সম্রাট আকবরের শাসনকালে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশের বহু প্রতিপত্তিশালী ভুঁইয়া অর্থাৎ জমিদার মোগল কর্তৃত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ এলাকায় শাসনকার্য চালাতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে চাঁদ রায়, প্রতাপ রায়, ইশার্খা, প্রতাপাদিত্য প্রমুখ বারোজন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন; তাঁরাই বারোভুঁইয়া নামে অভিহিত। এঁদের নামে নানা বীরত্বের কাহিনী প্রচলিত আছে। তবে বারোভুঁইয়ারা প্রকৃতপক্ষে প্রতিপত্তিশালী সামন্তের অতিরিক্ত কিছুই ছিলেন না। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁরা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেন। এঁদের মধ্যে প্রতাপাদিত্য ও ইশার্খাকে দমনের জন্য মোগল বাদশাহদের রীতিমতো সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব সুদৃঢ় ও সংহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বারোভুঁইয়াদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়।

বার্লো, স্যার জর্জ: লর্ড কর্নওয়ালিস দ্বিতীয়বার গর্ভনর-জেনারেল হয়ে ভারতে আসার তিন মাস পরে মারা গেলে কলকাতায় কাউন্সিলের (গভর্নর-জেনারেলের উপদেষ্টা পরিষদ) সদস্য স্যার জর্জ বার্লো ১৮০৫ খ্রী অস্থায়ীভাবে ভারতের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন ও দুই বছর ঐ পদে বহাল থাকেন। তাঁর শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভেলোরের সিপাহি বিদ্রোহ দমন। তিনি মোটামুটিভাবে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে চলেন। ইংরেজ সৈন্য-বাহিনীর কাছে হোলকার পরাজিত হলেও (১৮০৬) বার্লো হোলকারকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন। সিন্ধিয়ার রাজ্যের সঙ্গেও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমান্ত ঐ সময় নির্ধারিত হয়। স্যার জর্জ বার্লোর প্রশাসনিক দক্ষতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঘাটতি বাজেট উদ্বৃত্তে পরিণত হয়। ১৮০৭ খ্রী লর্ড মিন্টো স্থায়ী গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হয়ে এলে বার্লোর কার্যকাল শেষ হয়।

বালুচিস্তান: পাকিস্তানের একটি প্রদেশ। মরু ও পর্বতময় জনবিরল স্থান। আয়তন ৫২,৯০০ বর্গ মাইল কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র ৬/৭

লক্ষ। রাজধানী কোয়েটা। আফগানিস্তানের দক্ষিণে অবস্থিত পাকিস্তানের এই প্রদেশের অধিকাংশ লোক পুশতুভাষী। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরাও পুশতুভাষী। তাই আফগানিস্তান ঐ দুটি প্রদেশের উপর দাবি জানায় এবং পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী সীমানা ডুরাণ্ড লাইনকে আফগানিস্তান স্বীকার করে না।

বাশিষ্ক : কণিষ্কর পর কুষাণ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। তাঁর মুদ্রাপাঠে অনুমান করা হয় যে মথুরা ও পূর্ব মালওয়ার উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বাশিষ্ক ও হুবিষ্ক ছিলেন কণিষ্কর দুই পুত্র এবং কণিষ্কের শাসনকালে তাঁরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে রাজপ্রতিনিধিরূপে কাজ করেন। কণিষ্কর জীবদ্দশায় বাশিষ্কর মৃত্যু হলে হুবিষ্ক পরবর্তী সম্রাট হন। সুতরাং কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, বাশিষ্ক কোনদিনই সম্রাট হননি। তিনি হয়ত মথুরা ও তার সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে রাজপ্রতিনিধি থাকাকালে তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রকাশ করেন।

বাসুদেব : কুষাণবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। তাঁর সমকালীন শিলালিপি ও মুদ্রা পাঠে মনে হয় তিনি ২৫।৩০ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর নাম থেকে মনে হয়—তিনি বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মুদ্রাতেও শিব ও বিষ্ণুর মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। বাসুদেবের মুদ্রা মথুরা, পূর্ব পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় নি। তাতে অনুমান করা হয় যে তাঁর রাজ্যসীমা ঐ এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাসুদেব নামে আরও দুজন নৃপতি বাসুদেবের পর কুষাণ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্ভবত তৃতীয় বাসুদেবের শাসনকালে নাগবংশের রাজাদের আক্রমণে কুষাণ বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

বাহমনি রাজ্য : দিল্লীর সুলতান মহম্মদ বিন তোগলকের শাসনকালে দাক্ষিণাত্যে হাসান গাঙ্গুর নেতৃত্বে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৪৭ খ্রী প্রতিষ্ঠিত ঐ রাজ্যের রাজধানী হয় দৌলতাবাদ, যার পূর্ব নাম ছিল দেবগিরি। হাসান গাঙ্গু নিজেকে পারস্যের সম্রাট বাহমনের বংশধর বলে দাবি করতেন। সে কারণে রাজা হওয়ার পর তিনি নাম নেন আলাউদ্দিন হাসান শাহ বাহমন এবং তাঁর রাজ্য বাহমনি রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করে

মোট ১৮ জন বাহমন বংশীয় রাজা প্রায় ১৮০ বছর (১৩৪৭-১৫২৬) বাহমনি রাজ্য শাসন করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাহমান শাহ (১৩৪৭-৫৮)। তাঁর পুত্র মুহম্মদ শাহ প্রথম (১৩৫৮-৭৭), মুহম্মদ শাহ দ্বিতীয় (১৩৭৮-৯৭), ফিরোজ শাহ (১৩৯৭-১৪২২), আহমদ শাহ (১৪২২-৩৫), আলাউদ্দিন দ্বিতীয় (১৪৩৫-৫৭), মুহম্মদ শাহ তৃতীয় (১৪৬৩-৮২)।

যুদ্ধ ও বিদ্রোহ দমনেই বাহমন

নৃপতিদের বেশি সময় ব্যয় হয়। কিন্তু কয়েকজন সুদক্ষ প্রশাসকের সহায়তায় তাঁরা রাজকার্যও বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে নির্বাহ করেন। সইফুদ্দিন ছিলেন প্রথম পাঁচজন বাহমন নৃপতির প্রধান মন্ত্রী এবং মাহমুদ গাওয়ান আরও তিন-জন বাহমন নৃপতির রাজকার্য পরি-চালনা করেন। তাঁরা দুজনেই রাজ-কার্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। তাঁরা যেমন সৈন্যবাহিনীকে সুশৃঙ্খল ও সুগঠিত করেন, বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নে ও শিক্ষা সংস্কারেও তেমনি পারদর্শিতা দেখান। সুশাসনের জন্য বাহমনি রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হয় এবং রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন-কল্পে নানা ব্যবস্থাবলম্বন করা হয়। তবে অধিকাংশ বাহমন নৃপতি ধর্মের ব্যাপারে অনুদার ছিলেন এবং হিন্দুদের উপর নানাভাবে অত্যাচার চালাতেন।

ধর্মের ব্যাপারে অসহিষ্ণুতা বাহ-মনি রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। প্রতিবেশী হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর, ওয়া-রাঙ্গল প্রভৃতির সঙ্গে একটানা যুদ্ধে বাহমনি রাজ্যের শক্তিক্ষয় হয় ও রাজ-কোষ শূন্য হয়। বাহমনি রাজ্যের আমিররা দক্ষিণী ও ইরানী এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল এবং তাদের বিরোধ ও পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বাহমণি রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। আমিরদের ষড়যন্ত্র ও বিরোধের ফলেই রাজ্যের দক্ষ প্রশাসক মাহমুদ গাও-য়ানের মৃত্যু হয়। আত্ম-কলহের ফলে বাহমনি রাজ্য বেরার, বিজাপুর, আহমদনগর, গোলকুণ্ডা, বিদর প্রভৃতি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায় এবং ঐ ক্ষুদ্র দুর্বল রাজ্যগুলি একে একে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১২) ঃ মোগল সম্রাট ঔরংজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুয়াজ্জাম, পিতার মৃত্যুকালে কাবুল ও পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর সংবাদ পেয়েই তিনি দিল্লী ছুটে আসেন ও অপর দুই ভ্রাতা আজিম-উল-শান ও কামবক্সকে যুদ্ধে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। সিংহাসনা-রোহণের পর মুয়াজ্জাম বাহাদুর শাহ নাম গ্রহণ করেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বাহাদুর শাহকে শান্ত ও মধুর প্রকৃতির এবং বিদ্বান বলে বর্ণনা করেছেন।

বাহাদুর শাহ ৬৩ বছর বয়সে সিংহাসনারোহণ করেন, তদুপরি তিনি ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির শাসক। সে কারণে তার শাসনকালে রাজদরবারে যে ষড়যন্ত্র ও দলাদলি শুরু হয় তা মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি আরও দুর্বল করে দেয়। বাহাদুর শাহ শিবজির পৌত্র ও শম্ভাজির পুত্র শাহুকে মুক্তি দিয়ে কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দেন। শাহুকে কেন্দ্র ক'রে শীঘ্র মারাঠাদের মধ্যে দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়, এবং বাহাদুর শাহর শাসনকালে তার মীমাংসা হয় না।

বাহাদুর শাহ রাজপুতদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। তিনি জিজিয়া কর প্রত্যাহার করেন এবং মেওয়ার ও মারোয়াড়ের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন। তিনি অম্বরের রাজার সঙ্গেও মৈত্রী স্থাপন করেন।

বাহাদুর শাহর শাসন কালে বান্দা বাহাদুরের নেতৃত্বে শিখরা বিদ্রোহী হয়। বাহাদুর যে সময় দাক্ষিণাত্যে,

সেই সময় শিখরা শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী সিরহিন্দ প্রদেশ দখল করে নেয়। তারপর সাহারানপুর, কর্নাল প্রভৃতি দখল করে শিখরা দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হলে মোগলবাহিনী শিখদের প্রতিহত করে। সম্রাট বাহাদুর শাহ স্বয়ং ঐ অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু শিখরা প্রতিহত হওয়ার অল্পকাল পরে, ১৭১০ খ্রী বাহাদুর শাহর মৃত্যু হলে আবার শিখদের তৎপরতা শুরু হয়।

বাহাদুর শাহ, দ্বিতীয় (১৮৩৭-৫৭): দিল্লীর শেষ মোগল বাদশাহ। মোগল সাম্রাজ্য তখন অস্তিত্বহীন এবং মোগল সম্রাটরা ইংরেজ সরকারের পেন্সনভোগী। কিন্তু দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ইংরেজ সরকারের উৎখাতের জন্য শেষ চেষ্টা করেন। তিনি ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহে যোগ দেন এবং বিদ্রোহীরা তাঁকেই ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। বিদ্রোহে সিপাহিদের পরাজয় হলে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহর বিচার হয় এবং ইংরেজ সরকার তাঁকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করেন। সেখানে ১৮৬২ খ্রী বাহাদুর শাহর মৃত্যু হয়।

বাহলুল লোদি: দিল্লীর লোদি বংশীয় সুলতানির প্রতিষ্ঠাতা। শাসনকাল ১৪৫১-৮৮ খ্রী। সৈয়দ বংশীয় সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহকে উৎখাত করে দিল্লীর মসনদ দখল করেন। সুদক্ষ সৈনিক, শক্তিশালী শাসক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। মেওয়াট, সম্ভাল, কল্পি, ঢোলপুর, রেওয়ারি প্রভৃতি স্থানের বিদ্রোহ দমন করেন। সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন এবং নিজে বিশেষ শিক্ষিত না হলেও বিদ্বজ্জনের সঙ্গ ভালবাসতেন। ১৩৮৮খ্রী বাহলুল লোদির মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র সিকন্দার লোদি দিল্লীর সুলতান হন।

বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়: পালরাজা ধর্মপালের শাসনকালে (৭৮০-৮১৫) তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মগধে একটি পর্বত চূড়ায় ও সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় (বিহার) প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ঐ বিহার পূর্ব ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। ঐ বিহারে বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠের উদ্দেশ্যে ভারতের বাইরে থেকেও ছাত্ররা আসতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি বিভাগ ছিল এবং প্রত্যেক বিভাগে শতাধিক অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যার্থীদের কাছ থেকে কোন বেতন নেওয়া হত না, পরন্তু তাদের বিনামূল্যে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল।

বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় একে অরণ্যাঞ্চলে পর্বতশীর্ষে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার উপর সেটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। এ কারণে ১২০৩ খ্রী বখতিয়ার খলজি ওটিকে দুর্গ মনে করে আক্রমণ করেন এবং সে আক্রমণে বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংস হয়।

বিক্রমাব্দ: অব্দ-দ্র।

বিগ্রহ রায়: দিল্লী ও আজমিরে চৌহান বংশীয় রাজপুত শাসনের প্রতিষ্ঠাতা। ১১৬৩ খ্রী তোমর রাজ দ্বিতীয় অনঙ্গ পালকে পরাজিত করে বিগ্রহ রায় দিল্লী অধিকার করেন। বিগ্রহ রায়ের পর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পৃথ্বীরাজ চৌহান।

বিজয়নগর রাজ্য : দাক্ষিণাত্যে বাহমনি রাজ্যের দক্ষিণে, মোটামোটি-ভাবে কৃষ্ণা নদী থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর অবস্থিত ছিল। দিল্লীর সুলতান মহম্মদ বিন তোগলকের শাসনকালে দুই ভ্রাতা হরিহর ও বাক্কা রায়ের নেতৃত্বে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা বিদ্রোহী হয় এবং ১৩৩৬ খ্রী বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

হরিহর বিজয়নগরের প্রথম রাজা। ১৩৪৩ খ্রী হরিহর যখন মারা যান তখন বিজয়নগর রাজ্য উত্তরে কৃষ্ণা থেকে দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত এবং পশ্চিমে আরব সাগর থেকে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। বিজয়নগর রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল প্রায় ২৩০ বছর এবং মোট ১৬ জন রাজা সে রাজ্যে রাজত্ব করেন। ঐ রাজারা তিনটি রাজবংশে বিভক্ত ছিলেন। হরিহর, বাক্কা রায় প্রমুখ রাজারা ছিলেন সঙ্গম বংশীয় এবং তাঁদের রাজত্বকাল প্রায় দেড় শ' বছর। দ্বিতীয় রাজবংশ—সালুভ রাজবংশের রাজাদের শাসনকাল মাত্র পনের বছর। তারপর তালুভ রাজবংশের শাসনকাল প্রায় ষাট বছর স্থায়ী ছিল।

বিজয়নগরের রাজাদের মধ্যে দ্বিতীয় দেবরায় (১৪১৯-৪৯) ও কৃষ্ণদেব (১৫০৯-৩০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পরেই বিজয়নগর রাজ্যের গৌরবের দিন শেষ হয়। অবশেষে সদাশিব রায়ের রাজত্ব-কালে, ১৫৬৫ খ্রী বিভক্ত বাহমনি রাজ্য-গুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিজয়নগর আক্রমণ করে এবং টালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর রাজ্যের চূড়ান্ত পরাজয় হয়। স্বাধীন বিজয়নগর রাজ্যের ইতিহাসের সেখানে পরিসমাপ্তি।

প্রায় ২৩০ বছর স্থায়ী বিজয়নগর রাজ্যের রাজারা প্রজাপালনের জন্য খ্যাত। রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা উন্নত ছিল। প্রজাদের কাছ থেকে ফসলের $\frac{1}{4}$ থেকে $\frac{1}{6}$ অংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হত। সুশাসনের উদ্দেশ্যে সমগ্র রাজ্য কয়েকটি প্রদেশ, জেলা (কট্টম) ও গ্রামগোষ্ঠীতে (তহশিল) ভাগ করা হয়। রাজবংশজাত লোকেরাই বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান শাসক নির্বাচিত হতেন। বিজয়নগর হিন্দু রাজ্য হলেও সেখানে ধর্মাচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। বিজয়নগর রাজ্যে অবস্থানকারী পারস্যের দূত আবদুর রজ্জাক তাঁর বিবরণীতে একথা লিখেছেন। সমাজে মহিলাদের উচ্চ মর্যাদা ছিল, তাঁরা উচ্চ রাজপদেও নিযুক্ত হতেন। তবে বিজয়নগর রাজ্যে সতীদাহ, বাল্য-বিবাহ,পণপ্রথা প্রভৃতির প্রচলন ছিল। কৃষি ছিল রাজ্যের অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা। দেশবিদেশের সঙ্গে বিজয়নগরের বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল।

বিজয়নগরের রাজারা শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্যেরও বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মন্দির, প্রাসাদ, ফলফুলের বাগান প্রভৃতির জন্য রাজধানী বিজয়নগর শহরটি সেদিন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। পণ্ডিত ও লেখকরা রাজ-দরবারে সমাদৃত হতেন। সে কারণে বিজয়নগরে তামিল, তেলুগু ও সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়।

বিজয়পুরী : বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের গুণ্টুর জেলায় অবস্থিত নাগার্জুন কোণ্ডার প্রাচীন নাম। এখানে উৎখননের ফলে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর ইক্ষাকু রাজাদের আমলের বহু বৌদ্ধ স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার হয়। ইক্ষাকু রাজাদের শাসনকালে বিজয়পুরী বহু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাসস্থান ছিল। যেসব স্তূপ, চৈত্য ও বিহারের জীর্ণোদ্ধার হয়েছে তাতে বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বনে চিত্র খোদিত দেখা যায়।

বিজয়সেন : সেনবংশীয় রাজা হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয়সেন (১০৯৫-১১৫৮ খ্রী) পালবংশীয় রাজাদের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে সর্বপ্রথম স্বাধীন রাজারূপে রাজ্যশাসন শুরু করেন। বিজয়সেন গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে সেন রাজ্যের সীমান্ত বিস্তৃত করেন। পূর্ববঙ্গের যদু বংশীয় রাজাকে পরাজিত করে বিজয়সেন বিক্রমপুর জয় করেন এবং পূর্ববঙ্গে অধিকৃত অঞ্চলগুলির রাজধানীরূপে তিনি বিজয়পুর নামে একটি নতুন নগরীর পত্তন করেন।

পিতা হেমন্ত সেনের আমলে শুধু বর্ধমান অঞ্চলে সীমিত একটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য পুত্র বিজয়সেনের পরাক্রমে একটি বিশাল সার্বভৌম রাজ্যের আকার ধারণ করে। এবং পালবংশের পতনের যুগে বঙ্গদেশে যে অরাজকতা দেখা দেয় বিজয়সেনের দক্ষ শাসনে তা দূর হয়। বিজয়সেনের সমকালীন কবি উমাপতিধর ও জীবনীকার শ্রীহর্ষের রচনায় বিজয়সেনের শাসনব্যবস্থার উচ্চ প্রশংসা আছে।

বিজ্ঞানেশ্বর : চোলসম্রাট ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের রাজসভার বিশিষ্ট শাস্ত্রকার। তাঁর রচিত 'মিতাক্ষরা' গ্রন্থের সূত্রানুসারে, হিন্দু কোড আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে (১৯৫৬) পর্যন্ত ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশের সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারিত হত।

বিধানচন্দ্র রায় : (১৮৮২-১৯৬২) প্রখ্যাত চিকিৎসক ও জাতীয়তাবাদী নেতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দলের প্রার্থীরূপে তরুণ চিকিৎসক ডাঃ রায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে পরাজিত করে ভারতের রাজনীতিতে প্রথম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। পরে কলকাতার মেয়র ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর রূপে বিশেষ প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় দেন। কয়েকবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন ও আমৃত্যু সে পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

বিন্দুসার : মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পুত্র ও সম্রাট অশোকের পিতা। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন ও ২৯৮-২৭৩ খ্রী-পূ রাজত্ব করেন। রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর 'অমিত্রঘাত' উপাধি গ্রহণ করেন। সম্ভবত পিতার মতোই তিনি পরাক্রমশালী ছিলেন, কিন্তু বিন্দুসারের শাসন কালের কথা সামান্যই জানা যায়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে তিনি দক্ষিণ ভারতেও রাজ্য বিস্তার করেন।

প্রতিবেশী গ্রীক রাজ্যগুলির সঙ্গে বিন্দুসারের ভাল সম্পর্ক ছিল। সিরিয়া ও মিশরের সঙ্গেও বিন্দুসারের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। প্রতিবেশী গ্রীক রাজ্যের নৃপতি এন্টিওকস বিন্দুসারের অনুরোধে তাঁর রাজ্যে একজন গ্রীক দার্শনিক পাঠান।

বিপিন চন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) : শ্রীহট্ট জেলায় জন্ম, একদা চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতারূপে খ্যাতি অর্জন করেন। অসাধারণ বাগ্মীরূপেও খ্যাত বিপিন পাল ছিলেন বালগঙ্গাধর টিলক ও লালা লাজপৎ রায়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এবং ভারতীয় রাজনীতিতে ঐ তিন নেতা লাল-বাল-পাল নামে খ্যাত হন। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের জন্য বিপিন পাল কারাবরণ করেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় ভ্রমণ করে তিনি ভারতের স্বাধীনতার দাবির সমর্থনে প্রচার কার্য চালান। সাংবাদিক হিসাবেও বিপিন পাল স্মরণীয়।

বিবেকানন্দ, স্বামী (১৮৬২-১৯০২) : ভারতপথিক সন্ন্যাসী, পাণ্ডিত্য, জাত্যাভিমান ও বাগ্মিতার জন্য খ্যাত। পূর্ব নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৯৩ খ্রী আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে যোগ দিতে যান। সে সময় ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতের ধর্মবিষয়ে তিনি যে সব ভাষণ দেন তা সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য দুনিয়াকে চমৎকৃত করে। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু শ্বেতাঙ্গ নর-নারী সেদিন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ ও বাণী পরবর্তীকালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের দিনগুলিতে অগণিত তরুণ প্রাণকে অনুপ্রাণিত করে। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা আইরিশ রমণী ভগিনী নিবেদিতা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে ও সমাজ সংস্কারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন।

বিম্বিসার : হর্যঙ্ক বংশজাত বিম্বিসার খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে, বুদ্ধদেবের সমকালে মগধের রাজা ছিলেন। তাঁর পরাক্রমে মগধ একটি বিশাল রাজ্যে রূপান্তরিত হয়। রাজগৃহ ছিল তাঁর রাজধানী। বিম্বিসারের রাজ্য ছিল সুশাসিত, আইন ছিল অত্যন্ত কঠোর। তিনি বুদ্ধদেবের অনুগত ছিলেন কিন্তু নিজে বৌদ্ধ ছিলেন কিনা জানা যায় না। জৈন ধর্মগ্রন্থে বিম্বিসারকে মহাবীরের অনুগত বলা হয়েছে। বিম্বিসার বৈবাহিক সূত্রে বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। কাশীরাজ্যের রাজা প্রসেনজিতের ভগ্নী কোশলদেবীকে বিবাহ করে বিম্বিসার কাশীরাজ্যের একাংশ উপঢৌকন হিসাবে লাভ করেন। তাছাড়া লিচ্ছবির রাজকন্যা চেল্লনা, বিদেহ রাজ্যের রাজকন্যা বাসবী ও মদ্র রাজকন্যা খেমার সঙ্গেও বিম্বিসারের বিবাহ হয়, এবং ঐসব বিবাহের ফলে মগধ রাজ্যের প্রভাব বিস্তৃত হয়। বিম্বিসার সম্ভবত পুত্র অজাতশত্রু হাতে নিহত হন।

বিহার : অগণিত জৈন ও বৌদ্ধ বিহারের স্মৃতিবাহী বর্তমান বিহার রাজ্য ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতার পীঠভূমি। ঐস্থানে একদা গঙ্গানদীর

উত্তরে বিদেহ ও গঙ্গানদীর দক্ষিণে মগধ নামে যে দুটি সমৃদ্ধ ও বৃহৎ রাজ্য গড়ে ওঠে, মোটামুটিভাবে তাই নিয়েই বর্তমান বিহার রাজ্যটির আয়তন। মগধ রাজ্যের প্রথম ঐতিহাসিক নৃপতি শিশুনাগ খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীতে, ভগবান বুদ্ধের সমকালে রাজত্ব করতেন এবং তাঁর সময়েই বিহার জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত হয়। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত থেকে সম্রাট অশোকের শাসনকালে (খ্রী-পূ ৩২২-২৩২) মগধ একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যের রূপ ধারণ করে এবং বর্তমান পাটনা শহরের নিকটবর্তী পাটলীপুত্র হয় সে সাম্রাজ্যের রাজধানী, যার সমৃদ্ধি ও বিশালতা সেদিন গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসকে বিস্মিত করে। সম্রাট অশোকের সমকালীন একটি স্তম্ভ এখনও উত্তর বিহারের রামপুর নামক স্থানে টিকে আছে। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর বিহারের কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস কিছুই প্রায় জানা যায় না। খ্রীষ্টিয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত রাজাদের শাসনকালে আবার বিহার ও পাটলীপুত্রের কথা জানতে পারি চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েনের বিবরণীতে। সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে তিনি ভারতে আসেন ও ছয় বছর ধরে (৪০৫-১১) এদেশের নানাস্থান পর্যটন করেন। তার মধ্যে পাটলীপুত্রে তিনি ছিলেন তিন বছর। গুপ্তরাজাদের শাসনকালে সমগ্র বিহার আবার হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিহার সম্রাট হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর (৬৪৭ খ্রী) অষ্টম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিহারের ইতিহাস আবার অস্পষ্ট। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক হিউ এন সাং ভারতে আসেন ও বিহারে অবস্থিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করেন।

অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে কনৌজের গুর্জর প্রতিহার, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট ও বঙ্গদেশের পাল রাজারা বিহারের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিন দিক থেকে বিহারের উপর আক্রমণ চালান। কিন্তু মগধের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন পাল রাজা গোপাল। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় নবম শতাব্দীর প্রথম অর্ধে মগধ আবার বৌদ্ধধর্মের প্রধান প্রচার কেন্দ্র হয়। কিন্তু নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুর্জর প্রতিহার-রাজ প্রথম মহেন্দ্র পাল (৮৫৫-৯১০) পাল রাজাদের পরাজিত করে বিহারের বিস্তীর্ণ অংশ জয় করেন।

বিহারে মুস্লিম অভিযান শুরু হয় ১১৯৪ খ্রী। মহম্মদ ঘুরির অনুচর বখতিয়ার খলজির আক্রমণে ওদন্তপুরী, নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিদ্যাবিহারগুলি বিধ্বস্ত হয় ও মঠগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

বিহার ইংরেজ শাসনে আসে ১৭৬৫ খ্রী এবং তখন থেকে লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত (১৯০৫) বিহার ও বঙ্গদেশ সংযুক্ত ছিল। তারপর বঙ্গবিভাগ রদ হলে বিহার ও ওড়িশাকে নিয়ে ১৯১২ খ্রী একটি প্রদেশ গঠিত হয়। তারপর ১৯৩৬ খ্রী ওড়িশা একটি স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। ভারত স্বাধীন

হওয়ার পর ১৯৪৮ খ্রী সরাইকেলা ও খরসোয়ান নামে দুটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য বিহারের অঙ্গীভূত হয়। তারপর ১৯৫৬ খ্রী রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে পূর্ণিয়া জেলার একাংশ ও মানভূম জেলার পুরুলিয়া মহকুমার প্রায় সবটুকু পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বর্তমানে বিহার রাজ্যের আয়তন ১,৭৩,৮৭৬ বর্গ কিলোমিটার। লোক-সংখ্যা ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ। রাজধানী পাটনা।

বীরবল : কলাপির ভাটবংশজাত মহামণ্ডিত, সুরসিক ও সঙ্গীতজ্ঞ বীর-বলের প্রকৃত নাম মহেশ দাস। উচ্চ রসবোধ ও বুদ্ধিদীপ্ত কথোপকথনের জন্য বীরবল মোগল সম্রাট আকবরের বিশেষ সমাদর লাভ করেন। সম্রাট তাঁকে রাজা বলে সম্বোধন করতেন। তিনিই একমাত্র হিন্দু যিনি আকবরের দিন ইলাহি ধর্ম গ্রহণ করেন। বীরবল যুদ্ধবিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে তিনি নিহত হন।

বীরভানুপুর : পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক স্থান। এখানে উৎখননের ফলে কুঠার, ছেদক, ফলা জাতীয় পাথরের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। সম্ভবত সেগুলি পাঁচ হাজার বছরের পুরানো।

বুদ্ধদেব : কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন ও মায়াদেবীর পুত্র। জন্মের কয়েকদিন পরে মাতৃহারা হন এবং বিমাতা ও মাতৃস্বসা গৌতমীর কাছে পালিত হন, সে কারণে তাঁর নাম হয় গৌতম। শাক্যবংশে জন্ম বলে শাক্যসিংহ নামেও অভিহিত। জন্ম ৫৬৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। উনিশ বছর বয়সে গৌতমের সঙ্গে যশোধারার বিবাহ হয় এবং তাঁদের যে একটি পুত্র সন্তান হয়। তার নাম রাহুল।

ত্রিশ বছর বয়সে গৌতম সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ কঠোর তপস্যান্তে বুদ্ধত্ব (জ্ঞান) লাভ করেন। তখন থেকে তিনি গৌতম বুদ্ধ বা বুদ্ধদেব নামে পরিচিত। গয়ায় যে বটবৃক্ষতলে বসে গৌতম দীর্ঘ ধ্যানান্তে বুদ্ধত্ব লাভ করেন সেই বৃক্ষ 'বোধিদ্রুম' এবং গয়ার সেই অঞ্চল 'বোধগয়া' বা 'বুদ্ধগয়া' নামে অভিহিত। বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম বর্তমান বিহার ও উত্তর প্রদেশের নানা স্থানে দীর্ঘ ৪০ বছর বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে ৮০ বছর, বয়সে কুশীনগর নামক স্থানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা অহিংসা সদাচার ও জীবে প্রেম ; সৎ কর্মের দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন এবং দুঃখকষ্ট ও পুনর্জন্ম হতে অব্যাহতি। ভগবান বুদ্ধের বাণী উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে ত্রিপিটক গ্রন্থে, যা বৌদ্ধদের মুখ্য ধর্মগ্রন্থরূপে বিবেচিত। ভগবান বুদ্ধের প্রেম ও মৈত্রীর বাণী ভারতের শাশ্বত বাণী। বুদ্ধদেব ভারতের প্রথম ইতিহাস পুরুষ, যাঁর সময় থেকে ভারতের ইতিহাসের সাল তারিখ সুনিশ্চিতভাবে জানার সূচনা হয়।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন : জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হওয়ার কয়েক দশক আগেই বাংলার শিক্ষিত সমা-জের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়।

১৮৫১ খ্রী ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের উদ্যোগে গঠিত হয় ইংরেজ শাসিত ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন।

দ্বারকনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স এসোসিয়েশন' ও রাজা রামমোহন রায়ের অনুগামী ইংরেজ এডাম, জর্জ টমসন প্রভৃতির উদ্যোগে গঠিত 'বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'কে সংযুক্ত করে ১৮৫১ খ্রী ৩১ অক্টোবর 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' গঠিত, হয়। ঐ সংস্থার প্রথম কমিটির সভাপতি হন রাধাকান্ত দেব ও সম্পাদক হন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সংগঠনটির প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল অস্তিত্ব থাকলেও ক্রমে তার গুরুত্ব হ্রাস পায়।

১৮৭৬ খ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' গঠিত হলে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের রাজনৈতিক সার্থকতা লোপ পায়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকেই জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রণী সংগঠন বলা যায়।

বেদ : বেদ কথার অর্থ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। সত্যযুগের ঋষিরা গভীর সাধনায় সমাধিস্থ অবস্থায় যে সব দেববাণী শ্রবণ করেন তাই বেদে লিপিবদ্ধ হয়। এ কারণে বেদের অপর নাম শ্রুতি। বেদের বাণী দেবতার বাণী, এ কারণে বেদের আর এক নাম অপৌরুষেয়। বিষ্ণুপুরাণে আছে, বেদের শ্লোক সংখ্যা এক লক্ষ, এবং তা চার ভাগে বিভক্ত। ঐ চার খণ্ডের নাম ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। প্রতিখণ্ড আবার সংহিতা অথবা মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক—এই তিন ভাগে বিভক্ত। সংহিতা ও ব্রাহ্মণকে কর্মখণ্ড বলা হয়, কারণ বেদের ঐ দুই খণ্ডে ধর্মীয় আচার আচরণ ও যাগ-যজ্ঞাদির নির্দেশ আছে। আর আরণ্যক হল জ্ঞানকাণ্ড, কারণ তাতে আছে গভীর জ্ঞান ও ঈশ্বরতত্ত্বের নানা বিষয়। উপনিষদ আরণ্যকের বিভিন্ন অধ্যায়। ব্রাহ্মণগুলির অধিকাংশ গদ্যে লেখা। তাতে বলি ও উৎসর্গের রীতিনীতি লিপিবদ্ধ আছে। প্রতি বেদেরই এক বা একাধিক ব্রাহ্মণ আছে। যেমন ঋগ্‌বেদের ব্রাহ্মণ সংখ্যা দুই—ঐতরেয় ও কৌষিতকি অথবা সাংখ্যায়ন। চার খণ্ড বেদকে প্রথম সংকলিত, বিভক্ত ও লিপিবদ্ধ করেন মহাভারতকার কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, যে কারণে তাঁর অপর নাম বেদব্যাস। ঋক, যজুঃ ও সাম—এই তিন বেদগ্রন্থে যথাক্রমে পদ্য, গদ্য ও গীতির প্রাধান্য। অথর্ববেদে পদ্য গদ্য ও গীতির সমান স্থান। অথর্বা ঋষি অঙ্গিরার সহযোগিতায় চতুর্থ বেদের সংকলন করেন বলে তার নাম অথর্ব বেদ। অথর্ব বেদে অপর তিন বেদের বহু শ্লোকের পুনরুল্লেখ আছে। পাণিনি বেদকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করেছেন এবং সে কারণে তিনি বেদকে বলেছেন 'ত্রয়ী'; তিনি অথর্ব বেদকে বেদের অন্তর্ভুক্ত করেননি।

ঋক শব্দের অর্থ পাদনিবদ্ধ মন্ত্র। দেবস্তুতির উদ্দেশ্যে মন্ত্রগুলি রচিত। অগ্নি দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত মন্ত্রের

সংখ্যা সর্বাধিক। অন্য দেবতাদের মধ্যে আছেন ইন্দ্র, আদিত্য, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি। ঋক সংহিতার মন্ত্রগুলির কাব্যগুণ উচ্চমানের। পরবর্তী কালের বহু পৌরাণিক উপাখ্যান ঋক সংহিতার বিষয় ও ভাবধারার অনুসরণে লিখিত হয়! ঋকবেদের রচনাকাল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা একমত নন। ঋক সংহিতার প্রথম সঙ্কলন সম্পাদক ম্যাক্সমুলারের মতে ঋকবেদের রচনাকাল খ্রী-পূ দ্বাদশ ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়। মার্টিন হিউগোর মতে বৈদিক যুগ ২৪০০ থেকে ২০০০ খ্রী-পূর্বাব্দ। বাল গঙ্গাধর টিলকের মতে ঋক সংহিতার রচনা কাল খ্রী-পূ চার সহস্রাব্দের কম নয়। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে ঋগ বেদের রচনাকাল খ্রী-পূ চতুর্দশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়।

বেদে যে সমাজ চিত্র পাওয়া যায় তাতে কোথাও নৈরাশ্যের চিহ্ন নেই। ঋগ্‌বেদের ঋষিরা কোথাও বলেননি যে, জগৎ অকল্যাণময় বা মনুষ্য জন্ম পাপের ফল। মানুষ সেদিন সুখ-সাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করত, নরনারী উভয়েই স্বর্ণালঙ্কার ও সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত থাকত। সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতির বিশেষ সমাদর ছিল। জগৎ সংসার ত্যাগ করে কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভের কথা কোন ঋষি সেদিন প্রচার করেননি। এমনকি পাপ-নরক প্রভৃতি বিষয়েও বৈদিক ঋষিরা সেদিন নীরব ছিলেন। তাঁরা এই বিশ্বকে ধর্মাত্মা ব্যক্তির পুণ্য জীবন যাপনের উপযুক্ত স্থান বলে বর্ণনা করেছেন। ঋষিরা বৈদিক যুগে সমাজেই বাস করতেন। পরবর্তীকালে উপনিষদ ও পুরাণের যুগে ঋষিরা বনবাসী হয়েছেন। ঋগ্‌বেদে বর্ণাশ্রয়ের উল্লেখ থাকলেও বৈদিক যুগে জাতিভেদ ছিল না। গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র প্রমুখ ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছেন, বহু ক্ষত্রিয় কন্যার সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিবাহ হয়েছে। নারীদের সেদিন পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল, বহু বৈদিক স্তোত্র নারীর রচনা বলে জানা যায়। পরিবহন হিসাবে অশ্ববাহিত রথের প্রচলন ছিল সব চেয়ে বেশি। বেদে বিমানপোতের কোন উল্লেখ নেই যা পরবর্তী কালের রচনা মহাকাব্যগুলিতে দেখা যায়। অথর্ব বেদে রথ, গোসকট ও পদযাত্রীদের জন্য তিন শ্রেণীর পথের উল্লেখ আছে ; পাল্কির উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। তবে নৌযান ও নৌ-বিহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। গৃহপালিত পশুর মধ্যে উল্লেখ আছে গরু, ঘোড়া, বলদ, কুকুর ও গাধার।

বৈদিক সমাজ অনেক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকলেও তাদের ধর্মচিন্তা ও দেবতা ছিল অভিন্ন। বৈদিক সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল না বলে মনে হয়। জুয়া খেলা, মদ্যপান বৈদিক সমাজে নিন্দিত ছিল। তবে ঘোড়-দৌড়, রথদৌড় প্রভৃতি প্রতিযোগিতার প্রচলন ছিল। পশুবধ নিষিদ্ধ ছিল না। বৈদিক আর্যরা, এমনকি ব্রাহ্মণেরাও মাছ, মাংস ভক্ষণ করতেন। সম্মানিত অতিথিদের সেবায় গোমাংস পরিবেশন করা হত। এইজন্য অতিথির অপর নাম ছিল গোঘ্ন—অর্থাৎ যার উদ্দেশ্যে গোবধ করা হয়েছে। শিক্ষা বাধ্যতা-

মূলক ছিল। বেদের একটি শ্লোকে আছে প্রত্যেকের শিক্ষালাভ করা উচিত— স্বাধ্যায়ো অধ্যেতব্যঃ। শিক্ষা অবৈতনিক ছিল। রাজা ও ধনীদের অর্থে শিক্ষা ভবনের ব্যয় নির্বাহ হত। ঋগ্‌বেদে কর্মকার, সূত্রধর, মৃৎশিল্পী, তন্তুবায়, চর্মকার, চিকিৎসক প্রভৃতি বৃত্তিজীবীর উল্লেখ অছে। ঋগ্‌বেদে শল্য চিকিৎসারও উল্লেখ আছে।

বৈদিক যুগের রাজ্যগুলি প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের মত ছোট ছিল। প্রজাতন্ত্র, অভিজাততন্ত্রও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না। ঋগ্‌বেদের একটি শ্লোকে 'বিশ' (জনগণ) কর্তৃক রাজা নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে। সে কারণে রাজাদের 'বিশপতি'ও বলা হত। বৈদিক যুগের শেষের দিকে বৃহৎ রাজ্যের উদ্ভব হয়।

বেদাঙ্গ : বেদ পাঠ ও উপলব্ধিতে সহায়ক এবং বেদবর্ণিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষক ছয়টি বিষয় নিয়ে রচিত গ্রন্থসমূহকে বেদাঙ্গ বলা হয়। বেদাঙ্গর অন্তর্ভুক্ত ছয়টি বিষয়— শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। বেদাঙ্গ শব্দটির অর্থ বেদের অঙ্গ, কিন্তু রক্ষণশীল বেদতত্ত্ববিদরা বেদাঙ্গকে বেদের অঙ্গ বলে স্বীকার করেন না।

বেন্টিঙ্ক, লর্ড উইলিয়ম : লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ১৮২৮–৩৫ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন। তার আগে তিনি ছিলেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গভর্নর। কয়েকটি ছোটখাট যুদ্ধে বেন্টিঙ্ককে নিযুক্ত হতে হয়েছিল। অত্যাচারী রাজার হাত থেকে প্রজাদের উদ্ধারের জন্য তিনি কুর্গ রাজ্যটি দখল করেন। কাছাড় রাজ্যের কোন উত্তরাধিকারী না থাকার জন্য বেন্টিঙ্কের শাসনকালে কাছাড় বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। জয়ন্তিয়া রাজ্যে বলিদানের উদ্দেশ্যে ধৃত কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারীকে উদ্ধারের জন্যও তাঁকে সেখানে সৈন্য পাঠাতে হয়। এছাড়া মহীশূর রাজ্যে অরাজকতা দূর করার জন্য বেন্টিঙ্ক সাময়িকভাবে সে রাজ্যের শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনকালে ভারতে রুশ আক্রমণ আশঙ্কা প্রবল হওয়ায় উত্তর সীমান্ত নিরাপদ করার প্রয়োজনে তিনি শিখ রাজা রণজিৎ সিংহের সঙ্গে চিরস্থায়ী মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন। লর্ড বেন্টিঙ্ক ছিলেন শান্তিবাদী এবং নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী। এ কারণে গোয়ালিয়র, জয়পুর, ভূপাল প্রভৃতি রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ বিরোধের সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তারের সম্ভাবনা তিনি উপেক্ষা করেন।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর সংস্কারমূলক কাজগুলির জন্য। তিনিই প্রথম বিচারবিভাগীয় উচ্চ পদে ভারতীয়দের নিয়োগ করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি সতীদাহ নিবারণে আইন প্রণয়ন; ১৮২৯ খ্রী সারা ভারতে সতীদাহ আইনত নিষিদ্ধ হয়। ঠগী দমন তাঁর অপর স্মরণীয় কীর্তি। ঐ দস্যুদের জন্য ভারতের রাজপথগুলি অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। লর্ড বেন্টিঙ্ক ঠগী দমনের জন্য ১৮৩৫ খ্রী একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করেন এবং কর্নেল স্লীম্যান ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হয়। স্লিম্যান কঠোর হাতে ঠগী দমন

করে এদেশের পথঘাট নিরাপদ করেন। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তৎকালীন শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের সমর্থনে ১৮৩৫ খ্রী এদেশে ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এ কাজে বেন্টিঙ্কের প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁর কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য লর্ড মেকলে। কলকাতার মেডিকাল কলেজ, বোম্বাইর এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউশন প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকালে স্থাপিত হয়।

বৈরাম খাঁ : জাতিতে তুর্কি এবং প্রথম জীবনে পারস্যের অধিবাসী। ভারতে এসে বাবরের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন এবং পরবর্তীকালে হুমায়ুনের সৈন্যবাহিনীতে পদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত হন। হুমায়ুনের বঙ্গদেশ অভিযানে বৈরামের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয়ের পর বৈরাম খাঁ শেরশাহের হাতে বন্দী হন। কিন্তু বন্দীশালা থেকে পলায়ন করে সিন্ধুপ্রদেশে গিয়ে আবার হুমায়ুনের সঙ্গে যোগ দেন। হুমায়ুনের পরবর্তী-কালের সাফল্যে বৈরাম খাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

হুমায়ুন বৈরামকে আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত করেন। সেই সময় হুমায়ুনের ভগ্নীর কন্যা সলিমার সঙ্গে বৈরাম খাঁর বিবাহ হয় এবং এইভাবে মোগল রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈরাম খাঁর নিপুণ পরিচালনায় পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে মোগল বাহিনীর বিজয়ের পর দিল্লীতে মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বৈরাম খাঁ ছিলেন অভিভাবক হিসাবে অত্যন্ত কঠোর এবং সে কারণে আকবর ১৫৬০ খ্রী ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর বৈরামকে জানান যে তখন থেকে তিনি নিজেই রাজ্য শাসন করবেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৈরাম আকবরের সে দাবি মেনে নেন। পরে জলন্ধরে বৈরামের এক বিদ্রোহের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু আকবর তাঁকে ক্ষমা করেন ও তাঁর হজ যাত্রার ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু মক্কা যাওয়ার পথে গুজরাতে এক আফগানের হাতে বৈরাম খাঁ নিহত হন।

বৈশালী : উত্তর বিহারের মজঃফরপুর জেলায় অবস্থিত এই প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানে খননকার্য চালিয়ে গুপ্ত ও প্রাক্-গুপ্ত যুগের বহু সীলমোহর ও মাটির মূর্তি পাওয়া গেছে। বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহূত হয়েছিল।

বোম্বাই ঃ মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী বোম্বাই শহরটি ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্তী আরব সাগরের একটি দ্বীপের উপর গড়ে ওঠে। দ্বীপটি সাড়ে এগারো মাইল লম্বা ও তিন থেকে চার মাইল চাওড়া, মোট আয়তন পঁচিশ বর্গমাইল। বর্তমানে দ্বীপটি মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত। সম্ভবত হিন্দু দেবী মুম্বাবাইর নাম থেকে বোম্বাই নামের উদ্ভব হয়েছে। দ্বীপটি ১৩৪৮ খ্রী পর্যন্ত হিন্দু রাজাদের শাসনাধীন ছিল; ঐ বছর দ্বীপটি গুজরাতের সুলতানের অধিকারে চলে যায়। তারপর ১৫৩৪ খ্রী পর্তুগীজরা গুজরাতের সুলতান বাহাদুর শাহর কাছ থেকে দ্বীপটির দখল নেয়। তারপর

শতাধিক বর্ষকাল দ্বীপটি পর্তুগীজদের অধিকারে থাকে। ১৬৬১ সালে পর্তুগালের রাজকন্যার সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহ হলে পর্তুগালের রাজা বোম্বাই দ্বীপটি দ্বিতীয় চার্লসকে উপঢৌকন দেন। দ্বিতীয় চার্লস আবার ১৬৬৮ খ্রী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বছরে দশ পাউণ্ড খাজনার শর্তে দ্বীপটি হস্তান্তর করেন। তারপর কোম্পানির গভর্নর জেরাল্ড অঙ্গিয়ার-এর (১৬৬৯-৭৭) পরিকল্পনায় বোম্বাই দ্বীপে শহরের পত্তন হয় এবং বোম্বাই শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে থাকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন বোম্বাই প্রেসিডেন্সি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬১৩ খ্রী সুরাটে কুঠি স্থাপনের অনুমতি পায় এবং সুরাটই প্রথমে ছিল কোম্পানির পশ্চিম ভারত অঞ্চলের সদর ঘাঁটি। কিন্তু মারাঠারা বারবার সুরাট আক্রমণ করতে থাকায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অধিক নিরাপদ স্থান বোম্বাই দ্বীপে সদর ঘাঁটি স্থানান্তরিত করে।

১৮১৮ সাল পর্যন্ত বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত হয় পেশোয়া, সিন্ধিয়া ও গাইকোয়াড়ের রাজ্যের অধিকৃত অংশ। ১৮১৮-৫৮ সালের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় দুটি দেশীয় রাজ্য—মাণ্ডবি (সুরাট ও সাতারা এবং সিন্ধু (১৮৪৩)। ১৮৪৮ সালে সংযুক্ত হয় বিজাপুর জেলা ও ১৮৬১ সালে সিন্ধিয়ার রাজ্যের অবশিষ্টাংশ। আরব বন্দর এডেন ১৮৩৮ খ্রী ইংরেজ অধিকারে আসার পর তাও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে সিন্ধু স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫৬ খ্রী রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে গুজরাতি ও মারাঠিভাষী অঞ্চল নিয়ে বোম্বাই রাজ্য গঠিত হয়। পরে ১৯৬০ সালে বোম্বাই রাজ্য থেকে গুজরাতকে আলাদা করা হয় এবং শুধু মারাঠিভাষী অঞ্চল নিয়ে গঠিত রাজ্যের নাম হয় মহারাষ্ট্র। বোম্বাই শহর হয় মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী। বোম্বাই শহরের সমৃদ্ধিতে পার্শি সম্প্রদায়ের অবদান সর্বাধিক। লাভজি নামের বানজি ১৭৩৬ খ্রী সুরাট থেকে বোম্বাই শহরে এসে সেখানে জাহাজের কারখানা স্থাপন করে বোম্বাইর সমৃদ্ধির সূচনা করেন। তারপর অপর পার্শি কাওয়াসজি নানাভাই দাবর ১৮৮৪ খ্রী স্থাপন করেন প্রথম কাপড়ের কল। তার পাঁচ বছরের মধ্যে সেখানে ৫০টি কাপড়কল স্থাপিত হয়।

বোম্বাই এসোসিয়েশন: কলকাতায় সংগঠিত বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অনুসরণে বোম্বাইতে ১৮৫২ খ্রী ২৬ আগস্ট 'দি বোম্বাই এসোসিয়েশন' গঠিত হয়। এই উদ্দেশ্যে ঐ দিন এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউটে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিশিষ্ট নাগরিকদের যে সভা হয় তাতে পৌরোহিত্য করেন শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর শেঠ। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অভ্যন্তরেই এই সংস্থার তৎপরতা সীমিত ছিল। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ইংরেজ সরকার ও বৃটিশ পার্লামেন্টের কাছে আবেদন-নিবেদন পেশ করা ও তার সমর্থনে নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলন চালানো বোম্বাই

এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল। শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতির জন্যও ঐ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছিল।

বৌদ্ধ সঙ্গীতি : সঙ্গীতি কথাটির অর্থ মহাসম্মেলন। ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে, বিম্বিসারের রাজত্বকালে মগধের রাজধানী রাজগৃহে বৌদ্ধরা প্রথম এক সম্মেলনে মিলিত হন ভগবান বুদ্ধের বাণী ও জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিভিন্ন তথ্য সঙ্কলনের উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহূত হয় বুদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় শত বর্ষ পরে বৈশালীতে। ঐ মহাসম্মেলনে বৌদ্ধ-তত্ত্বাচার্যগণ বুদ্ধদেবের নামে প্রচারিত নানা অলীক কাহিনী ও কুসংস্কারের নিন্দা করেন এবং বিভিন্ন বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রবিষ্ট প্রক্ষিপ্ত বিষয়গুলি সংস্কারের সঙ্কল্প নেন। তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির আহ্বায়ক ছিলেন সম্রাট অশোক। তাঁর রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে ঐ মহাসম্মেলন আহূত হয়। ঐ সম্মেলনেও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র সংস্কারের প্রস্তাব গৃহীত হয়। চতুর্থ ও শেষ বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহূত হয় কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় কাশ্মীরে (মতান্তরে জলন্ধরে)। সে সময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে 'হীনযান' ও 'মহাযান' নামক দুটি সম্প্রদায়ের যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয় তার মীমাংসাকল্পে চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহূত হয়েছিল।

ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ : ভারতকে তার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িত করার প্রতিবাদে গান্ধীজী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা করেন ১৯৪০ খ্রী ১৭ অক্টোবর। আচার্য বিনোবা ভাবে প্রথম সত্যাগ্রহীরূপে কারাবরণ করেন। দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সারা ভারতে কয়েক হাজার ব্যক্তি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ছিল প্রকৃতপক্ষে ১৯৪২ সালের ব্যাপক গণ-আন্দোলনের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি।

ব্যানোনেস : ভারতে যে পাঁচ শতাধিক রাজ্য অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়ে ইংরেজ সরকারের বশ্যতা স্বীকার করে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ছিল ব্যানোনেস। কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে অবস্থিত ঐ রাজ্যটির আয়তন ছিল ০.২৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২০৬। বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল পাঁচ-শ টাকা। বর্তমানে রাজ্যটি গুজরাতের অন্তর্ভুক্ত।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১—১৯০৭) : প্রকৃত নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন, পরে খ্রীষ্টান হন এবং সে সময় নাম পরিবর্তন করে সন্ন্যাস বেশ ধারণ করেন। তারপর কলকাতায় ও করাচিতে কিছুদিন সাংবাদিকতা করে বিলাত যান এবং সেখানে বেদান্তের ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে ব্রহ্মবান্ধব আবার হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে চরমপন্থীদের সঙ্গে যোগ দেন। সে সময় সন্ধ্যা পত্রিকা প্রকাশ করেন ও কিছুকাল পরে রাজদ্রোহের

অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। বিচারাধীন অবস্থায় ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যু হয়।

ভক্তিবাদী আন্দোলন: ভারতে মুস্লিম শাসনকালে হিন্দু ও মুস্লিম ভক্তিবাদী সাধকদের চিন্তায় সমন্বয়ে এক নতুন ভাবধারার উদ্ভব হয় যা সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে প্রভাবিত করে। ঐ ভাবধারার মূল কথা ছিল ঈশ্বরে সরল বিশ্বাস ও ভক্তি এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে একান্ত আপন জ্ঞানে ভালবাসা। খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মের ভক্ত ও ধর্মসংস্কারক প্রচারিত ঐ ভাবধারা ভক্তিবাদী আন্দোলন নামে অভিহিত।

ভক্তিবাদের মূল কথা হ'ল—ঈশ্বরকে যে নামেই ডাকা হোক তিনি এক ও অভিন্ন। ভক্তের প্রধান কর্তব্য হ'ল ঈশ্বরে নিঃশর্ত আত্মনিবেদন। ভক্তের কাছে মানুষের কোন জাতি-বিচার থাকবে না, বিনি অন্তর থেকে বিশ্বাস করবেন সকল মানুষ সমান ও ঈশ্বরের সন্তান। তবে ভক্তিবাদী আন্দোলনের মূল বনিয়াদ ছিল হিন্দুধর্ম এবং বেদ, উপনিষদ ও ভাগবত গীতার সারকথাই ভক্তিবাদীরা সরল ভাষায় প্রচার করতেন। ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রচারকরা সকলে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, কিন্তু ভক্তরা তাঁদের কাছে অকুণ্ঠ চিত্তেই অন্তরের পূজা নিবেদন করতেন। ভক্তিবাদী আন্দোলনের স্রষ্টা কয়েকজন সাধক ও ধর্মসংস্কারেকের কথা এখানে সংক্ষেপে বলা হল।

রামানুজ: দক্ষিণভারতে ১০১৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। প্রথম জীবন কাঞ্চিতে পরে ত্রিচিনাপল্লীর নিকটবর্তী শ্রীরঙ্গমে অতিবাহিত করেন। পরবর্তী কালে উত্তরভারতে তীর্থ পরিক্রমায় বার হন। তিনি ঈশ্বরকে কল্পনা করতেন প্রেম ও সৌন্দর্যের অপার অতল সাগর রূপে। তাঁর প্রচারে দক্ষিণভারতে ভক্তির প্লাবন বয়ে যায়।

রামানন্দ: দক্ষিণভারতীয় পিতা-মাতার সন্তান কিন্তু জন্ম এলাহাবাদে, শিক্ষা বারাণসীতে। তিনি হিন্দু ধর্মে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার করেন। তিনি বলেন, ভগবানের সন্তান সকল মানুষ সমান। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত মানুষরাই তাঁর প্রচারে বেশি আকৃষ্ট হন। অনেক ভিন্ন ধর্মাবলম্বীও রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন কবীর।

কবীর: কবীরের জন্মকাহিনী অস্পষ্ট। বলা হয়, তিনি এক হিন্দু বিধবার সন্তান, জন্মের পর বারাণসীতে এক পুকুরের ধারে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকলে এক মুস্লিম দম্পতি তাঁকে উদ্ধার করেন। বড় হয়ে তিনি ঐ মুস্লিম দম্পতির সন্তানরূপে তাঁদের তাঁতের কাজে হাত লাগান। ঐ সময় স্বামী রামানন্দের প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে তিনিও ভক্তিধর্মের প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করেন। কবীর ধর্মের ভেদাভেদ মানতেন না। তিনি বলতেন, ঈশ্বরকে রাম বা রহিম যাই বলা হোক, তিনি এক এবং হিন্দু-মুস্লিম সকলে তাঁর সন্তান। তাঁর প্রচারে মুগ্ধ হয়ে হাজার হাজার হিন্দু মুস্লিম তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁরা কবীরপন্থী নামে পরিচিত হন।

কবীর বলতেন, ভক্তিই সব আর ভক্তি না থাকলে উপবাস বা মালা জপা বৃথা। তাঁর রচিত ভক্তি রসাশ্রিত ভজন ও দোঁহা আজও ভক্তের কণ্ঠে কণ্ঠে প্রচারিত হয়।

চৈতন্যদেব: নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ পরিবারের ১৪৮৫ খ্রী চৈতন্যদেবের জন্ম। তিনি ছিলেন ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে গভীর ভক্তি ও প্রেমধর্ম প্রচারের আকুলতা তাঁকে মাত্র ২৪ বছর বয়সে সংসারত্যাগে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর প্রেমগানে পূর্বভারতে অভূতপূর্ব ভক্তির প্লাবন আসে। অগণিত হিন্দু মুস্লিম শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। ১৫৩৩ সালে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে পুরীতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের দেহান্ত ঘটে।

টুকারাম: মহারাষ্ট্রে, পুনের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের দেহুগ্রামে টুকারামের জন্ম। তিনি ২৯ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন ও ভজন-কীর্ত্তনের সাহায্যে তাঁর প্রেমধর্ম প্রচার করেন। তাঁর মারাঠীভাষায় রচিত গানগুলি অভঙ্গ নামে পরিচিত। তিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর কল্পনায় সে ঈশ্বর দয়ালু, প্রেমময় ও সকলের ত্রাতা।

গুরু নানক: লাহোরের তালবন্দী গ্রামে ১৪৬৯ সালে গুরু নানকদেবের জন্ম। তিনি সংসারী হলেও ঈশ্বর বন্দনাই তাঁর একমাত্র কাজ হয়। তিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন এবং জাতি-ধর্মের বিভেদ মানতেন না। অন্তরের মহত্ত্ব ও পবিত্রজীবন ঈশ্বরলাভের পথ—এই ছিল তাঁর ধর্মের মূল কথা। তিনিও অনেক গীত রচনা করেন যা তাঁর অনুগামীদের কাছে ঈশ্বর স্তোত্র স্বরূপ। গুরুনানকের অনুগামীরা শিখ নামে অভিহিত যার অর্থ হল শিষ্য। ১৫৩৯খ্রী গুরুনানকের দেহান্ত ঘটে।

মীরাবাঈ: রাজপুত রমণী ও মেবারের রাজপরিবারের বধূ। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে তিনি রাজ ঐশ্বর্য ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী হন। তাঁর শেষ জীবন মথুরা ও বৃন্দাবনে অতিবাহিত হয়। ১৫৪৬ খ্রী মীরাবাঈর মৃত্যু হয়। তার ব্রজভাষা ও রাজস্থানী ভাষায় রচিত ভজন গান আজও ভারতের সকল প্রদেশে শ্রদ্ধার সঙ্গে গীত হয়।

ভগৎসিং: শিখ ধর্মাবলম্বী পাঞ্জাবি, ভারতের চরমপন্থী জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ও শহিদ। লাহোর ষড়যন্ত্র ও কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন। লালা লাজপৎ রায়ের উপর জঘন্য পুলিশী আক্রমণের প্রতি-শোধ নিতে একজন কর্মচারীকে হত্যা করেন এবং সেন্ট্রাল এসেমব্লী ভবনে বোমা বর্ষণ করে ইংরেজ শাসনের বর্বরতার প্রতিবাদ জানান। বিচারে মৃত্যুদণ্ড হয় ও বীরের মৃত্যু বরণ করেন (১৯৩১খ্রী)।

ভগবান দাস, রাজা: অম্বররাজ বিহারী মল্লর পুত্র। ১৫৭২ খ্রী পিতা-পুত্র একসঙ্গে সম্রাট আকবরের সার্ব-ভৌমত্ব স্বীকার করেন। তারপর সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের পুরস্কার-স্বরূপ পাঁচ হাজারি মনসবদারি লাভ করেন। ১৫৮৫ খ্রী তার কন্যার সঙ্গে সম্রাট আকবরের পুত্র যুবরাজ সেলিমের (পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর) বিবাহ হয়। জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরু ঐ বিবাহের সন্তান।

ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১): প্রকৃত নাম মার্গারেট নোব্‌ল্‌। ১৮৯৬ খ্রী স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ভারতে আসেন ও ভারতের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ক্রমে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হন ও অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল প্রমুখ জাতীয় নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ভগিনী নিবেদিতাকে 'লোকমাতা' নামে অভিহিত করেন। সমাজ সংস্কারে ও নারীশিক্ষা বিস্তারে ভগিনী নিবেদিতা বিশেষ ভূমিকা নেন।

ভবভূতি: সপ্তম শতাব্দীর লোক, বিদর্ভে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। সংস্কৃত ভাষায় নাটক রচনার জন্য খ্যাত। কনৌজের রাজা যশোবর্মনের সভাকবি ছিলেন। তাঁর রচিত তিনটি নাটক—মহাবীর চরিত, মালতী মাধব ও উত্তররাম চরিত।

ভাইসরয়: সিপাহী বিদ্রোহের পর, ১৮৫৮ খ্রী নভেম্বর মাসে, বৃটিশ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণাবলে ভারতের শাসন দায়িত্ব ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে গ্রহণ করে বৃটিশ সরকারের উপর ন্যস্ত করেন। তখন থেকে ভারতে ইংরেজ সরকারের সর্বোচ্চ শাসক গভর্নর-জেনারেল বৃটেনের রাজ-প্রতিনিধি ভাইসরয়রূপে ভারতের শাসনকার্য চালাতে থাকেন। লর্ড ক্যানিং ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয়।

ভান্সিটার্ট: লর্ড ক্লাইভের প্রথম দফা কার্যকাল শেষ হওয়ার পর ভান্সিটার্ট ১৭৬০ খ্রী বাঙলার গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি ১৭৬৪ খ্রী পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। ভান্সিটার্টের শাসনকালে মিরজাফরকে ইংরেজ বিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গদিচ্যুত করে মিরকাশিমকে নবাব করা হয়। পরে মিরকাশিমের সঙ্গেও ভান্সিটার্টের বারবার বিরোধ ও সংঘর্ষ হয় এবং শেষ পর্যন্ত মিরকাশিমকেও ১৭৬৪ খ্রী গদিচ্যুত করা হয়। ভান্সিটার্টের কার্যকাল ঐ বছর শেষ হয়।

ভারত: সুপ্রাচীনকাল থেকেই পাহাড় ও সাগরে ঘেরা এই উপমহাদেশটির নাম ভারতবর্ষ। বর্ষ কথাটির অর্থ উপমহাদেশ। বিষ্ণুপুরাণে আছে—সমুদ্রের উত্তরে ও হিমাবৃত পর্বতমালার দক্ষিণে যে বিশাল ভূখণ্ড, তার নাম ভারত। আবহাওয়া, ভূমি, জাতি, ধর্ম, ও ভাষার নানা বৈচিত্র্যের জন্য ভারতকে অতীতকাল থেকেই একটি দেশ না বলে উপমহাদেশ বলা হয়। এই কারণেই সমগ্র ভারতের অধিপতিকে রাজা না বলে একরাট বা সম্রাট বলার রীতি প্রচলিত হয়। যেমন, সম্রাট অশোক, সম্রাট আকবর প্রভৃতি।

সিন্ধু নদীর নাম থেকে হিন্দ এবং হিন্দ থেকে হিন্দু, হিন্দুস্থান, ইণ্ডিয়া প্রভৃতি নামের উৎপত্তির কাহিনী সুবিদিত। মুস্লিমযুগে ভারত হিন্দুস্থান ও ইংরেজ শাসনকালে ইণ্ডিয়া নামে পরিচিত হলেও ভারত নামটি কোন সময়েই অপ্রচলিত হয় না। স্বাধীনতা লাভের পর এই দেশ সরকারিভাবে ভারত ও ইণ্ডিয়া উভয় নামেই আখ্যায়িত হয়েছে। ইণ্ডিয়া অর্থাৎ ভারত India that is Bharat.

ভারত শাসন আইন : ভারতের শাসন ব্যবস্থায় সংস্কারকল্পে ১৯৩৫ খ্রী বৃটিশ সরকার যে সংবিধান বিধির প্রস্তাব করেন এবং যার প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের অংশটুকু ১৯৩৭ খ্রী ১লা এপ্রিল বলবৎ হয় সেই ভারত শাসন সংস্কার আইন Government of India Act. 1935 বা ভারত শাসন আইন নামে অভিহিত।

ভারত শাসন আইন অনুসারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার কথা ছিল। ঐ যুক্তরাষ্ট্রে সমগ্র বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাটি খুব স্পষ্ট না হওয়ায় এবং কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় গভর্নর-জেনারেলের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা ন্যস্ত থাকায় ভারতের নেতৃবৃন্দ ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটুকু গ্রহণে আপত্তি জানান। কিন্তু প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রস্তাব থাকায় ঐ অংশটুকু গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। সে কারণে ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ খ্রী ভারতের ১১টি বৃটিশ শাসিত প্রদেশে নির্বাচন হয় এবং নির্বাচনের পর সকল প্রদেশে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় শাসন ১৯১৯ সালের মন্টফোর্ড শাসন সংস্কার অনুসারে চলতে থাকে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলতে থাকে।

ভারত শাসন আইনে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয় তাতে চারিটি বিষয় সম্পূর্ণরূপে গভর্নর-জেনারেলের এক্তিয়ারভুক্ত থাকে। সেগুলি ছিল—প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, উপজাতীয় সম্বন্ধ ও খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়। ঐ বিষয়গুলি প্রশাসনের ব্যাপারে গভর্নর-জেনারেলের কেন্দ্রীয় আইন সভার কাছে কোন রকম জবাবদিহি করার দায়িত্ব ছিল না। অপর আটটি বিষয়ের শাসন দায়িত্ব কেন্দ্রীয় আইন সভার কাছে দায়ী মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু প্রয়োজনবোধে ঐ বিষয়গুলির প্রশাসনেও গভর্নর-জেনারেলকে তাঁর বিবেচনা (discretion) ও ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি (individual judgment) অনুসারে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন দায়িত্ব এইভাবে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় তা জাতীয় নেতৃবৃন্দের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়।

ভারত সচিব : ১৮৫৮ খ্রী বৃটিশ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাবলে ভারতের শাসন দায়িত্ব বৃটিশ সরকার গ্রহণ করার পর সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া পদের সৃষ্টি হয়। ঐ পদাধিকারী ব্যক্তি এদেশে ভারত সচিব নামে অভিহিত হন। তিনি বৃটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন এবং বৃটিশ সরকারের নীতি অনুসারে ভারত শাসনের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে বৃটিশ পার্লামেণ্টকে অবহিত রাখা তাঁর দায়িত্ব ছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর স্বভাবতই ঐ পদের অবসান ঘটে। শেষ ভারত সচিব মিঃ (পরে লর্ড) পেথিক লরেন্স ভারতের স্বাধীনতার

দাবির প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে যেসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় তাতে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল। তিনি ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যরূপে ভারতে আসেন। অন্যান্য ভারত সচিবদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লর্ড মর্লি, লর্ড মণ্টেগু, স্যার সামুয়েল হোর, জন এমেরি প্রভৃতি।

ভাস্কর পণ্ডিত: নবাব আলিবর্দি খাঁর শাসনকালে বর্গীদের নেতারূপে বাংলায় আসেন। বর্গীহাঙ্গামা দমনে বদ্ধপরিকর নবাব আলিবর্দি ভাস্কর পণ্ডিতকে কৌশলে বন্দী করেন। বন্দী অবস্থায় বহু অনুচরসহ ভাস্কর পণ্ডিত নিহত হন।

ভাস্কর বর্মা: সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমকালীন, কামরূপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি। রাজত্বকাল ৬০৬-৪৭ খ্রী। গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধনের সাহায্যে তিনি উত্তরবঙ্গের কিছু অংশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। চীনা পরিব্রাজক হিউএন-সাং ভাস্কর বর্মার রাজত্বকালে কামরূপ পরিদর্শন করেন। ভাস্কর বর্মা পরাক্রম-শালী ও সুশাসক ছিলেন।

ভাস্কো ডা গামা (১৪৬৯-১৫২৪): পর্তুগীজ নাবিক। ইউরোপ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে প্রথম জলপথে ভারতে আসেন। ১৪৯৮ খ্রী ২০ মে তিনি দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছান। কালিকটের রাজা জামোরিন সেবার তাঁকে কোন বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন না। ১৫০২ খ্রী ভাস্কো ডা গামা দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন এবং কালিকট ও কোচিনের রাজার বিবাদের সুযোগ নিয়ে ভারতে প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন। কোচিন ও কানানোর এই দুই স্থানে পর্তুগীজ বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। কোচিন শহরে পর্তুগীজরা দুর্গ নির্মাণ করে ও নিকটবর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে।

ভীটা: এলাহাবাদের নিকটবর্তী একটি স্থান। প্রত্নতত্ত্ববিদ জন মার্শালের নেতৃত্বে এখানে উৎখনন কার্য চালিয়ে মৌর্য যুগের বহু স্থাপত্যের জীর্ণোদ্ধার করা হয়।

ভূপাল: প্রাক্তন ভূপাল রাজ্যের ও বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী। ১৭২৩ খ্রী দোস্ত মহম্মদ খাঁ নামে এক পরাক্রমশালী আফগান মোগলসাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ার সুযোগ নিয়ে স্বাধীন ভূপাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজ শাসিত ভারতে ভূপাল ছিল, হায়দরাবাদের পরেই, মুস্লিম শাসনাধীন দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য। ১৮১৭ খ্রী অধীনতা মূলক মিত্রতা চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়ে ভূপাল ইংরেজ সরকারের আশ্রিত করদ রাজ্যে পরিণত হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৯-১৯২৪): কলকাতা হাইকোর্টের এটর্নিরূপে কর্মজীবন শুরু করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯১৪ খ্রী মাদ্রাজে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হন। পরের বছর কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য হন। রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী ছিলেন।

ভেরেলস্ট : লর্ড ক্লাইভের দ্বিতীয় দফা কার্যকাল শেষ হলে ভেরেলস্ট বাঙলার গর্ভনর হন। ১৭৬৯ খ্রী পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন।

ভৌমকর বংশ : ওড়িশার একটি রাজবংশ। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভৌমকর বংশীয় রাজাদের নেতৃত্বে বঙ্গদেশের মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অংশ থেকে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সোনপুর সম্বলপুর অঞ্চলের সোম বংশীয় রাজা তৃতীয় মহাশিবগুপ্ত যযাতির আক্রমণে ভৌমকর রাজ্য স্বাধীনতা হারায়।

মগধ : বিভিন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রাচীন ভারতের (খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর সূচনায়) যে ষোলটি মহাজনপদের (রাজ্য) উল্লেখ আছে মগধ তার অন্যতম। মগধ ছিল বর্তমান বিহারের পাটনা ও গয়া জেলা নিয়ে গঠিত। মগধের প্রথম রাজধানী ছিল বর্তমান রাজগিরের নিকটবর্তী গিরিব্রজ। তারপর রাজধানী স্থানান্তরিত হয় প্রথমে রাজগৃহে, পরে পাটলিপুত্র নগরে। নৃপতি বিম্বিসারের রাজত্বকালে মগধ একটি বিশাল শক্তিশালী রাজ্য হয়। বিম্বিসার ছিলেন হর্ষক বংশীয়। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন মগধের রাজা ছিলেন নন্দ বংশীয় ধননন্দ। সে সময় মগধ যে অতি শক্তিশালী রাজ্য ছিল তা গ্রীক ঐতিহাসিকদের রচনাতেই উল্লেখিত আছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে মগধ রাজ্যের প্রচণ্ড সামরিক বলের কথা জেনেই গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার তাঁর ক্লান্ত সৈন্য বাহিনী নিয়ে আর অগ্রসর না হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মৌর্যসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মগধরাজ ধননন্দনকে উৎখাত করে, সম্ভবত ৩২৩ খ্রী-পূ, মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। মগধ বিশাল মৌর্যসাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়।

মঙ্গল পাণ্ডে : সিপাহি বিদ্রোহের প্রথম শহিদ। ১৮৫৩ খ্রী ২৯ মার্চ বাংলার ব্যারাকপুর সৈন্য শিবিরে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেন সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডে। বিদ্রোহের অপরাধে মঙ্গল পাণ্ডে ও তাঁর সঙ্গী ঈশ্বরী পাণ্ডে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

মণিপুর : ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত একটি রাজ্য। আয়তন ২২,৩৫৬ বর্গ কিমি; লোকসংখ্যা ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার। রাজধানী ইম্ফল। মণিপুর ছয়টি জেলায় বিভক্ত। বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ৬০। মণিপুরের প্রায় দু হাজার বছরের ইতিহাস মেলে। ৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই পর্বতময় স্থানটি সাতটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মণিপুর একটি রাজ্যে পরিণত হয় এবং মণিপুরের সেই আয়তন আজও অক্ষুন্ন। ভারত স্বাধীন হবার পর ১৯৪৯ সালে মণিপুর ভারতের অংশ হয়। ১৯৫৬ সালে মণিপুর কেন্দ্র শাসিত রাজ্যের মর্যাদা পায়। ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি থেকে মণিপুর ভারতের একটি পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন রাজ্য।

মৎস্য খ্রী-পূ ৫ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে যে ষোলটি মহাজনপদ

ছিল মৎস্য তার অন্যতম। মৎস্য রাজ্যটি ছিল বর্তমান রাজস্থান রাজ্যের জয়পুর অঞ্চলে। রাজধানী ছিল বিরাটনগর।

মদ্র: মহাভারত ও বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লিখিত রাজ্য। খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মদ্র সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। মদ্র ছিল মধ্য পাঞ্জাবে অবস্থিত। মগধের রাজা বিম্বিসারের এক পত্নী ছিলেন মদ্রদেশের রাজকন্যা।

মধ্য প্রদেশ: আয়তনে ভারতের বৃহত্তম রাজ্য মধ্যপ্রদেশ ভারতের মধ্য-স্থলে অবস্থিত। আয়তন ৪,৪২,৮৪১ বর্গ কিমি, লোকসংখ্যা ৪ কোটি ২০ লক্ষ। ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর মধ্য-প্রদেশ রাজ্য যখন পুনর্গঠিত হয় তখন প্রাক্তন সেন্ট্রাল প্রভিন্সের ১৪টি মহাকোশল জেলা, মধ্যভারত, বিন্ধ্য-প্রদেশ ও ভূপাল রাজ্য মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। মধ্যপ্রদেশ ৪৫টি জেলায় বিভক্ত। বস্তার জেলার আয়তন (৩৯,০৬০ বর্গ কিমি) কেরল রাজ্যের চেয়ে বেশি। দেশের দুই-পঞ্চমাংশ বনভূমি গোয়ালিয়রের দুর্গ, রাজা মানসিং-এর প্রাসাদ, তানসেনের কবর, খাজুরাহো মন্দিরের শিল্পকলা, সাঁচি স্তূপ এই রাজ্যের বিশিষ্ট প্রত্নসম্পদ।

মণ্ট ফোর্ড শাসন সংস্কার: প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে জাতীয়তাবাদী ভারতের স্বরাজ্যের দাবি কিছুটা পূরণের উদ্দেশ্যে তৎকালীন ভারত সচিব মণ্টেগু ও ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের মিলিত উদ্যোগে ১৯১৯খ্রী যে শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হয় তা Government of India Act of 1919 নামে অভিহিত। তবে ভারত সচিব মণ্টেগু ও বড়লাট চেমসফোর্ডের মিলিত উদ্যোগে ঐ আইন রচিত হয় বলে তা মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার, সংক্ষেপে মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার নামেই অধিক পরিচিত। ভারত সচিব মণ্টেগু ১৯১৭ খ্রী নভেম্বর মাসে ভারতে আসেন এবং তাঁর পরিকল্পিত শাসন সংস্কারের খসড়া নিয়ে বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করেন। তারপর উভয়ের আলোচনার ফলে প্রস্তুত মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। আর সেই রিপোর্ট অনুসারে হয় ১৯১৯ খ্রী ভারত শাসন সংস্কার আইন।

ঐ আইন অনুসারে বৃটিশ ভারতে গভর্নর-জেনারেল এবং কাউনসিল অফ স্টেট ও লেজিসলেটিভ এসেমব্লী—এই দুই সভা নিয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠন করা হয়। কাউন্সিল অফ-স্টেটের ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ২৪ জন মনোনীত ও ৩৬ জন নির্বাচিত; এবং লেজিসলেটিভ এসেমব্লীর ১৪৫ জন সদস্যের মধ্যে ১০৫ জন নির্বাচিত, বাকী সকলে মনোনীত। অর্ডিনান্সের সাহায্যে আইন প্রণয়নের বিশেষ অধিকার গভর্নর-জেনারেলের উপর ন্যস্ত থাকে। মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্টে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সমালোচনা করা হলেও মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারে তা বহাল থাকে। বড়লাটের শাসন পরিষদের সমালোচনার অধিকার বা অর্থবিষয়ে কিছুটা নিয়ন্ত্রণের অধিকার কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দেওয়া হয়।

কিন্তু ভোটাধিক্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সিদ্ধান্ত বাতিলের অধিকার কেন্দ্রীয় আইনসভার থাকে না।

প্রা দে শি ক আইনসভাগুলির অন্তত ৭০ শতাংশ সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকে এবং বলা হয় যে সভার মোট সদস্যের ২০ শতাংশের বেশি সদস্য সরকারি কর্মচারী হতে পারবেন না। প্রাদেশিক সরকারের কয়েকটি বিভাগকে সংরক্ষিত ও কয়েকটি বিভাগকে আইনসভার কাছে দায়ী করা হয়। এইভাবে প্রদেশগুলিতে যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তার নাম হয় ডায়ার্কি বা দ্বৈত শাসন।

মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারেই প্রথম কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা-গুলিতে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা স্বীকৃত হয় এবং প্রাদেশিক আইনসভার কাছে শাসন বিভাগের কয়েকটি দপ্তরকে দায়ী করা হয়। এ কারণে নরমপন্থী নেতারা মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারকে স্বা গ ত জানান। কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃক ঐ শাসন সংস্কার বর্জিত হয় এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বরাজের দাবীতে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। পরে অবশ্য ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে গঠিত স্বরাজ্য দল আইনসভায় প্রবেশ করে শাসন ব্যবস্থা অচল করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এ ব্যাপারে দেশবন্ধুর প্রধান সহকারী হন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু।

স্বরাজ্য দলের প্রবল বা ধা য় বাঙলা ও মধ্যপ্রদেশে কোন স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভব হয় না এবং ভারতের জন্য নতুন সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে গোল টেবিল বৈঠক আহ্বানের দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভায় পণ্ডিত মতিলাল নেহরু যে প্রস্তাব আনেন, ১৯২৪ খ্রী ১৮ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে তা গৃহীত হয়। স্বরাজ্য দলের প্রবল বিরোধিতার মুখে বৃটিশ সরকার ১৯২৭ খ্রী যে সাইমন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তাতেই কার্যত মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারের ব্যর্থতা স্বীকার করে নেওয়া হয়।

মভলঙ্কর, জি ভি (১৮৮৮-১৯৫২): আইন ব্যবসায়ীরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯২১-২৩ সালে গুজরাত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে যোগ-দানের জন্য বহুবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৭-৪৬ খ্রী বোম্বাই প্রাদেশিক ব্যব-স্থাপক সভার স্পীকার ছিলেন। স্বাধীন ভারতে লোকসভায় প্রথম অধ্যক্ষরূপে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

মমতাজ মহল : মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরের প্রধানা মহিষী নূরজাহা-নের ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা। নূর-জাহান সম্রাট জাহাঙ্গিরের দরবারে স্বীয় প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে জাহা-ঙ্গিরের তৃতীয় পুত্র খুররমের (পরবর্তী-কালে সম্রাট শাহজাহান) সঙ্গে ভ্রাতু-স্পুত্রী মমতাজের বিবাহ দেন। মম-তাজ ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের প্রধানা ও প্রিয়তমা মহিষী। দারা, সুজা, ঔরংজেব ও মুরাদ তাঁর পুত্র। ত্রয়োদশ সন্তানের জননী মমতাজ মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে মারা যান।

সম্রাট শাহজাহান তাঁর প্রিয়তমা মহিষীর স্মৃতি উজ্জ্বল রাখার উদ্দেশ্যে মমতাজের সমাধির উপর বিশ্বখ্যাত মর্মরসৌধ তাজমহল নির্মাণ করেন। সম্রাট শাহজাহানের মৃতদেহও পরবর্তী-কালে তাঁর পাশে সমাহিত করা হয়।

ময়রা (হেস্টিংস), লর্ড : লর্ড ময়রা ১৮১৩-২৩ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন। শাসন দায়িত্ব গ্রহণের পরেই লর্ড ময়রা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে তৎপর হন। ১৮১৪ খ্রী নেপালের সঙ্গে তাঁর যে যুদ্ধ হয় তা ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ বা গোর্খা যুদ্ধ নামে অভিহিত। ঐ যুদ্ধ ১৮১৬ খ্রী পর্যন্ত চলে এবং নেপালের পরাজয়ের পর সগৌলির সন্ধি দ্বারা শান্তি স্থাপিত হয়। সন্ধির শর্ত অনুসারে আলমোড়া, নৈনিতাল, সিমলা, মুসৌরি প্রভৃতি স্থানগুলি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে একজন বৃটিশ প্রতিনিধি থাকার ব্যবস্থা হয়। সিকিমের সঙ্গেও ইংরেজ সরকারের মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং সেই চুক্তিমতো নেপালের একটি অংশ সিকিমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

রাজপুতনার ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির উপর মারাঠাদের প্রাধান্য লোপের উদ্দেশ্যে লর্ড ময়রা ১৮১৭ খ্রী সব কটি রাজপুত রাজ্যের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি সম্পাদন করেন। লর্ড ময়রার অন্যতম কীর্তি পিণ্ডারী দমন। ১৮২৩ খ্রী লর্ড ময়রার কার্যকাল যখন শেষ হয় তখন কুমারিকা অন্তরীপ থেকে সমগ্র দাক্ষিণাত্যসহ উত্তরে শতদ্রু নদী পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। একমাত্র রণজিৎ সিংহের শিখরাজ্য ছাড়া কোন শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য সেদিন ভারতে ছিল না। শিখরাজ্য তখন উত্তরে পেশোয়ার ও কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে শতদ্রু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। লর্ড ময়রার শাসনকালে যে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ হয় তাতে মারাঠা শক্তির সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটে।

ভারতে গভর্নর-জেনারেল থাকা-কালেই, ১৮১৭খ্রী, লর্ড ময়রা নেপাল যুদ্ধে সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ মার্কুইস অফ হেস্টিংস খেতাব লাভ করেন। তিনি বৃটিশ সম্রাট চতুর্থ জর্জের নিকট বন্ধু ছিলেন এবং মুখ্যত সেই কারণেই তিনি ভারতের সর্বোচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। উনষাট বছর বয়সে তিনি গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন, কিন্তু ঐ বয়সেও লর্ড ময়রা পরাক্রমে ও প্রশাসনে সমান পারদর্শিতা দেখান। তাঁর দক্ষতার জন্যই তিনি প্রথম দফার পাঁচ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও আবার পাঁচ বছরের জন্য গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন।

মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কার : ভারত সচিব জন মর্লি ও ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোর দ্বৈতউদ্যোগে, ভারতে ইংরেজ সরকারের শাসন ব্যবস্থার সংস্কারকল্পে ১৯০৯ খ্রী যে আইন প্রবর্তিত হয় তার সরকারি নাম 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এক্ট', কিন্তু ঐ আইন উদ্যোক্তাদ্বয়ের নামানুসারে মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কার (১৯০৯) নামেই সমধিক পরিচিত।

উল্লেখিত আইন বলবৎ করার আগে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে

১৯০৭ সালে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে দুজন ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করা হয় (ইণ্ডিয়া কাউন্সিল-দ্র) এবং ১৯০৯ সালে শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে বড়লাটের শাসন পরিষদে আইন মন্ত্রীরূপে (ল মেম্বার) গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভা ২৭ জন নির্বাচিত ও ৩৩ জন মনোনীত মোট ৬০ জন সদস্য নিয়ে গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য বলা হয় যে ৩৩ জন মনোনীত সদস্যের মধ্যে সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা ২৮ জনের বেশি হতে পারবে না। যার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে ৬০ জনের অধিকাংশ হবেন বেসরকারি সদস্য। বিভিন্ন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাতেও অনুরূপভাবে বেসরকারি সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যবস্থা করা হয়। শুধুমাত্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বীকৃত হয়। অত্যন্ত সীমিত পরিমাণে হলেও নির্বাচিত সদস্য নিয়ে আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কারেই প্রথম করা হয়। কিন্তু ঐ সংস্কারেই সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব থাকে এবং সে কারণে ভারতের হিন্দু-মুস্লিম নেতৃবৃন্দ সেদিন সমবেতভাবে ঐ শাসন সংস্কারের নিন্দা করেন।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১৯০৯ সালেই ঐ শাসন সংস্কারের নিন্দা করা হয় এবং এক প্রস্তাবে "মহামান্য বৃটিশ সম্রাটের ভারতীয় প্রজাদের" মুস্লিম ও অমুস্লিম সংজ্ঞায় বিভক্ত করাকে অন্যায় বিদ্বেষপ্রসূত ও অপমানকর বলে মন্তব্য করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, পূর্ববঙ্গ ও আসাম (বঙ্গদেশ তখনও লর্ড কার্জনের ব্যবস্থামত দ্বিখণ্ডিত) এবং বর্মার তিনটি প্রেসিডেন্সির (বেঙ্গল, বোম্বাই, মাদ্রাজ) অনুরূপ লে: গভর্নরের কাজে সাহায্য করার জন্য শাসন পরিষদ (Executive Council) গঠনের দাবি জানানো হয়। পরের বছর ১৯১০ সালে এলাহাবাদে কংগ্রেসের ২৫তম অধিবেশনে মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কারে আইনসভায় সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করেন মহম্মদআলি জিন্না এবং তার সমর্থনে জোরালো ভাষণ দেন বিহারের জননেতা মৌলভি মজরুল হক।

মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কার স্বল্পস্থায়ী ছিল। ১৯১৯ সালে মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হয় এবং তার আগে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকেই স্বীকার করা হয় যে, মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কারের বিধি-ব্যবস্থা ভারতীয়দের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের পক্ষে খুবই সঙ্কীর্ণ ছিল।

মরুমক্কটায়ম : দক্ষিণ ভারতে, বিশেষত কেরলের চের রাজ্যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রথম কন্যার সূত্রে রাজ্য তথা বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণের প্রথা প্রবর্তিত হয়। ঐ প্রথার নাম ছিল মরুমক্কটায়ম। কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে সম্প্রতিকালেও কন্যার সূত্রে উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত ছিল।

মল্ল : খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে যে ১৬টি মহাজনপদ (রাজ্য) ছিল, মল্ল তারই অন্যতম। বুদ্ধপূর্ব

যুগে মল্ল ছিল রাজতন্ত্র, পরে বুদ্ধদেবের সমকালে সেটি হয় অভিজাত তন্ত্র। উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলা নিয়ে সম্ভবত মল্ল রাজ্যটি গঠিত ছিল। রাজধানী ছিল কুশীনগর।

মহম্মদ ঘুরি: ঘুরি ছিল আফগানিস্তানের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। তার শাসক গিয়াসুদ্দিনের ছোট ভাই সাহাবুদ্দিন ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরি নামে অধিক খ্যাত। গিয়াসুদ্দিন ১১৭৩ খ্রী গজনি অধিকার করে তাঁর ছোট ভাই মহম্মদ ঘুরিকে সেখানকার শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও রণকুশলী মহম্মদ ঘুরি শুধু গজনি রাজ্যে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। তাই ১১৭৫ খ্রী তিনি রাজ্য জয়ের অভিযান শুরু করেন এবং ১২০৬ খ্রী মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকেন।

ঘুরি ১১৭৫-৮৬ খ্রী মধ্যে পাঞ্জাব ও সিন্ধু জয় করেন, ১১৭৯ খ্রী খুসরো মালিককে পরাজিত করে ঘুরি পেশোয়ার অধিকার করেন। কিন্তু ১১৯১ খ্রী তরাইনের প্রথম যুদ্ধে ঘুরি দিল্লী ও আজমিরের রাজপুত নৃপতি পৃথ্বীরাজের কাছে পরাজিত হন। ঐ পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পরের বছর ১১৯২ খ্রী মহম্মদ ঘুরি বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আবার তরাইনের রণক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ছোট-বড় অনেক রাজপুত-নৃপতি সে যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের সহায়তায় এগিয়ে এলেও কনৌজের রাজা জয়চাঁদ নীরব থাকেন। পৃথ্বীরাজ বীর বিক্রমে সংগ্রাম করেন কিন্তু মহম্মদ ঘুরির রণকুশলতায় শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। পৃথ্বীরাজের ভাই গোবিন্দরাজ যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ হারান, পৃথ্বীরাজ বন্দী হয়ে পরে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরি জয়ী হলে দিল্লী ও আজমীর মুস্লিম অধিকারভুক্ত হয়।

গজনি প্রত্যাবর্তনের আগে মহম্মদ ঘুরি তাঁর ক্রীতদাস ও পরে বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতবুদ্দিন আইবককে ভারতে অধিকৃত অঞ্চলগুলির শাসন দায়িত্ব দিয়ে যান। কুতবের রাজধানী হয় দিল্লী এবং এইভাবে দিল্লীতে সুলতানি শাসনের সূচনা হয়। দু'বছর পরে মহম্মদ ঘুরি আবার ভারত অভিযানে আসেন ও ১১৯৪ খ্রী কনৌজরাজ জয়চাঁদকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। ঐ যুদ্ধে জয়ের ফলে মহম্মদ ঘুরির রাজ্য কনৌজ ও বারাণসী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। কনৌজের যুদ্ধে জয়লাভের পর মহম্মদ ঘুরি আবার গজনি প্রত্যাবর্তন করেন ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন স্থান জয়ে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে উত্তরভারতের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১২০৬ খ্রী লাহোরে অনুরূপ একটি বিদ্রোহ দমন করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে মহম্মদ ঘুরি শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে নিহত হন। মহম্মদের কোন পুত্র না থাকায় কুতবুদ্দিন আইবক স্বাধীন সুলতানরূপে ভারতে মহম্মদ ঘুরির রাজ্য শাসন করতে থাকেন। মহম্মদ ঘুরিই ভারতে মুস্লিম রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

মহম্মদ বিন কাশিম: ৭১২ খ্রী ভারতের সিন্ধুপ্রদেশে যে আরব অভিযান পরিচালিত হয় তার নেতা ছিলেন

বঙ্গদেশে বিদ্রোহ দমন করে গিয়াসুদ্দিন যখন দিল্লী প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য দিল্লীর প্রবেশ পথে একটি তোরণ নির্মাণ করা হয়। জুনা খাঁর পরিকল্পনা মতো তোরণটি নির্মিত হয়। কিন্তু গিয়াসুদ্দিন ঐ তোরণের নীচে আসা মাত্র তোরণটি ভেঙে পড়ে এবং সেই আঘাতেই সুলতান গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যু হয়। এতে অনেকে সন্দেহ করেন যে ঐ মারাত্মক দুর্ঘটনার পিছনে জুনা খাঁর ষড়যন্ত্র ছিল।

সুলতান হওয়ার পরেই, ১৩২৬ খ্রী, মহম্মদ বিন তোগলক গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলের রাজস্ব অত্যধিক বৃদ্ধি করেন। সেখানকার মাটি খুব উর্বর ও শস্যপ্রসূ ছিল। কিন্তু সুলতান রাজস্ব বৃদ্ধি করেন সেখানকার উদ্ধত প্রজাদের তাঁবে আনার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত দোয়াব অঞ্চলে সেবার ফসল ভাল হয় না। তবু বর্ধিতহারে কর আদায়ের জন্য সরকারের লোকেরা প্রজাদের উপর জুলুম শুরু করে, বনে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েও প্রজাদের পক্ষে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন হয়। কৃষকরা দলে দলে দেশত্যাগ করতে থাকে, চাষবাস বন্ধ হয়। দেশের সর্বাধিক শস্যসমৃদ্ধ অঞ্চল পরিত্যক্ত শ্মশানে পরিণত হয়। পরে অবশ্য কূপ খনন করে ও সেচ ব্যবস্থা প্রসারিত করে অবস্থার উন্নতির চেষ্টা হয়, কিন্তু সে কাজ হয় বড় বেশি বিলম্বে।

সুলতান সেই বছরেই (১৩২৬-২৭) রাজ্যের রাজধানী দিল্লী থেকে দাক্ষিণাত্যে দেবগিরিতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। তখন দেবগিরির নাম হয় দৌলতাবাদ। দাক্ষিণাত্যে অধিকৃত অঞ্চলগুলি সুশাসনের জন্য ও উত্তরে মোঙ্গলদের আক্রমণ থেকে রাজধানী নিরাপদ করার জন্য সুলতান দাক্ষিণাত্যে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। সেদিক থেকে পরিকল্পনাটি দূষণীয় ছিল না। কিন্তু তিনি এক বিপর্যয়কর ভুল করেন, রাজধানী থেকে সব দপ্তর সরানোর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর সব লোককেও জোর করে দৌলতাবাদে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে। দৌলতাবাদে অনেক প্রাসাদ নির্মিত হয়, দিল্লী থেকে দৌলতাবাদ সড়ক নির্মাণের কাজও শেষ হয়। কিন্তু দিল্লীর লোকেরা দৌলতাবাদে যেতে না চাইলে সুলতান ধৈর্য হারান ও সকলকে যেতে বাধ্য করেন। অন্ধ খঞ্জ কাউকে রেহাই দেওয়া হয়না। ফলে পথে অগণিত লোকের মৃত্যু হয় এবং জনগণের বিক্ষোভ চরমে ওঠে। ওদিকে উত্তরভারতে নানা স্থানে বিদ্রোহ শুরু হয়, এবং মোঙ্গলদের হানাও শুরু হয়। তখন আবার সুলতানের ধারণা হয়, তাঁর রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্তে ভুল ছিল এবং সে কারণে মুহূর্তের মধ্যে আবার তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেন। ফলে প্রজাপুঞ্জের আবার লাঞ্ছনা শুরু হয়। দিল্লী পুনরায় রাজধানী হয় ও দৌলতাবাদ শূন্য পুরীতে পরিণত হয়।

সুলতান ১৩৩০ খ্রী তামার প্রতীক মুদ্রা প্রচলনের সিদ্ধান্ত নেন। পরিকল্পনাটি ভুল ছিল না, কিন্তু ছিল যুগের অনুপযোগী। সরকারি ঘোষণায়

মহম্মদ বিন কাশিম। তিনি ছিলেন তৎকালীন ইরাকের শাসক হজ্জাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা। সিন্ধুর হিন্দু রাজা দাহিরের প্রতিরোধে প্রথম আরব অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর মহম্মদ বিন কাশিমের নেতৃত্বে দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হয়। প্রায় ছয় হাজার সৈন্য, চার হাজার উট ও এক হাজার অন্যান্য ভারবাহী পশুর এক বিশাল বাহিনী নিয়ে কাশিম সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করেন। তারপর স্থানীয় বৈরিতার জন্য সিন্ধুর জাঠ ও বৌদ্ধরা দাহিরের বিরুদ্ধে কাশিমের পক্ষ অবলম্বন করেন। তবু রাজা দাহির প্রবল বিক্রমে সে আক্রমণের সম্মুখীন হন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সামান্যক্ষণ পরে দাহিরের হাতিটি তীরবিদ্ধ হয়ে ইতস্তত ছোটাছুটি শুরু করলে তাঁর সৈন্যদলের মনোবল ভেঙে পড়ে। রাজা দাহির যুদ্ধে পরাজিত হন এবং বন্দী অবস্থায় নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। তারপর কাশিম সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশ জয় করেন।

কিন্তু কাশিম কোন কারণে খলিফের বিরাগভাজন হন এবং সে-কারণে খলিফের নির্দেশে তাঁকে হত্যা করা হয়।

মহম্মদ বিন তোগলক : দিল্লীর তোগলক বংশীয় দ্বিতীয় সুলতান। গিয়াসুদ্দিনের পুত্র, পূর্ব নাম জুনা খাঁ। শাসনকাল ১৩২৫-৫১ খ্রী। মহম্মদ বিন তোগলক নানা পরস্পর বিরোধী গুণের এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন এবং গণিত, ন্যায়শাস্ত্র, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। ধার্মিক ছিলেন কিন্তু ধর্মান্ধ ছিলেন না, আর ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অতি সংযমী ও সচ্চরিত্র। কিন্তু অস্থিরচিত্ততা ছিল তাঁর চরিত্রের সব চেয়ে বড় ত্রুটি। তিনি যখনই কোন অভিনব পরিকল্পনার কথা চিন্তা করতেন তখনই তা কার্যকর করার জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন। কোন পরিকল্পনার ভাল-মন্দ উভয়দিক সুস্থিরচিত্তে বিচার করার ধৈর্য তাঁর ছিল না এবং এ ব্যাপারে কারও মতামতও তিনি গ্রহণ করতেন না। পরন্তু কোন বাধা কোন পক্ষ থেকে এলে তিনি হয়ে উঠতেন চরম নিষ্ঠুর। আবার কোন পরিকল্পনা নিয়ে অনেকদূর অগ্রসর হওয়ার পর তার ভুল বা অসম্ভাব্যতা উপলব্ধি করা মাত্র তিনি তা বাতিল করে পূর্ব ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। তার জন্য ক্ষয়-ক্ষতি বা মৃত্যু কত হল তা নিয়ে তিনি ভাবতেন না। এই কারণে মহম্মদ বিন তোগলক ইতিহাসে পাগলা রাজা, রক্তপিপাসু ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হয়েছেন। কিন্তু আধুনিক-কালের ঐতিহাসিকদের অনেকেই সুলতান মহম্মদ বিন তোগলককে এক কথায় পাগলা রাজা বলে তুচ্ছ করতে দ্বিধা বোধ করেন। তোগলকের দক্ষিণ ভারতে রাজধানী স্থানান্তর, প্রতীক মুদ্রা প্রচলন ইত্যাদিকে তাঁরা দূরপ্রসারী, উন্নত চিন্তাধারার পরিকল্পনা বলে মনে করেছেন।

এক দুর্ঘটনায় গিয়াসুদ্দিন তোগলকের মৃত্যু হওয়ার পর তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র জুনা খাঁ সুলতান হন এবং মহম্মদ বিন তোগলক নাম গ্রহণ করেন।

বলা হয়, তামার মুদ্রার ধাতুমূল্য স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রার সমান না হলেও তাদের বিনিময় মূল্য সমান হবে। কিন্তু প্রতীক মুদ্রা রক্ষার জন্য যে প্রশাসনিক সতর্কতা প্রয়োজন তা সেদিন ছিল না বলে শীঘ্রই ব্যাপক-ভাবে মুদ্রা জাল শুরু হয় এবং তামার মুদ্রার কপর্দক মূল্যও থাকে না। ফলে নিরুপায় সুলতানকে প্রতীক মুদ্রার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়।

সুলতান আর এক ভুল করেন হানাদার মোঙ্গলদের টাকা দিয়ে শান্ত করতে গিয়ে। ১৩২৮খ্রী তারম শিরিন খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলরা উত্তরভারত আক্রমণ করলে সুলতান টাকা দিয়ে তাদের সেবারের মতো বিদায় করেন। কিন্তু অর্থলোলুপ মোঙ্গলরা তারপর বারবার হানা দিতে শুরু করে ও সুলতানের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। কিন্তু সুলতান বোধহয় সবচেয়ে বড় ভুল করেন বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন দেখে। তার জন্য তিনি ৩ লক্ষ ৭০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গঠন করেন। তিনি প্রথমে পারস্য জয়ের সঙ্কল্প নেন। কিন্তু এক বছর ঐ বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণের পর সুলতান সে পরিকল্পনা বাতিল করেন ও সৈন্যবাহিনীও ভেঙে দেন। ফলে কর্মচ্যুত বিক্ষুব্ধ সৈন্যরা লুঠতরাজ শুরু করে। এইভাবে মহম্মদ বিন তোগলকের নানা পরীক্ষা পরিকল্পনা ও খেয়ালের খেসারত দিতে রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে ও রাজকোষ শূন্য হয়।

১৩৫১ খ্রী মহম্মদবিন তোগলক অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁর পিতৃব্যপুত্র ফিরোজশাহ তোগলক তাঁর উত্তরাধিকারী হন।

মহাজনপদ : বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'অঙ্গুত্তর নিকয়' এবং জৈন ধর্মগ্রন্থ 'ভগবতী সূত্রতে' খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতে ষোলটি রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ রাজ্যগুলিকে বলা হ'ত 'মহাজনপদ'। মহাজনপদগুলির নাম ছিল কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, বজ্জি অথবা বৃজি যৌথরাজ্য, মল্ল, চেদি, বংশ অথবা বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অস্মক, অবন্তি, গান্ধার ও কম্বোজ।

রাজ্যগুলি ছোট ছিল এবং সবই অবস্থিত ছিল বর্তমান বিহার, উত্তর-প্রদেশ ও মধ্যভারত অঞ্চলে। এক-মাত্র অস্মক ছিল দক্ষিণভারতে। পাঞ্জাবে অবস্থিত ছিল গান্ধার ও কুরু রাজ্য। খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজা বিম্বিসারের শাসনকালে মগধ বিশেষ শক্তিশালী রাজ্য হয়ে ওঠে এবং অনেকগুলি মহাজনপদ জয় করে তিনি একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর শাসনকালে মগধ আরও শক্তিশালী হয় এবং ঐ সময় মগধের রাজধানী রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি বা মহাসম্মেলন আহূত হয়।

মহাদজি সিন্ধিয়া : পেশোয়া মাধব রাওর শাসনকালে মহাদজি সিন্ধিয়া উত্তরভারতে মারাঠা বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর মধ্যস্থতায় প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়। মারাঠা সামন্তদের মধ্যে মহাদজি সিন্ধিয়া ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী।

তিনি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে তাঁর সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। উত্তর-ভারতে মোগল সম্রাট শাহ আলমের সহায়তায় তিনি তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করেন। রাজপুত ও জাঠদের উপরেও তাঁর কর্তৃত্ব বিস্তার লাভ করে। ১৭৯৩ খ্রী হোলকারের সঙ্গে মহাদজি সিন্ধিয়ায় যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে তিনি হোলকারকে পরাজিত করেন। তারপর নানা ফাড়নবিশের ক্ষমতা লাঘবের উদ্দেশ্যে মহাদজি সিন্ধিয়া পুণা অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু সে উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হওয়ার আগেই ১৭৯৪ খ্রী মহাদজির মৃত্যু হয়।

মহাপদ্ম : নন্দ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দ বা উগ্রসেন মগধের শিশুনাগ বংশীয় রাজা কালাশোককে হত্যা করে মগধে নন্দ বংশীয় শাসন-প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সম্ভবত শূদ্র মাতার সন্তান ছিলেন, সে কারণে নন্দবংশীয় রাজারা কোন সময়েই প্রজাপুঞ্জের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন না। তবে মহাপদ্ম নন্দ যে সুদক্ষ শাসক ছিলেন সে বিষয়ে সকল ঐতিহাসিক একমত। মহাপদ্ম নন্দর রাজ্যের সীমানা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছু জানা যায় না। সম্ভবত কোশল, কলিঙ্গ, দাক্ষিণাত্যের কুন্তল, অশ্মক প্রভৃতি রাজ্য তিনি জয় করেন। ভারতে বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে মহাপদ্মকেই প্রথম উদ্যোগী বলা যায়।

মহাবীর : জৈন-ধর্মের প্রবর্তক। প্রকৃত নাম বর্ধন তবে মহাবীর নামেই পরিচিত। জৈনশাস্ত্র অনুসারে মহাবীর ২৪তম ও শেষ তীর্থঙ্কর। জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব এবং ২৩তম তীর্থঙ্কর বারাণসীর রাজা অশ্বসেনের পুত্র পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ। জৈনধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক পরেশনাথ, কিন্তু জৈন-শাস্ত্রে মহাবীরকেই উক্ত সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

মহাবীরের জন্ম বৈশালীর নিকটবর্তী কুণ্ডগ্রাম নামক স্থানে, সম্ভবত ৫৯৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। তাঁর পিতা সিদ্ধার্থ ছিলেন স্থানীয় ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের প্রধান এবং মাতা তৃষলা ছিলেন লিচ্ছবির রাজকন্যা। ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত মহাবীর সংসার ধর্ম পালন করেন এবং যশোদা নামক এক রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি এক কন্যারও পিতা হন। কিন্তু ত্রিশ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও সংসার ত্যাগ করেন। তারপর বারো বছর কঠিন তপস্যার শেষে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তখন অসম্ভব সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করার জন্য তাঁর নাম হয় মহাবীর। তারপর ত্রিশ বছর দেশে দেশে ভ্রমণ করে তিনি যে বাণী প্রচার করেন তাই জৈনধর্মের সার কথা। ৫২৭ খ্রী-পূ রাজগৃহের নিকটবর্তী পাবা নামক স্থানে মহাবীর দেহরক্ষা করেন। তাঁর জীবদ্দশায় জৈনধর্ম মগধ, অঙ্গ, মিথিলা, কোশল প্রভৃতি স্থানে বিস্তার লাভ করে। সে সময় তাঁর শিষ্যের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ হাজার।

মহাবীর ভগবানে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং এই বিশ্বচরাচরের নিয়ন্ত্রক কোন সার্বভৌম শক্তির অস্তিত্বও স্বীকার করতেন না। যজ্ঞ, বলিদানে বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান জৈনধর্মে নিষিদ্ধ।

বেদ অপৌরুষেয় বলে মহাবীর স্বীকার করেননি। ব্রাহ্মণ ও দেবতার বদলে জৈনদের পূজ্য চব্বিশজন তীর্থঙ্কর। কিন্তু জৈনরা হিন্দু ও বৌদ্ধদের মতো আত্মা, কর্মফল, পরজন্ম ইত্যাদিতে বিশ্বাসী।

মহাভারত: মহাকবি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের রচনা বলে কথিত, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত লক্ষাধিক শ্লোক বিশিষ্ট মহাকাব্য। অষ্টাদশ পর্বের এই মহাকাব্যে খ্রীষ্ট পূর্ব যুগের ভারতের সমাজ, সভ্যতা ও ন্যায়নীতির আদর্শ সম্পর্কে নানা কথা জানা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে মহাভারত কোন এক ব্যক্তির রচনা নয়। অশ্বলায়নের 'গৃহ্যসূত্র' ও পাণিনির 'অষ্টাধ্যয়ী' গ্রন্থে মহাভারতের উল্লেখ মেলে। কিন্তু তখন মহাভারতের আকৃতি পরবর্তী-কালের মহাভারতের এক চতুর্থাংশও ছিল না। লক্ষ শ্লোক মহাভারতের প্রথম উল্লেখ মেলে গুপ্তযুগের এক লিপিতে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাভারত কাব্যের অনুলিপি দূর প্রাচ্যের দেশগুলিতেও প্রচারিত হয়।

মহারাজা মার্তণ্ডবর্মা: ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যকে ১৭৫৯ খ্রী ঐক্যবদ্ধ করেন। ঐ বছরেই ওলন্দাজদের সঙ্গে মহারাজার চুক্তিক্রমে স্থির হয় যে, ওলন্দাজরা কখনও ত্রিবাঙ্কুর বা তার কোন মিত্র রাজ্যকে আক্রমণ করবে না।

মহারাষ্ট্র: আয়তনে ও জনসংখ্যায় মহারাষ্ট্র ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম রাজ্য। আয়তন ৩,০৭,৭২৬ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ৫ কোটি ১০ লক্ষ। লোকসংখ্যায় উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের পরে এবং আয়তনে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের পর মহারাষ্ট্রের স্থান। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে, আরব সাগরের উপকূলে ত্রিভুজাকৃতির এই রাজ্যটি ১৯৬০ সালের ১ মে স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার কালে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট একত্রে বোম্বাই প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু মারাঠী বা গুজরাটীরা ঐ একীকরণের বিরোধিতা করায় ১৯৬০ সালের ১ মে তারা দুটি পৃথক রাজ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ঐতিহাসিক কারণে মহারাষ্ট্রকে পশ্চিম মহারাষ্ট্র, বিদর্ভ ও মারাঠাওয়াড়া এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। বিদর্ভের ইতিহাস সুপ্রাচীন, মহাভারতেও তার উল্লেখ মেলে। ১২৯৪ খ্রী পর্যন্ত মহারাষ্ট্র হিন্দু রাজাদের শাসিত ছিল। ঐ বছর যাদব বংশীয় রাজাদের পরাজিত করে মহারাষ্ট্রে মুস্লিম শাসন কায়েম হয়। পরে ছত্রপতি শিবজির অভ্যুত্থানকালে মহারাষ্ট্রে একটি বিপুল শক্তিশালী রাজ্য হয়। শিবাজির উত্তরাধিকারী পেশোয়াদের শাসনকালে মারাঠা সাম্রাজ্য উত্তরে গোয়ালিয়র থেকে দক্ষিণে তাঞ্জোর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। পূর্বে বঙ্গদেশ পর্যন্ত মারাঠাদের পরাক্রম অনুভূত হত। কিন্তু ১৭৬১ খ্রী পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আফগান অভিযাত্রী আহমদশাহ আবদালির সৈন্যবাহিনীর কাছে মারাঠা শক্তি সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। ১৮১৮খ্রী সমগ্র মহারাষ্ট্র অঞ্চল ইংরেজের অধিকারে যায় ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত হয়।

মারাঠা ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে

মহারাষ্ট্র গঠিত হলেও মহারাষ্ট্রের তিনটি অঞ্চলের ভাবগতি সংহতি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। বিদর্ভের অধিবাসীরা নাগপুরকে রাজধানী করে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গড়তে চায়।

মহারাষ্ট্র বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ২৮৮।

মহীপাল : পালবংশীয় রাজা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপাল (রাজত্বকাল ৯৮৮–১০৩৮) পাল রাজ্যের গৌরব অনেকটা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। তিনি সমগ্র উত্তরবঙ্গে এবং পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশে ও বিহারের কয়েকটি স্থানে পালবংশীয় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। ১০২৬ খ্রী প্রথম মহীপালের কর্তৃত্ব বারাণসী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তিনি কম্বোজ নামক এক বিদেশি জাতির আক্রমণ থেকে বঙ্গদেশকে রক্ষা করেন। তবে শেষ জীবনে প্রথম মহীপাল কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেবের কাছে পরাজিত হন। দাক্ষিণাত্যের মহাপরাক্রমশালী রাজা রাজেন্দ্রচোলদেবও ঐ সময় বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন এবং তার একাংশ বিধ্বস্ত করে চলে যান।

দ্বিতীয় মহীপাল পালবংশের আর এক রাজা। তিনিও পাল রাজ্যের হৃত মর্যাদা কিছুটা উদ্ধারে সমর্থ হন। তাঁর শাসনকালে উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত নেতা দিব্যোকের নেতৃত্বে প্রজা বিদ্রোহ হয়। সে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হন।

মহীশূর : কর্নাটক দ্র।

মহীশূর (ইঙ্গ) যুদ্ধ : প্রথম ১৭৬৬ খ্রী ইংরেজ, মারাঠা ও নিজাম হায়দর আলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন। ঐ মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভব নয় বুঝে হায়দর মারাঠাদের প্রচুর অর্থ দিয়ে স্বপক্ষে টেনে আনেন। তারপর ইংরেজ ও নিজাম হায়দরের রাজ্য আক্রমণ করলে হায়দর অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে মাঙ্গালোর জয় করেন এবং মাদ্রাজ দখলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। তখন ইংরেজরা নিরুপায় হয়ে হায়দরের সঙ্গে সন্ধি করেন (১৭৬৯) এবং সন্ধির শর্ত অনুসারে উভয়পক্ষ পরস্পরের দখল করা স্থান ছেড়ে দেয়। আরও স্থির হয় যে, ইংরেজ অথবা হায়দর আলি কোন তৃতীয় শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলেও অপর পক্ষ তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

দ্বিতীয় যুদ্ধ—১৭৮০ খ্রী বোম্বাইস্থ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে মহীশূরের সুলতান হায়দর আলির যুদ্ধ দ্বিতীয় মহীশূর (ইঙ্গ) যুদ্ধ নামে অভিহিত। যুদ্ধের শুরুতে নিজাম ও মহাদজি শিন্ধিয়া হায়দরের পক্ষ নেন, কিন্তু তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের প্ররোচনায় তাঁরা হায়দরের পক্ষ ত্যাগ করেন। তারপর হায়দরকে দমনের উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার স্যার আয়ারকুটের নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। পোর্টো-নাভোর যুদ্ধে (১৭৮১) স্যার আয়ার-কুটের কাছে হায়দর পরাস্ত হন এবং নেগাপট্টম, ত্রিঙ্কোমালি প্রভৃতি স্থান তাঁর হস্তচ্যুত হয়। অপর দিকে হায়দরের পুত্র টিপুর হাতে তাঞ্জোর রণাঙ্গনে কর্নেল ব্রেথওয়েটের বিশাল সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়। সে

সময় একটি বিশাল ফরাসি নৌবহর ইংরেজদের বিরুদ্ধে হায়দরকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারতের উপকূলে উপস্থিত হয়। ফরাসিদের সাহায্যে হায়দর নতুন উৎসাহে যুদ্ধ শুরু করেন। কিন্তু যুদ্ধের নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই ১৭৮২ খ্রী হায়দর আলির মৃত্যু হয়।

হায়দরের মৃত্যুর পর টিপু মহীশূরের সুলতান হন ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্তু ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজ-ফরাসি বিরোধের নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়াতে টিপু হীনবল হয়ে পড়েন। সে সময় মাদ্রাজের ইংরেজ গভর্নর টিপুর সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব দিলে টিপু তাতে সম্মত হন। ১৭৮৪ খ্রী ম্যাঙ্গালোরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং সন্ধির শর্ত অনুসারে উভয়পক্ষ পরস্পরের অধিকৃত স্থান ফিরিয়ে দেয়। তৃতীয় যুদ্ধ—তৃতীয় মহীশূর (ইঙ্গ) যুদ্ধ হয় গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে। ১৭৮৯ খ্রী টিপু ইংরেজের আশ্রিত রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করলে তৃতীয় যুদ্ধ শুরু হয়। ইংরেজ, মারাঠা ও নিজাম একসঙ্গে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দু বছর ধরে যুদ্ধ চলার পর শত্রু সেনাবাহিনী টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের অবরোধ করলে টিপুর আত্মসমর্পণ ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। ১৭৯২ খ্রী শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি অনুসারে তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়। টিপুকে রাজ্যের প্রায় অর্ধেক ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয় এবং ঐ অঞ্চল ইংরেজ, নিজাম ও মারাঠাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। তাছাড়া ক্ষতিপূরণস্বরূপ টিপুকে প্রচুর অর্থ দিতে হয় এবং নিজের দুটি পুত্রকে ইংরেজদের হাতে জামিনস্বরূপ অর্পণ করতে হয়। মাদুরাই, সালেম জেলার একাংশ, কুর্গ, মালাবার প্রভৃতি স্থান ইংরেজ সরকারের অধিকারভুক্ত হয়।

চতুর্থ যুদ্ধ—তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে দারুণ পরাজয়ের পরও টিপু হার মানেন না। পুনরায় শক্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি ফ্রান্স, ফরাসী উপনিবেশ মরিসাস, আফগানিস্থান, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। লর্ড ওয়েলেসলি তখন ভারতের গভর্নর-জেনারেল। তিনিও টিপুকে চরম আঘাত হানার জন্য নিজাম ও মারাঠা-দের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। তারপর তিনি টিপুর কাছে ফ্রান্সের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার জন্য কৈফিয়ৎ তলব করেন এবং টিপুর কৈফিয়ৎ সন্তোষ-জনক বিবেচিত না হওয়ায় লর্ড ওয়েলেসলি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হয়। টিপু পর পর সদাশির, মলভেলি ও শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে পরাস্ত হন। শেষে সৈন্যবাহিনী যখন রাজধানী প্রবেশের উপক্রম করে, টিপু বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দেন (১৭৯৯)।

টিপুর পরাজয় ও মৃত্যু এবং মহীশূর রাজ্যের পতনের পর ইংরেজরা মহীশূর রাজ্যের অর্ধেক দখল করে। অবশিষ্ট অংশে, যে হিন্দু রাজবংশকে উৎখাত করে হায়দর মহীশূরের সিংহাসন দখল করেছিলেন, তাদের উত্তরাধিকারীকে

পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। মহীশূরের কিছু অংশ নিজামের রাজ্যের সঙ্গেও যুক্ত হয়।

মহেঞ্জোদরো : বর্তমানে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় অবস্থিত। মহেঞ্জোদরো কথাটির অর্থ 'মড়ার ঢিপি'। সুতরাং ঐ স্থানে অবস্থিত সুপ্রাচীন সভ্যতাটি ধ্বংস হওয়ার পর হয়ত স্থানটি মহেঞ্জোদরো নামে পরিচিত হয়। প্রাচীন বৌদ্ধ-সভ্যতার নিদর্শনের সন্ধানে প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২২ সালে ঐ স্থানে খনন কার্য শুরু করেন। সেই খননের ফলে মহেঞ্জোদরোর এক বিরাট নগরী ও সুপ্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। ঐতিহাসিকদের অনুমান, শহরটি বিভিন্ন সময়ে অন্তত সাতবার নির্মিত হয়। উদ্ধারপ্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, মহেঞ্জোদরো একটি সুপরিকল্পিত শহর ছিল। শহরটি নির্মিত হয় রোদে পোড়ানো ইঁটের উঁচু ভিতের উপরে। শহরের প্রাসাদগুলি নির্মিত হয় আগুনে পোড়ানো ইটে। রাস্তাগুলি ছিল সোজা ও চওড়া এবং তার দুধারে ছিল সারিবদ্ধ ছোটবড় অসংখ্য প্রাসাদ। প্রতি গৃহেই কূপ, স্নানাগার প্রভৃতি ছিল। শহরের জল নিকাশের জন্য এখনকার মত প্রয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ছিল। মহেঞ্জোদরো শহরের কোথাও কোন মন্দির বা উপাসনাগৃহের সন্ধান মেলেনি। তাতে মনে হয়, সমবেত প্রার্থনা রীতি সিন্ধু সভ্যতার যুগে প্রচলিত ছিল না। তখন এক যোগীপুরুষের পূজা প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিকদের অনুমান, ঐ যোগীপুরুষ হিন্দু দেবতা শিবের পূর্ব-সংস্করণ। এক মাতৃমূর্তির পূজাও সে সময় প্রচলিত ছিল।

সেদিন সিন্ধু উপত্যকাবাসীদের জীবিকা ছিল কৃষি, পশুপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য। বিভিন্ন কুটিরশিল্প, ভাস্কর্য, ধাতুশিল্প প্রভৃতিরও প্রচলন ছিল। প্রধান খাদ্য ছিল গম, বার্লি, দুধ, খেজুর ও অন্যান্য ফলমূল। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই অলঙ্কারপ্রিয় ছিল, এবং সোনা রূপা ব্রোঞ্জ তামা প্রভৃতি ধাতু ও মিশ্রধাতুর অলঙ্কার ও অন্যান্য সামগ্রী মহেঞ্জোদরোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গেছে। লোহার কোন সামগ্রী না মেলায় প্রমাণ হয় যে, মহেঞ্জোদরো সভ্যতা লৌহযুগের আগের। মহেঞ্জোদরোয় কোন ঘোড়ার ছবি পাওয়া-যায়নি, তাতে মনে হয় ঘোড়া তখনও সিন্ধুবাসীদের বশ্যতা স্বীকার করেনি। তবে কুকুর ভেড়া মহিষ প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশুর ছবি পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদরোর লোকেরা জল ও স্থলপথে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করত। মেসোপটেমিয়ার মহেঞ্জোদরোর কয়েকটি সীলমোহরের সন্ধান পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদরোর যে দু হাজার সীলমোহর পাওয়া গেছে তার লিপিপাঠ আজও সম্ভব হয়নি।

খ্রী-পূ দুই সহস্রাব্দের কোন এক কালে মহেঞ্জোদরো তথা সমগ্র সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংস হয়। প্লাবন, ভূমিকম্প, মড়ক, আর্য আক্রমণ প্রভৃতি সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসের কারণ বলে অনুমান করা হয়। ভারত সভ্যতার ইতিহাসে

সিন্ধুসভ্যতা আবিষ্কৃতির গুরুত্ব সীমাহীন। দীর্ঘদিন এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারত অসভ্য দেশ ছিল এবং আর্য-সভ্যতা দিয়েই ভারতীয় সভ্যতার সূচনা। কিন্তু মহেঞ্জোদরোর সভ্যতা সে ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে। মহেঞ্জোদরোর সুপ্রাচীন সভ্যতা প্রমাণ করেছে যে, আর্য আগমনেরও দুহাজার বছর আগে ভারত সুসভ্য ও সমৃদ্ধ দেশ ছিল।

মহেন্দ্র বর্মন : খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে দক্ষিণভারতে সিংহবিষ্ণু পল্লব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজ্য কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তিনি পাণ্ড্য, চোল ও চের রাজ্যকে পরাজিত করেন। প্রথম মহেন্দ্র বর্মন সিংহবিষ্ণুর পুত্র ও উত্তরাধিকারী। তিনি সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে পল্লব রাজ্যের রাজা ছিলেন। তিনি পিতার মতো পরাক্রমশালী ছিলেন না এবং চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁকে পরাজিত করে বেঙ্গী প্রদেশটি দখল করে নেন। মহেন্দ্র বর্মন প্রথম জীবনে জৈন ছিলেন, পরে সন্ত অপ্পরের প্রভাবে শিবের উপাসক হন এবং জৈনদের প্রতি অসহিষ্ণু হন। তিনি দক্ষিণ আরকটের বহু জৈন মন্দির ধ্বংস করেন। পাথর কেটে মন্দির নির্মাণ পদ্ধতি মহেন্দ্র বর্মনের শাসনকালে দক্ষিণভারতে প্রচলিত হয়। মহেন্দ্র বর্মন সুলেখকও ছিলেন এবং তিনি সম্ভবত 'মত্তবিলাস প্রহসন' গ্রন্থের রচয়িতা।

মহেন্দ্র বর্মন নামে আরও দুই রাজা পল্লব সিংহাসনে বসেন। দ্বিতীয় মহেন্দ্র বর্মন ছিলেন প্রথম মহেন্দ্র বর্মনের পৌত্র এবং তৃতীয় মহেন্দ্র বর্মন ছিলেন দ্বিতীয় মহেন্দ্র বর্মনের প্রপৌত্র।

মাউন্টব্যাটেন, লর্ড : ১৯৪৭ খ্রী জুন মাসে ভারতের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনিই বৃটিশ ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়। ভারতীয়দের হাতে শাসনদায়িত্ব অর্পণের জন্যই লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে গভর্নর-জেনারেল করে এদেশে পাঠানো হয়। শাসনদায়িত্ব হাতে নিয়েই মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করেন, ভারতের মুস্লিম গরিষ্ঠ প্রদেশগুলি ইচ্ছা করলে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করতে পারে। আর বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাব যদি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় তবে ঐ দুটি প্রদেশকে হিন্দু ও মুস্লিম অধ্যুষিত এলাকার ভিত্তিতে ভাগ করা হবে; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের শ্রীহট্ট জেলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য ঐ দুই স্থানে গণভোট নেওয়া হবে। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের এই প্রস্তাব মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা নামে অভিহিত।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান গঠিত হয়। অবশিষ্ট ভারত পরদিন ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন ভারতের নেতৃবৃন্দের ইচ্ছানুসারে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের গভর্নর-জেনারেল পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৮ খ্রী পর্যন্ত তিনি সে পদে বহাল থাকেন। তিনি গভর্নর জেনারেল থাকাকালে কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভূক্ত হয়। তাঁর

অবসর গ্রহণের পর শ্রী সি রাজা-গোপালাচারী ভারতের গভর্নর-জেনারেল হন।

মাঙ্গালোর সন্ধি : আমেরিকায় স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার কালে ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ইংরেজরা দক্ষিণভারতে ফরাসিদের সব কটি বাণিজ্যকেন্দ্র দখল করে নেয়। পরে হায়দর আলির সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধলে ফরাসিরা হায়দরের পক্ষ নেয় ও নানাভাবে সাহায্য করে। কিন্তু ১৭৮৩ খ্রী ভার্সাই সন্ধিতে আন্তর্জাতিক ইঙ্গ-ফরাসি বিরোধের অবসান হলে ভারতেও উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। ১৭৮৪ খ্রী মাঙ্গালোর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় এবং উভয়পক্ষ পরস্পরের অধিকৃত স্থানগুলি প্রত্যর্পণ করে।

মাদ্রাজ : বিজয়নগরের রাজার সামন্ত চন্দ্রগিরির রাজার কাছ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬৪০ খ্রী ২০ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজের পত্তনি লাভ করে এবং ১৬৪০-৫৩ খ্রী মধ্যে সেখানে গড়ে ওঠে ভারতে ইংরেজের প্রথম দুর্গ 'ফোর্ট সেন্ট জর্জ'। তারপর দক্ষিণ-ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে এক্তিয়ার গড়ে ওঠে সরকারিভাবে তার নাম হয় 'প্রেসিডেন্সি অফ ফোর্ট সেন্ট জর্জ'। ঐ সময় মাদ্রাজ শহরটির পত্তন করেন ফ্রান্সিস ডে।

ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগরের তীরে গড়ে ওঠা মাদ্রাজ শহর হয় দক্ষিণভারতে ইংরেজ সরকারের সদর দপ্তর। দেশ স্বাধীন হওয়ার কালে তেলুগুভাষী অন্ধ্রের অধিকাংশ ও মালয়লমভাষী কেরলের অনেকখানি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজ্য পুনর্গঠন কমি-শনের (১৯৫৬) সুপারিশ অনুসারে শুধু তামিলভাষী অঞ্চল নিয়ে মাদ্রাজ রাজ্য গঠিত হয় এবং মাদ্রাজ শহর হয় তার রাজধানী। পরবর্তী কালে (১৯৬৭) তামিলভাষীদের ইচ্ছানুসারে মাদ্রাজ রাজ্যের নাম হয় তামিলনাড়ু।

মাদ্রাজ মহাজন সভা : ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হওয়ার আগে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে কয়েকটি আধা-রাজনৈতিক আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে ওঠে। মাদ্রাজ শহরে ১৮৮১ সালে গঠিত হয় মাদ্রাজ মহাজন সভা। পরের বছর মহাজন সভার উদ্যোগে মাদ্রাজ প্রাদেশিক সম্মেলন আহূত হয়। সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার, সি বিজয়রাঘবাচারিয়ার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। কংগ্রেস গঠিত হওয়ার পর উল্লেখিত নেতৃবৃন্দ সকলেই কংগ্রেসে যোগ দেন এবং মাদ্রাজ মহাজন সভাও কংগ্রেসে মিশে যায়।

মাধব কন্দলী : পৃথক ভাষারূপে অসমিয়া সাহিত্যের শুরু পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। অসমিয়া ভাষার এই স্বতন্ত্র উদ্ভবের যুগে মাধব কন্দলী ছিলেন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবি। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। তিনি রামায়ণের পাঁচটি খণ্ড সুন্দর ছন্দে অসমিয়া ভাষায় অনুবাদ করেন।

মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪) : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন

বিপ্লবী নেতা, প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রত্যাশায় দেশত্যাগের পর মানবেন্দ্রনাথ রায় নাম গ্রহণ করেন ও পরবর্তীকালে সেই নামেই পরিচিত হন। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে তিনি অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রথমে জাভা যান। সেইখানেই যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিজ উদ্যোগে চীনে যান ও সান ইয়াৎ সেনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। তারপর, চীন থেকে জাপান ও জাপান থেকে আমেরিকায়। আমেরিকায় তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা হলে তিনি মেক্সিকোয় পলায়ন করেন। মেক্সিকোয় অবস্থানকালে রায় কম্যুনিস্ট মতাদর্শে আকৃষ্ট হন ও সেখানে কম্যুনিস্ট পার্টি গঠন করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে সেই প্রথম কম্যুনিস্ট পার্টি এবং মেক্সিকো কম্যুনিস্ট সম্মেলনের তিনি প্রথম সভাপতি। তারপর লেনিনের আমন্ত্রণে বিশ্ব-কম্যুনিস্ট সম্মেলনে যোগ দিতে রায় মস্কোয় যান। সেখানে শীঘ্রই তিনি বিশ্ব-কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতারূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে অবস্থানকালেই মানবেন্দ্রনাথ ভারতে কম্যুনিস্ট দল গঠনে উদ্যোগী হন। ১৯২৪ খ্রী ভারতে ইংরেজ সরকার মানবেন্দ্রনাথ রায়কে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁকে আদালতে উপস্থিত করা সম্ভব হয় না। ১৯২৭ খ্রী মানবেন্দ্রনাথ বিশ্ব-কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রতিনিধিরূপে চীনে যান ও সেখানে কম্যুনিস্ট দল গঠনে অগ্রণী ভূমিকা নেন। ইতিমধ্যে লেনিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় স্টালিন ও লেনিনের অন্যান্য সহকর্মীদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ শুরু হলে মানবেন্দ্রনাথ প্রথমে স্টালিনকে সমর্থন করেন। কিন্তু পরে স্টালিনের সঙ্গেও তাঁর বিরোধ শুরু হলে ১৯২৯ খ্রী আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে রায়ের সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

১৯৩০ খ্রী ডঃ মামুদ ছদ্মনামে মানবেন্দ্রনাথ ভারতে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরেই গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে তাঁর বারো বছর জেল হয়। আপীলে দণ্ডাদেশ হ্রাস পেয়ে ছয় বছর হয়। ১৯৩৬ খ্রী মুক্তির পর রায় কংগ্রেসে যোগ দেন। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 'লীগ অফ র‍্যাডিকাল কংগ্রেসম্যান' গঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে তিনি ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির আগেই ফ্যাসি-বিরোধী গণযুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন ও যুদ্ধকে পূর্ণ সমর্থনের আহ্বান জানান। ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয় এবং কংগ্রেস ত্যাগ করে তিনি 'র‍্যাডিকাল ডিমক্র্যাটিক পার্টি' গঠন করেন। ঐ দল কম্যুনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ ক্রমে কম্যুনিস্ট মতাদর্শেও আস্থা হারান এবং সে কারণে ১৯৪৮ খ্রী র‍্যাডিকাল ডিমক্র্যাটিক পার্টি ভেঙে দিয়ে 'র‍্যাডিকাল হিউম্যানিজম' অর্থাৎ প্রগতিশীল মানবতাবাদের আদর্শ প্রচার শুরু করেন। তারপর থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে মানবেন্দ্রনাথের আর কোনো

প্রভাব থাকে না। মানবেন্দ্র যেমন বিশ্ব-কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী নায়ক, তেমনই বিশ্ব মানবতা আন্দোলনেরও অন্যতম পথিকৃৎ।

মানসিংহ: সম্রাট আকবরের অন্যতম বিশ্বস্ত ও দক্ষ সেনাপতি। মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারে তাঁর উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা ছিল। তিনি ছিলেন অম্বর (জয়পুর)-রাজ ভগবানদাসের দত্তক পুত্র। সম্রাট আকবর মান-সিংহকে তাঁর সেবার পুরস্কারস্বরূপ সাতহাজারি মনসবদার করেন। হলদিঘাটের যুদ্ধে (১৫৭৬) তিনি মোগল বাহিনীর সেনাপতিরূপে রানা প্রতাপ সিংহকে পরাজিত করেন। মানসিংহ বিভিন্ন সময়ে কাবুল, বাঙলা ও বিহারের শাসক ছিলেন।

মারাঠা (ইঙ্গ) যুদ্ধ: প্রথম—নারায়ণ রাও পেশোয়াপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র নয় মাস পরে তাঁর পিতৃব্য রঘুনাথ রাওর ষড়যন্ত্রে নিহত হন (১৭৭৩)। তারপর রঘুনাথ রাও পেশোয়া হন। কিন্তু নারায়ণ রাওর মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন এবং নিহত নারায়ণ রাওর একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র পেশোয়াপদে ঐ নবজাতকের উত্তরাধিকার নানা ফড়নবিশ প্রমুখ মারাঠা প্রধানদের দ্বারা স্বীকৃত হয় এবং নিরুপায় রঘুনাথ রাও পলায়ন করে হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য বোম্বাইস্থ ইংরেজ সরকারের শরণ নেন। ইংরেজ সরকার রঘুনাথ রাওকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিলে উভয়ের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (১৭৭৫); ঐ চুক্তি সুরাট চুক্তি নামে অভিহিত। চুক্তিতে বোম্বাইস্থ ইংরেজ সরকার রঘুনাথ রাওকে ক্ষমতা পুনর্দখলের জন্য আড়াই হাজার সৈন্য দিয়ে সাহায্যের বিনিময়ে সলসেট ও বেসিন নামক দুটি স্থান পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পান এবং ভারুচ ও সুরাটের রাজস্বের একাংশ ইংরেজদের আদায় করার অধিকার দিতেও রঘুনাথ রাও কথা দেন।

সুরাট চুক্তির শর্ত অনুসারে ইংরেজরা সলসেট দখল করতে গেলেই পুনার মারাঠা সরকারের সঙ্গে বোম্বাইস্থ ইংরেজ সরকারের যুদ্ধ বেধে যায়। কিন্তু ঐ যুদ্ধ বেশিদূর গড়াতে পারে না। কারণ ইংরেজ সরকারের কলকাতাস্থ কেন্দ্রীয় প্রশাসন বোম্বাইস্থ ইংরেজ সরকার সম্পাদিত সুরাট চুক্তি অনমু-মোদন করেন। কলকাতা থেকে অবিলম্বে কর্নেল আপটন বোম্বাই প্রেরিত হন এবং তিনি পুনার মারাঠা সরকারের সঙ্গে বিরোধের মীমাংসা করে নেন। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে মারাঠা সরকারের সম্পাদিত চুক্তির নাম পুরন্দরের সন্ধি (১৭৭৬)। ঐ সন্ধির শর্ত অনুসারে সুরাট চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। রঘুনাথ রাওকে পেন্সন দিয়ে গুজরাতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তবে সলসেট ইংরেজ সরকারের অধিকারে থাকার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু বোম্বাইস্থ ইংরেজ সরকার পুরন্দরের সন্ধি সম্মানজনক অথবা ইংরেজ স্বার্থের অনুকূল বলে মনে করেন না এবং পুরন্দরের সন্ধি অস্বীকার করেই তাঁরা রঘুনাথ রাওকে সুরাটে রাখার ব্যবস্থা করেন।

ওদিকে বৃটেনের ডাইরেক্টর সভা

আবার সুরাট চুক্তিই অনুমোদন করেন এবং ভারতস্থ ইংরেজ সরকারকে রঘুনাথ রাওর পক্ষ অবলম্বনের নির্দেশ দেন। ঐ নির্দেশে উৎসাহিত বোম্বাইস্থ ইংরেজ সরকার আবার মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। কিন্তু সে যুদ্ধে ইংরেজদেরই পরাজয় হয় ও ওয়াড়গাঁওর সন্ধিতে (১৭৭৯) ইংরেজ সরকার রঘুনাথ রাওর পক্ষ ত্যাগ করেন। ওয়াড়গাঁওর সন্ধিতে ইংরেজদের মর্যাদা বিশেষ ক্ষুণ্ন হওয়ায় গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস সে সন্ধি না মেনে আবার মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। অবশ্য মহাদজি সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় ইংরেজ ও মারাঠাদের বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। সলবই'র সন্ধিতে (১৭৮২) ইংরেজ সরকার নারায়ণ রাওর পুত্র মাধব রাও নারায়ণকে পেশোয়া বলে মেনে নেন। রঘুনাথ রাওকে বাৎসরিক ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। আর সলসেট ইংরেজদের অধিকারে থেকে যায়।

দ্বিতীয় যুদ্ধ—লর্ড ওয়েলেসলি যখন ভারতের গভর্নর-জেনারেল তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে মারাঠা শক্তি খুবই দুর্বল। মহাদজি সিন্ধিয়া, অহল্যাবাঈ, নানা ফড়নবিশ প্রমুখ নেতৃস্থানীয় মারাঠারা তখন পরলোকে, এবং পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও, যশোবন্ত রাও হোলকার, দৌলতরাও সিন্ধিয়া প্রভৃতি মারাঠা প্রধানরা পরস্পরের বিরুদ্ধে নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে লিপ্ত।

যশোবন্ত রাও হোলকার ও দৌলতরাও সিন্ধিয়ার মিলিত আক্রমণে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও পরাজিত হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হন। পেশোয়া ও ইংরেজদের ঐ চুক্তি বেসিনের চুক্তি নামে খ্যাত। যশোবন্ত রাও হোলকার কিন্তু ঐ চুক্তি মানেন না। তিনি পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাওর ভাই অমৃত রাওকে পেশোয়াপদে অধিষ্ঠিত করে নিজেই মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হতে চাইলেন। ওদিকে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা ইংরেজের কাছে পেশোয়ার আত্মসমর্পণকে মারাঠা জাতির চরম অপমান জ্ঞান করলেন এবং তাঁরাও বেসিনের চুক্তি অস্বীকার করলেন। ইংরেজরা কিন্তু দ্বিতীয় বাজিরাওকেই পেশোয়া বলে ঘোষণা করলেন ও অধীনতামূলক মিত্রতার শর্ত অনুসারে দ্বিতীয় বাজিরাওর সমর্থনে এগিয়ে এলেন। ফলে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ অনিবার্য হল। ১৮০৩ সালের ঐ যুদ্ধ দ্বিতীয় মারাঠা (ইঙ্গ) যুদ্ধ।

দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর নেতৃত্ব করেন লর্ড ওয়েলেসলির ভাই আর্থার ওয়েলেসলি ও সেনাপতি লেক। ইংরেজ বাহিনীর প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার সম্মিলিত বাহিনী অল্পকালের মধ্যেই পরাজিত হয়। প্রথমে সিন্ধিয়া ক্ষান্ত হন, তার কিছুদিন বাদে ভোঁসলা ওয়াড়গাঁওর যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে দেবগাঁওর সন্ধি স্বাক্ষর করে ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করেন। তারপর সিন্ধিয়াও ইংরেজের চাপে সুরজ-অর্জুনগাঁওর চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়ে ইংরেজের বশ্যতা মেনে নিতে বাধ্য হন। সিন্ধিয়ার রাজ্যের একটি বড় অংশ ইংরেজ-

দের অধিকারে চলে যায়। সিন্ধিয়ার পরাজয়ের পর ভরতপুর, বুন্দি প্রভৃতি রাজ্যগুলিও ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করে।

সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, হোলকার তখন নিষ্ক্রিয় থাকেন। কিন্তু পরে ইংরেজদের শক্তিবৃদ্ধির তাৎপর্য উপলব্ধি করে তিনি একাই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধের গোড়ার দিকে হোলকার সাফল্য অর্জন করায় ভরতপুরের রাজা অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি অস্বীকার করেন ও হোলকারের পক্ষে যোগ দেন। হোলকার ও ভরতপুরের মিলিত বাহিনী দিল্লী দখলের জন্য অগ্রসর হলে দিগ নামক স্থানে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে তাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যদেরই জয় হয়। তখন ভরতপুরের রাজা তাড়াতাড়ি ইংরেজের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নেন (১৮০৫) ও ইংরেজ সরকারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ২২ লক্ষ টাকা দেন। এরপর লর্ড ওয়েলেসলি যখন হোলকারকে শেষ আঘাত হানবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন সেই সময় তাঁকে স্বদেশে ডেকে পাঠানো হয়। ফলে হোলকার সেবারের মত রক্ষা পান।

তৃতীয় যুদ্ধ—বেসিনের সন্ধিতে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সিন্ধিয়া, ভোঁসলা ও হোলকারের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আবার পেশোয়াকে অনুপ্রাণিত করে এবং তিনি ইংরেজের অধীনতা বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তৎপর হন। এ ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহ যোগান ত্রিম্বকজি। ত্রিম্বকজি যেমন ষড়যন্ত্রে ও কূটকৌশলে বিচক্ষণ ছিলেন তেমনই প্রবল ছিল তাঁর দেশাত্মবোধ, তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মহারাষ্ট্রের চার প্রধান হোলকার, সিন্ধিয়া, ভোঁসলা ও পেশোয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আত্মনিয়োগ করেন।

পুনার বৃটিশ রেসিডেন্ট এলফিনস্টোন পেশোয়ার তৎপরতার সংবাদ পেয়ে প্রথমে ত্রিম্বকজিকে গ্রেপ্তার করেন। কিন্তু ত্রিম্বকজি গোপনে পলায়ন করে আবার ইংরেজ বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হয়। তখন এলফিনস্টোন পেশোয়াকে একটি অপমানকর চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করেন (১৮১৭)। ঐ চুক্তির শর্ত অনুসারে পেশোয়া মারাঠা শক্তি জোটের নেতৃপদ ত্যাগে বাধ্য হন এবং মালব, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি স্থান ইংরেজদের ছেড়ে দেন। পরন্তু তাঁকে এ শর্তও মেনে নিতে হয় যে ইংরেজ সরকারের অনুমতি ছাড়া তিনি কোন রাজ্যের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ করতে পারবেন না।

কিন্তু পেশোয়ার নিগ্রহ সত্ত্বেও হোলকার সিন্ধিয়া ভোঁসলার ইংরেজ বিরোধী প্রস্তুতি বেশ কিছুটা অগ্রসর হলে পেশোয়ার নির্দেশে একদিন পুনাস্থ বৃটিশ রেসিডেন্ট এলফিনস্টোনের গৃহে আগুন লাগানো হয়। এলফিনস্টোন কোনক্রমে পলায়নে সমর্থ হন। এর পরেই ইংরেজের সঙ্গে মারাঠা শক্তি জোটের যুদ্ধ শুরু হয়। এই

যুদ্ধ তৃতীয় মারাঠা (ইঙ্গ) যুদ্ধ নামে অভিহিত (১৮১৭-১৮)। তখন ভারতের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন লর্ড হেস্টিংস।

পুনা আক্রান্ত হতেই পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও পলায়ন করেন ও পুনা ইংরেজের অধিকারভুক্ত হয়। হোলকার ও ভোঁসলাও অনতিবিলম্বে পরাজিত হন। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও কোরিগাঁও ও অস্তির যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। পেশোয়ার মন্ত্রী গোকলা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু বরণ করেন। এইভাবে সব কটি মারাঠাশক্তি পরাস্ত হওয়ায় ভারতে ইংরেজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বাজিরাওকে বাৎসরিক ভাতা দানের ব্যবস্থা হয় ও তাঁর রাজ্যের একাংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মারাঠাজাতিকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার শিবজির এক বংশধরকে পেশোয়ার রাজ্যের অপর অংশে অধিষ্ঠিত করান। ভোঁসলার রাজ্যের একাংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হোলকারকেও তাঁর রাজ্যের একাংশে বৃটিশ অধিকার মেনে নিতে হয় এবং ইংরেজ সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন বহিঃ-শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ না করার জন্যও তাঁকে চুক্তিবদ্ধ হতে হয়।

মারাঠা শক্তির ইতিহাস : ভারতের পশ্চিম প্রান্তে আরব সাগরের উপকূলে একটি বিশাল ভূখণ্ডে মারাঠা জাতির বাস। ঐ ভূখণ্ড বর্তমানে মহারাষ্ট্র নামে অভিহিত। মহারাষ্ট্রের ভূমি অনুর্বর ও পর্বত সঙ্কুল এবং বৃষ্টিপাত যথেষ্ট নয় বলে কঠোর শ্রম করে মহারাষ্ট্রবাসীদের জীবন নির্বাহ করতে হয়। সে কারণে মারাঠা জাতি চির-দিনই কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী ও বলিষ্ঠ। ঐসব গুণের জন্য মারাঠারা বরাবরই ঐ এলাকার বিভিন্ন রাজ্যে সামরিক বাহিনীতে কাজ পেত। একনাথ, তুকারাম প্রমুখ ধর্মপ্রচারকদের শিক্ষায় মারাঠারা এক স্বতন্ত্র জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। সেই ঐতিহাসিক ক্ষণে শিবজির আবির্ভাবে মারাঠারা এক ঐক্যবদ্ধ, দুর্ধর্ষ, ধর্মপ্রাণ সামরিক জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

শিবজি প্রথমে মাওলি উপজাতীয়-দের নিয়ে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তারপর দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের অনৈক্য ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি বিজাপুর রাজ্যের তোরণা দুর্গটি অধিকার করেন। শিবজির নেতৃত্বে মারাঠাদের ঐ প্রথম সামরিক তৎপরতা ও সাফল্যের অল্প-কাল পরেই বিজাপুরের রায়গড় দুর্গটি শিবজির অধিকারে আসে। শিবজির পিতা সাহজি বিজাপুরের সুলতানের দরবারে চাকরি করতেন। শিবজির ক্রমবর্ধমান সামরিক তৎপরতা বন্ধের উদ্দেশ্যে বিজাপুরের সুলতান সাহজিকে বন্দী করলে শিবজি কিছুকাল বিজাপুর রাজ্যে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ রাখেন। কয়েক বছর বাদে সাহজি মুক্তি পেলে আবার শিবজির অভিযান শুরু হয়। জাওলির মারাঠা নৃপতিকে হত্যা করে শিবজি ঐ রাজ্যটি অধিকার করেন। তার অল্পকাল পরেই বিজা-পুরের সুলতানের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের

তৎকালীন মোগল শাসনকর্তা ঔরংজেবের সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে শিবজি মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জুনার ও আমেদনগর লুণ্ঠন করেন। তারপরেই শিবজির সঙ্গে ঔরংজেবের বিরোধ শুরু হয়। কিন্তু ঔরংজেবের শক্তির সমকক্ষ শিবজি তখনও ছিলেন না এবং সে কারণে তিনি অবিলম্বে মোগল শাসকের বশ্যতা স্বীকার করে নেন।

এর অল্পকাল পরে সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে ঔরংজেব দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করে দিল্লী যাত্রা করেন, আর তখনই শিবজি আবার তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের বহুস্থান দখল করেন এবং ১৬৫৯ খ্রী কোঙ্কন রাজ্যেরও একাংশ শিবজির অধিকারভুক্ত হয়।

প্রথমে বিজাপুরের সুলতান শিবজিকে দমনের জন্য তাঁর সেনাপতি আফজল খাঁকে পাঠান (১৬৫৯)। আফজল খাঁ শিবজিকে বন্দী করার চেষ্টা করেন কিন্তু শিবজির কৌশলে আফজল খাঁ নিহত হন। তারপর সম্রাট ঔরংজেব শিবজিকে দমনের উদ্দেশ্যে তাঁর মাতুল শায়েস্তা খাঁকে পাঠান। কিন্তু শায়েস্তা খাঁও শিবজির অতর্কিত আক্রমণ থেকে কোনরকমে প্রাণ রক্ষা করে পলায়ন করেন। তারপর শিবজিকে দমন করতে ঔরংজেব অম্বররাজ জয়সিংহ ও সেনাপতি দিলীর খাঁকে পাঠান। ঐ বিপুল শক্তিকে পরাজিত করা সম্ভব নয় বুঝে শিবজি পরাজয় স্বীকার করেন ও পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষর করেন (১৬৬৫)। সন্ধির শর্ত অনুসারে শিবজি ২৩টি দুর্গের অধিকার ত্যাগ করেন। তারপর ঔরংজেবের আমন্ত্রণে ও জয়সিংহের পরামর্শে শিবজি দিল্লীর দরবারে পুত্র শম্ভুজিকে নিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু মোগল সম্রাট তাঁকে সেখানে বন্দী করেন। সুচতুর শিবজি কিন্তু কৌশলে বন্দী অবস্থা থেকে পুত্রকে নিয়ে মুক্ত হন ও বহু দেশ ঘুরে স্বরাজ্যে ফিরে আসেন।

স্বরাজ্যে ফিরে এসে শিবজি যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ রেখে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। ঐ সময় ঔরংজেবের সঙ্গে শিবজির আপস হয়ে যায় এবং মোগল সম্রাট শিবাজিকে 'রাজা' উপাধি দেন এবং বেরারের কিছু অংশ তাঁকে জায়গির হিসাবে দান করেন। এর তিন বছর পরে শিবজি আবার সক্রিয় হন এবং রাজ্যের প্রায় সব হৃত এলাকা পুনরুদ্ধার করেন। ১৬৭৪ খ্রী মহাসমারোহে শিবজির অভিষেক সম্পন্ন হয়। তারপর কয়েক বছরের মধ্যে শিবজির নেতৃত্বে বিশাল মারাঠাসাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। কিন্তু ১৬৮০ খ্রী শিবজির অকস্মাৎ মৃত্যু হয়।

শিবজির মৃত্যুর পর শম্ভুজি মারাঠা রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। পিতার প্রতিভা ও যোগ্যতা না থাকলেও শম্ভুজি সাহসী ছিলেন এবং মোগলদের বিরুদ্ধে মারাঠাদের অভিযান তিনি অব্যাহত রাখেন। মারাঠাদের দমনের জন্য সম্রাট ঔরংজেব স্বয়ং ১৬৮১ খ্রী দাক্ষিণাত্যে আসেন এবং তারপর জীবনের অবশিষ্ট ছাব্বিশ বছর তিনি দাক্ষিণাত্যেই অতিবাহিত করেন।

১৬৮৯ খ্রী শম্ভুজি মোগলদের হাতে বন্দী ও পরে নিহত হন। এরপর মারাঠা রাজ্যের বহু স্থান, এমন কি রাজধানী রায়গড় মোগলদের দখলে চলে যায়। রায়গড়ের পতনকালে শম্ভুজির শিশুপুত্র সাহু ও পরিবারের লোকজন মোগলদের হাতে বন্দী হন। তখন শম্ভুজির ছোটভাই রাজারাম মোগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান ও অনেকগুলি মারাঠা দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন। রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী তারাবাঈ মোগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান এবং রাজারামের শিশুপুত্র তৃতীয় শিবজি মারাঠা রাজ্যের রাজা বলে ঘোষিত হন। মারাঠারা অবিশ্রান্ত আক্রমণ চালিয়ে মোগলদের উত্যক্ত করে তোলে এবং ১৭০৭ খ্রী সম্রাট ঔরংজেবের মৃত্যুর পর তারা দুর্নিবার হয়ে ওঠে। ঐ সময় মারাঠাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্রাট ঔরংজেবের পুত্র আজমশাই শম্ভুজির বন্দীপুত্র সাহুকে মুক্তি দেন।

সাহু মুক্ত হয়েই মারাঠা রাজ্যের দাবি করেন। কিন্তু তারাবাঈ তাঁর পুত্রের দাবি ত্যাগ না করায় মারাঠাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। আবার ১৭১২ খ্রী তারাবাঈর মৃত্যুর পর রাজারামের দ্বিতীয় পত্নী রাজসবাঈ তাঁর পুত্র দ্বিতীয় শম্ভুজিকে মারাঠা রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করলে মারাঠাদের অন্তর্বিরোধ আরও বৃদ্ধি পায়। সেই সময় কোঙ্কনের চিৎপাবন বংশীয় ব্রাহ্মণ বালাজি বিশ্বনাথ সাহুর পক্ষ অবলম্বন করেন। তাঁর চেষ্টায় সব বিরোধের নিষ্পত্তি হয় এবং সাহু মারাঠা রাজ্যের রাজা হন ও বালাজি বিশ্বনাথ হন তাঁর পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী। বালাজি বিশ্বনাথের চেষ্টায় মারাঠারা আবার এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়।

বালাজি বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম বাজিরাও পেশোয়া পদ গ্রহণ করেন এবং তখন থেকে পেশোয়া পদ বংশানুক্রমিক হয়। বাজিরাওর দক্ষতায় অবিলম্বে মারাঠা রাজ্য বিশাল আকার ধারণ করে। তিনি প্রথমে বিভিন্ন মারাঠা শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি মারাঠা যৌথরাষ্ট্র গঠন করেন। তাতে যোগ দেন গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, বরদার গাইকোয়াড়, নাগপুরের ভোঁসলা এবং মারাঠা সামন্তরাজ্য ধার ও পাওয়ার। তারপর জয়পুরের রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ এবং বুন্দেলখণ্ডের রাজা ছত্রসালের সঙ্গে বাজিরাওর মিত্রতা হয় এবং নিজাম-উল-মল্‌ককে যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় মারাঠা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৪০ খ্রী প্রথম বাজিরাওর মৃত্যু হয়।

বাজিরাওর মৃত্যুর পর মারাঠাদের ঐক্যবন্ধন আবার শিথিল হয়। তখন মোগল সাম্রাজ্যও ধ্বংসোন্মুখ। সেই সময় উত্তর ভারতে আহমদশাহ আবদালির অভিযান শুরু হয়। ১৭৪৮—৬৭ খ্রী মধ্যে আহমদশাহ কয়েকবার ভারত আক্রমণ করেন ও কাবুল, কান্দাহার, পেশোয়ার, কাশ্মীর, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থান জয় করেন। মোগল বাদশাহ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আহমদশাহকে সিন্ধু, সরহিন্দ প্রভৃতি স্থানও ছেড়ে

দিতে বাধ্য হন। আহমদশাহ নিজ পুত্র তৈমুরকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই সময় তৃতীয় পেশোয়া বালাজি বাজিরাওর ভাই রঘুনাথরাও তৈমুরকে পরাজিত করে পাঞ্জাব দখল করে নেন। ফলে আহমদশাহ ক্রুদ্ধ হয়ে আবার ভারতে আসেন ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় মারাঠারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আহমদশাহ আবদালির আক্রমণের সম্মুখীন হন না। উত্তর ভারতের জাঠ, রাজপুত প্রভৃতি রাজারাও মারাঠা প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কায় নিষ্ক্রিয় থাকেন। অপর দিকে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্দৌলা, রহিলা সর্দার নজিব খাঁ প্রমুখ মুসলমান রাজারা আহমদশাহর পক্ষে যোগ দেন। ১৭৬১ খ্রী ১৪ জানুয়ারি পাণিপথের প্রান্তরে মারাঠা-দের সঙ্গে আহমদশাহ আবদালির যে যুদ্ধ হয় হয় তা পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নামে খ্যাত। ঐ যুদ্ধে মারাঠাদের শোচনীয় পরাজয় হলে সর্বভারতীয় রাজ্যরূপে মারাঠাদের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা চিরতরে লোপ পায়।

পানিপথের যুদ্ধে আহমদশাহ আবদালির ৬০ হাজার আফগান সৈন্যের বিরুদ্ধে ৪৫ হাজার মারাঠা সৈন্যের অসম যুদ্ধের ফলাফল সম্পূর্ণরূপে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যায়। চল্লিশ হাজার মারাঠা সৈন্য একদিনের যুদ্ধে (১৪ জানুয়ারি, ১৭৬১) নিহত হয়। সেদিন মহারাষ্ট্রের প্রায় প্রতি ঘরে আত্মীয় বিয়োগ বেদনায় কান্নার রোল ওঠে। যুদ্ধক্ষেত্রে পেশোয়া বালাজি বাজিরাওর পুত্র, রণক্ষেত্রের প্রধান নায়ক বিশ্বাসরাও, সেনাপতি সদাশিবরাও ভাও প্রমুখ সৈন্যাধ্যক্ষরা প্রাণ হারান। ঐ মর্মান্তিক সংবাদ শোনার অনতিকাল পরে পেশোয়াও মারা যান (জুন, ১৭৬১)। মারাঠা যৌথরাষ্ট্র ভেঙে পড়ে; সিন্ধিয়া, হোলকার, ভোঁসলা, গাইকোয়াড় সকলেই পেশোয়ার নিয়ন্ত্রণমুক্ত কার্যত স্বাধীন রাজ্যরূপে নিজ নিজ এলাকা শাসন করতে থাকেন।

কিন্তু ঐ হতাশার দিনেও বালাজি বাজিরাওর পুত্র প্রথম মাধবরাও পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হয়েই আবার মারাঠা শক্তিকে সুসংহত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর শাসন-কালে (১৭৬১-৭২) মারাঠা শক্তি অল্প-কালের মধ্যেই আবার সুসংহত ও প্রবল হয়ে ওঠে। মারাঠাদের ভাগ্য-বিপর্যয়ের সুযোগ নিতে হায়দরাবাদের নিজাম আলি ও মহীশূরের হায়দর আলি তৎপর হন। কিন্তু নিজাম আলি পরপর দুটি যুদ্ধে ও হায়দর আলি শ্রীরঙ্গপত্তনমের যুদ্ধে মারাঠাদের কাছে পরাজিত হন। উত্তরভারতেও মারাঠা-দের মালোয়া ও বুন্দেলখণ্ড জয়ের অভিযান সফল হয়, জাঠ ও রোহিলা-দের দমন করা হয়; বহু রাজপুত রাজ্য মারাঠাদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন। মারাঠারা ইংরেজের হাতে এলাহাবাদে বন্দী মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে মুক্ত করে দিল্লী নিয়ে যায় এবং দিল্লীও কার্যত মারাঠাদের নিয়ন্ত্রণে আসে (১৭৭২)। কিন্তু ঐ সময়েই মাধবরাও পেশোয়া তাঁর ক্ষমতালোভী

পিতৃব্য রঘুনাথ রাওর ষড়যন্ত্রে নিহত হন এবং তার ফলে আবার মারাঠা শক্তিগুলির মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয় তা থেকে উদ্ধার লাভ মারাঠাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয় না।

মারাঠাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নেয় ইংরেজ এবং পর পর তিনটি যুদ্ধে (মারাঠা ইঙ্গ যুদ্ধ-দ্র) ইংরেজদের কাছে পরাজিত হওয়ার পর সব কটি মারাঠা রাজ্য ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করে। পেশোয়াকে ইংরেজ সরকার থেকে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়। পেশোয়ার রাজ্যের বৃহদংশ বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অপর অংশ, মারাঠাদের সন্তুষ্ট করার জন্য, শিবজির এক বংশধরকে দান করা হয়।

মালব্য মদনমোহন (১৮৬১-১৯৪৬): বিশিষ্ট পণ্ডিত, শিক্ষাব্রতী, দেশনেতা। ১৮৮৬ খ্রী জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে যুক্তপ্রদেশের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। প্রথমে শিক্ষকতা, তারপরে 'হিন্দুস্তান', 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন' প্রভৃতি ইংরেজি পত্রিকা সম্পাদনার পর ১৮৯৩ খ্রী এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ১৯০২ খ্রী যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯০৯ ও ১৯১৮খ্রী কংগ্রেসের লাহোর ও দিল্লী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। পরে কংগ্রেসের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন ও মহসভার ১৯২৩, ১৯২৪ ও ১৯৩৬ সালের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩১ খ্রী লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মালব্যজির শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

মালিক কাফুর: সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সেনাপতি। প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্য বিস্তারে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৩০৫-১১ খ্রী মধ্যে মালিক কাফুর দেবগিরি, ওয়ারাঙ্গল, দ্বারসমুদ্র, মাদুরা জয় করেন এবং ১৩১২ খ্রী দ্বিতীয়বার দেবগিরি আক্রমণ করেন। মালিক কাফুরের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল লুণ্ঠন। সব রাজ্য থেকেই হস্তী, অশ্ব, মণিমাণিক্য লুঠ করে তিনি দিল্লী ফিরে যেতেন। এ ব্যাপারে মালিক কাফুর প্রকৃতপক্ষে সুলতান আলাউদ্দিনের নীতি মতোই কাজ করেন। দিল্লী থেকে সুদূর দাক্ষিণাত্যে সুষ্ঠু রাজ্য শাসন সম্ভব নয় বুঝে সুলতান আলাউদ্দিন দাক্ষিণাত্যের ধনদৌলত ও সেখানকার রাজাদের আনুগত্য লাভেই সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিলেন।

শেষ বয়সে সুলতান আলাউদ্দিন অসমর্থ হলে মালিক কাফুর রাজ্যের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন। সম্ভবত মালিক কাফুরের ষড়যন্ত্রেই আলাউদ্দিনের মৃত্যু হয়। আলাউদ্দিন মৃত্যুকালে, সম্ভবত মালিক কাফুরের চাপে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজর খাঁকে বঞ্চিত করে নাবালক কনিষ্ঠ পুত্র শিহাবুদ্দিন ওমরকে সুলতান পদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। সে কারণে শিহাবুদ্দিন ওমর সুলতান হলে তাঁর অভিভাবকরূপে মালিক কাফুরই রাজ্যের সর্বেসর্বা হন। ঐ সময় মালিক কাফুরের নির্দেশে আলাউদ্দিনের দুই পুত্র খিজর খাঁ ও সাদি খাঁকে অন্ধ করা হয়। তারপর মালিক কাফুর আলা-

উদ্দিনের তৃতীয় পুত্র মুবারককেও খতম করার জন্য লোক লাগান। কিন্তু মুবারক ঐ লোকগুলিকেই প্রচুর ঘুষ দিয়ে মালিক কাফুরকে হত্যা করান। মালিক কাফুর নিহত হওয়ার পর মুবারক প্রথমে শিহাবুদ্দিনের অভিভাবক বলে নিজেকে ঘোষণা করেন। পরে শিহাবুদ্দিনকে অন্ধ করে নিজেই মসনদ দখল করেন। সুলতান হওয়ার পরেই মুবারক মালিক কাফুরের হত্যাকারীদের কোন সুবিধা আদায়ের সুযোগ না দিয়ে প্রত্যেককে খতম করেন।

মাসির-ই-আলমগিরি : মোগল সম্রাট ঔরংজেবের শাসনকালের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ইতিহাস। লেখক মুহম্মদ সাকি মুস্তাইদ খাঁ সম্রাট ঔরংজেবের রাজদরবারের সঙ্গে চল্লিশ বছর ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন এবং গ্রন্থটির অধিকাংশ তিনি লেখেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। এতে যেমন মোগল রাজদরবারের নানা চিত্তাকর্ষক কাহিনীর বর্ণনা আছে তেমনই আছে ঔরংজেবের বিভিন্ন অভিযানের বিস্তারিত বর্ণনা। সম্রাটের মৃত্যুর তিন বছর পরে, ১৭১০খ্রী গ্রন্থটির রচনা শেষ হয়।

মাহমুদ গাওয়ান : মাহমুদ গাওয়ান ছিলেন পারস্যের লোক, ভাগ্যান্বেষণে ভারতে আসেন এবং দাক্ষিণাত্যে বাহমনি নৃপতিদের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। স্বীয় প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার গুণে তিনি বাহমনি নৃপতি হুমায়ুনের (১৪৫৭-৬১) প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং তারপর আরও দুইজন বাহমনি নৃপতির প্রধানমন্ত্রীরূপে কাজ করেন। ১৪ বছর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের পর তিনি এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বলি হন এবং ১৪৮১ খ্রী তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তিনি যেমন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন, রণকুশলতায়ও তেমনই পারদর্শিতা দেখান। বিজয়নগর, কোঙ্কন, সঙ্গমেশ্বর, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যের বিরুদ্ধে গাওয়ান সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত ছিলেন এবং রাজ্য বিস্তারেও তিনি বিশেষ তৎপরতা দেখান। সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে ৭৮ বছর বয়সে গাওয়ানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পরেই বাহমণি রাজ্যের পতন শুরু হয়।

মিজোরাম : ভারতের নয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের একটি। আয়তন ২১,০৯০ বর্গ কিলোমিটার। রাজধানী আইজল। মিজোরামের লোকসংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষ। ১৯৭২ সালে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ার আগে মিজোরাম ছিল আসামের একটি জেলা, তখন নাম ছিল মিজো হিলস ডিস্ট্রিক্ট। মিজোদের দাবি অনুসারে জেলাটিকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করা হয় ও নাম দেওয়া হয় মিজোরাম, যার অর্থ মিজোদের দেশ।

ভারতের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত এই পার্বত্য জেলাটি ১৮৯১ সালে বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে মিজোরাম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হলেও সেখানে নিজস্ব শাসনব্যবস্থা আছে। মিজোরাম বিধানসভায় ৩৩জন সদস্য।

মিত্রাদেতিস : পার্থিয়ার রাজা, শাসনকাল ১৭১-৩৭ খ্রী পূর্ব। তিনিই প্রথম ভারত আক্রমণ করেন এবং ঝিলম ও সিন্ধুনদীর মধ্যবর্তী স্থান, ইন্দো-ব্যাকট্রিয়ান রাজা ডেমেট্রিউসকে পরাজিত করে অধিকার করেন।

মিথিলার কর্ণাটক বংশ : একাদশ শতাব্দীর শেষে, সম্ভবত ১০৯৭ খ্রী কর্ণাটক রাজবংশের নান্যদেব বিহারের তীরভুক্তি অঞ্চলে রাজ্য-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তীরভুক্তি (বর্তমান ত্রিহুত) মিথিলা নামেও পরিচিত ছিল এবং নান্যদেব যে অঞ্চলের রাজা হন তার চতুঃসীমায় ছিল গণ্ডক, কৌশি, হিমালয় ও গঙ্গানদী। সম্ভবত চালুক্য নৃপতি ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য নান্যদেবকে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। নান্যদেব পূর্বে সম্ভবত পালবংশীয় রাজাদের উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি স্বাধীন রাজারূপে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হন। মিথিলার কর্ণাটক রাজ্যের রাজধানী ছিল সীমারামপুর, বর্তমান নাম সিমরাঁও। নান্যদেবের সঙ্গে সম্ভবত গৌড়ের রাজা কুমার পাল ও বঙ্গের রাজা হরি বর্মনের যুদ্ধ হয়। নান্যদেবের নেপাল জয়ের কাহিনীও প্রচলিত আছে। নান্যদেব প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হন তাঁর পুত্র গঙ্গদেব। গঙ্গদেবের রাজত্বকাল একচল্লিশ বছর। তারপর একে একে রাজত্ব করেন নৃসিংহ, শক্তি-সিংহ, ভূপাল সিংহ ও হরিসিংহ। হরিসিংহ সম্ভবত ১৩২৪ খ্রী নেপাল জয় করেন।

মিনান্দার : ব্যাকট্রিয় গ্রীক নৃপতি। শাসনকাল ১৬০-১২০ খ্রী-পূ। পুষ্যমিত্র শুঙ্গর সমকালীন। পরাক্রম-শালী নৃপতিরূপে খ্যাত। আফ-গানিস্থান, পাঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতানা, কাথিওয়াড়, মথুরা তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজধানী ছিল সাকলা, বর্তমান শিয়ালকোট। মিনান্দার সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় রাজায় পরিণত হন ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় 'মিলিন্দা'।

মিণ্টো, লর্ড : ১৮০৭-১৩ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন। তাঁর শাসনকালে, ১৮০৯ খ্রী অমৃতসরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় যাতে শতদ্রু নদী পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের রাজ্য ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমান্তরূপে চিহ্নিত হয়। লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী কঠোর হাতে সে বিদ্রোহ দমন করে। মাদ্রাজে সৈন্য-বাহিনীর মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দেয়, কিন্তু তা বিদ্রোহের রূপ নেওয়ার আগেই সংযত করা হয়।

মিণ্টো, লর্ড (দ্বিতীয়) : লর্ড মিণ্টো ১৯০৫-১০ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন। তাঁর শাসনকালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের বিরোধের ফলে ১৯০৭ সালে সুরাটে জাতীয় কংগ্রেস দ্বিখণ্ডিত হয়; ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। ঐবছরেই সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপের অভিযোগে অরবিন্দ ঘোষ, কানাইলাল প্রমুখ বিপ্লবীরা গ্রেপ্তার

হন। ঐ পরিস্থিতিতে ভারতবাসীকে শান্ত করার জন্য ১৯০৯ খ্রী কাউন্সিলস এক্ট পাশ হয়, যা তৎকালীন ভারত সচিব মর্লি ও গভর্নর-জেনারেল মিণ্টোর নামানুসারে মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কার নামে অভিহিত হয়। পরের বছর লর্ড মিণ্টোর কার্যকাল শেষ হয়।

মিরকাশিম: মিরজাফরের জামাতা। ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শ্বশুরকে মসনদচ্যুত করেন ও ১৭৬০ খ্রী বাংলার নবাব হন। ১৭৬৪ খ্রী পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। ষড়যন্ত্র করে মসনদ দখল করলেও মিরকাশিম তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। নবাব পদে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি ইংরেজদের বাংলা থেকে তাড়ানোর জন্য তৎপর হন। ইংরেজদের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য তিনি বাঙলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। তারপর ইংরেজ সৈনিকদের প্রশিক্ষণে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ইউরোপীয় পদ্ধতির যুদ্ধে পারদর্শী করে তোলেন। তাঁর গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন গুর্গিন খাঁ নামে একজন আর্মেনিয়ান।

শীঘ্রই শুল্ক ফাঁকি দেওয়া নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে মিরকাশিমের বিরোধ দেখা দেয়। পাটনার ইংরেজ কুঠির প্রধান এলিস মিরকাশিমের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে পাটনা দখল করে নিলে মিরকাশিম তৎক্ষণাৎ পাল্টা আঘাত হানেন ও পাটনা পুনর্দখল করে সেখানকার ইংরেজ কুঠি ধ্বংস করেন। তারপর ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালা এই তিন স্থানে যুদ্ধ হয়। তিনটি যুদ্ধেই মিরকাশিম পরাজিত হন। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে মিরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে হাত মেলান। দিল্লীর বাদশাহ শাহআলমও ঐ জোটে যোগ দেন। তারপর ১৭৬৪ খ্রী বক্সারে ঐ তিন শক্তির সঙ্গে ইংরেজদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধেও ইংরেজদের জয় হয় এবং মিরকাশিম পলায়ন করেন। মিরকাশিমের পরাজয় ও পলায়নের পর ইংরেজদের অনুগ্রহে মিরজাফর আবার বাঙলার নবাব হন। ঐ সময় বাঙলায় ইংরেজ প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়।

মিরকাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমী ও প্রজাবৎসল শাসক। ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁর সশস্ত্র অভ্যুত্থানে প্রমাণ হয় যে পলাশির যুদ্ধেই বাঙলার ভাগ্য নির্দ্ধারিত হয়ে যায়নি।

মিরজাফর: নবাব আলিবর্দি খাঁর ভগ্নীপতি ও নবাব সিরাজুদ্দৌলার সৈন্যবাহিনীর প্রধান অধিনায়ক ছিলেন। বাঙলার নবাবির লোভে তিনি ক্লাইভের সঙ্গে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের পর পূর্ব ব্যবস্থামত মিরজাফর বাঙলার নবাব হন (১৭৫৭)। কিন্তু জামাতা মিরকাশিমের ষড়যন্ত্রে তিন বছর পরে তিনি গদিচ্যুত হন (১৭৬০)। কিন্তু মিরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ শুরু হয় এবং ১৭৬৪ খ্রী বক্সারের যুদ্ধে মিরকাশিম পরাজিত হয়ে পলায়ন করার পর ইংরেজদের অনুগ্রহে মিরজাফর আবার নবাব হন। দ্বিতীয়বার

বাঙলার নবাব হওয়ার এক বছর পরে, ১৭৬৫ খ্রী মিরজাফরের মৃত্যু হয়।

মিরজাফর নবাব হলেও কোনদিন শান্তি পাননি। অর্থলোলুপ ইংরেজ বণিকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে তিনি রাজকোষ শূন্য করেন, পরে নবাববাড়ির আসবাব ও সঞ্চিত ধন-রত্ন বিক্রয় করে তিনি তাদের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চান। কিন্তু তাতেও লর্ড ক্লাইভ ও তাঁর অনুচরদের খুশী করা যায় না। শেষে ইংরেজদের উৎখাতের জন্য তিনি ওলন্দাজ বণিক-দের শরণ নেন। কিন্তু ১৭৫৯ খ্রী বাদারের যুদ্ধে লর্ড ক্লাইভের হাতে ওলন্দাজদের শোচনীয় পরাজয় হলে ইংরেজদের হাত থেকে মিরজাফরের অব্যাহতি লাভের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৭৬০ খ্রী ইংরেজ সরকারের তৎকালীন গভর্নর ভান্সিটার্ট মিরজাফরকে ওলন্দাজদের সঙ্গে চক্রান্ত করার ও ইংরেজদের প্রাপ্য না দেওয়ার অভি-যোগে পদচ্যুত করেন এবং মির-জাফরের জামাতা মিরকাশিম বাঙলার নবাব হন। ১৭৬৪ খ্রী মিরকাশিমের পতনের পর মিরজাফর স্বল্পকালের জন্য দ্বিতীয়বার নবাব হন। ১৭৬৫ খ্রী মিরজাফরের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র নজমুদ্দৌলা নবাব পদ লাভ করেন।

দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মিরজাফর ভারতের ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত নাম।

মিরন : মিরজাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তার নির্দেশে মহম্মদি বেগ নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে হত্যা করে। পরে বজ্রাঘাতে মিরনের মৃত্যু হয়।

মিরমদন : নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিশ্বস্ত সেনাপতি। পলাশির যুদ্ধে অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে ক্লাইভের বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে বীরের মৃত্যু বরণ করেন।

মিহিরকুল : খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কালে উত্তর ভারতে আবার হূণদের আক্রমণ শুরু হয়। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পর প্রায় ত্রিশ বছর উত্তর-পশ্চিম ভারতে হূণ রাজা তোরমান ও তাঁর পুত্র মিহিরকুল রাজ্য শাসন করেন। সপ্তম শতাব্দীর চীনা পরিব্রাজক হিউ এন সাং মিহিরকুলকে তীব্র বৌদ্ধ-বিরোধী রাজা বলে বর্ণনা করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর কাশ্মীরী ঐতিহাসিক কহ্লনও মিহির-কুল সম্বন্ধে একই কথা বলেছেন। মিহিরকুল বহু বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস করেন ও বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু হত্যা করেন। কহ্লন তাঁর বর্ণনায় কাশ্মীরে বৌদ্ধদের উপর মিহিরকুলের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত ৫৩০ খ্রী মান্দাসোরের রাজা যশোবর্মন মিহির-কুলকে পরাজিত করেন। তবে কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে মিহিরকুলের রাজ্য আরও কিছুদিন বজায় থাকে। মিহিরকুলের পরেই ভারতে হূণ রাজ্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে।

মুদ্রা : প্রাচীন ভারতের নানা ঐতিহাসিক তথ্যের অন্যতম প্রামাণিক সূত্র। ব্যাকট্রিয় ও গ্রীক ভারতীয় নৃপতিদের শাসনকাল সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য শুধু তৎকালীন মুদ্রা থেকেই সংগৃহীত হয়। ঐ সব মুদ্রায় গ্রীক ও খরোষ্ঠিভাষায় লেখা তথ্যগুলি উত্তরভারতে ব্যাকট্রিয় ও গ্রীক

ভারতীয় নৃপতিদের রাজ্যশাসনের সাক্ষ্য বহন করে। কোন কোন মুদ্রায় বিভিন্ন রাজার ধর্ম ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরও পরিচয় মেলে। যেমন সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় অঙ্কিত বিষ্ণুচক্র প্রমাণ করে যে সমুদ্রগুপ্ত বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। ঐ সম্রাটকেই অপর মুদ্রায় বীণাবাদনরত অবস্থায় দেখা যায় যা তাঁর সঙ্গীতানুরাগের সাক্ষ্য বহন করে। তাছাড়া মুদ্রায় ব্যবহৃত সোনা, রূপা, তামা ও নানা মিশ্র ধাতু থেকে ঐসব মুদ্রার যুগে ভারতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধাতু সম্পর্কে ধারণা করা যায়। মুদ্রায় ব্যবহৃত সন-তারিখগুলি থেকে বিভিন্ন রাজার শাসনকাল সম্পর্কে সুনিশ্চিত প্রমাণ মেলে।

মহেঞ্জোদরোর মুদ্রা মেসোপটেমিয়ায় আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণ হয় যে সিন্ধু সভ্যতার যুগে ভারতের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল। মহেঞ্জোদরোর মুদ্রার লিপির পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয়নি, হলে সিন্ধুসভ্যতার যুগের বহু অজ্ঞাত তথ্যের কথা বিশ্ববাসীর পক্ষে জানা সম্ভব হবে। দক্ষিণভারতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমক মুদ্রার সন্ধান মিলেছে, যা খ্রীষ্টীয় যুগের সূচনাকালে ভারত ও রোমের মধ্যে সম্পর্কের সুনিশ্চিত প্রমাণ বহন করে।

মুদ্রারাক্ষস : বিশাখ দত্ত রচিত এই গ্রন্থে নন্দ ও মৌর্য বংশীয় রাজাদের নানা কাহিনী, বিশেষ করে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের হাতে নন্দবংশীয় রাজা ধননন্দের পরাজয় ও উৎখাতের কাহিনী বর্ণিত আছে।

মুবারক শাহ : দিল্লীর খলজি বংশীয় সুলতান আলাউদ্দিনের পুত্র। পিতার মনোনীত উত্তরাধিকারী কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিহাবুদ্দিনকে অন্ধ করে নিজে মসনদ অধিকার করেন ও ১৩১৬-২০ খ্রী দিল্লীর সুলতান থাকেন। অত্যন্ত বিলাসী, মগ্যপ ও দায়িত্বহীন শাসক ছিলেন। অবশেষে পার্শ্বচর খুসরো খাঁ কর্তৃক নিহত হন।

মুরাদ : মোগল সম্রাট শাহজাহানের চতুর্থ পুত্র। পিতার সিংহাসন অধিকার নিয়ে যখন শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ শুরু হয় মুরাদ তখন গুজরাতের সুবাদার ছিলেন। তিনি সাহসী ছিলেন কিন্তু অত্যধিক মগ্যপ, বিলাসী ও নির্বোধ হওয়ায় কূটবুদ্ধি ঔরংজেবের কাছে তাঁকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হয়। মুরাদের সাহায্যেই ঔরংজেব ক্ষমতা দখল করেন কিন্তু তারপরেই ঔরংজেব মুরাদকে বন্দী করেন। তিন বছর বন্দী থাকার পর মুরাদ মিথ্যা অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

মুর্শিদ কুলি খাঁ : জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণসন্তান, শৈশবে পারস্যের এক বণিকের কাছে বিক্রীত হন। তারপর তাঁকে ইস্পাহানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। মুর্শিদ কুলি খাঁর পূর্বনাম ছিল জাফর খাঁ। যৌবনে ভাগ্যান্বেষণে ভারতে আসেন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে মোগল সম্রাট ঔরংজেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথমে তিনি হায়দরাবাদের দেওয়ান নিযুক্ত হন, তারপর ১৭০১ সালে বাঙলার দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে ঢাকায়

যান। ঢাকার তখন নাম ছিল জাহাঙ্গির নগর এবং জাহাঙ্গির নগর ছিল বাঙলার রাজধানী। সেখানে ঔরংজেবের পুত্র ও বাঙলার নবাব আজিম উশ শানের মতবিরোধ হ'তে থাকলে, বাঙলার মহালগুলি ঢাকা থেকে অনেক দূরে এই অজুহাতে তিনি ১৭০৪ খ্রী মুর্শিদাবাদে তাঁর কর্মক্ষেত্র স্থানান্তরিত করেন। এ ব্যাপারে সম্রাট ঔরংজেবের সম্মতি ছিল। মুর্শিদাবাদ তখন ছিল একটি ক্ষুদ্র পল্লী। এবং ঐ স্থানের নাম ছিল মখসুসাবাদ।

সম্রাট ঔরংজেব কর্তৃক ১৭০৬ খ্রী বাঙলা ও ওড়িশার দেওয়ান ও সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি মুর্শিদ কুলি খাঁ নাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নামানুসারে বর্ধিত মখসুসাবাদ শহরের নাম হয় মুর্শিদাবাদ।

১৭০৭ খ্রী সম্রাট ঔরংজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়লে মুর্শিদ কুলি খাঁ স্বাধীন নবাবের মত রাজ্য শাসন করতে থাকেন। ১৭১৭ খ্রী মোগল সম্রাট ফারুকশিয়ার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাঙলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার ফরমান দেন, কিন্তু মুর্শিদ কুলি খাঁ সে ফরমান অগ্রাহ্য করেন। তিনি স্বাধীন রাজার মত মুর্শিদাবাদ থেকে নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করেন।

মুর্শিদ কুলি খাঁ হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন এবং বহু হিন্দু কীর্তি ধ্বংসের অপবাদ তাঁর আছে। তিনি মুর্শিদাবাদ শহরের একাংশে একটি বাজার (কাটরা) স্থাপন করেন, সে এলাকা জাফর শাহর কাটরা নামে পরিচিত হয়। ঐ কাটরায় মুর্শিদ কুলি খাঁ মক্কার মসজিদের অনুকরণে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৭২৫ খ্রী মুর্শিদ কুলি খাঁর মৃত্যু হলে তাঁর ইচ্ছানুসারে ঐ মসজিদের সিঁড়ির নীচে তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়।

মুস্লিম লীগ: ১৯০৬ খ্রী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ারূপে ঢাকায় গঠিত হয় নিখিল ভারত মুস্লিম লীগ। লীগ গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মহামান্য আগা খাঁ ও ঢাকার নবাব ভিকার-উল-মূল্‌ক্। মুস্লিম লীগ লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। সে কারণে ১৯১২ সালে বিভক্ত বঙ্গ পুনরায় যুক্ত হলে মুস্লিম লীগ ক্ষুব্ধ হয়। ঐ বছরেই খুব বড় করে লীগের সর্বভারতীয় সম্মেলন আহুত হয় এবং মহম্মদ আলি জিন্না সে সম্মেলনে যোগ দেন। কিন্তু জিন্নার ভাষণ মুস্লিম লীগ সদস্যদের নিরাশ করে। তিনি বলেন, বৃহত্তর স্বার্থে ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে পাশাপাশি বাস করতে হবে ও সে কারণে উভয় সম্প্রদায়ের মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করে তোলার দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে।

জিন্নার সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ হয় ১৯২১ সালে, গান্ধিজির নেতৃত্বে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর। তিনি আন্দোলনের বিরোধিতা করে বলেন, শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পথেই স্বরাজ অর্জন সম্ভব। জিন্না কংগ্রেস ত্যাগ করেন, কিন্তু মুস্লিম লীগেও যোগ দেন না। ১৯২৪ সালেও লাহোরে মুস্লিম লীগের অধিবেশনে তিনি বলেন, হিন্দু-মুস্লিম মিলিত হলে তবেই ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব।

১৯৩৬ খ্রী জিন্না মুস্লিম লীগে যোগ দেন এবং তখন থেকেই মুস্লিম লীগ একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অবশ্য মুস্লিম লীগ কোন বড় রকমের সাফল্য লাভ করে না। সারা ভারতের ১১টি প্রদেশের ৪৮২টি মুস্লিম আসনের মধ্যে মাত্র ১১০টিতে মুস্লিম লীগ প্রার্থীরা জয়ী হন। মুস্লিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বাংলা কোথাও মুস্লিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠনে সমর্থ হয় না। কিন্তু জিন্নার নেতৃত্বে কয়েক বছরের মধ্যেই মুস্লিম লীগ ভারতের মুস্লিম সম্প্রদায়ের প্রায় একমাত্র দলে পরিণত হয়।

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে মুস্লিম লীগের সম্মেলনে মুস্লিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় প্রদেশগুলিকে নিয়ে মুস্লিমদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের দাবি জানানো হয়। ঐ সম্মেলনেই প্রথম 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' প্রচারিত হয়। মহম্মদ আলি জিন্না তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন, ভারতের হিন্দু ও মুস্লিম দুটি স্বতন্ত্র 'জাতি' (Nation), সুতরাং দুটি জাতির জন্য দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চাই। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের দাবিতে মুস্লিম লীগ সব কটি মুস্লিম আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং একমাত্র সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া সর্বত্র আশাতীত সাফল্য লাভ করে। ফলে পাকিস্তানের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে দাবিতে মুস্লিম লীগ শেষ পর্যন্ত অবিচল থাকায় ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

লীগের অন্যান্য নেতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন লিয়াকৎ আলি খাঁ, খাজা নাজিমুদ্দিন, শহিদ সুরাবর্দি, সর্দার আব্দুর রব নিস্তার, আই. আই. চুন্দ্রিগড় প্রভৃতি।

মহম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮): রফি-উদ-দৌলার (দ্বিতীয় শাহজাহান) মৃত্যুর পর, মোগল রাজদরবারে বিশেষ প্রভাবশালী সৈয়দভ্রাতাদের ব্যবস্থানুসারে মহম্মদ শাহ দিল্লীর বাদশাহ হন। সৈয়দভ্রাতাদের ইচ্ছায় দিল্লীর মসনদ লাভ করলেও মহম্মদ শাহ রাজদরবারকে সৈয়দভ্রাতাদের প্রভাবমুক্ত করার জন্য তৎপর হন এবং ১৭২২ খ্রী সে কাজে সাফল্য লাভ করেন।

মহম্মদ শাহ অযোগ্য শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনকালে বঙ্গদেশ, অযোধ্যা আগ্রা, রহিলাখণ্ড প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ হয় এবং ঐ সব স্থানের শাসকরা দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করেন। হায়দরাবাদ স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহম্মদ শাহর রাজত্বকালে পারস্যের রাজা নাদির শাহ (১৭৩৯) ও আহমেদ শাহ আবদালি (১৭৪৮) ভারত আক্রমণ করেন। নাদির শাহর পুত্রের সঙ্গে মহম্মদ শাহর কন্যার বিবাহ হয় এবং নাদির শাহ দিল্লী ত্যাগের সময় মহম্মদ শাহকে দিল্লীর বাদশাহরূপে স্বীকৃতি জানান।

পরবর্তীকালে আহমেদ শাহ আবদালি ভারত আক্রমণ ক'রে দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হলে মহম্মদ শাহ পাঞ্জাব ও মুলতান আহমেদ শাহকে দিয়ে শান্তি ক্রয় করেন। কিন্তু তাতেও

তিনি রক্ষা পান না। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত ও অন্ধ ক'রে বন্দী করা হয়।

মেগাস্থিনিস: গ্রীক নৃপতি সেলিউকসের দূতরূপে মেগাস্থিনিস প্রায় পাঁচ বছর (৩০২-২৯৮ খ্রী-পূ) সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তৎকালীন ভারতের সমাজ ও শাসনব্যবস্থা, নগরীর সমৃদ্ধি, পথঘাট, প্রজাদের দৈনন্দিন জীবন, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা তাঁর 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। সেই গ্রন্থটির কোন অনুলিপি পাওয়া যায়নি কিন্তু স্ত্রাবো, আরিয়ান, জাস্টিন প্রমুখ গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকদের রচনায় তার বড় বড় উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। ঐ উদ্ধৃতিগুলি থেকেই খ্রী-পূ চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ও তৃতীয় শতাব্দীর সূচনার ভারতের একটি প্রামাণ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায়।

মেগাস্থিনিস কাবুল ও পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে উপনীত হন। তিনি ভারতের অন্য কোথাও যাননি। গঙ্গার নিম্ন অববাহিকা সম্বন্ধে তাঁর বর্ণনা অন্যের মুখে শোনা কাহিনীর উপর রচিত। তিনি ভারতের কোন ভাষা শেখেননি, এবং লোকমুখে শুনে তিনি যা লিখেছেন তা প্রায় ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জিত। কিন্তু তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে বা তাঁর রাজসভা ও রাজধানী পাটলিপুত্র সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা সম্পূর্ণ তথ্যনির্ভর এবং বহু ক্ষেত্রে তা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর মুখ্য মন্ত্রণাদাতা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের বর্ণনার সদৃশ।

মেগাস্থিনিসের বর্ণনানুসারে পাটলিপুত্র ছিল তখন ভারতের বৃহত্তম ও সর্বাধিক সমৃদ্ধ নগরী। সাড়ে নয় মাইল দীর্ঘ ও পৌনে দুই মাইল প্রস্থ নগরীটি ছিল প্রাচীর বেষ্টিত, যাতে ছিল ৫৭০টি মিনার ও ৬৪টি প্রবেশপথ। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য ও আড়ম্বর পারস্যের রাজপ্রাসাদ অপেক্ষাও বেশি ছিল। পাটলিপুত্র ছাড়াও কৌশম্বী, তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী নগরীর উল্লেখ মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে আছে।

মেগাস্থিনিস ভারতের অধিবাসীদের দার্শনিক, কৃষক, পশুপালক ও শিকারী, কারিগর, সৈনিক, নগর-পরিদর্শক ও পৌরপালক এই সাত ভাগে ভাগ করেন। চন্দ্রগুপ্তর রাজ্যের আইন ও শাসন শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে বলেছেন, আইন ছিল অত্যন্ত কঠোর এবং লঘু অপরাধেও হাত-পা কাটার বিধান ছিল। তবে জনসাধারণ অপরাধপ্রবণ ছিল না এবং সরল শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করত। দাসপ্রথা একেবারেই ছিল না। ভারতে সেদিন কোন লিখিত আইন না থাকার কথা বলে মেগাস্থিনিস তার কারণস্বরূপ যে বলেছেন, লিখন রীতি তখনও ভারতে অজ্ঞাত ছিল, সেটা ঠিক বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন না। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তর শাসনকালে ভারতবাসীরা যে লিখন পঠনে পারদর্শী ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকরা পেয়েছেন।

মেঘালয়: উত্তর-পূর্ব ভারতে অবস্থিত ভারতের অন্যতম রাজ্য। ১৯৭০

সালের ২ এপ্রিল স্বয়ংশাসিত এলাকা হয়. ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি পূর্ণ-রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। 'মেঘালয়' কথাটির অর্থ মেঘের দেশ, অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্যই নতুন রাজ্যটির ঐ নাম দেওয়া হয়। খাসি, জয়ন্তিয়া ও গারোদের এই পার্বত্য রাজ্যটির মোট আয়তন ২২,৪৮৯ বর্গ কিমি। লোক-সংখ্যা ১২ লক্ষ। রাজধানী শিলং। রাজ্যটিতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০০০ থেকে ১২৭০ সেন্টিমিটার। চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বছরে গড়ে ১২৭০ সেন্টিমিটার (৫০০ ইঞ্চি)। ঘন ঘন, নদী, ঝর্ণা ও পাহাড়ে ভরা মেঘালয়।

মেটকাফ, স্যার চার্লস : লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের পর স্যার চার্লস মেটকাফ ১৮৩৫ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল হন। তিনি মাত্র এক বছর ঐ পদে বহাল ছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকার তাঁর শাসনকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়। এ ব্যাপারে ডাইরেক্টর সভা তাঁর সমা-লোচনা করলে তিনি ১৮৩৬ খ্রী পদত্যাগ করেন।

মেয়ো, লর্ড : লর্ড মেয়ো ১৮৬৯ খ্রী পাঁচ বছরের জন্য গভর্নর-জেনালের নিযুক্ত হয়ে এদেশে আসেন। তিনি জনপ্রিয় শাসক ছিলেন এবং এদেশে শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ উৎসাহ দেখান। কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই ১৮৮২ খ্রী আন্দামান পরিদর্শনকালে এক নির্বাসিত বন্দীর অতর্কিত আক্রমণে লর্ড মেয়ো নিহত হন।

মৈত্রক বংশ : গুপ্ত সাম্রাজ্য শক্তিহীন হয়ে পড়লে মৈত্রক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভট্টারকের নেতৃত্বে কাথিয়া-ওয়াড়ে বল্লভী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ভট্টারক গুপ্ত সাম্রাজ্যের পদস্থ সামরিক কর্মচারী ছিলেন। মৈত্রক বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ধ্রুব সেন। অষ্টম শতাব্দীতে আরবদের আক্রমণে মৈত্রক বংশ শাসিত বল্লভী রাজ্যের স্বাধীনতা লোপ পায়।

মোগল সাম্রাজ্য : বাবর মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পিতার দিক থেকে তৈমুর ও মাতার দিক থেকে চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর। বাবর নিজেকে মোগল বংশীয় বলে পরিচয় দিতেন, সে কারণে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য মোগল সাম্রাজ্য নামে অভিহিত।

সুলতান ইব্রাহিম লোদির শাসন-কালে, দিল্লী ও লাহোরের প্রভাবশালী আমির-ওমরাহদের মধ্যে বিরোধের সুযোগ নিয়ে বাবর ১৫২৫ খ্রী লাহোর জয় করেন। কিন্তু লাহোরের লোদি বংশীয় শাসকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাবরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে বাবর পশ্চাদ-পসরণ করে কাবুল প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু পরের বছর, ১৫২৬ খ্রী বাবর আবার এক সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন ও দিল্লী অভি-মুখে অগ্রসর হন। সে আক্রমণ প্রতি-রোধ করতে দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদি একটি বিশাল বাহিনী পাঠালে পানিপথের রণক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনীর সাক্ষাৎকার ঘটে ও সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধ পানি-পথের প্রথম যুদ্ধ নামে অভিহিত। যুদ্ধে বাবর জয়ী হন ও সুলতান ইব্রাহিম লোদি রণক্ষেত্রেই প্রাণ হারান। তার-পর বাবর সহজেই দিল্লী ও আগ্রা জয়

করে দিল্লীর তিন শ বছরের সুলতানি শাসনের অবসান ঘটান ও মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা করেন। অনতিবিলম্বে উত্তর ভারতের সব মুস্লিম রাজ্য বাবরের বশ্যতা স্বীকার করে। কেবল মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহ (রানা সঙ্গ) বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে খানুয়ার যুদ্ধে (১৫২৭) বাবর রানা সঙ্গকে পরাজিত করেন। ফলে উত্তর ভারতে মোগলের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন শক্তি থাকে না। তারপর গোগরার যুদ্ধে বাঙলা ও বিহারের আফগান শাসকদের পরাজিত করে পূর্ব ভারতেও তিনি তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সমগ্র অধিকৃত এলাকা সুসংহত করার আগেই ১৫৩০ খ্রী বাবরের মৃত্যু হয়।

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর বাদশাহ হন। বাবরের সামরিক প্রতিভা তাঁর ছিল না। ফলে জ্ঞাতিবিরোধ ও বিদ্রোহের ফলে রাজ্যে যে অরাজকতা দেখা দেয় তাতে হুমায়ুনের পক্ষে রাজ্যশাসন অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারপর বিহারের আফ-গান শাসক শেরশাহ হুমায়ুনকে পর পর চৌসা (১৫৩৯) ও বিলগ্রামের (১৫৪০) যুদ্ধে পরাজিত করলে হুমায়ুন রাজ্য ত্যাগ করে অমরকোটের রাজার আশ্রয় নেন। সেখানে ১৫৪২ খ্রী হুমায়ুনের পুত্র আকবরের জন্ম হয়, যিনি পরবর্তীকালে মোগল সাম্রাজ্যের তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাটরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

শেরশাহর শাসনকাল মাত্র পাঁচ বছর স্থায়ী ছিল। তাঁর উত্তরাধিকারীরা শাসনকার্যের অযোগ্য ছিলেন। সেই সুযোগে ১৫৫৫ খ্রী হুমায়ুন আবার দিল্লী ও আগ্রা জয় করেন। তার একবছর পরে হুমায়ুনের মৃত্যু হয়।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর মাত্র তের বছর বয়সে আকবর দিল্লীর বাদশাহ হন। সে সময় তাঁর অভিভাবক, হুমায়ুনের বিশেষ অনুগত বৈরাম খাঁ ছিলেন রাজ্যের প্রকৃত শাসক। হুমায়ুনের মৃত্যুকালে দিল্লী, আগ্রা ও পাঞ্জাবে মোগল কর্তৃত্ব ছিল নাম মাত্র। সারা ভারতে তখন অগণিত রাজ্য মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং সব রাজ্যের রাজারাই ছিলেন কার্যত স্বাধীন। তাঁদের মধ্যে শুর বংশীয় আফগান আদিল শাহ ছিলেন খুবই শক্তিশালী, যাঁর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন হিমু নামে এক হিন্দু। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আদিল শাহর নির্দেশে হিমু অনায়াসে দিল্লী ও আগ্রা জয় করেন। আকবর তখন পাঞ্জাবে। হিমুর দিল্লী জয়ের সংবাদে আকবর ও তাঁর অভিভাবক বৈরাম খাঁ দিল্লী উদ্ধারের জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। হিমুও সে আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য অগ্রসর হলে পাণি-পথের প্রান্তরে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, যে যুদ্ধ পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ নামে অভিহিত। পাণিপথের যুদ্ধে হিমুর পরাজয় হয় ও উত্তর ভারতে মোগলরা আবার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারপর সম্রাট আকবরের অর্ধশতাব্দী শাসনকালে মোগল সাম্রাজ্য উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান থেকে পূর্বে বঙ্গদেশ এবং উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে দৌলতাবাদ-আহ্‌মেদ নগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। সম্রাট

আকবরের শাসনকাল ১৫৫৫-১৬০৫ খ্রী। প্রজাপালনে, শাসন দক্ষতায়, রাজনৈতিক বুদ্ধি ও রণকুশলতায় আকবর ইতিহাসের এক অনন্য সম্রাট।

আকবরের মৃত্যুর পর দিল্লীর সম্রাট হন জাহাঙ্গির। জাহাঙ্গিরের শাসনকাল ১৬০৫-২৭ খ্রী। জাহাঙ্গির ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং সাহিত্য, শিল্প ও চিত্রকলায় অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক। আকবর যে বিশাল সাম্রাজ্য জয় করেন তাকে সুসংহত ও সুশৃঙ্খল করার কৃতিত্ব জাহাঙ্গিরের। জাহাঙ্গিরের শাসনকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে বাণিজ্যের অনুমতি লাভ করে। জাহাঙ্গিরের মৃত্যুর পর সম্রাট হন তাঁর পুত্র খুররম। সম্রাট হওয়ার পর তাঁর নাম হয় শাহজাহান। শাহজাহানের শাসনকাল ১৬২৮-৫৮ খ্রী। সম্রাট শাহজাহানের শাসনকালকে মোগল শাসনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। কারণ মোগল সাম্রাজ্য যেমন সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ করে তেমনই তার সমৃদ্ধির উজ্জ্বলতাও সর্বাধিক ভাস্বর হয়। বৃদ্ধ বয়সে শাহজাহানকে পুত্র ঔরংজেবের হাতে বন্দী ও লাঞ্ছিত হতে হয়। কৌশলে অপর তিন ভ্রাতাকে পরাজিত ও নিহত করে ঔরংজেব ১৬৫৮ খ্রী দিল্লীর মসনদ অধিকার করেন। বন্দী অবস্থায় সম্রাট শাহজাহানের ১৬৬৬ খ্রী মৃত্যু হয়।

সম্রাট ঔরংজেবের শাসনকাল ১৬৫৮-১৭০৭ খ্রী। ঔরংজেব ছিলেন কূটবুদ্ধি, সাহসী, রণকুশলী এবং ব্যক্তিগত জীবনে অতীব ধার্মিক ও মিতাচারী। কিন্তু বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজাপুঞ্জের শাসক হতে গেলে যে মনের প্রসারতা প্রয়োজন তা তাঁর ছিল না। তিনি শুধু যে হিন্দু ও শিখদের উপর নির্যাতন করতেন তাই নয়, নিজে সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলে শিয়া সম্প্রদায়ের মুস্লিমদের উপরেও তাঁর অত্যাচারের সীমা ছিল না। তারপর শাসনকার্যেও কাউকে বিশ্বাস করে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না। তাই বিশাল সাম্রাজ্যের সব কাজ নিজেই দেখার চেষ্টা করতেন। ফলে তাঁর শাসনকালে সারা সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়; বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে মারাঠাদের যে অভ্যুত্থান ঘটে তা দমনের জন্য বৃথাই তিনি শাসনকালের শেষ ছাব্বিশ বছর দাক্ষিণাত্যে অতিবাহিত করেন। ঔরংজেবের জীবদ্দশাতেই মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙন শুরু হয়।

ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের আশঙ্কায় ঔরংজেব মৃত্যুর আগেই তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার তিন পুত্র মোয়াজ্জেম, আজম ও কামবক্স এর মধ্যে ভাগ করে দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয় না, মোয়াজ্জেম তাঁর অপর দুই ভ্রাতাকে হত্যা করে 'বাহাদুর শাহ' নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন (১৭০৮)। তিনি 'শাহ আলম' নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৭১২ খ্রী।

বাহাদুর শাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যেও সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রথমে জাহান্দর শাহ জয়ী হয়ে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁকে তাঁর অপর ভ্রাতা আজিমুস-শানের পুত্র ফারুক-

শিয়ার সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করে নিজে সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু প্রভাবশালী অমাত্যদের ষড়যন্ত্রে ফারুকশিয়ার অবিলম্বে সিংহাসনচ্যুত হন ও তাঁকে অন্ধ করে ফেলা হয়। তারপর সিংহাসন লাভ করেন ফারুকশিয়ারের পিতৃব্য-পুত্র মহম্মদ শাহ। তিনি ১৭১৯-৪৮ খ্রী দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন।

মহম্মদ শাহ অযোগ্য দুর্বল শাসক ছিলেন। সে কারণে তাঁর শাসনকালে বাঙলা, অযোধ্যা, আগ্রা, রহিলাখণ্ড প্রভৃতি স্থানের শাসকরা দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন শুরু করেন। মহম্মদ শাহর একদা প্রধানমন্ত্রী নিজাম উল মুলক দক্ষিণ ভারতে স্বাধীন হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মহম্মদ শাহর রাজত্বকালেই পারস্যের রাজা নাদির শাহ (১৭৩৯) ও আহমদ শাহ আবদালি (১৭৪৮) ভারত আক্রমণ করেন।

মহম্মদ শাহর মৃত্যুর পর প্রথমে মোগল সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র আহমদ শাহ। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁর পিতৃব্য-পুত্র আজিমুদ্দিন তাঁকে উৎখাত করে দ্বিতীয় আলমগির নাম নিয়ে মোগল সিংহাসন অধিকার করেন। দ্বিতীয় আলমগিরের পর একে একে দিল্লীর বাদশাহ হন দ্বিতীয় শাহ আলম, দ্বিতীয় আকবর ও সর্বশেষে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। তখন মোগল সাম্রাজ্যের নামে মাত্র অস্তিত্ব ছিল।

১৮৫৭ খ্রী সিপাহি বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী সৈন্যরা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে সারা ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। ঐ বিদ্রোহের শেষে ইংরেজ সরকার বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করেন। সেখানে ১৮২৬ খ্রী বাহাদুর শাহর মৃত্যু হয়।

মোঙ্গল অভিযান, ভারতে:

সুলতান ইলতুৎমিসের শাসনকালে ১২২১ খ্রী মোঙ্গলরা সর্বপ্রথম দিগবিজয়ী যোদ্ধা চেঙ্গিজ খাঁর নেতৃত্বে ভারত অভিমুখে অগ্রসর হয়। চেঙ্গিজ খাঁর আক্রমণে মধ্য এশিয়ার রাজ্য খোয়ারজামের শাহ জালালুদ্দিন মঙ্গবারনি রাজ্য ত্যাগ করে পালিয়ে এসে ইলতুৎমিসের আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং তাঁরই পশ্চাদ্ধাবন করে চেঙ্গিজ খাঁর সৈন্যরা ভারত সীমান্তে উপনীত হয়। কিন্তু ইলতুৎমিস মঙ্গবারনিকে আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করায় মঙ্গবারনি পারস্যে চলে যান। চেঙ্গিজ খাঁর সৈন্যবাহিনীও তখন আর ভারতে প্রবেশ করে না। সুলতান ইলতুৎমিসের বিচক্ষণতার জন্যই ভারত সেবার মোঙ্গলদের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পায়। কিন্তু সুলতানা রাজিয়ার অপসারণ ও মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের শাসনকালে যখন উত্তর ভারতে দারুণ বিশৃঙ্খলা ও অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন মোঙ্গলরা আবার ভারত আক্রমণ শুরু করে। ১২৪১ খ্রী তারা পাঞ্জাবে প্রবেশ করে এবং লাহোর সাময়িকভাবে তাদের দখলে যায়। কিন্তু ১২৪৫ খ্রী প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে মোঙ্গলরা সেবারের মত ভারত ত্যাগ করে। পরবর্তীকালে ১২৭৯ খ্রী সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের শাসনকালে

সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে মোঙ্গলদের ভারত আক্রমণ প্রয়াস আর একবার ব্যর্থ হয়। পুনরায় ১২৮৫ খ্রী মোঙ্গলরা ভারতে প্রবেশ করে; বলবনের পুত্র যুবরাজ মহম্মদ তখন মুলতানের শাসনকর্তা। মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে তিনি নিহত হন, কিন্তু বৃদ্ধ সুলতান গিয়াসুদ্দিন সেবারও মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন।

১২৯২ খ্রী খলজি বংশীয় সুলতান জালালুদ্দিনের শাসনকালে মোঙ্গলরা আবার ভারত আক্রমণ করে। কিন্তু জালালুদ্দিনের সৈন্যবাহিনী সে আক্রমণ প্রতিহত করলে মোঙ্গলদের সঙ্গে সুলতানের একটা আপস হয়। মোঙ্গলদের অধিকাংশ ভারত ত্যাগ করে, কিন্তু চেঙ্গিজের এক বংশধর উলঘু তাঁর অনুগামীগণসহ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সুলতানের অনুমতি নিয়ে দিল্লীর উপকণ্ঠে বসতি স্থাপন করেন। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত মোঙ্গলরা 'নব মুসলমান' নামে পরিচিতি লাভ করে।

আলাউদ্দিন খলজির শাসনকালে মোঙ্গলরা আবার ব্যাপকভাবে ভারত আক্রমণ শুরু করে। কিন্তু আলাউদ্দিনের দক্ষ সেনাপতি জাফর খাঁর রণনিপুণতায় ১২৯৮ ও ১২৯৯ খ্রী মোঙ্গলদের দুটি বড় অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। আলাউদ্দিনের শাসনকালে মোঙ্গলদের আর এক বৃহৎ আক্রমণ পরিচালিত হয় ১৩০৭-০৮ খ্রী। কিন্তু সে আক্রমণও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় এবং হাজার হাজার মোঙ্গল নিহত হয়। ঐ সময় নব মুসলমানরা সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার গুজব প্রচারিত হওয়ায় সুলতান আলাউদ্দিন তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করার নির্দেশ দেন এবং সেই নির্দেশমত ত্রিশ হাজার নব মুসলমানকে হত্যা করা হয়।

তোগলকবংশীয় শাসক মহম্মদ বিন তোগলকের শাসনকালে ১৩২৭-২৮ খ্রী মোঙ্গলরা আবার একবার ভারত আক্রমণ করে। তারা পাঞ্জাব লুণ্ঠন করে দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। কিন্তু মহম্মদ বিন তোগলক তাদের অস্ত্রবলে পরাজিত না করে মোঙ্গলসর্দার তরমশিরিণ খাঁকে প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়ে বিদায় করেন। মোঙ্গলরা সেবারের মত চলে যায়, কিন্তু তারপর অর্থলোভী মোঙ্গলরা বারবার আসতে থাকে ও সমগ্র উত্তর ভারতে একটা অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। মোঙ্গল আক্রমণে উত্যক্ত হয়েই সুলতান মহম্মদ বিন তোগলক তাঁর রাজ্যের রাজধানী দিল্লী থেকে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন।

মোপলা বিদ্রোহ : ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে, মালাবার অঞ্চলে (বর্তমান কেরল রাজ্যের অন্তর্গত) মুস্লিম ধর্মাবলম্বী আরব বংশোদ্ভূত মোপলাদের বাস। মালাবারে স্বাধীন খিলাফৎ রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মোপলারা ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে বিদ্রোহী হয়। ধর্মান্ধ মুস্লিমদের ব্যাপক আক্রমণে সেদিন ঐ অঞ্চলের বহু হিন্দু নিহত হয় এবং অনেকে প্রাণ রক্ষা করতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। পাহাড় ও বনে দুর্গম মালাবার অঞ্চল গেরিলা যুদ্ধের আদর্শ স্থান বলে মোপলাদের বিদ্রোহ দমন করতে কয়েক মাস সময় লাগে। ১৯২২

সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে। বিদ্রোহে সাড়ে চার শ' লোক নিহত ও পাঁচ হাজারেরও বেশি লোক আহত হয়। ইংরেজ সরকার কঠোর হাতে বিদ্রোহ দমন করেন এবং বহু মোপলা বিদ্রোহীকে আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়।

১৯২১ সালে মোপলাদের বিদ্রোহ সর্বাধিক ব্যাপক আকার ধারণ করে। তার আগেও ১৮৪৯, ১৮৫১, ১৮৫২ ও ১৮৫৫ সালে মোপলা বিদ্রোহ হয়।

মোয়েস : মোয়েস বা মোগ ভারতের প্রথম শক নৃপতি। তাঁর রাজধানী ছিল তক্ষশিলা; গান্ধার ও তার সমীপবর্তী অঞ্চল নিয়ে মোয়েসের রাজ্য গঠিত ছিল। খ্রী-পূ প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে মোয়েস 'মহাসম্রাট' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় অজেস খ্যাত ছিলেন। তাঁদের শাসনকালে শক রাজ্য পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মোহনলাল : নবাব সিরাজুদ্দৌলার অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি। পলাশির যুদ্ধে নবাবের অপর বিশ্বস্ত সেনানায়ক মিরমদন নিহত হওয়ার পর মোহনলাল নবাবের পক্ষে যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ও অকুতোভয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যান। যুদ্ধের ফল তখনও অনিশ্চিত ছিল সেই সময় মিরজাফরের কুপরামর্শে নবাব সিরাজুদ্দৌলা মোহনলালকে যুদ্ধে নিরস্ত হতে বলেন। নবাবের পরামর্শে মোহনলাল ক্ষান্ত হওয়ার অল্প পরেই ক্লাইভের সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে নবাব পক্ষের পরাজয় হয়।

মৌখরি বংশ : গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে তার অন্তর্গত সামন্তরাজ্য কনৌজ মৌখরি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হরিবর্মনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। স্বাধীন মৌখরি রাজ্যের অন্যান্য রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঈশ্বরবর্মন, ঈশানবর্মন, গ্রহবর্মন প্রভৃতি।

গ্রহবর্মনের সঙ্গে থানেশ্বরের পুষ্যভূতি রাজবংশের কন্যা, সম্রাট হর্ষবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। মালবরাজ দেবগুপ্তর হাতে গ্রহবর্মন নিহত হলে কনৌজ রাজ্য পুষ্যভূতি রাজবংশের প্রভাবাধীনে চলে যায়।

মৌর্য সাম্রাজ্য : মগধে নন্দবংশের শাসনের অবসান ঘটিয়ে সিংহাসনারোহণ করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। নন্দবংশের উৎখাতে চন্দ্রগুপ্তর প্রধান সহায়ক ছিলেন চাণক্য নামে তক্ষশিলার এক কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণ। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর শাসনকাল ৩২২-২৯৮ খ্রী-পূ।

গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক অধিকৃত অঞ্চলগুলি স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর সাম্রাজ্য উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান থেকে পূর্বে বঙ্গদেশ এবং দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

চন্দ্রগুপ্তর মৃত্যুর পর মৌর্য-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র বিন্দুসার (২৯৮-২৭৩ খ্রী-পূ)। বিন্দুসার 'অমিত্রঘাত' উপাধি গ্রহণ করেন। তাতে মনে হয় তিনিও পিতার মতোই পরাক্রমশালী ছিলেন। তবে তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর সিংহাসনে

বসেন তাঁর পুত্র অশোক। সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল ২৭৩-২৩২ খ্রী-পূ। সুশাসন ও প্রজাবাৎসল্যের জন্য সম্রাট অশোক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতিরূপে খ্যাত। তিনি দেশে দেশে ভগবান বুদ্ধের বাণী প্রচার করেন। দেশ-বিদেশের বহু রাজা স্বেচ্ছায় সম্রাট অশোকের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন। সম্রাট অশোক ছিলেন প্রকৃত অর্থে ভারতের প্রথম সম্রাট।

কিন্তু সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পরেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। সম্ভবত সম্রাট অশোকের পৌত্রদের কোন একজন তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। কারণ অশোকের দুই পুত্র ত্রিভব ও জালুক পিতার জীবদ্দশাতেই মারা যান এবং তৃতীয় পুত্র কুণাল বিমাতার ষড়যন্ত্রে দৃষ্টিশক্তি হারান। ঐতিহাসিক স্মিথের মতে সম্রাট অশোকের দুই পৌত্র দশরথ ও সম্প্রতি নিজেদের মধ্যে মৌর্য সাম্রাজ্য দুই অংশে ভাগ করে নেন। দশরথ পূর্ব অংশের রাজা হন এবং তাঁর রাজধানী হয় পাটলিপুত্র; আর সম্প্রতি হন পশ্চিম অংশের রাজা, তাঁর রাজ্যের রাজধানী হয় উজ্জয়িনী।

২৩২ খ্রী-পূ সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ ১৮২ খ্রী-পূ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মৌর্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে ঐ বছরে হত্যা করে তাঁর প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ সিংহাসন অধিকার করেন এবং এইভাবে মৌর্য শাসনের অবসান ও শুঙ্গ শাসনের সূচনা হয়।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ ঐ বিশাল সাম্রাজ্য শাসনে অশোকের পরবর্তী শাসকদের অযোগ্যতা। সম্রাট অশোক অহিংস নীতি অনুসরণ করায় রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উপেক্ষিত হয়, যার ফলে সম্রাট অশোকের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নৃপতি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না থাকায় রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ শুরু হয়। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় এবং যথেষ্ট সৈন্যবল না থাকায় অশোকের পরবর্তী শাসকগণের পক্ষে সে বিদ্রোহ দমন বা সাম্রাজ্যের ভাঙন রোধ করা সম্ভব হয় না।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ সম্রাট অশোকের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-বিরোধী নীতি। অশোকের মৃত্যুর পর আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম উজ্জীবিত হয় ও তাই শেষ পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হয়। মৌর্য সিংহাসন দখলকারী পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ছিলেন ব্রাহ্মণ।

মৌর্যবংশীয় শাসন (সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত থেকে বৃহদ্রথ পর্যন্ত) খ্রী-পূ ৩২২ থেকে খ্রী-পূ ১৮২ অব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ঐতিহাসিক স্মিথ মৌর্য শাসনের সূচনাকে ভারতের ইতিহাসে অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের যুগ বলে বর্ণনা করেছেন। মৌর্য সাম্রাজ্য প্রকৃত অর্থে ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য এবং সম্রাট অশোকই সর্বপ্রথম এই বিশাল উপমহাদেশকে এক ধর্মরাজ্য পাশে আবদ্ধ করেন। সম্রাট অশোকের কল্যাণ রাষ্ট্র আজ সারা বিশ্বের রাষ্ট্রীয় আদর্শ।

মৌর্য শাসনের বিস্তারিত ও তথ্য-

পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় গ্রীক ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিশাখ দত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে, বিভিন্ন জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে, বিভিন্ন সমকালীন শিল্পকলায় ও সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে।

মৌর্য সাম্রাজ্যের, বিশেষ করে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা আছে মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে (রচনাকাল ৩০২-২৯৮ খ্রী-পূ)। তখন রাজা ছিলেন মুখ্য প্রশাসক, প্রধান সেনাপতি, প্রধান বিচারপতি ও ধর্মীয় প্রধান। তিনি মন্ত্রিপরিষদের সহায়তায় রাজদায়িত্ব পালন করতেন। সমগ্র রাজ্য ছিল সুশাসিত ও শান্তিপূর্ণ। রাজধানী পাটলিপুত্র নগরী ও মৌর্য সম্রাটদের প্রাসাদের সৌন্দর্য, শিল্পকলা ও আড়ম্বর মেগাস্থিনিসকে মুগ্ধ করে। পাটলিপুত্র ছাড়াও কৌশম্বি, তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি মৌর্য সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য নগরী ছিল। তবে প্রজাদের বেশির ভাগই ছিল গ্রামবাসী। জমির উর্বরতা অনুসারে প্রজারা ফসলের এক চতুর্থাংশ থেকে এক ষষ্ঠাংশ রাজস্ব দিত।

প্রজাপালন সম্পর্কে সম্রাট অশোকের অনুসৃত নীতির পরিচয় পাওয়া যায় একটি কলিঙ্গ শিলালিপিতে, যাতে তিনি বলেছেন: আমার সব প্রজা আমার সন্তানের মতো এবং আমি যেমন আমার সন্তানদের এ জগতে ও পরজগতে সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করি, আমার প্রজাদের জন্যও আমি তাই চাই।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত শিকারপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু সম্রাট অশোক শুধু যে শিকার ত্যাগ করেন তাই নয় তিনি মাংস ভক্ষণও ত্যাগ করেন। রাজাদের প্রমোদবিহার বন্ধ করে তিনি প্রবর্তন করেন ধর্মবিহার।

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে স্থাপত্য শিল্প, ভাস্কর্য চিত্রকলা, বস্ত্রশিল্প, অলঙ্কার শিল্প প্রভৃতি সব কিছুই চরম উৎকর্ষ লাভ করে। চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন মৌর্য যুগের প্রাসাদগুলির বর্ণনাকালে বলেছেন-সেগুলি ভগবানের সৃষ্টি বলে মনে হয়। অশোকস্তম্ভগুলি মৌর্য যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন। মৌর্য শাসকরা প্রজাদের মধ্যেও শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। সে সময় তক্ষশিলা ও বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় দুটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল।

ম্যাকফার্সন, জন: ১৭৮৫ খ্রী ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর-জেনারেল পদে ইস্তফা দিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে স্যার জন ম্যাকফার্সন অস্থায়ীভাবে ভারতের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন এবং এক বছর সে পদে বহাল থাকেন। ১৭৮৬ খ্রী লর্ড কর্নওয়ালিস এসে তাঁকে দায়িত্বমুক্ত করেন।

ম্যাকমেহন লাইন: তিব্বত ও ও ভারতের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯১৩ সালে ভারতস্থ ইংরেজ সরকারের আমন্ত্রণে সিমলায় ভারত, চীন ও তিব্বতের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহূত হয় এবং বহু নোট ও মানচিত্র বিনিময়ের পর ঐ সম্মেলন শেষ হয় ১৯১৪ সালের ২৭ এপ্রিল। ঐ দিন যে চুক্তিপত্র

স্বাক্ষরিত হয় তাতে ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর দেন ত্রিপক্ষ সম্মেলনের সভাপতি ও ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের তৎকালীন সেক্রেটারি স্যার হেনরি ম্যাকমেহন। তিব্বতের পক্ষে স্বাক্ষর দেন তিব্বতের প্রধান মন্ত্রী লোচেন সাত্রা ও চীনের পক্ষে চীনা প্লেনিপোটেনশিয়ারী ইভান চেন। ম্যাকমেহন সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বলে ত্রিপক্ষের সম্মতিতে স্থিরীকৃত ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্তী সীমান্ত রেখা ম্যাকমেহন লাইন নামে অভিহিত হয়।

২৭°৪৮´ অক্ষাংশ বরাবর ভুটান থেকে ভারত-চীন-বর্মা সীমান্ত সঙ্গমে অবস্থিত তালুপাস পর্যন্ত প্রায় ৭৫০ মাইল দীর্ঘ ঐ সীমান্ত রেখা প্রকৃত পক্ষে ভারত ও তিব্বত কর্তৃক দীর্ঘকাল স্বাভাবিক সীমান্ত রেখা রূপে মেনে চলা সীমান্ত রেখারই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। ঐ সীমান্ত বরাবর রয়েছে প্রায় এক শ মাইল প্রশস্ত দুর্গম পর্বতশ্রেণীর দুস্তর ব্যবধান।

তবে চীন সরকারের প্রতিনিধি সিমলাতে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে গেলেও সিদ্ধান্তগুলির পাকা দলিল যখন চীনে পাঠানো হয় তখন চীন সরকার তা মানতে অস্বীকার করেন। চীনের পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজদূতরূপে ইভান চেন সিমলা বৈঠকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দেন, সে কারণে পরবর্তীকালে চীন সরকার তা মানতে অস্বীকার করলেও ঐ চুক্তিপত্রের আইনগত মর্যাদা লোপ পায় না। তাছাড়া চীন সেদিন তিব্বতকে সম্মেলনের একটি স্বতন্ত্র পক্ষ বলে মেনে নিয়েছিল যার দ্বারা চীন কার্যত তিব্বতের সার্বভৌমত্বই স্বীকার করে নিয়েছিল। আর তিব্বত ১৯৫০ সালে চীন কর্তৃক অধিকৃত না হওয়া পর্যন্ত ম্যাকমেহন লাইনকেই ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্তী সীমান্ত বলে মেনে আসে।

যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী : অন্ধ্রপ্রদেশের সাতবাহন রাজ্যের শেষ উল্লেখযোগ্য নৃপতি। তিনি শকদের অধিকার থেকে বহু স্থান পুনরুদ্ধার করেন। পূর্বে বঙ্গোপসাগর থেকে পশ্চিমে আরবসাগর পর্যন্ত তাঁর রাজ্যের সীমা বিস্তৃত ছিল। তিনি প্রায় ত্রিশ বছর (১৬৫-৯৬ খ্রী) রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে সাতবাহন রাজ্যের পতন শুরু হয়।

যতীন্দ্রনাথ দাস (১৯০৪-২৯): ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম শহিদ। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৪ সালে আবার গ্রেপ্তার হবার পর ঢাকা জেলে প্রেরিত হন এবং সেখানে জেল কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে ২৩ দিন অনশন করেন। ১৯২৮ খ্রী লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামীরূপে লাহোর জেলে প্রেরিত হন। সেখানে রাজবন্দীর উপযুক্ত মর্যাদা স্বীকৃতির দাবিতে পুনরায় অনশন শুরু করেন। তাঁর অনশন ভাঙার জন্য নানাভাবে চেষ্টা হয়, কিন্তু দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অনশনের প্রতিজ্ঞায় তিনি অবিচল থাকেন। অবশেষে অনশনের ৬৫তম দিনে তাঁর মৃত্যু হয়।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯১৫): প্রখ্যাত বিপ্লবী, জাতির

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম শহিদ, 'বাঘা যতীন' নামে সুপরিচিত। সরকারি চাকরিতে থাকাকালেই বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১০ খ্রী প্রথম কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর জার্মানি থেকে অস্ত্র আমদানি করে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের এক বিরাট পরিকল্পনা করেন। সেই উদ্দেশ্যে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়কে জাভায় পাঠান। 'মেভারিক' নামক জার্মান জাহাজে ভারতের উপকূলে অস্ত্র আসার কথা ছিল। ঐ অস্ত্র সংগ্রহের জন্য যতীন্দ্রনাথ কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে ময়ূরভঞ্জে যান। কিন্তু দলের একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় ঐ অস্ত্র আমদানির ষড়যন্ত্রের কথা পুলিশ আগেই জানতে পারে এবং ময়ূরভঞ্জে অপেক্ষমান বাঘা যতীন ও তাঁর সঙ্গীদের গ্রেপ্তারের জন্য সেখানে উপস্থিত হয়। কিন্তু ঐ বিপ্লবীরা সেখান থেকে পলায়ন করলে বালেশ্বর জেলায় বুড়িবালাম নদীর তীরে পাঁচজন বীর দেশপ্রেমীর সঙ্গে ইংরেজের তিন শ পুলিশ ও সৈন্যদলের কয়েক ঘণ্টা ধরে সংগ্রাম চলে। সেই অসম যুদ্ধে ঘটনাস্থলেই চিত্তপ্রিয় চৌধুরী নিহত হন, আহত যতীন্দ্রনাথ কটক হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। বিচারে মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নারেন দাশগুপ্তের ফাঁসি হয় এবং জ্যোতিষ পালের দ্বীপান্তর হয়।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৩৩): বরেণ্য দেশনেতা, দেশবাসী শ্রদ্ধাভরে তাঁকে 'দেশপ্রিয়' নামে সম্বোধন করে। ব্যারিস্টাররূপে কর্মজীবনের সূচনা করেন ও আইনজ্ঞরূপে খ্যাতি ও প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রথম কারাবরণ করেন, পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। ১৯২৮ সালে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন যতীন্দ্রমোহন। বর্মা অয়েল কোম্পানি ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের শ্রমিক ধর্মঘট পরিচালনা করতে গিয়ে তাঁর চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ হয়। ১৯৩৩ সালে রাঁচিতে অন্তরীণ অবস্থায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যু হয়।

যতীন্দ্রমোহনের সহধর্মিণী ইংরেজ মহিলা নেলি সেনগুপ্তা ভারতকে তাঁর স্বদেশরূপে গ্রহণ করেন ও দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যে বছর যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় সেই বছরেই কলকাতার জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৭৩ খ্রী নেলি সেনগুপ্তা 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন।

যদু সেন (জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ): উত্তরবঙ্গে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গণেশের পুত্র। সিংহাসনে বসার পর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন ও জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ নাম নেন। ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি অত্যন্ত হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র সামসুদ্দিন সিংহাসনে বসেন। সামসুদ্দিন ও অত্যাচারী সুলতান ছিলেন এবং সে কারণে রাজকর্মচারীরা বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে হত্যা করেন।

যশোধর্মন: মান্দাসোরের রাজা যশোধর্মন অত্যাচারী হূন রাজা মিহিরকুলের আক্রমণ প্রতিরোধে ও শেষ পর্যন্ত তাঁর উৎখাতে বিশেষ ভূমিকা নেন। মধ্যভারতে মান্দাসোর ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি করদ রাজ্য। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে যশোধর্মন স্বাধীন রাজার মতো রাজ্যশাসন করতে থাকেন। ভারতে হূন অভিযান প্রতিহত করার জন্য যশোধর্মন স্মরণীয়।

যশোবর্মন: সম্ভবত ৭০০-৪০ খ্রী কনৌজের রাজা ছিলেন। তাঁর বংশ পরিচয় অস্পষ্ট। তিনি সম্ভবত ৭৩১ খ্রী চীনে দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু সে দৌত্যের উদ্দেশ্য বা পরিণতি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। যশোবর্মনের সভাকবি বাকপতি যশোবর্মনকে গৌড়-বিজয়ী এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে রাজ্যজয়ী বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সে বর্ণনার সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক তথ্য মেলে না। 'উত্তররাম চরিত' নাটক রচয়িতা ভবভূতি যশোবর্মনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি সম্ভবত কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের হাতে পরাজিত হন।

যাস্ক: বেদভাষ্যকার ও প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত চিন্তানায়ক। খ্রী-পূ সপ্তম শতাব্দী সম্ভবত তাঁর আবির্ভাবকাল। ছয় 'বেদাঙ্গের' অন্যতম 'নিরুক্ত'র সঙ্কলক যাস্ক বলেন, ঈশ্বর এক, যদিও বহুরূপে তিনি প্রকাশিত।

যুক্তপ্রদেশ: দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় বর্তমান উত্তর প্রদেশের নাম ছিল যুক্তপ্রদেশ (ইউনাইটেড প্রভিন্স)। ইংরেজ শাসনকালে ঐ প্রদেশের কয়েক বার নাম পরিবর্তন হয়। ১৯০২ খ্রী পর্যন্ত প্রদেশটির নাম ছিল নর্থ-ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স। তারপর ১৯০২ থেকে ১৯৩৭ খ্রী পর্যন্ত প্রদেশটির নাম ছিল 'ইউনাইটেড প্রভিন্স অফ আগ্রা এণ্ড আউধ' তবে সংক্ষেপে বলা হত 'ইউ পি'। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নতুন সংবিধান প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ প্রদেশটির 'ইউনাইটেড প্রভিন্স' ও সংক্ষেপে 'ইউ পি' নাম বহাল থাকে। নতুন সংবিধানে 'ইউ পি' ভারতের একটি রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে ও তার নাম হয় 'উত্তর প্রদেশ'। তাতে রাজ্যটির সুপ্রচলিত সংক্ষিপ্ত নাম 'ইউ পি' অপরিবর্তিত থাকে।

ভারতের ইতিহাস ও পুরাণের স্মৃতি বিজড়িত প্রয়াগ (এলাহাবাদ), অযোধ্যা, কাশী প্রভৃতি স্থানগুলি উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থান 'সিপাহি বিদ্রোহ' উত্তর প্রদেশেই সর্বাধিক প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। আবার উত্তর প্রদেশের আলিগড়েই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুস্লিম সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের সূচনা হয়। মদনমোহন মালব্য, তেজবাহাদুর সাপ্রু, মতিলাল নেহেরু, জহরলাল নেহরু প্রমুখ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উত্তর প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। স্বাধীন ভারতের তিন প্রধান মন্ত্রীই (জহরলাল নেহরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী) উত্তর প্রদেশের মানুষ।

যুগান্তর দল : একটি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি। অনুশীলন সমিতিরই কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উদ্যোগে যুগান্তর বিপ্লবী দল গঠিত হয়। 'যুগান্তর' নামে পত্রিকা ঐ দলের মুখপত্র ছিল বলেই দলটি যুগান্তর নামে পরিচিত হয়। দলের প্রথম পর্যায়ের নেতা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। বাঙলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বহু বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি যুগান্তর দলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে। পত্রিকাটি প্রকাশনার দায়িত্বে ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। যুগান্তর দলের নেতৃত্বে বাঙলায় ও ভারতের অন্যান্য স্থানে নানা দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক অভিযান পরিচালিত হয়।

রংপুর : গুজরাত রাজ্যের সুরেন্দ্রনগর জেলায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। এখানে উৎখননের ফলে হরপ্পা সভ্যতার বহু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এটি হরপ্পা সভ্যতার শেষ যুগের, খৃ-পূ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন সময়ের সভ্যতা বলে মনে হয়। বন্যায় রংপুরের হরপ্পা সভ্যতা বিনষ্ট হয়।

রংমহল : রাজস্থানের গঙ্গানগর জেলায় অবস্থিত। এখানে উৎখননের ফলে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

রণজিৎ সিংহ : ১৭৮০ খ্রী সুকারচুরিয়া নামে পাঞ্জাবের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে (মিসল) রণজিৎ সিংহের জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি সুকারচুরিয়া মিসল্-এর আধিপত্য লাভ করেন। রণজিৎ সিংহ লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায়, প্রশাসনিক দক্ষতায়, দেশাত্মবোধে ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় তাঁর সমকক্ষ নৃপতি ভারতে খুব বেশি জন্মাননি। সমগ্র শিখজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি বিশাল শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন শৈশবেই রণজিৎ সিংহকে অনুপ্রাণিত করে এবং সেইভাবেই তিনি অগ্রসর হন। প্রকৃতপক্ষে গুরু গোবিন্দ সিংহ যে স্বপ্ন দেখেন তার সফল রূপ দান করেন পাঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ। কাবুলের রাজা জামাল শাহ ভারত আক্রমণ করলে রণজিৎ সিংহ বারবার তাঁর সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করে বিভিন্ন এলাকা দখল করেন। শেষ পর্যন্ত জামাল শাহ রণজিৎ সিংহের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে বাধ্য হন ও তাঁকে রাজা উপাধি দেন। এরপর রণজিৎ সিংহ কিছুদিন নিষ্ক্রিয় ছিলেন। কিন্তু জামাল শাহ ভারত ত্যাগের পরেই তিনি লাহোর দখল করেন। তারপর জম্মু জয়ে অগ্রসর হলে জম্মুর রাজা রণজিৎ সিংহের বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৮০৫ খ্রী রণজিৎ সিংহ অমৃতসর দখল করেন। এইভাবে শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরবর্তী সব কটি শিখ রাজাকে নিজ নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করে রণজিৎ সিংহ শতদ্রুর পূর্বতীরে রাজ্য বিস্তারের জন্য তৎপর হন। কিন্তু পূর্বতীরবর্তী রাজ্যগুলি রণজিৎ সিংহের অগ্রগতিকে ভাল চোখে দেখে না এবং আত্মরক্ষার জন্য তারা ইংরেজদের

শরণ নেয়। লর্ড মিণ্টো তখন ভারতের গভর্নর-জেনারেল। শতদ্রুর পূর্ব-তীরবর্তী শিখ রাজ্যগুলির ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি স্যার চার্লস মেটকাফকে রণজিৎ সিংহের সঙ্গে কথা বলতে পাঠান। ইংরেজের শক্তি সম্পর্কে রণজিৎ সচেতন ছিলেন, তাই তিনি ইংরেজদের মিত্রতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন না। ফলে ১৮০৯ খ্রী ইংরেজ সরকারের সঙ্গে রণজিৎ সিংহের অমৃতসরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়,যাতে রণজিৎ সিংহ শতদ্রুর পূর্ব তীরে রাজ্য বিস্তারের কোন রকম চেষ্টা না করার প্রতিশ্রুতি ইংরেজ সরকারকে দেন ; সে প্রতিশ্রুতি রণজিৎ সিংহ কখনও ভঙ্গ করেননি।

ইংরেজ সরকার তখন ভারতে রুশ আক্রমণের আশঙ্কায় শঙ্কিত। তাই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একটি শক্তিশালী মিত্র রাজ্য গড়ে ওঠায় তাঁদের সমর্থনই ছিল। সে কারণে রণজিৎ সিংহকে তাঁরা সাগ্রহে মিত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে তাঁর রাজ্য বিস্তারে কোন বাধা দেন না। রণজিৎ সিংহও অবিলম্বে কাশ্মীর, মুলতান, পেশোয়ার, কোহাট, বান্নু প্রভৃতি স্থান দখল করে উত্তর-পশ্চিমে খাইবার গিরিপথ ও পশ্চিমে সিন্ধু দেশ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।

রণজিৎ সিংহ ধর্মপ্রাণ শিখ হলেও সকল ধর্মের প্রতি উদার ছিলেন। তাঁর উদার, দূরদর্শী ও দক্ষ শাসন-নীতির কল্যাণে শিখ রাজ্যে কোনদিন কোন বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতা দেখা দেয়নি। তিনি স্বৈরাচারী শাসক (despot) ছিলেন কিন্তু কখনও কারুর প্রতি অবিচার করেননি। সৈন্য-বাহিনীকে সমকালীন যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করার জন্য তিনি দুজন ফরাসি সামরিক কর্মচারীকে প্রশিক্ষণের কাজে নিযুক্ত করেন। বহু বিদেশী পর্যটক, রাজনীতিজ্ঞ ও ঐতিহাসিক রণজিৎ সিংহের শাসনদক্ষতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। রাষ্ট্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সার্বভৌম শক্তির সমর্থক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অস্টিন মহারাজ রণজিৎ সিংহকে আদর্শ শাসক বলে বর্ণনা করেছেন। এক ফরাসি পর্যটক রণজিৎ সিংহকে ভারতের নেপোলিয়ন বলেছেন। পাঞ্জাবের এই অসীম শক্তিশালী স্থিতবুদ্ধি রাজা ভারতের ইতিহাসে 'পাঞ্জাব কেশরী' নামে অভিহিত হয়েছেন।

রত্নগিরি : ওড়িশার কটক জেলায় অবস্থিত একটি ছোট পাহাড়। উৎখননের ফলে এখানে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে মহাযানী বৌদ্ধরা এখানে স্তূপ, বিহার প্রভৃতি নির্মাণ করেন।

রফি-উদ-দরাজত : রাজ-দরবারের ষড়যন্ত্রে মোগল বাদশাহ ফারুকশিয়ার নিহত হওয়ার পর তৎ-কালে মোগল দরবারে সর্বাধিক প্রভাব-শালী সৈয়দভ্রাতারা রাজশক্তি সম্পূর্ণ-রূপে করায়ত্ত করার উদ্দেশ্যে রফি-উদ-দরাজতকে দিল্লীর মসনদে বসান (১৭১৯খ্রী)। তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর, কিন্তু ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হওয়ার জন্য শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ফলে সৈয়দ-

ভ্রাতারাই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হন। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলে না। রফি-উদ-দরাজত মসনদে বসার মাত্র তিন মাস পরে অপসৃত হন এবং তার অল্পকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

রফি - উদ - দৌলা : রফি - উদ-দরাজতের অপসারণের পর সৈয়দ-ভ্রাতাদের ইচ্ছায় তাঁর বড় ভাই রফি-উদ-দৌলা মোগল সিংহাসনে বসেন। মোগল বাদশাহ হয়ে তিনি নাম নেন দ্বিতীয় শাহজাহান। তিনিও ক্ষয়রোগী ছিলেন এবং শাসন কার্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে সৈয়দভ্রাতাদের হাতে নিয়ন্ত্রিত হতেন। ১৭১৯ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি শাসন কার্যে বহাল ছিলেন এবং সেপ্টেম্বর মাসেই তাঁর মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১): বিশ্বখ্যাত কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার ও সঙ্গীত রচয়িতা। গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩খ্রী নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর রচিত দেশাত্মবোধক গান বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দিনে ও পরবর্তীকালের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করে। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের দেওয়া 'স্যার' খেতাব ত্যাগ করেন। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ প্রথম সারির জাতীয় নেতারা রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব নামে সম্বোধন করতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের 'জন-গণ-মন' গান ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হয়।

ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাঙলাদেশও রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাঙলা' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করেছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯): রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও রমেশচন্দ্র দত্ত একই বছরে, ১৮৭১ সালে, আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রমেশচন্দ্র ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী, ঐতিহাসিক ও উদারপন্থী জাতীয় নেতা। তিনি ১৮৯৯ খ্রী কংগ্রেসের লখনৌ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

রহিমতুল্লা, মহম্মদ সায়নি (১৮৪৭-১৯০২): বোম্বাই শহরে জন্ম, জাতীয়তাবাদী নেতা। ভারতীয় মুস্লিমদের মধ্যে প্রথম এম. এ. পাশ করেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৮৯৬ খ্রী কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

রাওলাট এক্ট : প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ছয়-মাস পরে ভারত রক্ষা আইনের (Defence of India Act) মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে দেশে হিংসাত্মক কার্য-কলাপ কোন্ আইন বলে দমন করা হবে তা সুপারিশ করার জন্য ইংরেজ সরকার রাওলাটের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। তারপর রাওলাট কমিটির সুপারিশ মতো ১৯১৯ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় আইন সভায় দুটি বিল আসে। তার একটি সরকারের পক্ষ থেকেই পরে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং অপরটি ঐ বছর

মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পাশ হয়ে যায়। রাওলাট কমিটির সুপারিশ মতো ঐ আইন রচিত হয় বলে তা 'রাওলাট এক্ট' নামে পরিচিত হয়। ঐ আইনে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনের জন্য নানা কঠোর ব্যবস্থার বিধান থাকে। একটি বিধানে সন্ত্রাসবাদীদের বিচার বিশেষ আদালতে করার ব্যবস্থা করা হয় এবং সে বিচারের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ থাকে না। সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিকে কোন কারণ না দেখিয়ে গ্রেপ্তার করার, অন্তরীণ রাখার বা গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতাও সরকারকে দেওয়া হয়। সংবাদপত্রের উপরেও নানা নিষেধাজ্ঞা জারির ব্যবস্থা থাকে।

রাওলাট কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হওয়া মাত্র গান্ধিজি ইংরেজ সরকারকে জানিয়ে দেন যে ঐ আইন বলবৎ করা হলে তিনি সারা ভারতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করবেন। তারপরেই তিনি জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা ভারত সফর করেন ও দেশবাসীর কাছ থেকে বিপুল সাড়া পান। আইন পাশ হয়ে গেলে সারা ভারতে ৬ থেকে ১৩ এপ্রিল প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের ডাক দেওয়া হয়। সে ডাকে সবচেয়ে বেশি সাড়া দেয় পাঞ্জাব এবং সে কারণে সেখানেই ইংরেজ সরকারের নির্যাতন চরমে ওঠে। ১৩ এপ্রিল অমৃতসর শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি সমাবেশে গুলি চালিয়ে অন্তত চারশ লোককে ঘটনাস্থলেই হত্যা করা হয়; আহতের সংখ্যা সহস্র অতিক্রম করে। ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সারা ভারত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। লর্ড চেমসফোর্ড তখন ছিলেন ভারতের গভর্নর-জেনারেল।

লর্ড চেমসফোর্ডের পর লর্ড রীডিং ভারতের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হয়ে (১৯২১-২৬) ভারতের বিক্ষুব্ধ জনমতকে শান্ত করতে উদ্যোগী হন। তিনি রাওলাট আইন বাতিল করে দেন ও ভারতীয়দের দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করে ভারতবাসীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৬ ১৯৩০): প্রত্নতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক। সম্রাট কণিষ্ক সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হয়। বাঙলার পাল রাজাদের সম্বন্ধে তিনি বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি সিন্ধু নদীর উপকূলে মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় প্রাক-বৈদিক যুগের ভারতীয় সভ্যতা আবিষ্কার। ১৯২২ সালে মহেঞ্জোদরোয় একটি বৌদ্ধস্তূপ খননকালে তিনি মহেঞ্জোদরোর প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান লাভ করেন। রাখালদাসের এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে পাঁচ হাজার বছর আগেও ভারত একটি সুসভ্য জাতি ছিল।

রাজকোট: বর্তমানে গুজরাত রাজ্যের একটি জেলা ও জেলাসদর। জেলার অধিকাংশ স্থান নিয়ে প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য রাজকোট গঠিত ছিল। রাজকোটে, ১৯৩৮ সালে, প্রজা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে গান্ধিজি প্রজাদের দাবির সমর্থনে

আমৃত্যু অনশন শুরু করেন। রাজকোট নৃপতি গান্ধিজির দাবি মেনে নিলে অনশন প্রত্যাহৃত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে রাজকোট প্রথমে সৌরাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর ১৯৫৬ সালে সৌরাষ্ট্র বোম্বাই রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। ১৯৬০ সালে বোম্বাই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে মহারাষ্ট্র ও গুজরাত রাজ্যের সৃষ্টি হলে সৌরাষ্ট্র গুজরাতের অন্তর্ভুক্ত হয় ও রাজকোট হয় গুজরাতের একটি জেলা, আর রাজকোট শহর হয় সেই জেলার সদর শহর।

রাজগৃহ: বিহারের পাটনা জেলায় অবস্থিত ও রাজগির নামে পরিচিত। প্রাচীন মগধ রাজ্যের রাজধানী। পালিগ্রন্থ ও দুই চীনা পরিব্রাজক ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করে প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজাণ্ডার কানিংহাম রাজগৃহের বিভিন্ন স্থানে ভগবান বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত নাম ও স্থানের অবস্থিতি নির্ধারিত করেন।

রাজপুত: সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যু ও দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে মুস্লিম অভিযানের মধ্যবর্তী সময়ের (৬৫০-১১৯২ খ্রী) উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস মোটামুটিভাবে রাজপুত শাসনের ইতিহাস। অবশ্য একটি বৃহৎ শক্তিরূপে রাজপুতেরা কখনও আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারেনি, বিভিন্ন রাজপুত বংশের নেতৃত্বে অগণিত ক্ষুদ্র রাজ্য বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠে। তাই রাজপুত জাতির ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে চৌহান, রাঠোর, পারমার, চান্দেল্লা, শিশোদিয়া, তোমর, কলচুরি, গাহরবাল, গুর্জরপ্রতিহার প্রভৃতি রাজবংশের ও দিল্লী, আজমিড়, কনৌজ, মালোয়া, বুন্দেলখণ্ড, মেবার প্রভৃতি রাজ্যের ইতিহাস। রাজপুতরা যে মারাঠা বা শিখ জাতির মতো ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি তার প্রধান কারণ তাদের অনৈক্য ও আত্মকলহ।

রাজপুত জাতির বংশগত ইতিহাস সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত নন। টড, ক্রুকস, হাভেল প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে রাজপুতরা কুষাণ, শক, হুন প্রমুখ বহিরাগত ও ভারতীয়দের সংমিশ্রণে সৃষ্ট জাতি। তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে বলেন কুষাণ, শক, হুন প্রভৃতি বহিরাগতদের ভারতে অভিযানের আগের কোন ভারতীয় গ্রন্থে রাজপুত কথাটির উল্লেখ মেলে না। তারপর তাদের অগ্নি উপাসনা প্রভৃতি কয়েকটি ধর্মীয় রীতি হুন ও শকদের অনুরূপ। তাদের দৈহিক গঠনেও বৈদেশিক প্রভাব স্পষ্ট। ঐতিহাসিক হাভেলের অভিমত, রাজপুতরা হুনজাতি উদ্ভূত। হুনরা উত্তর ভারতে স্থায়ীবসতি গড়ে তোলার পর ভারতীয় নারীদের বিবাহ করে এবং তাদের বংশ ধারাই রাজপুত নামে অভিহিত হয়। শক্তিশালী গোষ্ঠী প্রধানরাই প্রথমে রাজপুত নামে পরিচিত ছিল এবং ঐ জাতিগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষ পরিচিত ছিল জাঠ, গুর্জর, আহির প্রভৃতি নামে। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজপুত কথাটি

ব্যাপকতা লাভ করে। তবে রাজপুতরা নিজেরাই এই মতের বিরোধী। রাজপুতরা নিজেদের সম্পূর্ণ আর্যবংশীয় বলে দাবি করে। তাদের মতে তারা সূর্য ও চন্দ্রবংশ জাত ক্ষত্রিয়। অগ্নি উপাসনাকে রাজপুতরা আর্যধর্ম বলে মনে করে।

ঐতিহাসিক স্মিথ দুই পরস্পর বিরোধী মতের মধ্যপন্থা অনুসরণের পক্ষপাতী। তিনি বলেন, রাজপুতদের মধ্যে যেমন ক্ষত্রিয় বংশজাতও আছে, তেমনই কুষাণ, শক, হুন প্রভৃতি জাতিরও সংমিশ্রণ ঘটেছে। রাজপুতদের নিম্নলিখিত রাজ্যগুলি বিশেষ উল্লেখ্য—

দিল্লী—ভারতে মুস্লিম অভিযানের সূচনায় দিল্লী ছিল চৌহান বংশীয় রাজপুতদের শাসনাধীন। ১১৬৩ খ্রী চৌহানরাজ বিগ্রহ রায় দিল্লী জয় করেন। বিগ্রহ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী পৃথ্বীরাজ চৌহানের শাসনকালে দিল্লী বিশেষ সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু ১১৯২ খ্রী তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরি পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত ও নিহত করে দিল্লী জয় করেন।

কনৌজ—খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কনৌজ ছিল প্রতিহার বংশীয় রাজাদের শাসনাধীন। ঐ রাজ্যের বিশিষ্ট রাজা ছিলেন মিহির ভোজ (৮৪০-৯০খ্রী)। তাঁর শাসনকালে কনৌজ ভারতের বিশিষ্ট নগরীতে পরিণত হয়। সুলতান মামুদের আক্রমণে ১০১৮-১৯ খ্রী কনৌজ বিধ্বস্ত হয়, তারপর রাঠোর বংশীয় রাজপুতরা কনৌজ অধিকার করে। কনৌজে রাঠোর শাসন শতাব্দীকাল কায়েম ছিল (১০৯০-১১৯৪)। কনৌজের রাঠোর রাজাদের মধ্যে জয়চাঁদ প্রধান। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরি যখন পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত, তখন জয়চাঁদ সম্পূর্ণ নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকেন। তার দু বছর পরে (১১৯৪) জয়চাঁদও একইভাবে মহম্মদ ঘুরির আক্রমণে পরাজিত ও নিহত হন।

মালোয়া—মালোয়া রাজ্যটি ছিল পারমার বংশীয় রাজপুতদের শাসনাধীন। রাজ্যের রাজধানী ছিল ধারা। ঐ রাজ্যের বিশিষ্ট রাজা ছিলেন মুনজা (৯৭৪-৯৫)। তিনি শিক্ষানুরাগী ও কবি ছিলেন। ঐ বংশের অপর রাজা ভোজ (১০১৮-৬০) বহু বিদ্যায় পারদর্শী ও সুলেখক ছিলেন। রাজা ভোজ বহু কিংবদন্তীর নায়ক। তাঁর মৃত্যুর পর পারমার বংশের প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে লোপ পায়।

বুন্দেলখণ্ড—চান্দেলা বংশীয় রাজপুতদের শাসিত বুন্দেলখণ্ড রাজ্য যমুনা ও নর্মদা নদীর মধ্যে অবস্থিত ছিল। রাজধানী ছিল মাহোবা। ঐ বংশের রাজা ধঙ্গ সুলতান মামুদের আক্রমণের সম্মুখীন হন। ঐ বংশের শেষ রাজা পারমল প্রথমে পৃথ্বীরাজের, পরে মহম্মদ ঘুরির বশ্যতা স্বীকার করেন।

মেবার—মেবার ১৫৪৭ খ্রী পর্যন্ত শিশোদিয়া বংশীয় রাজাদের শাসনাধীন ছিল। রাজধানী ছিল চিতোর। রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাপা রাওয়াল। মবারের অপর রাজা রানা কুম্ভ ও

তাঁর পৌত্র রানা সঙ্গর শাসনকালে মেবারের বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটে। কৃষ্ণ-প্রাণা ভক্তিমতী রাজপুত রমণী মীরা-বাঈ ছিলেন রানা কুম্ভর মহিষী।

রানা প্রতাপ সিংহের শাসনকালে ১৫৪৭ খ্রী মোগল সম্রাট আকবরের আক্রমণে মেবার স্বাধীনতা হারায়।

চেদি—নর্মদা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী চেদিরাজ্য রাজপুত কলচুরি বংশের শাসনাধীন ছিল। চেদির রাজধানী ছিল বর্তমান জব্বলপুরের নিকটবর্তী ত্রিপুরা। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চেদি স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে ওয়ারাঙ্গলের গণপতি, দেবগিরির যাদব ও বাঘেলার রাজপুতদের আক্রমণে চেদি স্বাধীনতা হারায়। চেদির রাজবংশের উল্লেখযোগ্য নৃপতি লক্ষ্মীকরণ।

অম্বর অথবা জয়পুর—ক্ষুদ্র রাজ্য অম্বরের রাজা বিহারীমল ১৫৬২ খ্রী বিনাযুদ্ধে মোগল সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁর কন্যার সঙ্গে আকবরের বিবাহ হয় ও তিনি পাঁচ হাজার মনসবদারি লাভ করেন। বিহারীমলের পুত্র ভগবান দাস ও পৌত্র মানসিংহ মোগল সেনাবাহিনীতে উচ্চ পদ লাভ করেন এবং রাজপুতানায় মোগল প্রভুত্ব বিস্তারে সহায়ক হন। মোগলের অশ্বারোহী বাহিনীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছিল রাজপুত। রাজ-পুতদের মধ্যে একমাত্র মেবারের রাজ্যচ্যুত রানা প্রতাপ শেষ পর্যন্ত মোগলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যান এবং রাজ্যের বহু অংশ পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন।

রাজস্থান : ভারতের উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী রাজ্য। আয়তন ৩,৪২,২১৪ বর্গ কিমি; লোকসংখ্যা ২ কোটি ৬০ লক্ষ। রাজধানী জয়পুর। ভারতে ইংরেজ শাসনকালে ঐ অঞ্চলে রাজপুতদের অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য ছিল এবং সমগ্র এলাকা রাজপুতানা নামে পরিচিত ছিল। দেশীয় রাজ্যগুলির সম্মিলনে বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বর্তমান রাজস্থান রাজ্য গঠিত হ'তে স্বাধীনতার পর আট বছর সময় লাগে। আলোয়ার, ভরতপুর, ঢোলপুর, কারাউলি, বাঁসোয়ারা, বুন্দি, ডোঙ্গরপুর, ঝালাওয়ার, কিষেণগড়, কোটা, প্রতাপগড়, শাহপুর ও টঙ্ক রাজ্য নিয়ে ১৯৪৮ সালের ২৫ মার্চ গঠিত হয় প্রথম রাজস্থান রাজ্য। তারপর ঐ বছর ১৮ এপ্রিল উদয়পুর যোগ দেয় রাজস্থানে। তারপর একে একে বিকানির, জয়পুর, জয়সলমির, যোধপুর, সিরোহি ও আজমির রাজ্য রাজস্থানে যোগ দিলে ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর বর্তমান রাজস্থান রাজ্যের গঠন সম্পূর্ণ হয়।

রাজমহল : বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী, বর্তমানে বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগণা জেলার একটি মহকুমা শহর। গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী এই শহরটিকে সামরিক দিক থেকে গুরুত্ব-পূর্ণ বিবেচনা করে মোগল সম্রাট আকবরের সময় সুবাদার মানসিংহ ১৫৯৫ খ্রী সেখানে বঙ্গ-বিহার-ওড়িশার রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু কয়েক

বছর পরেই ১৬০৮ খ্রী রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ১৬৩৯ খ্রী শাহ সুজার আমলে আবার রাজমহলে বাঙলার রাজধানী স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু বিশ বছর পরেই ঢাকা পূর্ব মর্যাদা ফিরে পায়।

রাজাগোপালাচারী, চক্রবর্তী (১৮৭৯-১৯৭২): বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা, ভারতের শেষ গভর্নর-জেনারেল। একজন আইনব্যবসায়ীরূপে কর্মজীবনের সূচনা করেন ও অনতিবিলম্বে সুপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। কিন্তু গান্ধিজির আহ্বানে আইনব্যবসায় ত্যাগ করে মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেন ও তার জন্য বারবার কারাবরণ করেন। ১৯১৯ সালে রাওলাট বিলের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করেন ও ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং দুবারই কারাবরণ করেন। তারপর ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন ও ১৯৪০ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগদানের জন্য আবার কারারুদ্ধ হন। ১৯২২ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন, তারপর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ও মুস্লিম লীগের পাকিস্তানের দাবি সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব সম্পর্কে মতভেদ হওয়ায় রাজাজি কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে সাময়িকভাবে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। পরে ১৯৪৫ সালে আবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন।

রাজাজি ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী হন, পরে ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে পদত্যাগ করেন। ১৯৪৬ সালে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় যোগ দেন; স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন, ১৯৪৮ সালের জুন মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেন অবসর গ্রহণের পর ভারতের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন ও ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি নতুন সংবিধান বলবৎ হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত সে পদে বহাল থাকেন; ঐ বছর মে মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেন এবং ডিসেম্বর মাসে সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর পর স্বরাষ্ট্রদপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে রাজাজি আবার মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করেন। মতবিরোধের জন্য রাজাজির সঙ্গে কংগ্রেসের ধীরে ধীরে সম্পর্কচ্ছেদ হয় এবং ১৯৫৯ সালে তিনি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। ক্ষুরধার বুদ্ধি ও প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য খ্যাত রাজাগোপালাচারী সুলেখক রূপেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তিনি তামিল ও ইংরেজি ভাষায় ১৫টি গ্রন্থের প্রণেতা। অসামান্য প্রতিভাধর মনীষী রাজাজিকে ১৯৫৫ সালে ভারত রত্ন উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

রাজিয়া, সুলতানা: দাস বংশীয় সুলতান ইলতুৎমিসের কন্যা। ইলতুৎমিস তাঁর অযোগ্য পুত্রদের বাদ দিয়ে কন্যা রাজিয়াকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান এবং রাজিয়াও পিতার মৃত্যুর পর নিজেকে দিল্লীর সুলতানা বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু নারীর শাসন দিল্লীর প্রভাবশালী

মহল সহজ মনে গ্রহণ করতে না পারায় তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। প্রথমে ইলতুৎমিসের ইচ্ছাকে অমান্য করে তাঁর অযোগ্য ও অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল পুত্র রুকনুদ্দিনকে সুলতান বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু রুকনুদ্দিনের চরম স্বেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ হয়ে দিল্লীর প্রভাবশালী মহলই আবার তাঁকে অপসারিত করে রাজিয়াকে সুলতান বলে ঘোষণা করে (১২৩৬)। বিদুষী, বুদ্ধিমতী ও শাসনকার্যে সুপটু রাজিয়া পুরুষবেশে রাজদরবারে আসতেন ও শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

কিন্তু তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ হয় না। সরহিন্দের শাসক ইখতিয়ারুদ্দিন আলতুনিয়া তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে রাজিয়া স্বয়ং সেই বিদ্রোহ দমন করতে যান। কিন্তু আলতুনিয়া রাজিয়াকে পরাজিত ও বন্দী করেন। সেই সুযোগে দিল্লীর প্রভাবশালী মহল রাজিয়ার অপর এক ভাই মইনুদ্দিন বাহরমকে দিল্লীর মসনদে বসান।

রাজিয়া ইতিমধ্যে আলতুনিয়াকে বিবাহ করেন ও উভয়ে একসঙ্গে দিল্লীর মসনদ দখলের জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু সে যুদ্ধে রাজিয়া ও তাঁর স্বামী উভয়েই নিহত হন (১২৪০)।

রাজেন্দ্র চোল : চোল বংশীয় নৃপতি রাজরাজের যোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী। তাঁর শাসনকালে (১০১৬-৪৪) চোল রাজ্য গৌরবশীর্ষে উন্নীত হয়। পিতার শাসনকালেই রাজেন্দ্র চোল তুঙ্গভদ্রার অপর পারে রাজ্য জয় করে রণকুশলতার পরিচয় দেন। তারপর স্বয়ং সিংহাসনে বসে সমগ্র সিংহল জয় করেন। পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্য রাজেন্দ্র চোলের বশ্যতা স্বীকার করে। রাজেন্দ্র চোল শুধু দাক্ষিণাত্য জয়েই সন্তুষ্ট থাকেননি। তিনি উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতেও সৈন্য পাঠান এবং ওড়িশা, বর্তমান মধ্য প্রদেশের একাংশ এবং পাল রাজা মহীপালের শাসনাধীন বাঙলা ও বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করেন। গাঙ্গেয় অঞ্চল জয়ের পর রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাই কোণ্ডা উপাধি গ্রহণ করেন। রাজেন্দ্র চোলের বিশাল নৌবহর ছিল। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য ঐ নৌবহর ব্যবহৃত হত। তবে তিনি নৌবলে বর্মার পেগু এবং আন্দামান নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ জয় করেন।

রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম রাজাধিরাজ সিংহাসনে বসেন। তিনি যোগ্য ও পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন। কিন্তু পশ্চিমে চালুক্য নৃপতি প্রথম সোমেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। তারপর তাঁর ভাই রাজেন্দ্র সিংহাসনে বসেন (১০৫৪-৬৪)। তিনি দ্বিতীয় রাজেন্দ্র চোল নামে পরিচিত। তিনিও পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন এবং প্রথম সোমেশ্বর ও পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যকে পরাজিত করে চোল রাজ্যকে আবার শক্তিশালী করেন। পরবর্তীকালে রাজেন্দ্র নামে আরও দুজন চোল বংশীয় রাজা সিংহাসনে বসেন। তাঁরা তৃতীয় ও চতুর্থ রাজেন্দ্র চোল নামে

অভিহিত। চতুর্থ রাজেন্দ্র চোলের শাসনকালে (১২৪৬-৭৯) পাণ্ড্যরাজ জাতবর্মন সুন্দর চোলরাজ্য আক্রমণ করে কাঞ্চি জয় করেন। তারপর চোলরাজ্য ভেঙে পড়ে ও সেই ছত্রভঙ্গ রাজ্যের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডঃ (১৮৮৪-১৯৬৩): বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, সুপণ্ডিত, সুলেখক, জাতীয়তাবাদী নেতা ও স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি। প্রথম কলকাতা হাইকোর্টে, পরে পাটনা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ-উপার্জন করেন। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে বিপুল বিত্তের ওকালতি ছেড়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং সে আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের জন্য কারারুদ্ধ হন এবং তারপর বহুবার কারাবরণ করেন। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেস সভাপতি হন ১৯৩৪, ৩৯ ও ৪৭-৪৮ সালে। ১৯৪৬ খ্রী অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। ১৯৪৭-৫০ খ্রী গণপরিষদের সভাপতি হন। ১৯৫০ খ্রী ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্রী ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

রাজ্যবর্ধন: পুষ্যভূতি বংশীয় রাজা প্রভাকর বর্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, পিতার মৃত্যুর পর থানেশ্বরের রাজা হন। তিনি যুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন এবং পিতার শাসনকালে হুন আক্রমণ প্রতিরোধে কৃতিত্ব দেখান। কিন্তু ৬০৫ খ্রী সিংহাসনারোহণের মাত্র এক বছর পরে গৌড়রাজ শশাঙ্কের হাতে নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই হর্ষবর্ধন রাজা হন।

রাজ্যশ্রী: সম্রাট হর্ষবর্ধনের ভগ্নী ও কনৌজের মৌখরি বংশীয় শেষ নৃপতি গ্রহবর্মনের স্ত্রী। গ্রহবর্মন মালবরাজ দেবগুপ্তের আক্রমণে অকালে প্রাণত্যাগ করলে রাজ্যশ্রীর ইচ্ছায় সম্রাট হর্ষবর্ধন কনৌজের শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজ্যশ্রী রাজ্যের শাসনকার্যে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতেন এবং নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভাইকে পরামর্শ দিতেন।

রানী ভবানী (১৭১৫-৯৪): নাটরের জমিদার রামকান্তের স্ত্রী। ১৭৪৭ খ্রী স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি দেড় কোটি টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তির অধিকারিণী হন। সিরাজুদ্দৌলাকে মসনদচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে রানী ভবানী ইংরেজপক্ষে যোগ দেন।

দুর্ভিক্ষের জন্য রানী ভবানী সময়মতো খাজনা আদায়ে অসমর্থ হওয়ায় ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর জমিদারি কেড়ে নিয়ে দুলাল রায় নামে এক ব্যক্তিকে দেন। তা ছাড়াও রানী ভবানীর প্রাসাদ অবরোধ করে সেখান থেকে প্রচুর ধন-দৌলত নিয়ে যাওয়া হয়। হেস্টিংসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রানী ভবানী গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের কাছে আবেদন জানান। কাউন্সিল রানী ভবানীর আবেদন গ্রাহ্য করেন

ও রানী ভবানীর সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৩-৮৬): হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্ম। পূর্বনাম গ দা ধ র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ধর্মসাধনার মূল কথা ছিল সমন্বয়—সব ধর্মমতকেই তিনি ভগবৎ সান্নিধ্য লাভের পথ বলে জানতেন। তিনি বলতেন, যত মত, তত পথ। পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে এ দেশের শিক্ষিত সমাজ যখন বিভ্রান্ত সেই যুগ সন্ধিক্ষণে সর্বংসহা সনাতন ভারতের শাশ্বত প্রতীকরূপে রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমন্বয়বাদী চিন্তাধারায় অ নু প্রা ণি ত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সনাতন ধর্মের ঔদার্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের কথা সর্বপ্রথম বিশ্বসভায় প্রচার করেন ও ভারতের জাতীয় চেতনাকে নবভাবে উদ্বুদ্ধ করেন।

রামন, সি ভি (১৮৮৮-১৯৭০): বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। ১৯৩০ খ্রী পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

রামপাল: বাঙলার পাল বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য নৃপতি। তিনি উত্তরবঙ্গে প্রজা বি দ্রো হে র নেতা দিব্যোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এবং রাষ্ট্রকূট নৃপতিদের সহায়তায় ভীমকে পরাজিত ও নিহত করে পিতা মহীপালের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেন। রামপালের ঐ যুদ্ধ বিজয়ের কাহিনী তাঁর সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম' কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গ জয়ের পর রামপাল পূর্ববঙ্গ ও আসামকে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বাধীনে আনেন।

রামমোহন রায়, রাজা (১৭৭৪-১৮৩৩): বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক, ধর্মসংস্কারক, শিক্ষাসংস্কারক ও লেখক রাজা রামমোহন রায় আধুনিক ভারতের প্রথম জাগ্রত পুরুষরূপে সম্মানিত। গ্রাম্য হিন্দুধর্মের বহু গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও নানা নিষ্ঠুর প্রথার অবসানকল্পে তিনি আন্দোলন করেন। সতীদাহ প্রথার অবসানকল্পে তাঁর উদ্যোগ বিশেষ স্মরণীয়। মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর শাহ তাঁর বৃত্তি বাড়ানোর জন্য বৃটিশ সরকারের কাছে দরবার জানাতে রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে বিলাতে পাঠান। ১৮৩০ খ্রী রাজা রামমোহন বিলাতে যান। শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে রাজা রামমোহনই প্রথম সে দেশে যান। বিলাতেও রাজা রামমোহন ভারতীয়দের স্বার্থে নানা প্রচার কার্য চালান, ১৮৩৩ খ্রী ইংলণ্ডের বৃস্টল শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

রামানুজ: হিন্দু ধর্ম প্রচারক, সম্ভবত ১১৫০ খ্রী দাক্ষিণাত্যের চোল রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুর উপাসকরূপে তিনি প্রচার করেন, ভক্তিই মুক্তির পথ। তাঁর প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে দক্ষিণ ভারতের বহু রাজা জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন। মহীশূরের রাজা জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন, রামানুজের দীক্ষায় তিনি পুনরায় হিন্দু হন।

রামায়ণ: মহাকবি বাল্মীকি কর্তৃক

সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাকাব্য। প্রথম (বালকাণ্ড) ও শেষ কাণ্ড (উত্তর কাণ্ড) বাল্মীকির রচনা নয় বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন। রামায়ণ ও মহাভারতের ভাষা প্রায় সমকালীন এবং উভয় কাব্যে অনেকগুলি খণ্ডকাহিনী ও চরিত্রের সাদৃশ্য দেখা যায়। তা থেকে বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে মহাকাব্য দুটি প্রায় একই সময়ের রচনা। রচনাকাল সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। পাশ্চাত্যের পণ্ডিত উইণ্টারনিজ মনে করেন যে, একটি সুপ্রচলিত লোকগাথার ভিত্তিতে সম্ভবত খ্রী-পূ তৃতীয় শতাব্দীতে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। রামায়ণের মূল রচনা আকারে অনেক ছোট ছিল, পরবর্তীকালে বিভিন্ন অজ্ঞাত কবি তার সঙ্গে অনেক অধ্যায় সংযোজিত করে রামায়ণের কলেবর বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে যে আকারে রামায়ণ প্রচলিত তা সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর রচনা। খ্রী-পূ যুগের বহু বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে রামায়ণের উল্লেখ আছে।

রামায়ণ মহাকাব্যে খ্রী-পূ যুগের ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের নানা তথ্যের সন্ধান মেলে।

রাষ্ট্রকূট বংশঃ দাক্ষিণাত্যে বাতাপির চালুক্য রাজ্যের পতনের পর রাষ্ট্রকূট রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটে। ৭৫৩ খ্রী চালুক্য নৃপতি দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনকে পরাজিত করে দন্তিদুর্গ রাষ্ট্রকূট বংশীয় শাসনের সূচনা করেন। রাষ্ট্রকূট নৃপতিরা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় বংশ সম্ভূত। দক্ষিণ ভারতে প্রায় দুই শতাব্দীকাল (৭৫৩-৯৭৩) রাষ্ট্রকূট শাসন কায়েম ছিল। রাষ্ট্রকূট বংশীয় নৃপতিদের মধ্যে দন্তিদুর্গ, প্রথম কৃষ্ণ, তৃতীয় গোবিন্দ, অমোঘবর্ষ ও তৃতীয় ইন্দ্রর শাসনকাল উল্লেখযোগ্য।

প্রথম কৃষ্ণ ইলোরার পাথরকাটা কৈলাস মন্দিরের স্রষ্টা, সেটি স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। তৃতীয় গোবিন্দ পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি কাঞ্চির পল্লব ও বেঙ্গীর চালুক্য নৃপতিদের পরাজিত করেন এবং প্রতি-হার নৃপতি নাগভট্টর উজ্জয়িনী পুন-রুদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ করেন। তৃতীয় গোবিন্দ যখন উত্তরে নাগভট্টর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, সে সময় চোল, পাণ্ড্য, কাঞ্চি, কেরল রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৃতীয় গোবিন্দকে পরাজিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

রাষ্ট্রকূট বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি অমোঘ-বর্ষ, তিনি তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র। অমোঘবর্ষ দীর্ঘ ৬৩ বছর রাজত্ব করেন (৮১৪-৭৭)। তিনি বেঙ্গীর চালুক্য ও প্রতিহার নৃপতি মিহিরভোজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হন। কিন্তু যোদ্ধা অপেক্ষা শিক্ষা সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকরূপে তিনি অধিক খ্যাত। তিনি নিজেও সুলেখক ছিলেন। আরব পর্যটক সুলেমান অমোঘবর্ষকে পৃথিবীর চারজন শ্রেষ্ঠ নৃপতির একজন বলে বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ নৃপতি দ্বিতীয় কর্ক কল্যাণের চালুক্য রাজা দ্বিতীয় তৈলক কর্তৃক আনুমানিক ৯৭৭ খ্রী যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

দক্ষিণ ভারতে প্রায় দুই শতাব্দী-কাল স্থিতিশীল শাসন কায়েম রাখাই

বোধহয় রাষ্ট্রকূট রাজাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। রাষ্ট্রকূট রাজারা শিল্প, সংস্কৃতি ও শিক্ষার বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহির্বিশ্বের সঙ্গে রাষ্ট্রকূট রাজ্যের বাণিজ্যিক লেন-দেন ছিল এবং সেটিই রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

রাসবিহারী ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১) : বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ী, শিক্ষানুরাগী ও নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা। আইন ব্যবসায়ে যে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন তার একটি বড় অংশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিদ্যালয়ে দান করেন। রাসবিহারী ঘোষ ১৯০৭ সালে সুরাটে ও ১৯০৮ সালে মাদ্রাজে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

রাসবিহারী বসু (১৮৮৫-১৯৪৫) : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিপ্লবী। দেরাদুন ফরেস্ট রিসার্চ অফিসে কাজ করার সময় দেশ-বিদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপনে সংযোগ স্থাপন করেন। ১৯১২ খ্রী প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিশ তাঁর সন্ধান করলে তিনি গোপনে দেশত্যাগ করে জাপানে যান ও সেখান থেকে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেন। জাপানে তাঁর উদ্যোগে গঠিত হয় 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ'। ১৯৪১ সালে তাঁরই উদ্যোগে পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে গঠিত হয় প্রথম আজাদ হিন্দ বাহিনী। পরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র জাপানে পৌঁছালে তিনি নেতাজির হাতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব তুলে দেন। জাপানেই রাসবিহারী বসুর জীবনের অবসান ঘটে।

রিপন, লর্ড : লর্ড রিপন ১৮৮০-৮৪খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন। তিনি ছিলেন উদার মতাবলম্বী এবং ভারতের শাসন দায়িত্বে ভারতীয়দের সক্রিয় অংশ গ্রহণের পক্ষপাতী। তাঁর শাসনকালে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের উপর ন্যস্ত হয়। লর্ড লিটন যে দেশীয় সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেন, লর্ড রিপনের শাসনকালে তা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য লর্ড রিপন হাণ্টার কমিশন গঠন করেন। প্রাথমিক উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য হাণ্টার কমিশন যে সব সুপারিশ করেন লর্ড রিপন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সেইমত ঢেলে সাজায় উদ্যোগী হন। তিনি প্রজাদের স্বার্থে 'প্রজাস্বত্ব আইন' ও কারখানার শ্রমিকদের স্বার্থে 'কারখানা আইন' পাশ করেন।

বিচার ব্যবস্থায় এদেশীয় ইংরেজরা যে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন তা দূর করার জন্য লর্ড রিপন উদ্যোগী হন। অভিযুক্ত শ্বেতাঙ্গদের বিচার যাতে ভারতীয় বিচারকরাও করতে পারেন তার জন্য তিনি একটি আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেন। ঐ প্রস্তাবিত আইন 'ইলবার্ট বিল' নামে অভিহিত হয়। ঐ বিল নিয়ে ইংলণ্ডে ও এদেশে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন হওয়ায় বিলটি শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। ঐ ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ লর্ড

রিপন্ কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

রীডিং, লর্ড : রীডিং ১৯২১-২৬ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন। তাঁর শাসনকালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারা ভারত জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন হয়। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে মালাবার উপকূলে মোপলা বিদ্রোহ লর্ড রীডিং-এর শাসনকালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। লর্ড রীডিং রাউলাট আইন নাকচ করেন এবং ভারতীয়দের সৈন্য-বিভাগে অফিসার পদ লাভের সুযোগ দেন।

রুদ্রট : সম্ভবত কাশ্মীরের লোক ও খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জন্ম। অলঙ্কার শাস্ত্রের বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন।

রুদ্রদমন : পশ্চিম ভারতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাজধানী উজ্জয়িনীকে কেন্দ্র করে যে শক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, রুদ্রদমন ছিলেন সেই রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি। তাঁর রাজত্বকাল ১২০-১৫০ খ্রী। জুনাগড়ের শিলা-লিপিতে রুদ্রদমনের রাজ্য বিস্তারের কাহিনীর বর্ণনা আছে। গুজরাত, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চল, উত্তর কোঙ্কন, রাজপুতানা ও পাঞ্জাবের কিছু অংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর সঙ্গে সাতবাহন বংশীয় রাজা বশিষ্ঠপুত্র পুলমায়ির দীর্ঘ যুদ্ধ হয়। পরিশেষে রুদ্রদমনের কন্যার সঙ্গে পুলমায়ির বিবাহ হলে উভয় রাজ্যের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়। রুদ্রদমন শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজেও ব্যাকরণ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রজা-পালকরূপেও রুদ্রদমনের খ্যাতি ছিল।

রুদ্রাম্মা : ওয়ারাঙ্গলের কাকতীয় বংশীয় রানী (১২৫৯-৮৮)। রাজ্য শাসনে ও প্রজাপালনে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি পুরুষবেশে রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

রূপড় : পাঞ্জাবের আম্বালা জেলায় শিবালিক পর্বতমালার নীচে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। এখানে ১৯৫২-৫৫ সালে খনন কার্য চালিয়ে হরপ্পার সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়।

রেগুলেটিং এক্ট (১৭৭৩): ভারতে বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ১৭৭৩ খ্রী লর্ড নর্থের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে বৃটিশ পার্লামেণ্টে রেগুলেটিং এক্ট পাশ হয়। এজন্য ঐ রেগুলেটিং এক্ট নর্থস রেগুলেটিং এক্ট নামেও পরিচিত। ঐ এক্ট অনুসারে বাঙলার গভর্নরকে গভর্নর-জেনারেল পদে উন্নীত করা হয় এবং তাঁর উপর বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারের শাসন-কার্য পরিদর্শনের কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হয়। গভর্নর-জেনারেলের কাজে সহায়তা করার জন্য একটি চার সদস্য কাউন্সিল গঠন করা হয়। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মে 'সুপ্রীম কোর্ট' নামে সর্বোচ্চ আদালত স্থাপিত হয়। প্রধান বিচার-পতি ও তিনজন সহকারী বিচারপতি নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। স্যার এলিজা ইম্পে হন সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি।

রোহিলা যুদ্ধ : অযোধ্যার নবাব

সুজাউদ্দৌলা ওয়ারেন হেস্টিংসের সহায়তায় রোহিলাখণ্ড জয় করেন। চল্লিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ওয়ারেন হেস্টিংস রোহিলা যুদ্ধে অযোধ্যার নবাবের সহায়তা করেন। ইংরেজ সৈন্য-বাহিনীকে এইভাবে ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসকে স্বদেশে তীব্র ভর্ৎসনার সম্মুখীন হতে হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচারকালে রোহিলা যুদ্ধে তাঁর আচরণ সম্পর্কেও অভিযোগ আনা হয়।

লং, রেভারেণ্ড জেমস : ধর্মপ্রচারক রূপে ১৮৪৬খ্রী ভারতে আসেন। সে সময় নীলকর সাহেবদের প্রজাপীড়ন তাঁকে বিশেষভাবে বিচলিত করে। নীলকর সাহেবদের উৎপীড়ন কাহিনী ইংলণ্ডবাসীদের জানানোর জন্য তিনি ১৮৬১ খ্রী দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীলদর্পন' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। সে কারণে তিনি ইংরেজ সরকার কর্তৃক অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁর হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে এক মাস জেল হয়। তাঁর হয়ে সে টাকা দিয়ে দেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন সিংহ। ফাদার লং তাঁর নিঃস্বার্থ জনসেবার জন্য দেশবাসীর বিশেষ প্রিয় হন।

লক্ষ্মণ সেন : বঙ্গদেশে সেন রাজ-বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য নৃপতি। বল্লাল সেনের পুত্র, রাজত্বকাল ১১৮৫-১২০৬ খ্রী। পূর্ববর্তী সেন রাজারা শিবের উপাসক হলেও লক্ষ্মণ সেন ছিলেন বৈষ্ণব। কিন্তু রাজা হিসাবেও তিনি পরাক্রমশালী ছিলেন নি গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ ও কাশী রাজ্য জয় করেন। এলাহাবাদ পর্যন্ত তাঁর সৈন্য-বাহিনী অগ্রসর হয়।

লক্ষ্মণ সেন উচ্চশিক্ষিত ছিলেন এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। 'গীতগোবিন্দ' রচয়িতা জয়দেব ছিলেন তাঁর সভাকবি। ধোয়ী, শরণ, উমাপতি ধর, গোবর্ধন প্রভৃতি কবিগণও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। হলায়ুধ নামে এক খ্যাতনামা পণ্ডিত তাঁর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি ছিলেন।

লক্ষ্মণ সেনের শাসনকালের শেষের দিকে রাজ্যের অভ্যন্তরে নানা বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ও সেন রাজত্বের অবনতি শুরু হয়। সেই অরাজক অবস্থার সুযোগ নিয়ে মহম্মদ ঘুরির অনুগামী ভাগ্যান্বেষী তুর্কি যোদ্ধা ইখতিয়ারুদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি অতর্কিতে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণ সেন তখন নবদ্বীপে ছিলেন। অষ্টাদশ অশ্বা-রোহী সৈন্য নিয়ে বণিকের ছদ্মবেশে বখতিয়ার খলজি সে শহরে প্রবেশ করেন ও আক্রমণ শুরু করেন। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হওয়ায় লক্ষ্মণ সেন আক্রমণ প্রতিরোধের কোন চেষ্টা না করে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে সেন রাজত্বের অবসান ঘটে, কিন্তু পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের কর্তৃত্ব তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে।

লক্ষদ্বীপ : ভারতীয় ইউনিয়নের নয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের একটি। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এই দ্বীপপুঞ্জটি আগে লাক্ষাদ্বীপ, আমিন-দ্বীপ ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত ছিল, ১৯৭৩ সালের ১লা নভেম্বর থেকে

সমগ্র দ্বীপপুঞ্জটির লক্ষদ্বীপ নাম দেওয়া হয়। মোট ২৭টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলটির মোট আয়তন ৩২ বর্গ কিলোমিটার। ১৭টি দ্বীপ জনহীন। লোকসংখ্যা ৩৫ হাজার।

লখ্‌নৌ চুক্তি : ১৯১৬ সালে লখ্‌নৌতে কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি। ঐ চুক্তিতে উল্লেখিত উভয় দল ভারতের শাসন সংস্কারের জন্য একটি নতুন সংবিধানের প্রস্তাব দেয়। তাতে বলা হয়, অর্থ ও প্রশাসনের ব্যাপারে প্রদেশের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ যতটা সম্ভব হ্রাস করতে হবে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভাগুলির সদস্যদের চার-পঞ্চমাংশ নির্বাচিত ও এক-পঞ্চমাংশ মনোনীত হতে হবে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় যে আইন পাশ হবে তা বলবৎ করতে কেন্দ্র ও প্রদেশ সরকার বাধ্য থাকবেন; আইনসভায় অনু-মোদিত কোন আইন নাকচের ক্ষমতা শুধু গভর্নর-জেনারেলের থাকবে। ভারত সরকারের সঙ্গে ভারত সচিবের সম্পর্ক হবে বিভিন্ন ডোমিনিয়ন সরকা-রের সঙ্গে কলোনিয়াল সেক্রেটারির অনুরূপ। ভারত সরকারের সামরিক ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কেন্দ্রীয় আইন-সভার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগের মধ্যে নিকট সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা কয়েক-বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে মুস্লিম লীগের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী, মদন-মোহন মালব্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যোগ দেন এবং সভায় ভাষণ দেন। লখ্‌নৌ চুক্তি ঐ মৈত্রী প্রচেষ্টার পরিণতি।

অবশ্য লখ্‌নৌ চুক্তিতে প্রস্তাবিত সংবিধান বৃটিশ সরকারের অনুমোদন লাভ করে না এবং নানা প্ররোচনায় কংগ্রেস-লীগ মৈত্রীও বেশিদিন অক্ষুণ্ণ থাকে না। ফলে লখ্‌নৌ চুক্তিতে ঐক্য-বদ্ধ ভারতের যে অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছিল তাও দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

লরেন্স, স্যার জন : স্যার জন লরেন্স ১৮৬৪-৬৯ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন। তাঁর শাসনকালে ভুটানের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের বিরোধ হয়। ভুটানিরা সে সময় প্রায়ই বঙ্গদেশের উত্তর সীমান্ত লঙ্ঘন করত। ঐ ব্যাপারে ভুটান রাজ্যের সঙ্গে আলোচনার জন্য একজন ইংরেজ কর্মচারীকে পাঠানো হলে তিনি সেখানে বন্দী হন। ফলে ভুটানের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের যুদ্ধ অনিবার্য হয়।

যুদ্ধে ভুটানরাজ পরাজিত হন এবং ডুয়ার্স অঞ্চল ভারত সরকারকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তাছাড়া ভুটান বাৎসরিক করদানেও স্বীকৃত হয়। স্যার জন লরেন্সের শাসনকালে ভারতে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষে বহু লোকের মৃত্যু হয় এবং তখনই ভারত সরকার দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সরকারি দায়িত্ব স্বীকার করেন। ১৮৬৬ খ্রী এক রাজস্ব আইন বলবৎ করে লরেন্স জমিদারদের জমি থেকে প্রজা উৎখাতের অধিকার লোপ করেন।

ললিতাদিত্য মুক্তপীড় : কাশ্মীরের কারকোতা বংশীয় রাজা, শাসনকাল ৭২০-৬০ খ্রী। তিনি পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। তিব্বতীদের বিরুদ্ধে

অভিযান চালান, অকসস উপত্যকা পর্যন্ত সৈন্যবাহিনী পাঠান কনৌজ-রাজ যশোবর্মনকে পরাজিত করেন ও পাঞ্জাবের একাংশ জয় করেন। দাক্ষিণাত্যে চালুক্য রাজাদের বিরুদ্ধেও তিনি অভিযান চালান। ললিতাদিত্যের শাসনকালে উত্তর ভারতে কাশ্মীরের প্রভাব ও গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। কাশ্মীরের কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য ললিতাদিত্য যেসেচের ব্যবস্থা করেন তা আজও অটুট ও অপরিবর্তিত আছে।

লালকেল্লা : দিল্লীতে যমুনা নদীর তীরে লাল বালি পাথরে তৈরি দুর্গ। সম্রাট শাহজাহান ১৬৩৯ খ্রী আগ্রা থেকে দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং তারপর রাজধানীর প্রতিরক্ষাকল্পে ঐ দুর্গ নির্মিত হয়। লালকেল্লার অভ্যন্তরে রংমহল, মতিমহল, দিওয়ান-ই খাস, দিওয়ান-ই আম প্রভৃতি বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত শ্বেত পাথরের সুরম্য প্রাসাদগুলিও শাহজাহানের আমলের সৃষ্টি।

লালমোহন ঘোষ (১৮৪৯-১৯০৯) : বিশিষ্ট বাগ্মী, জাতীয়তাবাদী নেতা। ১৮৯০ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে প্রথম যোগ দেন। তারপর ১৯০৩ খ্রী মাদ্রাজে কংগ্রেসের ১৯তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ইলবার্ট বিলের সমর্থনে জনমত সৃষ্টির ব্যাপারে লালমোহন ঘোষের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল (ইলবার্ট বিল-দ্র)।

লালা লাজপৎ রায় (১৮৬৪-১৯২৮): পাঞ্জাব তথা ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১৯০৮ খ্রী মান্দালয়ে নির্বাসিত হন। কয়েক বছর পরে আমেরিকা যান এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯১৯ খ্রী আবার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। ঐ বছর কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য ১৯২১-২৩ খ্রী কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯২৮ খ্রী দেশব্যাপী যখন সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন হয় তখন একটি বিক্ষোভ মিছিলের পুরোভাগে থাকাকালে পুলিশের আক্রমণে গুরুতরভাবে আহত হন ও তার অল্প কয়েকদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে লালা লাজপৎ রায় ছিলেন চরমপন্থী। ১৯০৭ খ্রী সুরাট কংগ্রেসে যখন নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ হয় তখন লালাজি ছিলেন বালগঙ্গাধর টিলক, বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ চরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে। ঐ চরমপন্থী নেতৃত্বই একদা 'লাল-বাল-পাল' নামে উল্লেখিত হত। পরে অবশ্য লালাজি মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্ব ও আদর্শ গ্রহণ করেন।

লিটন, লর্ড : লর্ড লিটন ১৮৭৬-৮০ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন। তাঁর শাসনকালে ১৮৭৭ খ্রী মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনকালে ভারতে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় দুর্ভিক্ষের প্রতিকারকল্পে সেই সময় দুর্ভিক্ষ বিধি (Famine Code) প্রণীত হয়।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে বৃটিশ

সরকারের সমালোচনা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে লর্ড লিটন ভার্নাকুলার প্রেস এক্ট নামে একটি আইন পাশ করেন। ঐ আইন ইংরেজি সংবাদপত্রগুলির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না। এ কারণে তৎকালে বৃটিশ সরকারের বিশেষ সমালোচক বাংলা 'অমৃতবাজার পত্রিকা' রাতারাতি ইংরেজি ভাষায় রূপান্তরিত হয়।

আফগানিস্তানে রুশ প্রভাব প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে লর্ড লিটন আফগানিস্তানের আমির শের আলিকে কয়েকটি শর্তে সম্মত করাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শের আলি সম্মত না হওয়ায় দ্বিতীয় আফগান (ইঙ্গ) যুদ্ধ শুরু হয়। শের আলি পরাজিত হলে গাবদামুকের সন্ধি অনুসারে শের আলির পুত্র ইয়াকুব আলি আফগানিস্তানের নবাব হন। পরে আফগানিস্তানের সঙ্গে আবার বিরোধ দেখা দেয়। কিন্তু তার নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই লিটন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর শাসনকালে কোয়েটা ও বোলান গিরিপথে ইংরেজ কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

লিনলিথগো, লর্ড : লর্ড লিনলিথগো ১৯৩৬-৪৩খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন। তাঁর শাসনকালে ১৯৩৫ খ্রী ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ খ্রী ভারতের ১১টি প্রদেশে নির্বাচন হয় এবং নির্বাচনের পর প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং আসাম ও সিন্ধুপ্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করলেও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দলের সহযোগিতায় মন্ত্রিসভা গঠনে সমর্থ হয়। শুধু পাঞ্জাব ও বাঙলায় কংগ্রেস বিরোধীদলের ভূমিকা নেয়। কিন্তু ১৯৩৯ খ্রী বৃটিশ সরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতকে তার সম্মতি ছাড়াই জড়িত করানোর প্রতিবাদে কংগ্রেস নয়টি প্রদেশে মন্ত্রিসভা ত্যাগ করে। তখন লর্ড লিনলিথগোর পৃষ্ঠপোষকতায় মুস্লিম লীগ কয়েকটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনে সমর্থ হয়।

লর্ড লিনলিথগোর শাসনকালের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা ক্রিপস-দৌত্য। বৃটিশ সরকার ভারতের জাতীয় নেতাদের সঙ্গে একটা আপসে আসার উদ্দেশ্যে ১৯৪২ খ্রী বৃটিশ মন্ত্রিসভার বিশিষ্ট সদস্য স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠান। ক্রিপস প্রস্তাব করেন, যুদ্ধশেষে ভারতবাসীদের নিজ সংবিধান প্রণয়ণের সুযোগ দিতে সংবিধান পরিষদ ডাকা হবে। নতুন সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত ভারতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ইংরেজ সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। ভারতের জাতীয় নেতারা ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার অল্পকাল পরেই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে প্রচণ্ড জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়, যা আগস্ট আন্দোলন নামে খ্যাত। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ জাতীয় নেতারা সকলেই কারারুদ্ধ হন।

লর্ড লিনলিথগোর শাসনকালের সর্বাধিক কলঙ্কজনক ঘটনা ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ বা পঞ্চাশের মন্বন্তর। ঐ দুর্ভিক্ষে বাঙলার প্রায় দশ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর এমন ভয়াবহ লোকক্ষয়ী দুর্ভিক্ষ

ভারতে আর হয়নি। ঐ সময় জেলে বন্দী মহাত্মা গান্ধী তিন সপ্তাহের জন্ম অনশন শুরু করেন এবং তাঁর জীবন-সংশয় দেখা দেয়। ঐ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে ভাইসরয়'জ কাউন্সিল-এর সদস্য স্যার হোমি মোদি ও নলিনীরঞ্জন সরকার পদত্যাগ করেন। ভারতীয় রাজনীতির সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ খ্রী লর্ড লিনলিথগোর কার্যকাল শেষ হয়।

লোথাল : গুজরাতে ক্যাম্বে উপসাগরের নিকটবর্তী সাগরওয়ালা গ্রামে অবস্থিত এই স্থানটিতে উৎখননের ফলে হরপ্পা সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানকার বাড়িঘর, কূপ, মৃৎপাত্র, পরিমাপযন্ত্র প্রভৃতিতে হরপ্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। বন্যায় এই সভ্যতা ধ্বংস হয়। লোথাল একটি বাণিজ্য নগরী ছিল। গুজরাতের জামনগর, রাজকোট, জুনাগড় ও ব্রোচ জেলার বিভিন্ন স্থানে হরপ্পা যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

লোদিবংশ : সৈয়দবংশীয় সুলতানির অবসান ঘটিয়ে বহলুল লোদি দিল্লীতে লোদিবংশীয় সুলতানির সূচনা করেন ১৪৫১ খ্রী। লোদিবংশের মাত্র তিনজন সুলতান দিল্লীর মসনদে বসেন। তাঁরা হলেন বহলুল লোদি, সিকন্দর লোদি ও ইব্রাহিম লোদি। ১৫২৬ খ্রী মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লীর মসনদ দখল করেন। তার ফলে লোদিবংশের শাসন, সেই সঙ্গে দিল্লীর সুলতানিরও অবসান ঘটে। শুরু হয় মোগল যুগ।

ল্যান্সডাউন, লর্ড : লর্ড ল্যান্সডাউন ১৮৮৮–৯৪ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন। কয়েকটি সংস্কারমূলক আইন তাঁর শাসনকালে বলবৎ হয়। তিনি কারখানা আইন পাশ করে শ্রমিকদের কল্যাণ সাধন করেন। তিনি এদেশের মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স দশ বছর নির্ধারিত করেন। তাঁর সময়ে রূপার দাম অত্যন্ত হ্রাস পাওয়ায় তিনি স্বর্ণমানের প্রবর্তন করেন। তাঁর শাসনকালে ১৮৯২ খ্রী যে কাউন্সিল এক্ট পাশ হয় তাতে ভারতের শাসন-ব্যবস্থার বহু সংস্কার করা হয়।

লর্ড ল্যান্সডাউন মণিপুর, কালাত ও কাশ্মীর রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি কাশ্মীর রাজ্যের রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে সেখানে এক প্রতিনিধিসভার হাতে শাসনদায়িত্ব অর্পণ করেন। কিন্তু তাঁর ঐ ব্যবস্থা বৃটিশ সরকার অনুমোদন না করায় কাশ্মীরের রাজাকে সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

শক অভিযান, ভারতে : খ্রী-পূ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউচি নামে এক যাযাবর জাতির চাপে শকরা মধ্য এশিয়া ত্যাগ করে দক্ষিণে ভারত অভিমুখে অগ্রসর হয়। তারা আফগানিস্তান, বালুচিস্তান হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রথম উল্লেখযোগ্য শক নৃপতির নাম মোয়েস বা মোগ। তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের নানা মত। ১৩৫ খ্রী-পূ থেকে ১৫৪ খ্রী মধ্যে কোন একসময়ে, সম্ভবত ৭২ খ্রী-পূ

নাগাদ তিনি গান্ধার অঞ্চলের রাজা ছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী অজেস (১ম) সম্ভবত পূর্ব পাঞ্জাব জয় করেন।

ক্রমে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতেও শক শাসন বিস্তৃতি লাভ করে। এসব অঞ্চলের শকরা ছিল ক্ষহরত বংশীয়। ক্ষহরত শক বংশীয় শ্রেষ্ঠ নৃপতি নহপন সাতবাহন বংশীয় রাজাদের কাছ থেকে মহারাষ্ট্রের একাংশ জয় করেন। তাঁর রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে সম্ভবত ১২৪ খ্রী পর্যন্ত। গৌতমীপুত্র সাতকর্নির কাছে নহপন পরাজিত হন।

পশ্চিম ভারতে কয়েক শতাব্দী ধরে কর্দমক বংশীয় শক নৃপতিদের শাসন স্থায়ী ছিল। উজ্জয়িনী ছিল তাঁদের রাজধানী। কর্দমক বংশীয় শক নৃপতি-দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চস্তন ও তাঁর পৌত্র রুদ্রদমন। রুদ্রদমনের রাজত্বকাল ১৫০খ্রী কাছাকাছি এবং তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তিনি পশ্চিম মালব, উত্তর গুজরাত, কাথিয়াওয়াড়, কচ্ছ, মাড়োয়ার, নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চল প্রভৃতি স্থান তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি যেমন পরাক্রমশালী তেমনই সুশাসক ও পণ্ডিত ছিলেন। রুদ্রদমনের উত্তরাধিকারীদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের শক রাজ্য পহ্লবরাজ গণ্ডোফের্নিস কর্তৃক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অধিকৃত হয়। আর পশ্চিম ভারতে শক শাসনের অবসান ঘটান গুপ্ত বংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। মালোয়া গুজরাত ও সৌরাষ্ট্রের শক রাজ্যগুলি জয় করে তিনি ভারতে শকদের চির-তরে দমন করেন এবং ভারতে বৈদেশিক শক শাসনের অবসান ঘটিয়ে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকারি উপাধি গ্রহণ করেন।

শঙ্করদেব (১৪৪৯-১৫৬৮): পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে শঙ্করদেবের বৈষ্ণব আন্দোলন সমগ্র আসামে নবজাগরণের সূচনা করে। সেই জাগরণ অসমিয়া সাহিত্যেও নতুন সৃষ্টির প্রেরণা আনে। শঙ্করদেব স্বয়ং আটটি পুরাণ কাহিনী অসমিয়া ভাষায় অনুবাদ করেন। পুরাণের সার অবলম্বনে রচিত 'কীর্তন ঘোষা' শঙ্করদেবের শ্রেষ্ঠ রচনা। শঙ্করদেবের অনুপ্রেরণায় সমকালে অসমিয়া ভাষায় বহু গীত, নাটক ও কাহিনী কাব্য রচনা করেন তাঁর প্রধান শিষ্য মাধবদেব এবং অনন্ত কন্দলী ও রাম সরস্বতী নামে দুই কবি।

শঙ্করদেব ও মাধবদেবের মৃত্যু-বার্ষিকী আজও আসামে উৎসবের মাধ্যমে পালিত হয়। শঙ্করদেবের বৈষ্ণবতত্ত্বের মূল কথা একেশ্বরবাদ।

শঙ্করাচার্য: হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের প্রখ্যাত পণ্ডিত, তত্ত্বজ্ঞ ও প্রচারক। মালাবারে জন্ম সম্ভবত ৭৮৮ খ্রী। হিন্দু অদ্বৈতবাদের সমর্থনে প্রচারকালে বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন, কিন্তু প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অকাট্য যুক্তি বলে সর্বত্র স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করেন। শঙ্করাচার্যের প্রচারের মূল কথা, ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত দেবদেবী প্রকৃতপক্ষে একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপে প্রকাশ।

হিন্দু ধর্মের প্রচারকল্পে তিনি পূর্বে

পুরী, পশ্চিমে দ্বারকা, উত্তরে বদ্রীনাথ ও দক্ষিণে শৃঙ্গেরী—ভারতের এই চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করেন। কাশ্মীরের শ্রীনগরেও সম্ভবত শঙ্করাচার্য গিয়েছিলেন এবং সেখানেও একটি মঠ স্থাপন করেছিলেন। ভারতে বৌদ্ধযুগে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে শঙ্করাচার্যের ভূমিকার গুরুত্ব সীমাহীন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে শঙ্করাচার্যের মৃত্যু হয়।

শরৎচন্দ্র বসু (১৮৮৯-১৯৫০): কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টাররূপে কর্মজীবনের সূচনা করেন এবং অনতিবিলম্বে প্রচুর খ্যাতি ও অর্থোপার্জন করেন। অনুজ নেতাজি সুভাষচন্দ্র ও তিনি প্রায় একই সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন ও সে কারণে বারবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৫খ্রী কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৬ খ্রী অন্তবর্তীকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কর্মজীবনের মূল শক্তি ও অনুপ্রেরণা ছিলেন অগ্রজ শরৎচন্দ্র ও তাঁর সহধর্মিণী বিভাবতী দেবী।

শশাঙ্ক: গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার পর বঙ্গদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন রাজা শশাঙ্ক। সম্ভবত ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রতিষ্ঠিত ঐ রাজ্য গৌড় নামে খ্যাত। রাজা শশাঙ্কর বংশ পরিচয় জানা যায় না। তিনি সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম বঙ্গের ঐ অঞ্চলে একজন শক্তিশালী সামন্ত ছিলেন, পরে গুপ্ত রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

গৌড়রাজ শশাঙ্ক ও মালবরাজ দেবগুপ্ত ঐক্যবদ্ধ হয়ে কনৌজ আক্রমণ করেন। কনৌজের মৌখরি বংশীয় রাজা গ্রহবর্মণ ঐ আক্রমণে নিহত হন এবং তাঁর মহিষী রাজ্যশ্রী বন্দী হন। রাজ্যশ্রী ছিলেন থানেশ্বররাজ প্রভাকর বর্ধনের কন্যা এবং রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের ভগ্নী। ভগ্নীর বন্দী হওয়ার সংবাদ পেয়ে রাজ্যবর্ধন (তখন তিনি থানেশ্বরের রাজা) বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মালব আক্রমণ করেন ও মালবরাজকে পরাজিত করেন। কিন্তু মালবরাজের বন্ধু গৌড়রাজ শশাঙ্কর হাতে রাজ্যবর্ধন নিহত হন (৬০৬) খ্রী। তারপর অগ্রজের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হর্ষবর্ধন গৌড়রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। হর্ষবর্ধন তাঁর ভগ্নীকে উদ্ধার করেন কিন্তু তিনি বোধহয় শশাঙ্ককে পরাজিত করতে পারেননি। কারণ রাজা শশাঙ্ক ৬১৯ খ্রী, মতান্তরে ৬৩৭ খ্রী পর্যন্ত স্বাধীনভাবে গৌড়রাজ্য শাসন করেন। রাজা শশাঙ্কর রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার চিরুতিগ্রাম)। তাঁর রাজ্যের সীমানা ওড়িশার গঞ্জাম জেলার পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

ঐতিহাসিকদের মতে রাজা শশাঙ্কের শাসনকালেই বাংলাদেশ, বাঙালীজাতি ও বাঙলা সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের সূচনা হয়।

শালম্ভ বংশ: কামরূপে শালম্ভ বা প্রালম্ভ বংশের রাজত্বকাল ৮০০-১০০০ খ্রী। ঐ বংশের রাজা হর্জর গৌড়রাজ

দেবপালের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন। ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী হরূপেশ্বর ছিল শালস্ত রাজ্যের রাজধানী। শালস্ত বংশের শেষ রাজা ত্যাগসিংহের মৃত্যু হলে একাদশ শতাব্দীর শুরুতে তাঁর এক জ্ঞাতি ব্রহ্মপাল প্রাগজ্যোতিষের রাজা হন। ঐ বংশের শেষ রাজা ধর্মপাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়রাজ রামপালের বশ্যতা স্বীকার করেন।

শাস্ত্রী, লালবাহাদুর (১৯০৪-৬৬): বিশিষ্ট জাতীয় নেতা, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। ১৯২১ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে অংশ নেন ও বহুবার কারাবরণ করেন। প্রথমে উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী ছিলেন, ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ খ্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে প্রথম ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধের মীমাংসার্থে সোভিয়েট ইউনিয়নের তাসখন্দ শহরে এক বৈঠকে যোগ দিতে যান ও ঐতিহাসিক তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তারপর ঐ শহরেই অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

শাহ আলম, প্রথম (১৭০৭-১২): মোগল সম্রাট ঔরংজেবের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মুয়াজ্জাম দিল্লীর মসনদে বসেন। বাদশাহ হওয়ার পর তিনি বাহাদুরশাহ নাম গ্রহণ করেন (বাহাদুরশাহ-দ্র)। তিনি শাহ আলম নামেও পরিচিত ছিলেন।

শাহ আলম, দ্বিতীয় (১৭৫৯-১৮০৬): মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগিরের পুত্র আলি গহর বিহারে ছিলেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়েই তিনি নিজেকে মোগল বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন ও নাম নেন শাহ আলম। কিন্তু দিল্লীর অবস্থা তাঁর অনুকূল না হওয়ায় তিনি বারো বছর রাজধানীতে যান নি। পরিশেষে ১৭৭২ সালে তিনি যে দিল্লী যান সেও মারাঠাদের সহায়তায়। বিহারে অবস্থানকালে তিনি বিহার ও বঙ্গ জয়ের চেষ্টা করেন কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন (১৭৬৪)। কিন্তু মোগল বাদশাহ হিসাবে শাহ আলম ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি দিলে তার বিনিময়ে ইংরেজ সরকার তাঁকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা পেনসন মঞ্জুর করেন। ইংরেজ সরকার শাহ আলমকে মোগল বাদশাহ বলে স্বীকার করেন।

ইংরেজ, আহমেদ শাহ আবদালি ও মারাঠাদের সর্বদা তুষ্ট রেখে দ্বিতীয় শাহ আলম নামমাত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দিল্লীর মসনদে টিঁকে থাকেন। ১৭৮৮ খ্রী শাহ আলম অন্ধ হয়ে যান এবং ১৮০৬ খ্রী তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর আমলেই ১৮০৩ খ্রী ইংরেজ সরকার দিল্লী জয় করেন এবং শাহ আলম ইংরেজ সরকারের পেনসনেই সন্তুষ্ট থাকেন।

শাহজাহান: মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরের তৃতীয় পুত্র খুররম পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন ও শাহ-

জাহান নাম গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনকাল ১৬১৭-৫৮ খ্রী, অবশ্য তার পরেও তিনি জীবিত ছিলেন এবং আগ্রার দুর্গে বন্দী অবস্থায় ১৬৬৬খ্রী তাঁর মৃত্যু হয়। ১৬৫৮ খ্রী তাঁর অসুস্থতার সংবাদ প্রচারিত হয়ে পড়লে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে চার পুত্রের মধ্যে দারুণ সংঘর্ষ শুরু হয় এবং সে সংঘর্ষে জয়ী তৃতীয় পুত্র ঔরংজের পিতাকে বন্দী করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তারপর আট বছর বন্দী অবস্থায় থেকে ৭৪ বছর বয়সে শাহজাহান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শাহজাহান তাঁর শাসনকালে বুন্দেলখণ্ডের রাজা জুঝরসিংহ ও দাক্ষিণ্যাত্যের সুবাদার খানজাহান লোদির বিদ্রোহ দমন করেন। বাংলাদেশকে পর্তুগীজদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে শাহজাহান বিশেষ দৃঢ়তা ও দক্ষতার পরিচয় দেন। শাহজাহানের আদেশে বাঙলাদেশের শাসক কাশিম আলি খাঁ হুগলি থেকে পর্তুগীজদের উৎখাত করেন। বহু পর্তুগীজ নিহত হয় ও অবশিষ্ট সকলকে বন্দী করে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। ১৬৩৩ খ্রী শাহজাহানের সৈন্যবাহিনী দাক্ষিণ্যাত্যে অভিযান চালায় ও আহম্মদনগর জয় করে। তারপরেই গোলকুণ্ডার সুলতান শাহজাহানের বশ্যতা স্বীকার করেন। বিজাপুরের সুলতান আদিলশাহ আক্রান্ত হওয়ার পর গোলকুণ্ডার পথই অনুসরণ করেন। দাক্ষিণাত্যের শাসনভার সম্রাট তাঁর তৃতীয় পুত্র ঔরংজেবের উপর ন্যস্ত করেন। শাহজাহান কান্দাহার জয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তাঁর শাসনকালে একবার গুজরাত ও দাক্ষিণাত্যে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

সম্রাট শাহজাহানের শাসনকালের সর্বাধিক খ্যাতি জাকজমকের জন্য। সে কারণে শাহজাহানের শাসনকালকে মোগল শাসনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। প্রিয়তমা মহিষী মমতাজের স্মৃতিতে নির্মিত সমাধি-সৌধ তাজমহল সম্রাট শাহজাহানের শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি। মণি-মুক্তাখচিত স্বর্ণমণ্ডিত ময়ুর সিংহাসন শাহজাহানের আর এক ঐতিহাসিক সৃষ্টি। তাঁর শাসনকালেই মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়।

শাহজাহানের চার পুত্রের নাম ছিল দারা, সুজা, ঔরংজেব ও মুরাদ। দুই কন্যার নাম ছিল জাহানারা ও রোশেনারা। ভ্রাতাদের সিংহাসন দখলের সংগ্রামে জাহানারা ছিলেন দারার পক্ষে এবং রোশেনারা ঔরংজেবের পক্ষে।

ব্যাক্তিগত জীবনে সম্রাট শাহজাহান ছিলেন উচ্চাভিলাষী ও নিজ স্বার্থে নিষ্ঠুর। তিনি তাঁর পুত্র ঔরংজেবের মতোই সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য দুই ভাইকে অন্ধ করেন এবং জ্যেষ্ঠ খসরুকে অন্ধ করার পরেও ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেন। খসরুর পুত্র দাওয়ার বক্সকে তিনি দেশ থেকে বিতাড়িত করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর বিমাতা নুরজাহানকে চরম উপেক্ষা ও অবমাননার মধ্যে দিন

যাপনে বাধ্য করেন। তিনিও তাঁর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন এবং বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করে সেখান থেকে পিতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং পিতাও তাঁকে ক্ষমা করেন।

ধর্মের ব্যাপারেও শাহজাহান অনুদার ছিলেন ; হিন্দু, খ্রীষ্টান উভয়ের প্রতিই তিনি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু শিল্পপ্রেমের জন্য ও স্থাপত্যশিল্প ও চিত্রশিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগের জন্য সম্রাট শাহজাহান ইতিহাসে উচ্চ মর্যাদার আসন লাভ করেছেন। তাঁর শেষ জীবনের দুঃখবেদনাও তাঁর প্রতি ইতিহাসের পাঠকদের সহানুভূতিশীল করে।

শাহিবংশ : পাঞ্জাবে, চন্দ্রভাগা নদীর উত্তরে কাশ্মীরের শেষ প্রান্তে লামঘান পর্যন্ত স্থান খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে একাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত হিন্দু শাহিবংশের শাসনাধীন ছিল। ঐ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন লালিয়া।

ঐ বংশের জয়পাল, আনন্দপাল, ত্রিলোচনপাল প্রমূখ রাজাদের গজনির সুলতান সুবক্তগিন ও তাঁর পুত্র সুলতান মামুদের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। মুখ্যত সুলতান মামুদের আক্রমণেই শাহিবংশীয় শাসনের অবসান ঘটে। শাহিবংশের শেষ রাজা ভীমপালের মৃত্যু হয় ১০২৬খ্রী।

শিখ (ইঙ্গ) যুদ্ধ : প্রথম যুদ্ধ—প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ হয় গভর্নর-জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে (১৮৪৪-৪৮)। বেপরোয়া খালসাদের ঔদ্ধত্যে অতিষ্ঠ হয়ে তৎকালীন শিখরাজ্যের নাবালক রাজা দলীপ সিং-এর মাতা ও অভিভাবিকা ঝিন্দনবাঈ তাদের শতদ্রু নদী অতিক্রম করে ইংরেজ রাজ্য আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করেন। অবশ্য খালসারা জয়ী হলে শতদ্রুর পূর্ব পারেও শিখরাজ্য বিস্তার লাভের সুযোগ পাবে এমন আশাও ঝিন্দনবাঈর ছিল।

শিখসৈন্যরা শতদ্রু নদী অতিক্রম করলে অমৃতসরের সন্ধি লঙ্ঘিত হওয়ায় ইংরেজ সরকার শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ঐ যুদ্ধই প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ। মুদকি, ফিরোজশাহ, আলিওয়াল ও সেব্রাঁও নামক স্থানে পরপর শিখসৈন্যরা ইংরেজদের কাছে পরাজিত হওয়ার পর শতদ্রুর পূর্বপার ত্যাগ করে চলে আসে। যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য শিখদের প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে হয় এবং কাশ্মীর রাজ্যটির কর্তৃত্ব ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়। লাহোরে একজন বৃটিশ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন এবং তিনিই হন সেখানকার প্রকৃত শাসক।

দ্বিতীয় যুদ্ধ—দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ হয় গভর্নর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসির শাসনকালে। প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে ইংরেজ সরকার শিখরাজ্যের উপর যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করেন তা শিখদের পক্ষে বেশিদিন মেনে চলা সম্ভব হয় না। রানী ঝিন্দনবাঈর নির্বাসন হাজারার ছাতার সিং-এর প্রতি দুর্ব্যবহার প্রভৃতি ঘটনায় শিখদের বিক্ষোভ চরমে ওঠে। সেই অবস্থায় মুলতানরাজ মূলরাজ ইংরেজদের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ শুরু হয়। মূলতান নামেমাত্র পাঞ্জাব রাজ্যের অধীন ছিল। লাহোরের বৃটিশ রেসিডেণ্ট মূলতানরাজের উপর কর্তৃত্ব বিস্তারের চেষ্টা করলে মূলতান-রাজ বিদ্রোহী হন। লাহোরে বৃটিশ রেসিডেণ্টের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ শিখ-সেনারাও ঐ বিদ্রোহে যোগ দেয়; ফলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ শুরু হয়। ১৮৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে যুদ্ধ শুরু হয়। তারপর ইংরেজ সেনাবাহিনী মূলতান দখল করলে মূলতানরাজ আত্মসমর্পণ করেন। আর ফেব্রুয়ারি মাসে গুজরাত নামক স্থানে শিখ সৈন্যরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়। সেই সঙ্গে দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধেরও অবসান ঘটে। ঐ বছর ৩০মার্চ লর্ড ডালহৌসি সমগ্র পাঞ্জাব বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করেন। পাঞ্জাবের দশ বছরের বালক রাজা দলীপ সিংহকে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার বৃত্তি দিয়ে রাজ্যচ্যুত করা হয়। পাঞ্জাব বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমা আফগানিস্তানের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে।

শিখ শক্তির ইতিহাস : শিখজাতি গুরু নানকদেবের অনুগত একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। নবম গুরু তেগবাহাদুরের সময় পর্যন্ত শিখ ও হিন্দুধর্মে পার্থক্য সামান্যই ছিল। কিন্তু মোগলদের হাতে নবম গুরু তেগবাহাদুরের মৃত্যুর পর তেগবাহাদুরের পুত্র ও দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখ-সম্প্রদায়কে নব-ভাবে ও নব আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে একটি স্বতন্ত্র যোদ্ধজাতিরূপে গড়ে তোলেন।

শিখদের প্রথম শক্তিশালী রাজ্য গড়ে ওঠে পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের (১৭৮১-১৮৩৯) নেতৃত্বে। শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরের ক্ষুদ্র শিখ রাজ্য-গুলিকে (মিস্‌ল্) ঐক্যবদ্ধ করে রণজিৎ সিংহ একটি বিশাল রাজ্য গড়ে তোলেন। তারপর শতদ্রু নদীর পূর্বপারে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে সেখানকার রাজ্যগুলি রণজিৎ সিংহের গতিবিধি ভালচোখে দেখে না ও ঐ রাজ্যগুলি আত্মরক্ষার্থে ইংরেজ সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করে। ইংরেজরাও সেই সুযোগে পাঞ্জাবে প্রভাব বিস্তারকল্পে এগিয়ে আসে। ইংরেজ সরকার রণজিৎ সিংহের কাছে দূত পাঠান। ইংরেজ সরকারের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন মহারাজ রণজিৎ সিংহ। তাই তিনি ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলেন। ঐ সন্ধি অমৃতসরের সন্ধি নামে অভিহিত। ঐ সন্ধিতে রণজিৎ সিংহ ইংরেজ সরকারকে প্রতি-শ্রুতি দিলেন যে তিনি শতদ্রুর পূর্বতীরে রাজ্যবিস্তার করবেন না। কিন্তু পশ্চিম বা উত্তর দিকে রণজিৎ সিংহের রাজ্য-বিস্তারে আর কোন বাধা রইল না। ফলে অবিলম্বে সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান শিখরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় খাইবার গিরিবর্ত্ম পর্যন্ত রণজিৎসিংহের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

রণজিৎ সিংহকে শক্তিশালী করার পিছনে ইংরেজদেরও কিছুটা স্বার্থ ছিল। সেইসময় ভারতে রুশ আক্রমণের আশঙ্কা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

সেকারণে ইংরেজ সরকার বৃটিশ ভারত ও রুশদেশের মধ্যে একটি শক্তিশালী মিত্ররাজ্য গড়ে উঠতে কোন বাধা দেয় না।

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পরেই শিখ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিরোধ, দলাদলি ও অরাজকতা দেখা দেয়। তারপর পরপর দুটি শিখ (ইঙ্গ) যুদ্ধে (শিখ যুদ্ধ-দ্র) শিখরা পরাজিত হলে সমগ্র পাঞ্জাব বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাঞ্জাব বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর শিখরা অনেকদিন ইংরেজ সরকারের অনুগত থাকে। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের মাত্র আট বছর পরে, ১৮৫৭ খ্রী যে সিপাহী বিদ্রোহ হয় শিখরা তাতে যোগ দেয় না।

শিশুনাগ: বিম্বিসার, অজাতশত্রু ও উদয়িনের শাসনের পর মগধের রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়লে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেই বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে মগধ রাজ্যের অমাত্য শিশুনাগ রাজ্যের ক্ষমতা দখল করেন। তিনি প্রথমে গিরিব্রজ নগরে, পরে বৈশালীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। শিশুনাগের পর তাঁর বংশের যে সব রাজা মগধে রাজত্ব করেন তাঁরা শিশুনাগ-বংশীয় রাজা নামে অভিহিত।

শিশুপালগড়: ওড়িশার ভুবনেশ্বরের অদূরে অবস্থিত এই স্থানটিতে উৎখননের ফলে একটি নগর বেষ্টনকারী-প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। সম্ভবত খ্রী-পূ চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত শিশুপালগড় একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল।

শিহাবুদ্দিন ওমর: দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খলজির পুত্র। ১৩১৬ খ্রী আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর প্রধান সেনাপতি মালিক কাফুর রাজ্যের ক্ষমতা করায়ত্ত করার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিনের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র মাত্র দশ বছর বয়স্ক শিহাবুদ্দিন ওমরকে মসনদে বসিয়ে নিজেকে তার অভিভাবক ও রাজপ্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু মালিক কাফুরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কারণ আলাউদ্দিনের তৃতীয় পুত্র মুবারক আলাউদ্দিনের মৃত্যুর মাত্র পঁয়ত্রিশ দিন পরে মালিক কাফুরকে নিহত করে ও শিশুভ্রাতা শিহাবুদ্দিনকে অপসারিত ও অন্ধ করে নিজেকে দিল্লীর সুলতান বলে ঘোষণা করেন।

শুঙ্গবংশ: মৌর্য বংশের শেষরাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে তাঁর প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ সিংহাসনে বসেন। তারপর শুঙ্গবংশীয় নৃপতিদের শাসন শতাধিক বর্ষকাল ধরে চলে (১৮৫-৭৩ খ্রী-পূ)। পুষ্যমিত্রের শাসনকাল প্রায় ছত্রিশ বছর (১৮৫-১৪৮খ্রীপূ)। তারপর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্র, তিনি মহাকবি কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' কাব্যের নায়ক। তাঁর রাজত্বকাল আটবছর। অগ্নিমিত্রর পর আরও আটজন শুঙ্গবংশীয় নৃপতি রাজ্যশাসন করেন। তাঁদের শাসনকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ঐ বংশের শেষ রাজা দেবভূতিকে হত্যা করে (৭৩ খ্রী-পূ) তাঁর মন্ত্রী বাসুদেব সিংহাসন অধিকার করেন। এইভাবে শুঙ্গবংশীয় শাসনের অবসান ও কাণ্ব-বংশীয় শাসনের সূচনা হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মৌর্য যুগের অবসান ও শুঙ্গ শাসনের সূচনা প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধযুগের অবসান ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুদয়ের সূচনা। পুষ্যমিত্র জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তিনি সংস্কৃতকে রাজভাষার মর্যাদা দেন। শেষ মৌর্য শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গ্রীকরা যে ভারতে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে, শুঙ্গ শাসকদের বাধাদানে তা ব্যর্থ হয়। শুঙ্গ নৃপতিরা শিল্পকলা ও সাহিত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। হিন্দু আইনগ্রন্থ মনুস্মৃতি ঐ সময়ে সঙ্কলিত হয়।

শুরবংশ : শেরশাহ ছিলেন শুরবংশীয় আফগান। বিহারের শাসক থাকাকালে তিনি শের খাঁ শুর নামে পরিচিত ছিলেন। শেরশাহর বাবা হাসান শুর ছিলেন বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জাগিরদার। চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করার পর শের খাঁ শেরশাহ নাম গ্রহণ করেন ; 'শাহ' সার্বভৌমত্ব-বাচক শব্দ।

কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর (১৫৪০) হুমায়ুন পলায়ন করেন এবং ভারতে সাময়িকভাবে মোগল শাসনের অবসান ও শুরবংশের শাসন শুরু হয়। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছর পরে শেরশাহর মৃত্যু হয় (১৫৪৫) এবং শেরশাহর উত্তরাধিকারীরা দুর্বল ও অযোগ্য হওয়ায় হুমায়ুন আবার দিল্লী ও আগ্রা জয় করেন (১৫৫৫)। পরের বছর পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হুমায়ুনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী আকবর জয়লাভ করায় দিল্লীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মোগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

শেরশাহের মৃত্যুর পর প্রভাবশালী অভিজাতগণ শেরশাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিলের দাবি অগ্রাহ্য করে তাঁর অন্যতম পুত্র জালাল খাঁকে সিংহাসনে বসান। জালাল খাঁ ইসলাম শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তাঁর শাসনকাল ১৫৪৫-৫৪খ্রী। ইসলামের মৃত্যুর পর তাঁর বারো বছর বয়সের পুত্র ফিরুজ সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই শেরশাহর ভ্রাতা নিজাম খাঁ শুরের পুত্র মুবারিজ খাঁ ঐ বালককে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন ও নাম নেন মহম্মদ আদিল শাহ। আদিল শাহর শাসনকাল ১৫৫৪-৫৬ খ্রী। আদিল শাহ অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করায় শুরবংশের অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন এবং ইব্রাহিম খাঁ শুর আদিল শাহকে দিল্লী থেকে বিতাড়িত করে ঐ শহর নিজ অধিকারে আনেন। আদিল তখন চুনারে গিয়ে আশ্রয় নেন। শুরবংশীয় শাসকদের ঐ ঘরোয়া বিরোধের সুযোগ নিয়ে হুমায়ুন প্রথমে লাহোর, পরে দিল্লী ও আগ্রা পুনরধিকার করেন।

ওদিকে আদিল শাহর হিন্দু সেনাপতি হিমু এক বিশাল বাহিনী নিয়ে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন এবং কাল্পি ও খাজুয়ার যুদ্ধে ইব্রাহিম খাঁ শুরকে পরাজিত করে সাময়িকভাবে দিল্লী জয় করেন এবং আদিল শাহর নামমাত্র কর্তৃত্ব বজায় রেখে নিজেই দিল্লী শাসন করতে থাকেন। কিন্তু হিমুর ঐ

কর্তৃত্বের অবসান ঘটে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে ১৫৫৬ সালে। যুদ্ধে হিমু পরাজিত ও নিহত হন। শুরবংশীয় শাসন নিশ্চিহ্ন হয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী মোগল কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

শুরসেন: খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর ও মধ্যভারতে যে ষোলটি রাজ্য (মহাজনপদ) ছিল, শুরসেন ছিল তার অন্যতম। শুরসেন রাজ্যটি ছিল বর্তমান মথুরার সমীপবর্তী অঞ্চলে।

শেরশাহ: মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে যিনি বারবার পরাস্ত করে একদা ভারত ত্যাগে বাধ্য করেন সেই শুর-বংশীয় আফগানের প্রকৃত নাম ফরিদ। তাঁর জন্ম সম্ভবত ১৪৭২ খ্রী। পিতা হাসান খাঁ শুর ছিলেন বিহারের সাসারামের জাগিরদার। বিমাতার খারাপ ব্যবহারের জন্য অল্পবয়সে গৃহ-ত্যাগ করে তিনি জৌনপুরে চলে যান এবং সেখানে ফার্সিভাষা ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। পরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে পিতার জাগিরদারি দেখেন ও শাসন বিষয়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সেই সময় একটি বাঘ শিকারে কৃতিত্ব দেখানোর জন্য ফরিদ শের খাঁ নামে পরিচিতি লাভ করেন। ১৫২২খ্রী শের বিহারের প্রায়-স্বাধীন আফগান শাসক বাহার খাঁ লোহানির অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। ১৫২৯ খ্রী তিনি বাহার খাঁ লোহানির নাবালক পুত্র জালাল খাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হন। সেই সুযোগে তিনি বিহার প্রশাসনের উপর কর্তৃক বিস্তার করেন এবং ১৫৩০ খ্রী চুনার দুর্গ জয় করেন। কিন্তু ১৫৩১ খ্রী মোগল সম্রাট হুমায়ুন চুনার অবরোধ করেন এবং শের নতি স্বীকারে বাধ্য হন। ওদিকে শেরের দ্রুত ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলের আফগান প্রধানরা জোট বাঁধেন এবং শেরকে উৎখাতের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশের সুলতান মামুদ শাহের সঙ্গে হাত মেলান। তাঁর রক্ষণাধীন নাবালক শাসক জালাল খাঁও মামুদ শাহের আশ্রয় নেন। কিন্তু শের ১৫৩২ খ্রী সুরযগড়ের যুদ্ধে মামুদ শাহের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ আফগান সর্দারদের চুড়ান্ত আঘাত হানেন এবং বিহারের দক্ষিণ অংশে তাঁর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ওদিকে হুমায়ুন যখন গুজরাতের আফগান শাসক বাহাদুর শাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সেই সময় শের বঙ্গদেশের বিস্তীর্ণ অংশ দখল করে নেন। দক্ষিণ বিহারের শাসক থাকা কালে শেরশাহ শের খাঁ শুর নামে পরিচিত ছিলেন।

শেরের অধিক বৃদ্ধি নিরাপদ নয় বুঝে মোগল সম্রাট হুমায়ুন পূর্বদিকে দৃষ্টি ফেরান ও ১৫৩৮ খ্রী বাঙলা জয় করেন। কিন্তু ঐ জয়ের পর হুমায়ুন নয় মাস গৌড়ে অবস্থান করেন ও উৎসব-প্রমোদে দিন কাটান। শের সেই অবসরে বারাণসী, জৌনপুর জয় করে নেন এবং কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে হুমায়ুনের দিল্লী ফেরার পথ অবরুদ্ধ করেন। তখন হুমায়ুন রাজ-ধানী প্রত্যাবর্তনের জন্য তৎপর হন। ঐ প্রত্যাবর্তনের পথে ১৫৩৯ খ্রী চৌসা রণাঙ্গনে হুমায়ুনের সঙ্গে শেরশাহের যে যুদ্ধ হয় তাতে হুমায়ুন পরাজিত হন, কিন্তু কোনক্রমে রাজধানী প্রত্যা-

বর্তনে সমর্থ হন। চৌসার যুদ্ধে জয়-লাভের ফলে সমগ্র বাঙলা-বিহারসহ জৌনপুর পর্যন্ত স্থান শের খাঁর অধিকারে আসে। তখনই তিনি 'শেরশাহ' নাম গ্রহণ করেন এবং ১৫৩৯ খ্রী ডিসেম্বর মাসে শেরশাহ রাজারূপে অভিষিক্ত হন। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে হুমায়ুন পরের বছর শেরশাহর রাজ্য আক্রমণ করেন; কিন্তু গঙ্গার তীরে হরদইর যুদ্ধে পুনরায় পরাজিত হন (১৫৪০)। ঐ যুদ্ধ বিলগ্রাঁওর যুদ্ধ ও কনৌজের যুদ্ধ নামেও অভিহিত। ঐ যুদ্ধে পরাজয়ের পর হুমায়ুন রাজ্যহারা, আশ্রয়হারা অবস্থায় দেশত্যাগে বাধ্য হন এবং নানা দেশ ঘুরে শেষ পর্যন্ত পারস্যে আশ্রয় লাভ করেন।

হুমায়ুনের পরাজয়ের পর সমগ্র উত্তর ভারতে শেরশাহের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সিন্ধুপ্রদেশও শেরশাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সমগ্র রাজপুতানাও শেরের অধিকার-ভুক্ত হতে থাকে। কিন্তু ১৫৪৫ খ্রী বুন্দেলখণ্ডের কালাঞ্জর দুর্গ জয় করার কালে এক দুর্ঘটনায় শেরশাহর মৃত্যু হয়। সুতরাং শেরশাহর রাজত্বকাল প্রকৃতপক্ষে মাত্র পাঁচ বছর। তাঁর রাজত্ব যদি দীর্ঘস্থায়ী হত তাহলে হয়ত ভারতে আর কোন দিনই মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হত না।

শেরশাহের মাত্র পাঁচ বছর শাসন-কাল ভারত ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। পাঁচ বছর শাসনকালে শের-শাহকে যুদ্ধ-বিগ্রহ কম করতে হয়নি কিন্তু তারই মধ্যে তিনি যে রাজ্য-শাসনব্যবস্থা চালু করে যান তা পর-বর্তীকালের মোগল শাসনে, এমন কি ইংরেজ শাসনকালেও অপরিবর্তিত থাকে। প্রশাসনিক প্রয়োজনে তিনি সমগ্র রাজ্যকে ৪৭টি সরকার (প্রদেশ), এবং সরকারগুলিকে পরগনাতে বিভক্ত করেন। পরগনাগুলি শাসনের জন্য যে সব আমিন, শিকদার, কারকুন প্রভৃতি রাজকর্মচারী নিযুক্ত হতেন তাদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর বদলির ব্যবস্থা শেরশাহই প্রথম চালু করেন। তারপর জমির উপর কৃষকদের অধিকার শেরশাহর আমলেই প্রথম স্বীকৃত হয় আর রাজস্ব নির্ধারিত হয় জমির উর্বরতা অনুসারে। রাজস্ব নগদে অথবা ফসলে দেওয়া যেত। তিনি তাঁর অধীনস্থ সমগ্র রাজ্য নতুন করে জরিপের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তাঁর স্বল্পকালীন শাসনে সে কাজ শেষ হয় না। পিতার জাগিরদারিতে একজন শিকদাররূপে শেরশাহ তাঁর কর্ম-জীবনের সূচনা করেন। সে কারণে কৃষি ও রাজস্ব সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যাই তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা ছিল আর সুযোগ পাওয়া মাত্র তিনি সেগুলি সুনিয়ন্ত্রণে তৎপর হন। শেরশাহ মুদ্রা ব্যবস্থারও সংস্কার করেন এবং তিনি যে রূপার মুদ্রার প্রচলন করেন বর্তমান টাকা তারই আধুনিক সংস্করণ। ব্যবসায়ের প্রসারের জন্য তিনি কর ব্যবস্থাকে জটিলতা মুক্ত করেন ও গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের মত দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ করেন। পথিকদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন দীর্ঘ সড়কের ধারে তিনি সতের শ' সরাই স্থাপন করেন। বিচার ব্যবস্থার সংস্কার, রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আরক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পুনর্গঠন, ডাক ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি

শেরশাহর শাসনকালের অনন্ত কীর্তি। ধর্মের ব্যাপারেও তাঁর দৃষ্টি ছিল উদার এবং সকল ধর্মের লোককেই তিনি যোগ্যতানুসারে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করেন। শেরশাহর উদার নীতি প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল অনুসরণ করেই মোগল সম্রাট আকবর মহান শাসকের মর্যাদা লাভ করেন।

শের সিংহ: মহারাজ রণজিৎ সিংহের পৌত্র ও খড়ক সিংহের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৮৪০ খ্রী শিখ-রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু ১৮৪৩ খ্রী আততায়ী কর্তৃক নিহত হন।

শোর, স্যার জন: স্যার জন শোর ১৭৯২ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন এবং ১৭৯৮ খ্রী পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। তাঁর শাসন-কালে এলাহাবাদ ইংরেজের শাসনা-ধীনে আসে। অযোধ্যার নবাব আসফুদ্দৌলার মৃত্যুর পর স্যার জন শোর মৃত নবাবের পুত্র ওয়াজির আলিকে অযোধ্যার নবাব বলে স্বীকার না করে মৃত নবাবের ভ্রাতা সাদাত আলিকে স্বীকৃতি জানান। তারই পুরস্কার স্বরূপ সাদাত আলি ইংরেজ সরকারকে এলাহাবাদ উপহার দেন।

শৌকৎ আলি, মৌলানা (১৮৭৩-১৯৩৮): ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি অধ্যায়ের বিশিষ্ট নেতা। খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন; গোল-টেবিল বৈঠকে যোগ দেন। ক্রমে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয় ও মুস্লিম কনফারেন্স-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-৫৩) বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও নির্ভীক জাতীয়তাবাদী নেতা। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী স্যার আশুতোষ মুখো-পাধ্যায়ের পুত্র শ্যামাপ্রসাদ ব্যারিস্টারি পাশের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরেই রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেন কিন্তু মতভেদ হওয়ায় ১৯৫০ সালে পদত্যাগ করে 'জনসঙ্ঘ' দল গঠন করেন। তারপর লোকসভায় বিরোধী দলনেতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির প্রতিবাদ জানাতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তিনি ১৯৫৩ খ্রী কাশ্মীরে প্রবেশ করেন এবং সেখানেই বন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী (১৮৫৫-১৯২৬): পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলায় জন্ম, পূর্ব নাম লালা মুন্সিরাম। আইন ব্যব-সায়ীরূপে কর্মজীবনের সূচনা করেন, পরে দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজে যোগ দেন ও তাঁরই উদ্যোগে লাহোরে আর্য সমাজের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাওলাট আইনের প্রতিবাদে যখন দেশ জুড়ে আন্দোলন শুরু হয় তখন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ রাজ-নীতিতে যোগ দেন ও অসম সাহসী নেতারূপে খ্যাতি লাভ করেন। ১৯১৯ সালের ৩০ মার্চ দিল্লীর এক মিছিলে গুলী চললে পরদিন তার প্রতিবাদে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আর এক

মিছিল বার করেন। গোরা সৈন্যরা সে মিছিলের গতিরোধ করে গুলী চালনার ভয় দেখালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ খোলা বুকে উদ্যত বন্দুকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের হতবাক ও নিষ্ক্রিয় করে দেন। ১৯১ সালে অমৃতসরে যে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

আর্যসমাজীরূপে শুদ্ধি আন্দোলনের সূচনা করেন। হিন্দু ধর্মে জাতিভেদ দূর করা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোককে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করা ছিল এই আন্দোলনের মূল কথা। তাতে তিনি মুস্লিম সম্প্রদায়ের একাংশের বিরাগভাজন হন ও এক মুস্লিম যুবকের ছুরিকাঘাতে ১৯২৬ খ্রী স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যু হয়।

শ্রাবন্তী: উত্তর প্রদেশের গোণ্ডা-বহরাইচ জেলায় অবস্থিত। ভগবান বুদ্ধের ধনাঢ্য শিষ্য অনাথপিণ্ডদ এখানে একটি বিহার নির্মাণ করেন এবং সেই বিহারকে কেন্দ্র করে এখানে যে নগরী গড়ে ওঠে তাঁর অস্তিত্ব প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রাচীন নগরটির নাম যে শ্রাবন্তী ছিল তা প্রত্নলেখ পাঠ করে স্থির করেন আলেকজাণ্ডার কানিংহাম।

স্টিভেন্স, ফাদার টমাস: ভারতে গোয়ার জেসুইট কলেজের রেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি তাঁর ইংলণ্ডে লেখা বিভিন্ন চিঠিতে ভারতের প্রাচুর্যের যে বর্ণনা দেন তাতে ইংলণ্ডের বণিকদের মনে ভারতে বাণিজ্য করার আগ্রহ জাগে।

স্ট্রাচি, স্যার জন: লর্ড মেয়ো আন্দামান পরিদর্শনে গিয়ে ১৮৭২ খ্রী আততায়ীর আক্রমণে নিহত হলে স্যার জন স্ট্রাচি অস্থায়ীভাবে ভারতের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন। ঐ বছরেই লর্ড নর্থব্রুক গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হয়ে ভারতে আসেন ও স্ট্রাচিকে দায়িত্বমুক্ত করেন।

সৎনামি সম্প্রদায়: পাতিয়ালা ও আলোয়ার অঞ্চলের এক ধর্মীয় সম্প্রদায়। মোগল সম্রাট ঔরংজেবের শাসনকালে ১৭৬২ খ্রী সৎনামিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বিদ্রোহীরা সাময়িকভাবে নারনোল নামক স্থানটি দখল করে। কিন্তু মোগলবাহিনী শীঘ্রই সৎনামি বিদ্রোহ দমন করে।

সত্যমূর্তি, এস (১৮৮৭-১৯৪৩): বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা, দক্ষিণভারতে কংগ্রেসের সাংগঠনিক প্রভাব বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস 'স্বরাজ্য দল' গঠন করলে তাতে যোগ দেন। বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে যোগদানের জন্য বহুবার কারাবরণ করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩): মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস (১৮৬৩)। জাতীয়ভাবাপন্ন ছিলেন এবং 'গাও ভারতের জয়' প্রমুখ বহু দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন। স্ত্রী স্বাধীনতার আন্দোলনে তিনি ও তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী অগ্রণী ভূমিকা নেন।

সতেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, লর্ড (১৮৬৩-১৯৩০): ব্যারিস্টাররূপে কর্মজীবনের

সূচনা করেন। পরে কিছুদিন অধ্যাপনা করে আবার আইনব্যবসায়ে ফিরে যান ও আইনজ্ঞরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯০৯ খ্রী ভারত সরকারের আইন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। সে পদে তিনিই প্রথম ভারতীয়। পরে আবার আইন-ব্যবসায় শুরু করেন এবং ১৯১৫ খ্রী বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের সময় তিনি ভারতের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। পরে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে 'লর্ড' খেতাব লাভ করেন এবং ১৯২০ খ্রী বিহার ও ওড়িশার গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনিই প্রথম লর্ড উপাধিধারী ভারতীয় ও ও প্রথম ভারতীয় গভর্নর।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন: ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতে প্রথম যে জাতীয় অভ্যুত্থান হয় সেই তথাকথিত 'সিপাহী বিদ্রোহ' ছিল সম্পূর্ণ হিংসাশ্রয়ী ও রক্তক্ষয়ী। তারপর কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনকে সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা হলেও ভারতে হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবাত্মক আন্দোলন ইংরেজ শাসনকালে কোন দিনই বন্ধ হয় না। প্রকৃতপক্ষে সিপাহী বিদ্রোহে যার সূচনা, আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে তার পূর্ণ পরিণতি। এ-দেশের একদল বিপ্লবী কোনদিনই নিয়মতান্ত্রিক পথে স্বাধীনতা লাভ সম্ভব বলে মনে করেননি এবং সেকারণে তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসমতো সশস্ত্র সংগ্রামের পথে অগ্রসর হন ও দলে দলে অকাতরে আত্মদান করেন। ঐসব বিপ্লবীদের আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন নামেই অধিক পরিচিত, যদিও 'সন্ত্রাসবাদ' কথাটি সুপ্রযুক্ত নয়।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বাংলায় সর্বাধিক প্রচণ্ডরূপ নিলেও তার সূচনা হয় মহারাষ্ট্রে। ১৮৯৭ সালে বোম্বাই ও পুণা শহরে প্লেগ মড়ক হয়ে দেখা দিলে সেখানকার কয়েকজন সরকারি কর্মচারীর উদ্ধত আচরণ খুব অসন্তোষের কারণ হয়। সেই অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাণ্ড ও আয়ার্স্ট নামে দুজন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর মৃত্যুতে। ঐ দুজনকে পিস্তল দিয়ে হত্যার অভিযোগে দামোদর হরি চাপেকার ও তাঁর ভাইয়ের ফাঁসি হয়। এর পর ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল মজফ্ফরপুরে বোমার আঘাতে দুজন ইংরেজ মহিলা নিহত হন। জেলা শাসক কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী ঐ বোমা নিক্ষেপ করেন কিন্তু কিংসফোর্ডের বদলে প্রাণ হারান উল্লেখিত দুই মহিলা। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়, প্রফুল্ল চাকি ধরা পড়ার আগেই আত্মহত্যা করেন। ওদিকে লণ্ডনে এক জনসভায় স্যার কার্জন ওয়ালিকে হত্যার জন্য ১৯০৭ সালে লণ্ডনে মদনলাল ধিংড়া নামে এক মারাঠি যুবকের ফাঁসি হয় এবং ঐ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বীর বিণায়ক দামোদর সাভারকার গ্রেপ্তার হন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৯০৮ সালে ১৩ই জুলাই বালগঙ্গাধর

টিলক গ্রেপ্তার হন। একই দিনে অন্ধ্রে হরিসর্বোত্তম রাও ও আরও দুই-জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মাত্র পাঁচ-দিনের বিচারে টিলকের ছয় বছর নির্বাসন দণ্ড হয়। অন্ধ্রের আদালতে হরিসর্বোত্তম রাওকে নয় মাস কারাদণ্ড দেওয়া হলেও হাইকোর্টে পুনর্বিচারে তা বাড়িয়ে তিন বছর করা হয়। ১৯০৯ সালে হয় আলিপুর বোমার মামলা। ১৯১২ সালে দিল্লীতে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ১৯০৯ সালে লাহোরে কংগ্রেসের ২৪তম অধিবেশনে সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রকাশ্যে সন্ত্রাসবাদের ও সেইসঙ্গে নাসিকের কালেক্টর জ্যাকসনকে হত্যার নিন্দা করেন। ১৯০৮ সালে সিডিশাস মিটিং এক্ট পাশ হয়। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সব নিন্দা ও নির্যাতন উপেক্ষা করে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯১৫ সালে বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বালেশ্বরে বুড়ীবালাম নদীর তীরে ইংরেজ সৈন্য-দের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম হয়। একজন অত্যাচারী পুলিশ অফিসারকে হত্যা করে ও সেন্ট্রাল এসেমব্লীতে বোমা নিক্ষেপ করে ১৯৩১ সালে বীরের মৃত্যু বরণ করেন ভগৎ সিং। কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ প্রবেশ করে, একেবারে সিংহের গহ্বরে ঢুকে সিংহের সঙ্গে লড়াই করার কল্পনাতীত দুঃসাহস দেখান বিনয়-বাদল-দিনেশ। বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও জালালাবাদ যুদ্ধের কাহিনী সারা ভারতকে আলোড়িত করে। সারা ভারতে অগণিত যুবককে সন্ত্রাস-বাদী আন্দোলনে জড়িত থাকার অভি-যোগে গ্রেপ্তার করা হয়। অনেককে আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়।

পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন শুরু হওয়ায় এবং কম্যুনিস্ট মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ায় (কিছুটা ইংরেজ সরকারের সহায়তায়) সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতি দেশের যুব সমাজের আকর্ষণ হ্রাস পায়। বন্দী সন্ত্রাসবাদীরা কম্যুনিস্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং গান্ধিজীর নেতৃত্বে পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনে যে ত্যাগ ও দুঃখ বরণের আহ্বান ছিল তা তরুণ দেশকর্মীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে হিংসার সম্পর্ক কোনদিনই বিচ্ছিন্ন হয় হয় না। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী রূপ নেয় এবং তার পরেই আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে অনুপ্রাণিত ভারতের জনগণের প্রচণ্ড বিক্ষোভ ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান ত্বরান্বিত করে।

সমতট: দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউ এন সাং সমতট রাজ্যের বর্ণনাকালে বলেছেন, সমুদ্র উপকূলবর্তী নিম্নভূমিতে অবস্থিত এই রাজ্যটি শস্য ও ফুল-ফলে সমৃদ্ধ ছিল। রাজ্যের আবহাওয়া ছিল মনোরম এবং অধিবাসীরা ছিল ক্ষুদ্রাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ ও পরিশ্রমী। হিউ-এন সাং-এর সমকালে সমতট রাজ্যে

ত্রিশটি বৌদ্ধমঠ ও তাতে দুই সহস্রাধিক শ্রমণের বাস ছিল। কিন্তু রাজ্যে হিন্দু ও হিন্দুমন্দিরের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি।

আলেকজাণ্ডার কানিংহামের মতে সমতট রাজ্য ছিল ভাগীরথী ও গঙ্গার মূলধারার মধ্যবর্তী অঞ্চল ও তার রাজধানী ছিল যশোহর।

সমুদ্র গুপ্ত : গুপ্তবংশীয় সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তর পুত্র, উত্তরাধিকারী ও গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি সম্ভবত পিতার প্রথম পুত্র ছিলেন না, যোগ্যতার জন্যই পিতা কর্তৃক উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। সম্রাট সমুদ্র গুপ্তর শাসনকাল ৩২০-৮০ খ্রী। সিংহাসনারোহণের পরেই সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয় শুরু করেন। উত্তর ভারতে একের পর এক রাজাকে পরাজিত করে তিনি তাঁদের রাজ্যগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে সমুদ্রগুপ্ত ভিন্ন নীতি অনুসরণ করেন। সেখানকার রাজারা আনুগত্য স্বীকার করলেই সমুদ্র গুপ্ত তাঁদের রাজপদে বহাল রাখেন এবং রাজ্যগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়। দূরের রাজ্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে শাসন করা সম্ভব নয় বুঝেই সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে ভিন্ন নীতি অনুসরণ করেন। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ স্বেচ্ছায় সমুদ্র গুপ্তর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেন এবং সম্রাটের অনুমতি নিয়ে বুদ্ধ গয়ায় একটি মঠ নির্মাণ করেন। পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, পশ্চিম রাজপুতানা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীর বাদে সমগ্র উত্তর ভারত সমুদ্র গুপ্তর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দক্ষিণে বর্তমান মাদ্রাজ শহর পর্যন্ত সম্রাট সমুদ্র গুপ্তর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত ছিল। আরও দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত রাজ্যগুলি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে।

সমুদ্র গুপ্তর সুন্দর মুদ্রাগুলিতে অঙ্কিত প্রতিকৃতি থেকে প্রমাণ হয় যে সম্রাট যেমন শিকারপ্রিয় ছিলেন তেমনই ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয়। তিনি হয়ত কিছু কবিতাও লিখেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতিও উদার ছিলেন। তাঁর মন্ত্রী বসুবন্ধু ছিলেন একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত। তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত পণ্ডিত হরি সেনের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সম্রাট সমুদ্র গুপ্তর রাজ্যজয়ের বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে।

সরফরাজ খাঁ : বাংলা-বিহার-ওড়িশার সুবাদার ও পরবর্তীকালে নবাব। মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র ও নবাব সুজাউদ্দিন খাঁর পুত্র। সুজাউদ্দিন খাঁর মৃত্যুর পর ১৭৩৯ খ্রী বাঙলার নবাব হন। অত্যাচারী ও অযোগ্য শাসক ছিলেন। একবছরের মধ্যেই আলিবর্দি খাঁ কর্তৃক মসনদচ্যুত হন। ১৭৪৩ খ্রী গিরিয়ার যুদ্ধে আলিবর্দি খাঁ সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন।

সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) **:** কবি, বাগ্মী, দেশনেত্রী। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা; মাত্র বারো বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও বৃত্তি নিয়ে লণ্ডনে যান। ঐ সময় ইংরেজিতে কাব্য রচনা করে প্রাচ্য

ও পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ মহলে প্রশংসা লাভ করেন। ১৯১৫ সালে ভারতীয় রাজনীতিতে যোগ দেন ও ১৯২৫ সালে কানপুরে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯২৮ খ্রী আমেরিকা সফর করেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে সরোজিনী নাইডু প্রথম কারাবরণ করেন। তারপর দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বার বার কারান্তরালে প্রেরিত হন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর শ্রীমতী নাইডু উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন।

সাইমন কমিশন : আইন সভার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে স্বরাজ্য দল মন্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারের অসারতা প্রমাণ করেন। ১৯২৪ খ্রী ১৮ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় আইন সভার বিরোধী দল-নেতা মতিলাল নেহরু ভারতের নতুন সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গোল টেবিল বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়ে যে প্রস্তাব আনেন তা গরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়। বৃটিশ সরকার ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন গঠন করে কার্যত সেই দাবিই মেনে নেন। ভারতবাসী দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য কতটা প্রস্তুত হয়েছে, দায়িত্বশীল সরকার গঠনের অনুকূল পরিবেশ ভারতে কতটা সৃষ্টি হয়েছে এবং কি ধরনের শাসনতন্ত্র ভারতের সব ধরনের জনমত ও স্বার্থকে সন্তুষ্ট করতে পারবে তা পর্যালোচনার দায়িত্ব সাইমন কমিশনের উপর ন্যস্ত করা হয় কিন্তু সাইমন কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় দলমত নির্বিশেষে সব ভারতীয় নেতা ঐ কমিশনের নিন্দা করেন এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাইমন কমিশন সম্পূর্ণ বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাইমন কমিশন বর্জনের দাবি জানাতে গিয়ে বহু কংগ্রেস কর্মী গ্রেপ্তার হন। কিন্তু নানা বাধা, বিরোধিতা ও অসহ-যোগিতার মধ্যেও সাইমন কমিশনের সমীক্ষাকার্য চলে এবং ১৯৩০ সালের জুন মাসে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

ভারতের সংবিধান সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য সাইমন কমিশন গোল টেবিল বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাব দেন। সেই প্রস্তাব বৃটিশ সরকার গ্রহণ করেন এবং ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক আহূত হয়।

সাইরাস : খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সাইরাস পারস্যে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর ভারত অভিমুখে অগ্রসর হন। তাঁর প্রথম অভিযান ব্যর্থ হয়, কিন্তু পরবর্তী অভিযানে তিনি সিন্ধু নদী ও কাবুলের কোফেন নদীর মধ্যবর্তী স্থান জয়ে সমর্থ হন। গ্রীক ঐতিহাসিক টেসি-য়াসের বর্ণনায় আছে যে, গান্ধার রাজ্য জয়ের সময় এক ভারতীয় সৈন্যের অস্ত্রাঘাতে সাইরাস নিহত হন।

সাতকর্ণী : সাতবাহন রাজবংশের তৃতীয় নৃপতি। তিনি বিদর্ভ, মালব, তেলেঙ্গানা জয় করে সাতবাহন রাজ্যের সীমানা বাড়ান। তাঁর শাসন-কালে সৌরাষ্ট্র, মালব, বিদর্ভ, উত্তর কোঙ্কন, মহারাষ্ট্রের পুনা, নাসিক

প্রভৃতি স্থান নিয়ে সাতবাহন রাজ্য বিশাল রূপ ধারণ করে। তিনি তেলেঙ্গানা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠান নামক স্থানে রাজ্যের নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। সাতকর্ণী সাতবাহন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নৃপতি।

সাতবাহন বংশ: খ্রী-পূ প্রথম শতাব্দীতে সিমুক দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন বংশীয় শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কাণ্ব বংশীয় শেষ নৃপতি সুশর্মনকে হত্যা করে সাতবাহন রাজ্যের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি করেন। সিমুক সম্ভবত ২৮ খ্রী-পূ সিংহাসনারোহণ করেন ও ২৩ বছর রাজত্ব করেন। তারপর সিংহাসনে বসেন তাঁর ভাই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ সাতবাহন রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেন এবং মহারাষ্ট্রের নাসিক তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তৃতীয় রাজা প্রথম সাতকর্ণী ছিলেন সিমুকের পুত্র। তিনিই সাতবাহন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নৃপতি এবং তাঁর সময়ে সাতবাহন রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে (সাতকর্ণী-দ্র)।

সাতবাহন বংশের পরবর্তী রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বশিষ্ঠপুত্র পুলমায়ী, যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী প্রভৃতি। যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর সময় থেকে সাতবাহন বংশের পতন শুরু হয় এবং মহারাষ্ট্রে আভির, মধ্য-ভারতে বাকাটক, দক্ষিণ ভারতে পল্লব প্রভৃতির অভ্যুত্থানে সাতবহন রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বিভিন্ন পুরাণে সাতবাহন রাজাদের অন্ধ্র, অন্ধ্রভৃত্য প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী অন্ধ্র অঞ্চল তাঁদের অধিকারভুক্ত হয় বলেই সম্ভবত সাতবাহন [illegible] বা অন্ধ্রভৃত্য নামে অ[illegible] কিন্তু সাতবাহন রাজারা [illegible] ছিলেন না সে বিষয়ে [illegible] নিঃসন্দেহ। তাঁরা [illegible] ভারতীয় ব্রাহ্মণ [illegible] বত ২২৫ খ্রী নাগার্জু[illegible]ংশীয় শাসনের অবলুপ্তি [illegible]কেদের সঙ্গে একটানা যু[illegible] রাজ্যের শক্তিক্ষয় ও পত[illegible]লে মনে করা হয়। [illegible] সমকালীন এক শিলালি[illegible] আছে যে, সাতকর্ণী [illegible]র্ণ পরাজিত করেন। [illegible]তী কালের সাতবাহন রা[illegible] সাতকর্ণীর মত শক্তি ও যোগ্যতা ছিল না। সে কারণে শক আক্রমণ প্রতিরোধের সামর্থ্যও তাঁদের ছিল না।

সাধারণতন্ত্রী ভারত: ১৯৪৭ খ্রী ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। তারপরেই ভারতের নতুন সংবিধান রচনার কাজ শুরু হয় ও ১৯৫০ খ্রী ২৬ জানুয়ারি নতুন সংবিধান বলবৎ হয়। নতুন সংবিধান অনুসারে এদেশের নাম হয় 'ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ ভারত (India that is Bharat)। রাষ্ট্রসঙ্ঘে অথবা বহির্বিশ্বে ভারত 'ইণ্ডিয়া' নামেই পরিচিত। সংবিধানে ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' Sovereign Democratic Republic বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন সংবিধানে গভর্নর-জেনারেল পদের অবসান হয় এবং ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হন রাষ্ট্রপতি (President)। ১৯৫০ খ্রী ২৬ জানু-

যায়ী সাধারণতন্ত্রী ভারতের সংবিধান বলবৎ হয় বলে ২৬ জানুয়ারি ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবসরূপে পালিত হয়।

সাপ্রু, তেজবাহাদুর (১৮৭৫-১৯৪৮): বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও উদারনৈতিক নেতা। ১৯১০ খ্রী জাতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক হন। কিন্তু কংগ্রেস আন্দোলনের পথে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিন্ন হয়। তবে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা ও নীতি অনুসারে বরাবরই জড়িত ছিলেন। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের বিভিন্ন বিরোধের নিষ্পত্তিকালে মধ্যস্থ হিসাবে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সাপ্রু ১৯২০-২২ সালে বড়লাটের কাউন্সিলের আইন সদস্য ছিলেন। তিনি তিনটি গোলটেবিল বৈঠকেই যোগ দেন।

সাভারকার, বিনায়ক দামোদর (১৮৮৩-১৯৬৬): চরমপন্থী নির্ভীক দেশনেতা। শিবাজি বৃত্তিলাভ করে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে লণ্ডনে যান ও সেখানে বিপ্লবী তৎপরতায় লিপ্ত হন। ১৯০৭ খ্রী লণ্ডনে স্যার কার্জন উইলি নামে এক শ্বেতাঙ্গ মদনলাল ধিংড়া নামে এক ভারতীয়ের আক্রমণে নিহত হন। ঐ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে সাভারকারকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ভারতের বিভিন্ন বিপ্লবী তৎপরতার সঙ্গেও জড়িত থাকার অভিযোগে সাভারকারকে বন্দী অবস্থায় ভারতে আনার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু জাহাজটি যখন ফ্রান্সের বন্দর মার্সাইতে পৌঁছায় সে সময় সাভারকার জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ে ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করেন। দুর্ভাগ্যবশত ফ্রান্সের শাসকবর্গ তাঁকে রাজনৈতিক আশ্রয় না দিয়ে আবার বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করেন। এই ঘটনা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ভারতে আনার পর সাভারকারকে আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়। ১৯২৪ খ্রী সাভারকার আন্দামান থেকে মুক্তিলাভ করেন। তারপর জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সাভারকারের বিশেষ সংযোগ ছিল না। তিনি হিন্দুমহাসভায় যোগ দেন ও তাঁর নেতৃত্বে হিন্দুমহাসভা বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা: সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে প্রথম বিভেদ আনেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। তিনি একদা ভারতের হিন্দু ও মুস্লিম সম্প্রদায়কে ভারত মাতার দুই চক্ষু বলে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর তিনি মত পাল্টান ও মুস্লিমদের স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যের কথা প্রচার করতে থাকেন। ১৮৭৫ সালে আলিগড়কে কেন্দ্র করে তিনি যে মুস্লিম সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের সূচনা করেন তা 'আলিগড় আন্দোলন' নামে অভিহিত। কিন্তু আলিগড় আন্দোলন সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে মুস্লিম সমাজের সম্পর্ক কোনদিনই ছিন্ন হয় না। পরন্তু জাতীয় আন্দোলনে মুস্লিম, খ্রীষ্টান, পার্শি ও শিখ সম্প্রদায়ের লোকেদের যোগদান দিনে দিনে বাড়তে থাকে।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে (১৮৮৫) সভাপতিত্ব করেন একজন হিন্দু (ডবলিউ সি ব্যানার্জী), দ্বিতীয় অধিবেশনে একজন পার্শি (দাদাভাই নৌরজি) ও তৃতীয় অধিবেশনে একজন মুস্লিম (বদরুদ্দিন তয়েবজি)। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে মাত্র দু'জন মুস্লিম প্রতিনিধি যোগ দেন, কিন্তু পরের বছর (১৮৮৬) কলকাতা অধিবেশনে মুস্লিম প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৩৩; তার চার বছর পরে, ১৮৯০ সালে, আবার কলকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে ৭০২ জনের মধ্যে ১৫৬ জন, অর্থাৎ মোট প্রতিনিধির ২২ শতাংশ ছিলেন মুস্লিম।

কিন্তু আলিগড় আন্দোলনকারীদের সমর্থনে ইংরেজ সরকার প্রথম থেকেই জাতীয় আন্দোলনে বিভেদ ধরাতে তৎপর হন এবং ১৯০৯ সালের শাসন সংস্কারে (মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কার-দ্র) প্রথম সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। মহম্মদআলি জিন্নাসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ সেদিন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধিতা করেন। কিন্তু তা সত্বেও মুস্লিম লীগের সমর্থনের জোরে ইংরেজ সরকার সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিধিবদ্ধ করেন। পরে মুস্লিম লীগও স্বায়ত্ত শাসনের প্রস্তাব গ্রহণ করলে হিন্দু-মুস্লিম ঐক্যের আশায় ১৯১৬ সালে কলকাতায় মুস্লিম লীগ ও কংগ্রেসের মিলিত সভায় মুস্লিমদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবি নীতিগত ভাবে মেনে নেওয়া হয়। তারপর থেকে স্বাধীনতার পূর্বে পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের প্রতিটি শাসন সংস্কারেই সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকে।

১৯৩২ সালে ইংরেজ সরকার হিন্দু সমাজের অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির জন্য পৃথক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে তার প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী কারারুদ্ধ অবস্থায় আমৃত্যু অনশন শুরু করেন। পরিশেষে অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা ডঃ আম্বেদকার মহাত্মা গান্ধীর কাছে বৃটিশ সরকার প্রস্তাবিত আসন অপেক্ষা দ্বিগুণ আসন লাভের প্রতিশ্রুতি পেলে অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি প্রত্যাহার করে নেন এবং গান্ধীজিও অনশন প্রত্যাহার করেন। সেই সময় মহাত্মা গান্ধী ও ডঃ আম্বেদকারের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তা 'পুনা চুক্তি' নামে অভিহিত। কিন্তু চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরেও অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়।

সারনাথ: বারাণসীর অদূরে একটি বৌদ্ধযুগীয় সমৃদ্ধ নগরী। ভগবান বুদ্ধ বৌদ্ধগয়ায় বুদ্ধত্ব লাভের পর সারনাথের মৃগদাবে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রথম ধ্যানলব্ধ বাণী প্রচার করেন। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ জন মার্শাল এখানে খননকার্য চালিয়ে অশোকস্তম্ভের অংশ ও ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত বহু সামগ্রীর সন্ধানলাভ করেন। সারনাথে আবিষ্কৃত চতুঃসিংহ স্তম্ভ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছে। কুষাণ ও গুপ্তযুগের বহু সভ্যতার নিদর্শনও সারনাথে পাওয়া গেছে।

সিকন্দর শাহ: বঙ্গদেশের সুলতান। সুলতান হাজি ইলিয়াস শাহর মৃত্যুর

পর (১৩৫৭ খ্রী) সিকন্দর শাহ সুলতান হন। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক তাঁকে পরাস্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং তারপর সিকন্দর শাহের সঙ্গে দিল্লীর সুলতান যে শর্তে সন্ধি স্বাক্ষর করেন তাতে কার্যত বঙ্গদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হয়। সিকন্দর শাহ সুশাসক ছিলেন এবং শিল্প ও সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

সিকন্দর লোদি : দিল্লীর লোদি বংশীয় দ্বিতীয় সুলতান, বহলুল লোদির পুত্র। শাসনকাল ১৪৮৮-১৫১৭ খ্রী। তিনিই লোদি বংশের শ্রেষ্ঠ শাসকরূপে বিবেচিত হন। সিকন্দর পিতার মত পরাক্রমশালী ছিলেন এবং সিংহাসনে বসার পরেই রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনে ও সাম্রাজ্য বিস্তারে তৎপর হন। তিনি তাঁর বিদ্রোহী ভ্রাতা বরবাককে পরাজিত ও বন্দী করেন কিন্তু পরে মুক্তি দেন। তারপর জৌনপুরের বিদ্রোহ দমন করেন; ১৪৯৫ খ্রী বিহারের বিদ্রোহ দমন করেন ও সেখানে শান্তি শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশের বিদ্রোহী সুলতানের সঙ্গেও সিকন্দর একটা মীমাংসায় আসেন। ঢোলপুর, চান্দেরি ও গোয়ালিয়রের বিদ্রোহও তিনি দমন করেন। ১৫০৩ খ্রী সিকন্দর আগ্রা নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেটি হয় তাঁর প্রধান সামরিক দপ্তর। সমগ্র প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করার ব্যাপারেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখান।

ধর্মের ব্যাপারে সিকন্দর অনুদার ছিলেন। হিন্দু রমণীর সন্তান হয়েও তিনি হিন্দু প্রজাদের প্রতি অতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন। ধর্মের ব্যাপারে সিকন্দর লোদির অনুদারতা লোদি বংশের পতনের অন্যতম কারণ।

সিকিম : উত্তর-পূর্ব ভারতে অবস্থিত ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য। আয়তন ৭,৩০০ বর্গ কিমি, লোকসংখ্যা ২ লক্ষ ১২ হাজার। রাজধানী গ্যাংটক। উত্তরে তিব্বত, পশ্চিমে নেপাল, পূর্বে ভুটান ও দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ। সিকিমের আদিবাসী লেপচা, কিন্তু তারা এখন সংখ্যালঘিষ্ঠ। নেপালীরা সে রাজ্যের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী। সপ্তদশ শতাব্দীতে সিকিম একটি স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬১ সালে এক চুক্তি অনুসারে সিকিমের রাজা ভারতে ইংরেজ সরকারের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন এবং সিকিম হয় ভারতের আশ্রিত রাজ্য। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সিকিমের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় তার অবসান ঘটানো হয় ১৯৭৫ সালের ২৬ এপ্রিল, সিকিমকে ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্যে পরিণত করে।

সিদি বদর : পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বঙ্গদেশের সুলতান রুকনুদ্দিন বুরবাক শাহ সুলতানের দেহরক্ষী হিসাবে কাজ করার জন্য অনেক হাবসি ক্রীতদাস বঙ্গদেশে আনান। বুরবাক শাহের মৃত্যুর পর অযোগ্য সুলতানদের শাসনে বঙ্গদেশে অরাজকতা দেখা দিলে হাবসি ক্রীতদাস নেতা সিদি বদর রাজ্যের শাসন ক্ষমতা দখল করেন। তিনি উচ্চাভিলাষী হলেও তাঁর শাসন যোগ্যতা ছিল না, তদুপরি ছিলেন অত্যন্ত অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর। ফলে হাবসি শাসনাধীন বঙ্গদেশে দারুণ

অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ঐ অবস্থা থেকে বঙ্গদেশকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে রাজ্যের অভিজাত ব্যক্তিরা আলাউদ্দিন হুসেন শাহকে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করান। হুসেন শাহ সিদি বদরকে অপসারিত করে বঙ্গদেশে হাবসি শাসনের (১৪৮৬-৯৩) অবসান ঘটান ও হাবসি ক্রীতদাসদের বিতাড়িত করেন।

সিন্ধু সভ্যতা: সিন্ধু নদীর অববাহিকা অঞ্চলে আবিষ্কৃত ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতা। ১৯২২ সালে বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জোদরো নামক স্থানে সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ঐ সভ্যতা অনাবিষ্কৃত থাকাকালে ধারণা ছিল যে, আনুমানিক তিনহাজার বছর আগে আর্যরা ভারতে প্রবেশের আগে ভারতের নিজস্ব কোন সভ্যতা ছিল না। সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারে সে ধারণা মিথ্যা প্রমাণ হয়। সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা, চানহুদরো প্রভৃতি স্থানে খনন কার্য চালিয়ে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার বহু নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে। ঐসব নিদর্শন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে সেই যুগের ভারতবাসীরা প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, এসিরিয়া প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীদের মতই উন্নত ও সভ্য ছিল। (অনার্য, মহেঞ্জোদরো, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্পা-দ্র)।

সিপাহী বিদ্রোহ: ১৮৫৭ খ্রী ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। তাতে ভারতীয় সিপাহীদের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে ঐ বিদ্রোহ 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে অভিহিত। পরবর্তীকালের বহু ঐতিহাসিক ঐ বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানোই বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য ছিল। একারণে সিপাহি বিদ্রোহ এখন '১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ' নামে অভিহিত হয়।

নানাকারণে ঐ বিদ্রোহ হয়। লর্ড ডালহৌসী "স্বত্বলোপ নীতি" অনুসারে ও অন্যান্য অজুহাতে সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, অযোধ্যা, কর্ণাট প্রভৃতি রাজ্যগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলে দেশীয় রাজন্যবর্গের মনে দারুণ ক্ষোভ ও আশঙ্কা দেখা দেয়। তাঁরা মনে করেন যে, অবিলম্বে যে কোন অজুহাতে সব দেশীয় রাজ্যই বৃটিশ সাম্রাজ্য গ্রাস করবে। একারণে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে অনেক দেশীয় নৃপতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহে যোগ দেন, অনেকে আড়ালে থেকে সিপাহীদের সাহায্য করেন। পেন্সনভোগী পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাওর দত্তকপুত্র নানাসাহেবকে ইংরেজ সরকার পেন্সন থেকে বঞ্চিত করেছিলেন; ঝাঁসির রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁর দত্তক পুত্রের দাবি স্বীকার না করে ইংরেজ সরকার ঝাঁসিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ঐ রাজ্যের তেজস্বিনী রানী লক্ষ্মীবাঈকে বিক্ষুব্ধ করেছিলেন; দিল্লীর বাদশাহপদ বিলোপের প্রস্তাব বিবেচনা করছিলেন লর্ড ডালহৌসি, তাই শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহও

ইংরেজদের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন। একারণে নানা সাহেব, লক্ষীবাঈ, বাহাদুর শাহ সকলেই বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দেন।

ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার, সতীদাহ নিবারণ ও অন্যান্য সমাজ সংস্কারের ফলে সামাজিক চিন্তাধারার যে পরিবর্তন ও আধুনিকতার জোয়ার আসে সনাতনপন্থীরা সেটা ভালচোখে দেখেন না। ভারতীয়দের প্রতি বৃটিশ শাসক ও কর্মচারীদের উপেক্ষা ও আত্মাভিমানী ভারতীয়দের ক্ষোভের কারণ হয়।

বিদেশি পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতের কুটির-শিল্পজাত পণ্য টি`কতে পারে না। ফলে বহু শিল্প উঠে যায় এবং বৃত্তিচ্যুত অগণিত মানুষ বৃটিশ শাসনের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ইংরেজি শিক্ষার চাপে এদেশের টোল মক্তব মাদ্রাসাগুলি উপেক্ষিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায় এবং তার ফলে শিক্ষিত সমাজও বৃত্তিচ্যুত হয়ে বৃটিশ শাসনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়। ইংরেজ শাসকদের শোষণনীতি ও উপেক্ষার ফলে দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট দিনে দিনে অসহনীয় হয়ে ওঠে।

ঐসব বিক্ষোভ অসন্তোষে সারা-ভারতের জনমানস যখন বিস্ফোরন্মুখ সে সময় ভারতীয় সিপাহীরাও নানা কারণে ইংরেজ শাসকদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তাদের বেতন ও ভাতা ছিল ইংরেজ সৈন্যদের তুলনায় অনেক কম। তারপর কোন দায়িত্বশীল পদে ভারতীয় সিপাহীদের নিয়োগ করা হত না। ঐসব বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য ভারতীয় সিপাহীদের মন খুবই বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। তারপর হিন্দু সৈনিকদের কালাপানির সংস্কার উপেক্ষা করে তাদের ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পাঠানো হয়। পরিশেষে এনফিল্ড রাইফেল নামে এক ধরনের বন্দুক ব্যবহার নিয়ে হিন্দু-মুস্লিম উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদের মধ্যে বিক্ষোভ চরমে ওঠে। ঐ বন্দুকের টোটা দাঁত দিয়ে কাটতে হত। হঠাৎ গুজব রটে যে, ঐ টোটায় গরু ও শূয়রের চর্বি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং হিন্দু-মুস্লিম উভয় সম্প্রদায়ের সৈনিকই ঐ টোটা ব্যবহারে অস্বীকৃতি জানায়।

বিক্ষোভ প্রথম প্রকাশ পায় বাঙলায়, ব্যারাকপুর সামরিক শিবিরে। ১৮৫৭ খ্রী ২৯ মার্চ। ঐদিনই সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা। প্রথম বিদ্রোহী হলেন মঙ্গল পাণ্ডে। মঙ্গল পাণ্ডে ও তাঁর সঙ্গী ঈশ্বরী পাণ্ডের ফাঁসি হওয়ার পর সিপাহী বিদ্রোহের আগুন সারা-দেশে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বাহাদুর-শাহকে সারা ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে অবিলম্বে মিরাট, দিল্লী, কানপুর প্রভৃতি স্থানের সৈন্যশিবিরের ভারতীয় সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অগণিত ইংরেজ সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তি বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, বাঙলা—সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ সফল হয় না। প্রথম দিকে সিপাহীরা বহু যুদ্ধে জয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত লরেন্স, আউট-রাম প্রমুখ ইংরেজ সেনাপতিদের রণ-কুশলতায় এবং শিখ ও গোর্খা সৈন্য-

দের সহযোগিতায় সমগ্র যুদ্ধ পরিস্থিতি ইংরেজদের অনুকূলে চলে যায়। ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন, বিদ্রোহের অপর নেতা তাঁতিয়া টোপি ধরা পড়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। নানা সাহেব নেপালের অরণ্যে অন্তর্ধান করেন। শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ বন্দী হয়ে রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ মুখ্যত সিপাহীদের বিদ্রোহ হলেও ভারতের বহু স্থানে তা জনসমর্থিত জাতীয় অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। ঝাঁসির রানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও গৌরবময় আত্মদানেই প্রমাণ হয় যে, তাঁরা জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের এত বড় মিলিত অভিযান আর কখনও হয়নি। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের রূপ ও চরিত্র নিয়ে যত মতভেদই থাকুক, এ বিষয়ে মতদ্বৈধের কোন অবকাশ নেই যে ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসানকল্পেই ঐ বিদ্রোহ ঘটেছিল। সুতরাং সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলতে কোন আপত্তি হতে পারে না।

সিপাহী বিদ্রোহের ফলেই ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয় ও বৃটিশ সরকারের উপর ভারতের শাসনদায়িত্ব ন্যস্ত হয়। বৃটিশ সরকারের হাতে ভারতের শাসনদায়িত্ব ন্যস্ত করার কালে বৃটিশ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ঘোষণা করেন যে ভারতের আর কোন স্থান বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। ভারতে ইংরেজ সরকারের মুখ্য প্রশাসক গভর্নর-জেনারেলকে বৃটিশ রাজমুকুটেরও প্রতিনিধি ভাইসরয় বলে ঘোষণা করা হয়। লর্ড ক্যানিং হন ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয়। ভারতের শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের অধিক দায়িত্ব দানের নীতিও ঘোষিত হয়। সৈন্যবিভাগের ও প্রশাসনের নানা বৈষম্য দূর করা হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের অল্পকাল পরেই ভারতে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয় এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বালগঙ্গাধর টিলক প্রমুখ রাষ্ট্রনেতাদের আবির্ভাব ঘটে।

সিমুক: সাতবাহন বা অন্ধ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। আনুমানিক খ্রী-পূ ২৮ অব্দে কান্ব বংশের শেষ রাজা সুশর্মনকে হত্যা করে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তেইশ বছর রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁর রাজ্যশাসন বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

সিরকপ: প্রথম তক্ষশিলা নগরীর ধ্বংসস্তূপের উপর খ্রী-পূ দ্বিতীয় শতাব্দীতে গড়ে ওঠে এই সমৃদ্ধ নগরী। নগরীটি প্রায় চার শ' বছর স্থায়ী ছিল। ভারতীয় গ্রীক রাজাদের উদ্যোগে সিরকপ নগরীটি স্থাপিত হয়। নগরীটি খুবই উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল। নগরীর উত্তর প্রবেশমুখে গ্রীক ভাস্কর্যের অনুসরণে নির্মিত একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। নগরীর উত্তর উপকণ্ঠে যে একটি বড় স্তূপের সন্ধান

পাওয়া গেছে সেটি সম্রাট অশোকের পুত্র কুণালের স্মৃতিতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে নির্মিত হয় বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান।

সিরাজুদ্দৌলা (১৭৩৩-৫৭) : বাঙলার নবাব আলিবর্দি খাঁর কোন পুত্র না থাকায় তিনি তাঁর তৃতীয় কন্যা আমিনা খাতুনের পুত্র সিরাজুদ্দৌলাকে মসনদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। সেই মতো, ১৭৫৬ খ্রী নবাব আলিবর্দি খাঁর মৃত্যুর পর, ২৩ বছর বয়সে সিরাজ নবাব হন ও মাত্র এক বছর সে পদে বহাল থাকেন। তিনি নবাব হওয়ায় অনেকের আশা ভঙ্গ হয় এবং সে কারণে বঞ্চিতরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। সিরাজের নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতিও তাঁর পতনের সহায়ক হয়। পরিশেষে ১৭৫৭ খ্রী পলাশির যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও তার অল্প পরে ধৃত ও নিহত হন।

সিরাজ আলিবর্দির উত্তরাধিকারী হওয়ায় সিরাজের প্রতি সর্বাধিক বিরূপ হন তাঁর মাতৃষ্বসা ঘসেটিবেগম। তিনি ছিলেন ঢাকার প্রাক্তন শাসনকর্তার বিধবা পত্নী। অপর মাতৃষ্বসা ছিলেন পুর্ণিয়ার শাসনকর্তার স্ত্রী। অবিলম্বে ঘসেটিবেগম ও পুর্ণিয়ার শাসনকর্তার পুত্র সৌকৎজং সিরাজকে মসনদচ্যুত করার জন্য এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ঐ ষড়যন্ত্রে বুদ্ধি যোগান ঘসেটিবেগমের দেওয়ান রাজবল্লভ। পরে নবাব আলিবর্দির ভগ্নীপতি ও সিরাজের প্রধান সেনাপতি মিরজাফর বাঙলার নবাব হওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ ষড়যন্ত্রে যোগ দেন. এবং একে একে ইয়ারলতিফ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি রাজদরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ মিরজাফরের পক্ষে যোগ দেন। ওদিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কয়েকদফা কড়া ব্যবস্থা নেওয়ায় ইংরেজ বণিকদের পক্ষে রবার্ট ক্লাইভও ঐ ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। রবার্ট ক্লাইভ মিরজাফরকে নবাব করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং মিরজাফর ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীরা রবার্ট ক্লাইভকে সাহায্যের বিনিময়ে প্রচুর ধনদৌলত ও বাণিজ্যিক সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেন।

সিরাজের উদ্ধত স্বভাব ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য তাঁর কাছের মানুষ প্রায় সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে চলে যান। কিন্তু সিরাজের চরিত্রের একটি মহৎ গুণ অনস্বীকার্য। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা এবং ইংরেজ বণিকরা যে দেশের বিপদের কারণ হয়ে উঠেছিল সেটা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন। সেকারণে ক্ষমতাসীন হওয়ার মাত্র দু'মাস পরে তিনি কাশিমবাজারে ইংরেজের কুঠি দখল করেন ও কলকাতায় এসে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। সিরাজ কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করলে মাদ্রাজ থেকে সৈন্য ও নৌবহর নিয়ে বাংলায় এসে ক্লাইভ আবার কলকাতা দখলে আনেন (১৭৫৭ খ্রী ২রা জানুয়ারি)। ঐ সংবাদ পাওয়া মাত্র নবাব সিরাজ আবার কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু ক্লাইভের শক্তি উপেক্ষণীয় নয় এটা তিনি উপলব্ধি করেন, আর সে কারণে আলিনগরের সন্ধিতে তখনকার মতো উভয় পক্ষের একটা মীমাংসা হয়ে যায়। কিন্তু

ইংরেজরা বুঝতে পারে যে সিরাজ অপসারিত না হলে তাদের পক্ষে বাঙলায় ক্ষমতা বিস্তার কঠিন হবে। তাই সহজেই তারা মিরজাফরকে নবাব করার প্রস্তাবে সম্মতি দেয় ও সিরাজ উৎখাতের ষড়যন্ত্রে অংশ নেয়।

এরপর ১৭৫৭ খ্রী ২৩ জুন পলাশির প্রান্তরে ক্লাইভের সৈন্যদলের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ হয়। নবাবের প্রধান সেনাপতি মিরজাফর বিশাল সৈন্য-বাহিনী নিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকেন। তাই মিরমদন, মোহনলাল প্রমুখ কয়েকজন অনুগত সেনাপতি প্রাণপণে যুদ্ধ করেও নবাবের পরাজয় প্রতিরোধ করতে পারেন না। নবাব রণক্ষেত্র থেকে পলায়নের চেষ্টা করেন, কিন্তু পথে ধৃত হয়ে বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে আনীত হন। কয়েকদিন পরে মিরজাফরের পুত্র মিরনের আদেশে মহম্মদী বেগ সিরাজকে হত্যা করে।

সুজা: মোগল সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র। পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যখন চার ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ শুরু হয় তখন সুজা বাংলার সুবাদার ছিলেন। সুজা ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী, মদ্যপ ও অযোগ্য শাসক। তদুপরি সিয়া মত-বাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ থাকায় মোগল দরবারের প্রভাবশালী সুন্নি আমির-ওমরাহরা তাঁর বিরুদ্ধে যান।

উত্তরাধিকার সংগ্রামে সুজা খানোয়ার যুদ্ধে ঔরংজেবের কাছে পরাজিত হন ও আরাকানে পলায়ন করেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সুজাউদ্দিন খাঁ: বাঙলা-বিহার-ওড়িশার সুবাদার ও পরে নবাব, মুর্শিদ-কুলি খাঁর জামাতা। মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকালে তিনি ছিলেন নায়েব-সুবা অর্থাৎ ছোট নবাব। মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর আলিবর্দি খাঁর সহায়তায় তিনি বাঙলার মসনদ অধিকার করেন। ১৭২৭-৩৯ খ্রী সুজাউদ্দিন বাঙলার নবাব ছিলেন।

সুবক্তগিন: গজনির সুলতান, শাসনকাল ৯৭৬-৯৯৭ খ্রী। লামঘান, সিস্তান, খোরাসান প্রভৃতি জয়ের পর ভারত আক্রমণে তৎপর হন। তখন পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজা ছিলেন শাহি বংশীয় রাজপুত জয়পাল। সুবক্তগিনের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে জয়পাল নিজেই গজনি রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু লামঘানের যুদ্ধে শোচনীয়-ভাবে পরাজিত হন ও প্রচুর ক্ষতি-পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে আসেন। কিন্তু স্বরাজ্যে পৌঁছে জয়পাল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। তখন সুবক্তগিন তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে আবার জয়পালের পরাজয় হয় ও সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সুবক্তগিনের অধিকারে চলে যায়। সুবক্তগিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ শুরু করেন এবং এইভাবে ভারতে তুর্কি অভিযান আরম্ভ হয়।

সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫ ?): ভারতের বীর সন্তান, সর্বজনশ্রদ্ধেয় গণনায়ক নেতাজি। কৃতী ছাত্র সুভাষচন্দ্র তীব্র দেশাত্মবোধের জন্য ছাত্রাবস্থাতেই নানা দণ্ড ও লাঞ্ছনা ভোগ করেন। ১৯২০ খ্রী লণ্ডনে আই.

সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু উচ্চ রাজপদ তুচ্ছ করে স্বদেশে ফিরে এসে মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেন। তারপর থেকে সুভাষচন্দ্রের জীবন আপসহীন সংগ্রামের জীবন। ১৯৩৭ খ্রী গান্ধীজির ইচ্ছায় তিনি কংগ্রেস সভাপতি হন, কিন্তু তাঁর উগ্র আপসহীন মতবাদ কংগ্রেস নেতাদের মনোমত হয় না। তাই পরের বছর গান্ধীজি পট্টভি সীতারামাইয়াকে কংগ্রেস সভাপতি করতে চান। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ঐ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও পুনরায় কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধের ফলে তাঁর পক্ষে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে, সে কারণে তিনি সভাপতি পদে ইস্তফা দেন এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরে প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে সজ্ঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন।

জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্রকে কয়েকবার কারারুদ্ধ হতে হয়। ১৯৪১ খ্রী স্বগৃহে অন্তরীণ থাকাকালে সুভাষচন্দ্র অকস্মাৎ অন্তর্ধান করেন এবং বেশ কিছুদিন তাঁর অবস্থানের কথা ইংরেজ সরকারের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে। পরে জানা যায় যে, পেশোয়ার, কাবুল, মস্কো হয়ে সুভাষচন্দ্র বার্লিনে পৌঁছেছেন।

বার্লিনে সুভাষচন্দ্র গঠন করেন তাঁর প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ। সে সময় বার্লিন-প্রবাসী ভারতীয়রা সুভাষচন্দ্রকে নেতাজি নামে সম্বোধন করেন। নেতাজি জার্মান সরকারের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেন এবং বার্লিনে একটি অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারও গঠিত হয়। তখনও জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের চুক্তিবন্ধন অটুট ছিল। তাই নেতাজি সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সৈন্য নিয়ে ভারতে প্রবেশের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় নেতাজিকে সে পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়।

ইতিমধ্যে জাপানের সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধ শুরু হওয়ায় পূর্ব এশিয়াতেও একই সম্ভাবনা দেখা দেয়। তখন তিনি বার্লিন ত্যাগ করে ডুবো জাহাজে অতলান্তিক ও ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে, এক দুঃসাহসিক অভিযানের শেষে জাপানে পৌঁছান। জাপানে তাঁর আগমনের আগেই বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে জাপানের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠিত হয়েছিল। নেতাজি এসে সেই বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। নেতাজির অনুপ্রাণিত নেতৃত্বে সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক অভূতপূর্ব জাগরণ এল। ১৯৪৩ খ্রী ২১ অক্টোবর ভারতীয় ভূখণ্ড আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে গঠিত হল ভারতের প্রথম আজাদ হিন্দ সরকার। তারপর ১৯৪৫ খ্রী পর্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের সঙ্গে ইংরেজ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে যে সব সংগ্রাম হয় তাতে উপযুক্ত সমরসজ্জার অভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রাথমিক পরাজয় হলেও সেই বীরত্বপূর্ণ

সংগ্রাম কাহিনী ভারতের জনগণ ও এদেশীয় সৈন্য ও পুলিশবাহিনীকে যে প্রচণ্ড জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তার মোকাবিলা করা রণক্লান্ত বৃটিশ সরকারের পক্ষে অসম্ভব হয়। চারিদিকে গণবিক্ষোভ, পুলিশ বিদ্রোহ ও সৈন্য বিদ্রোহের মধ্যে বৃটেনের নব নির্বাচিত শ্রমিক সরকার ভারতকে স্বাধীনতা দানের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন।

নেতাজি আর দেশে ফিরে আসেননি, কিন্তু সারা ভারতের সকল মানুষের হৃদয়ে তাঁর শ্রদ্ধার আসন চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নেতাজির 'জয় হিন্দ' ধ্বনি ভারতের জাতীয় ধ্বনিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮–১৯২৫): ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পথিকৃৎ, রাষ্ট্রগুরুরূপে সম্মানিত সুরেন্দ্রনাথ আই.সি.এস. পাশ করার পর উচ্চ রাজকর্মচারীরূপে কর্মজীবনের সূচনা করেন।

কিন্তু কিছুকাল পরে প্রশাসনিক ত্রুটিবিচ্যুতির অভিযোগে তিনি ঐ পদ থেকে অপসারিত হন। তারপর কিছুদিন মেট্রপলিটন ইন্সটিটিউশনে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) অধ্যাপনা করেন। পরে নিজেই রিপন কলেজ স্থাপন করেন এখন যার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ নাম হয়েছে।

১৮৭৬ খ্রী সুরেন্দ্রনাথ আনন্দমোহন বসুর সহযোগিতায় 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' গঠন করেন ও 'বেঙ্গলি' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চিন্তাধারা সংহত করার সেই প্রথম উদ্যোগ। ১৮৮৩ খ্রী সুরেন্দ্রনাথ কলকাতা পৌরসভার প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৮৫ খ্রী জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে সুরেন্দ্রনাথ তাতে যোগ দেন। কংগ্রেসের ১৮৯৫ সালের পুনা অধিবেশনে ও ১৯০২ সালের আমেদবাদ অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার খ্যাতি সেদিন দেশে-বিদেশে প্রচারিত হয়।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। ঐ সময় পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে তিনি কয়েকবার কারারুদ্ধ হন। তেজস্বী নির্ভীক নেতা সুরেন্দ্রনাথ 'সারেণ্ডার নট' নামে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু ধীরে ধীরে সুরেন্দ্রনাথ নরমপন্থীদের শিবিরে চলে যান। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে টিলকের নেতৃত্বে যখন লালা লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ চরমপন্থীরা একজোট হন তখন সুরেন্দ্রনাথ যোগ দেন ফিরোজ শাহ মেহতা, মতিলাল নেহরু, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সমর্থক নরমপন্থীদের দলে। ১৯১৯ সালে মণ্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্কারকে তিনি স্বাগত জানান এবং পরে বাঙলা সরকারের স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের মন্ত্রীপদ গ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের প্রকৃতপক্ষে সেখানেই পরিসমাপ্তি। এরপর ব্যারাকপুর নির্বাচন কেন্দ্রে তিনি স্বরাজ্য দলের প্রার্থী তরুণ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে পরাজিত হন।

সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, কর্নেল (১৮৬১-১৯০৫): নির্ভীক অভিযাত্রী। মাত্র সতের বছর বয়সে জাহাজের স্টুয়ার্ড হয়ে ইংলণ্ডে যান। সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর এক সার্কাস কোম্পানিতে যোগ দিয়ে ১৮৮৫ খ্রী আমেরিকা চলে যান। সার্কাস পার্টি দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে গেলে তিনি সার্কাস ছেড়ে ঐ দেশের সৈন্যদলে যোগ দেন। সেখানে এক বিদ্রোহ দমনে তিনি অসমসাহসিকতার পরিচয় দিলে ব্রেজিল সরকার তাঁকে কর্নেল পদে উন্নীত করেন।

সুলতান মামুদ: গজনির তুর্কি শাসক সুবক্তগিনের পুত্র সুলতান মামুদ অপরাজেয় যোদ্ধা ও দক্ষ শাসকরূপে খ্যাত। জন্ম ৯৭১ খ্রী। পিতার মৃত্যুর পর প্রথমে তাঁর অনুজ ইসমাইলকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেন এবং বাগদাদের খলিফের অনুমতি অনুসারে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন শুরু করেন। নিজের মসনদ নিরাপদ করার পর ঐ প্রবল পরাক্রমশালী, ধর্মান্ধ, নিষ্ঠুর ও সম্পদলোলুপ সুলতান ভারত অভিযান শুরু করেন। ১০০০-১০২৬ খ্রী মধ্যে সুলতান মামুদ মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন।

তাঁর প্রথম অভিযান পরিচালিত হয় ১০০১ খ্রী, পাঞ্জাবের শাহি বংশীয় রাজপুত রাজা জয়পালের বিরুদ্ধে। কারণ জয়পাল সুলতান মামুদের পিতা সুবক্তগিনের দখল করা রাজ্যের হৃত অংশগুলি পুনরুদ্ধারে তৎপর হয়েছিলেন। যুদ্ধে জয়পালের ১৫ হাজার সৈন্য নিহত হয় এবং জয়পাল পরাজয়ের লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি পেতে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন।

সুলতান মামুদের দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হয় জয়পালের পুত্র আনন্দপালের বিরুদ্ধে, ১০০৮ খ্রী। কারণ আনন্দপাল সুলতান মামুদের আশঙ্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কনৌজ, দিল্লী, আজমিড় প্রভৃতি রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বর্তমান পেশোয়ার শহরের কাছে সুলতান মামুদ ও আনন্দপালের মিলিত বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। প্রথমদিকে আনন্দপালের সৈন্য জয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত সুলতান মামুদের রণদক্ষতার কাছে আনন্দপালকে নতি স্বীকার করতে হয়। ঐ যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর পাঞ্জাব ও বর্তমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সুলতান মামুদের অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরের বছর ১০০৯ খ্রী সুলতান মামুদ নগরকোট (কাংরা) আক্রমণ করেন শুধুমাত্র সেখানকার রত্ন-সমৃদ্ধ মন্দিরগুলি লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে। যুদ্ধে জয়ী হয়ে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে সুলতান মামুদ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর একই উদ্দেশ্যে ১০০৯-১০১৪ খ্রী মধ্যে তিনি মুলতান, আলোয়ার, কাশ্মীর ও থানেশ্বরে হিন্দু মন্দিরগুলি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন।

১০১৮ খ্রী সুলতান মামুদ উত্তর ভারতের সর্বাধিক সমৃদ্ধ হিন্দু রাজ্য কনৌজ আক্রমণ করেন এবং সেখানকার প্রায় প্রতিটি শহর-গ্রাম লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ করেন। মথুরার মন্দির লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়। মামুদের দুর্নিবার সৈন্য-

বাহিনীর কাছে কনৌজের প্রতিহাররাজ রাজ্যপাল আত্মসমর্পণ করেন। সমস্ত নগরী তছনছ করে ও বিপুল রত্ন-সম্ভার নিয়ে সুলতান মামুদ গজনি প্রত্যাবর্তন করেন। ১০২১ খ্রী মামুদ কালিঞ্জরের যুদ্ধে চণ্ডেলার রাজা গণ্ডকে পরাজিত করেন। তারপর ১০২৫ খ্রী সোমনাথের মন্দির লুন্ঠনের জন্য পরিচালিত হয় তাঁর ষোড়শ অভিযান। কাথিয়াওয়াড়ে অবস্থিত সোমনাথের মন্দির লুঠ করে সুলতান মামুদ প্রায় ২০০ মণ সোনা নিয়ে যান এবং সোমনাথের বিগ্রহটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে যান। তারপর ১০২৬ খ্রী সিন্ধুর পথ ধরে গজনির সুলতান স্বদেশে ফিরে যান।

মামুদের সর্বশেষ অভিযান পরিচালিত হয় পাঞ্জাবের জাঠদের বিরুদ্ধে ১০২৬ খ্রী। মামুদের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে কয়েক হাজার জাঠ নিহত হয়। তিন বছর পরে ১০৩০ খ্রী ৫৯ বছর বয়সে সুলতান মামুদের মৃত্যু হয়। লুণ্ঠনই ছিল সুলতান মামুদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য। ধর্মান্ধতার জন্য সেই সঙ্গে অগণিত হিন্দু মন্দির ও বিগ্রহও তিনি ধ্বংস করেন। ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য গঠনের কোন উৎসাহ তাঁর ছিল না। সে কারণে সুলতান মামুদের সপ্তদশ ভারত অভিযানের স্থায়ী ফল কিছুই প্রায় ছিল না। তবে তাঁর পাঞ্জাব অধিকারের ফলে ঐ স্থান থেকে পরবর্তী আক্রমণগুলি পরিচালনা করা অনেক সহজ হয়। ভারতে মুস্লিম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পায়। ভারতের বহু স্থাপত্য শিল্প ও অন্যান্য শিল্পকলা মামুদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় এবং ভারতের অর্থনীতিও বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

সূর্য সেন : ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম বিপ্লবী নায়ক। জন্ম ১৮৯৪ সালের ২২ মার্চ, ফাঁসিতে জীবনদান ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি। বিপ্লবী সংগঠনের সহকর্মীদের কাছে মাস্টারদা নামে পরিচিত ছিলেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলকে বৃটিশ শাসনমুক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করেন। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মাস্টারদার নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠ করেন এবং তারপর দু'দিন চট্টগ্রাম এলাকা বিপ্লবীদের দখলে ছিল। জালালাবাদ ও কালার পোলের খণ্ডযুদ্ধে বিপ্লবীরা সংগ্রামকুশলতা ও আত্মত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সূর্য সেন দু বছর বাদে ধরা পড়েন ও বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। সূর্য সেনের প্রধান সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, তারকেশ্বর দস্তিদার, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রভৃতি।

সেন বংশ : বঙ্গদেশে পাল বংশীয় রাজাদের অবনতির পর সেন বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীন সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন, রাজত্বকাল ১০৯৭-১১৫৯ খ্রী। সেন বংশের পূর্বপুরুষরা মহীশূরের অধিবাসী ও জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। বিজয় সেনের পিতামহ সামন্ত সেন বঙ্গদেশে আসেন এবং গঙ্গার তীরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র হেমন্ত সেন সম্ভবত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠায়

সমর্থ হন। তারপর তাঁর পুত্র বিজয় সেন পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ জয় করে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয় সেনের রাজ্যের দুটি রাজধানী ছিল, পশ্চিমাংশে বিজয়পুর ও পূর্বাংশে বিক্রমপুর। তিনি সম্ভবত কামরূপ জয় করেন এবং কলিঙ্গ ও মিথিলায় অভিযান চালান।

বিজয় সেনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বল্লাল সেন রাজত্বকাল ১১৫৯-৮৫ খ্রী। তাঁর শাসনকালে উত্তরবঙ্গে পাল-শাসনের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। তিনি সুপণ্ডিত ও সুশাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে এবং উত্তর বিহারে সেন শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন সেন বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য শাসক। তিনি গৌড়, কাশী, কামরূপ, কলিঙ্গ জয় করেন বলে ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর শাসন-কালেরই শেষের দিকে রাজ্যের অভ্যন্তরে বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, যার ফলে সেন শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও অরাজকতার দিনে ভাগ্যান্বেষী তুর্কি যোদ্ধা ইখতিয়ারুদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি মগধ জয়ের পর সামান্য কয়েক-জন ঘোড়সওয়ার নিয়ে অকস্মাৎ ঝাড়-খণ্ড অঞ্চল দিয়ে বঙ্গদেশে প্রবেশ করেন ও তারপর বণিকের ছদ্মবেশে নবদ্বীপে প্রবেশ করে লক্ষ্মণ সেনকে পরাভূত করেন। লক্ষ্মণ সেন সে সময় নবদ্বীপে ছিলেন এবং ঐ অতর্কিত আক্রমণের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। সেকারণে কোনরকম প্রতিরোধের চেষ্টা না করে লক্ষ্মণ সেন পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণ সেন আরও কিছুকাল রাজত্ব করেন এবং ১২০৫খ্রী তাঁর মৃত্যু হয়।

অতর্কিত আক্রমণে পরাস্ত হওয়ায় লক্ষ্মণ সেনের অতীত কীর্তি ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি যে রণনিপুণ ও সুশাসক ছিলেন তা তাঁর সমগ্র শাসনকাল (১১৮৫-১২০৫) পর্যা-লোচনা করলেই উপলব্ধি করা যায়। তিনি পশ্চিম ভারতে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন রাজ্য জয় করেন এবং এলা-হাবাদ পর্যন্ত তাঁর অভিযান পরিচালিত হয়। তারপর অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হওয়ার জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগে বাধ্য হলেও পূর্ববঙ্গে রাজ্য সুসংহত করেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় পূর্ববঙ্গে সেন শাসন অক্ষুণ্ণ থাকে।

লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর সেন রাজত্ব আরও দুর্বল ও সঙ্কুচিত হয়। লক্ষ্মণ সেনের পর তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন পর পর সিংহাসনে বসেন। তাঁদের সঙ্গে মুস্লিম আক্রমণ-কারীদের যুদ্ধ হয়, তবে সে যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে ১২৬০ খ্রী পর্যন্ত সেন শাসনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সেন শাসন স্বল্পস্থায়ী হলেও বঙ্গ-দেশের রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার অবদান সামান্য নয়। সেন শাসনকালে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে ও সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি হয়। 'গীতগোবিন্দ' রচয়িতা

জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। সেন শাসনের ফলে বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি আরও সুস্পষ্ট ও সুসংহত হয়।

সেলিউকস : গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হলে (৩২৩ খ্রী-পূ) তাঁর মধ্য এশিয়ায় ও ভারতে অধিকৃত রাজ্যগুলি গ্রীক সেনাপতিরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। সেই অনুসারে সেলিউকস হন সিরিয়া ও ভারতে গ্রীক-অধিকৃত অঞ্চলগুলির শাসক। তারপর মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলিউকসের তীব্র যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে পরাজিত সেলিউকস কাবুল, কান্দাহার, মকরান ও হিরাট প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তারপর সেলিউকসের কন্যার সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ হলে প্রতিবেশী গ্রীক রাজ্যের সঙ্গে মৌর্য সম্রাটের মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেলিউকস মেগাস্থিনিসকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় দূতরূপে পাঠান।

সৈয়দ আহমদ খান, স্যার (১৮১৭-৯৮) : বরাবরই ইংরেজ অনুগত ও জাতীয় আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন ; সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের নানাভাবে সাহায্য করেন। একদা ভারতের হিন্দু ও মুস্লিম সম্প্রদায়কে ভারত মাতার 'দুই চক্ষু' বলে বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের সময় মত পরিবর্তন করেন ও ভারতীয় মুস্লিমদের অধিকার ও স্বাতন্ত্র্যের কথা প্রচার করতে থাকেন। ১৮৮৫ খ্রী আলিগড়ে মহামেডান এংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন, পরে ঐ কলেজই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ঐ সময় আলিগড়কে কেন্দ্র করে তিনি সারা ভারতে জাতীয় আন্দোলন-বিরোধী ও ইংরেজ অনুগত এক মুস্লিম আন্দোলন গড়ে তোলেন। ঐ আন্দোলন "আলিগড় আন্দোলন" নামে অভিহিত। ভারতীয় মুস্লিমদের স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্যের কথা স্যার সৈয়দ আহম্মদ প্রথম প্রচার করেন বলে তাঁকে পাকিস্তানের প্রথম পরিকল্পনাকার বলা হয়। ভারতীয় মুস্লিমদের জাগরণে ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় স্যার সৈয়দ আহমদের অবদান সর্বাধিক।

সৈয়দ বংশ : তৈমুরলঙ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আগে তাঁর অধিকৃত অঞ্চলগুলির শাসনদায়িত্ব খিজর খাঁর উপর ন্যস্ত করে যান। খিজর খাঁ তোগলক বংশের শেষ সুলতান দৌলত খাঁকে ১৪১৪ খ্রী পরাজিত করে দিল্লীর মসনদ অধিকার করেন। ফলে তোগলক বংশের সুলতানির অবসান ও সৈয়দ বংশের সুলতানির সূচনা হয়। তবে খিজর খাঁ নিজেকে তৈমুরের প্রতিনিধি মনে করতেন বলে সুলতান পদবি গ্রহণ করেননি। খিজর খাঁর পুত্র মুবারক শাহ প্রথম নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করেন। সৈয়দ বংশের মোট চারজন সুলতান হন এবং তাঁদের শাসনকাল ১৪১৪-১৪৫১ খ্রী।

প্রথম সুলতান খিজর খাঁর শাসনকাল ১৪১৪-২১ খ্রী। তাঁর পুত্র মোবারক শাহ সুলতান ছিলেন ১৪২১ থেকে ১৪৩৩ খ্রী ; সৈয়দ বংশের

তৃতীয় সুলতান মহম্মদ শাহর শাসনকাল ১৪৩৪-৪৫ খ্রী এবং সর্বশেষ সুলতান মহম্মদ শাহর পুত্র আলাউদ্দিন আহম্মদ শাহর শাসনকাল ১৪৪৫-৫১ খ্রী। সৈয়দ বংশের সব সুলতানই দুর্বল ছিলেন এবং রাজ্যের সর্বত্র যে বিরোধ দেখা দেয় তা দমনের ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। অবশেষে লাহোর ও সরহিন্দের শাসক বহলুল লোদি বিদ্রোহী হয়ে ১৪৫১ খ্রী দিল্লীর মসনদ দখল করেন। ফলে সৈয়দ বংশীয় সুলতানির অবসান ও লোদি বংশীয় সুলতানির সূচনা হয়। সৈয়দ বংশীয় সুলতানরা নিজেদের পয়গম্বর মহম্মদের জামাতা আলির বংশধর বলে দাবি করতেন এবং সেই কারণেই তাঁদের সৈয়দ উপাধি ছিল।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়: মোগল শাসনের শেষের দিকে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় দিল্লীর রাজদরবারে অত্যধিক প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন। তাঁদের নাম হুসেন আলি ও আবদুল্লা। দুজনেরই ভারতে জন্ম এবং সাহস, রণকুশলতা ও প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য তাঁরা মোগল বাদশাহদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত মুস্লিম ছিলেন, সেকারণে সুন্নি প্রভাবিত মোগল রাজদরবারে তাঁদের প্রতিষ্ঠা লাভের কথা নয়। কিন্তু কূটনৈতিক দক্ষতায় তাঁরা দুর্বল মোগল বাদশাহদের করায়ত্ত করেন। মোগল বাদশাহ ফারুকশিয়ারের শাসনকালে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাব সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। ফারুকশিয়ার সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাব খর্ব করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন, কিন্তু ফারুকশিয়ারকেই শেষ পর্যন্ত মসনদ থেকে অপসৃত ও নিহত হতে হয়। তারপর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের ব্যবস্থানুসারে, ১৭১৯ খ্রী অতি অল্প সময়ের জন্য রফি-উদ-দরজেত ও রফি-উদ-দৌলা মোগল মসনদে বসেন। তারপর মহম্মদ শাহ মোগল বাদশাহ হন (১৭১৯-৪৮)। তিনি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের ব্যবস্থায় মোগল মসনদ লাভ করেন। কিন্তু মসনদে বসার পরেই মহম্মদ শাহ সৈয়দ ভ্রাতাদের উৎখাতে তৎপর হন। সেই প্রচেষ্টার ফলে ১৭২২ খ্রী সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় নিহত হন।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ধর্মের ব্যাপারে সহনশীল ছিলেন। তাঁদের চেষ্টাতেই জিজিয়া করের অবসান হয় এবং রাজপুতদের সঙ্গে মোগলদের মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হিন্দু মুস্লিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন। সৈয়দ ভ্রাতাদের মৃত্যুতে জাতীয় সংহতির উদ্যোগ অঙ্কুরেই বিনাশ পায় এবং সেই অনৈক্যের সুযোগে বহিরাক্রমণ শুরু হয়।

সোথি সভ্যতা: প্রাক-হরপ্পা যুগের সিন্ধু সভ্যতা। রাজস্থানের দৃষদ্বতী উপত্যকায় সিন্ধু প্রদেশের কোটডিজি নামক স্থানে এই সভ্যতার জীর্ণোদ্ধার হয়। এই সভ্যতার মৃৎপাত্রের গঠন, চিত্রকলা ও স্থাপত্য হরপ্পা যুগের সভ্যতা থেকে নানাভাবে স্বতন্ত্র। হরপ্পা সভ্যতা সোথি সভ্যতা অনুপ্রাণিত বলে পণ্ডিতদের অনুমান।

সোমনাথের মন্দির: কাথিয়াওয়াড় সমুদ্রতীরে অবস্থিত শিবমন্দির।

ভের তলা উঁচু ঐ মন্দিরটির ছাদ ৫৬টি কাষ্ঠস্তম্ভের উপর স্থাপিত ছিল এবং প্রতিটি স্তম্ভ ছিল স্বর্ণমণ্ডিত ও মূল্যবান পাথর খচিত। পিরামিডের মতো ত্রিকোণ ছাদটির চারিদিকে ছিল ১৪টি সোনার গম্বুজ। মন্দিরের শিবলিঙ্গটির বেড় ছিল ৪´-৬´´। মন্দিরের অভ্যন্তরের ঘণ্টাটির স্বর্ণ-শৃঙ্খলের ওজন ছিল ২০০ মণ। সুলতান মামুদ ১২২৬ খ্রী সোমনাথের মন্দির লুঠ করে কোটি কোটি টাকার সোনা ও দামী পাথর নিয়ে গজনি প্রত্যাবর্তন করেন। ভগ্ন শিবলিঙ্গের কয়েকটি টুকরাও নিয়ে যান, যেগুলি গজনির জামি মসজিদের সিঁড়িতে খচিত করা হয়।

সোস্যালিস্ট পার্টি : জওহরলাল নেহরুর সমাজবাদী চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত একদল প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী ১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটি সমাজবাদী জোট গঠন করেন। তখন ঐদল 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি,' সংক্ষেপে 'সি এস পি' নামে পরিচিত ছিল। দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন আচার্য নরেন্দ্র দেও, ইউসুফ মেহের আলি, জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। সুভাষচন্দ্র বসু যখন কংগ্রেসের গান্ধীনেতৃত্বের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেস সভাপতি পদ প্রার্থী হন তখন সি এস পি সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করে। কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসে পন্থ প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রকৃত শক্তি পরীক্ষার সময় সি এস পি সুভাষচন্দ্রের পক্ষে থাকে না।

আগস্ট আন্দোলনে সি এস পি নেতৃবৃন্দের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। শুরুতেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলে জয়প্রকাশ, অচ্যুত পট্টবর্ধন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সে আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব নেন ও নানাভাবে দেশের বিপ্লবী শক্তিকে অনুপ্রাণিত করেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি কংগ্রেস ত্যাগ করে। তখন দলের নাম হয় সোস্যালিস্ট পার্টি।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সন্তান, জন্ম ১৯০১ সালে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। প্রথম জীবনের রাজনৈতিক চিন্তায় গান্ধীজীর প্রভাব ছিল, পরে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হন। ১৯২৭ সালে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়ার যে প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটি হয় তার তিনি সদস্য ছিলেন। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন এস এ ডাঙ্গে, মুজফ্ফর আমেদ, সৌকত ওসমানি, ঘাটে প্রভৃতি। ১৯২৮ সালে হন ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টস পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি। ঐ বছরেই তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে যান। ইউরোপে সাত বছর থাকাকালে তিনি জার্মানিতে হিটলারের শাসনকালে একবার কয়েকদিনের জন্য গ্রেফতার হন। ইউরোপে অবস্থানকালে স্তালিন অনুসৃত চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ঘটে। তিনি স্তালিনের চিন্তাধারাকে 'স্তালিনিজ্‌ম' নামে চিহ্নিত করেন যা তাঁর মতে ছিল

প্রকৃত কমিউনিজম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ। সোভিয়েত ইউনিয়নে একনায়কতন্ত্র কায়েমের জন্য স্তালিন লেনিনের সহকর্মীদের ও অগণিত বিপ্লবীকে হত্যা করে সে দেশে ভয়ের রাজত্ব কায়েম করেছেন—বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনে সৌম্যেন্দ্রনাথই প্রথম এই অভিযোগ আনেন।

স্তালিনবাদ কমিউনিজম নয় এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বুর্জোয়াদের দল—সুতরাং প্রকৃত কমিউনিস্টদের লেনিনের আদর্শে, কংগ্রেসের বাইরে প্রতিদ্বন্দ্বী বিপ্লবী নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে।—মুখ্যত এই দুই চিন্তাধারার ভিত্তিতে ১৯৩৪ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কমিউনিস্ট লীগ নামে দল গঠন করেন যা ১৯৪২ সালে রেভোলিউশনারি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া নামে পরিচিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত থাকার জন্য তিনি দীর্ঘদিন বন্দী ছিলেন। রাজনীতির বাইরেও দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর বাগ্মীতাও ছিল সুখ্যাত। ১৯৭৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন: ভারতের রাজনৈতিক স্বাধিকারের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ইংরেজ। কংগ্রেস গঠনে বিশেষ উৎসাহ দেখান এবং কংগ্রেসের বোম্বাই (১৮৮৯) ও এলাহাবাদ (১৯১০) অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ইংলণ্ডেও ভারতের রাজনৈতিক স্বাধিকারের পক্ষে প্রচার কার্য চালান।

স্কন্দগুপ্ত: গুপ্ত বংশীয় সম্রাট, প্রথম কুমার গুপ্তের পুত্র ও উত্তরাধিকারী স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকাল ৪৫৫-৬৭ খ্রী। তিনি গুপ্ত বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য সম্রাট। তিনি পুষ্যমিত্র উপজাতির আক্রমণ থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে নিরাপদ করেন। তাঁর রাজত্বকালে ভারতে হুন আক্রমণ শুরু হয়। সে আক্রমণও স্কন্দগুপ্ত প্রতিহত করেন। স্কন্দগুপ্ত বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন।

স্বত্ববিলোপ নীতি: লর্ড ডালহৌসি দেশীয় নৃপতিদের মাধ্যমে রাজ্যশাসন অপেক্ষা ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসন ভারতবাসীর পক্ষে অধিক মঙ্গলকর মনে করতেন। এজন্য তিনি **স্বত্ববিলোপ নীতি** (Doctrine of Lapse) নামে এক নীতির প্রবর্তন করেন। ঐ নীতি অনুসারে দেশীয় নৃপতিদের বৃটিশ সরকারের অনুমতি ছাড়া দত্তক পুত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়, এবং অপুত্রক অবস্থায় দেশীয় নৃপতিদের রাজ্য সরাসরি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। স্বত্ববিলোপ নীতির ফলে সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্যগুলি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারপর পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁর আট লক্ষ টাকা পেন্সন থেকে দত্তক পুত্র নানা সাহেবকে বঞ্চিত করা হয়।

লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম মুখ্য কারণ।

স্বদেশ বান্ধব সমিতি: বরিশালের জননেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী) উদ্যোগে গঠিত রাজনৈতিক সংগঠন। ঐ সমিতির উদ্যোগে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে বরিশাল শহরে এক প্রাদেশিক সম্মেলন আহূত হয়। সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন আবদুল রসুল। রাসবিহারী ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, পুলিনবিহারী দাস, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, সুবোধকুমার মল্লিক প্রমুখ তৎকালীন বাংলার বিশিষ্ট নেতারা ঐ সম্মেলনে যোগ দেন। কিন্তু ইংরেজ সরকারের গোর্খা রাইফেলস বাহিনীর আক্রমণে ঐ সম্মেলন ছত্রভঙ্গ হয়। উল্লেখিত নেতৃবৃন্দের সকলেই গ্রেপ্তার হন। বঙ্গদেশের গণআন্দোলনের উপর ইংরেজ সরকারের সেই প্রথম পুলিশি নির্যাতন। ঐ ঘটনার পর এদেশের চরমপন্থী আন্দোলন গুপ্ত সন্ত্রাসবাদের পথ ধরে।

স্বরাজ্য দল: ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গয়ায় কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি ১৯১৯ সালের মন্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার অনুসারে গঠিত আইন সভাগুলিতে প্রবেশ করে সরকারি নীতির বিরোধিতা করার প্রস্তাব আনেন। তিনি বলেন, ভিতর থেকে বাধা দিয়ে মন্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারের অসারতা প্রমাণ করতে হবে। গান্ধীজী তখনও কারারুদ্ধ ছিলেন। সে কারণে গান্ধীজীর অনুগামীরা চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং আইন সভায় প্রবেশের প্রস্তাব কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করে না। চিত্তরঞ্জন তখন নিজ প্রস্তাবের অনুকূলে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই স্বরাজ্য দল গঠন করেন। সে সময় দেশবন্ধুর নীতির প্রধান সমর্থক ছিলেন মতিলাল নেহরু। তাছাড়া বিঠলভাই প্যাটেল, ভুলাভাই দেশাই, টি প্রকাশম, সত্যমূর্তি প্রমুখ নেতারাও দেশবন্ধুর পক্ষাবলম্বন করেন। জওহরলাল নেহরু নিরপেক্ষ ছিলেন। স্বরাজ্য দলের মুখপত্র হয় দৈনিক ফরোয়ার্ড পত্রিকা।

অনতিবিলম্বে দেশবন্ধুর প্রচেষ্টা সফল হয়। ১৯২৩ খ্রী দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে আইন সভায় প্রবেশের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ বছরের নির্বাচনে স্বরাজ্য দল আশাতীত সাফল্য লাভ করে। বঙ্গদেশ ও মধ্যপ্রদেশে স্বরাজ্য দলের বিরোধিতায় সরকারের শাসনকার্য পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯২৪ খ্রী ১৮ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় আইন সভায় বিরোধী দলনেতা মতিলাল নেহরু নতুন সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গোল টেবিল বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়ে যে প্রস্তাব আনেন তা সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হয়। কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে স্বরাজ্য দলের বিরোধিতায় মন্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারের অসারতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হওয়ায় বৃটিশ সরকার ভারতের জন্য নতুন সংবিধানের ক্ষেত্রপ্রস্তুতির উদ্দেশ্যে ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

বাংলার হিন্দু-মুস্লিম ঐক্যের জন্য

স্বরাজ্য দল মুস্লিম নেতাদের সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের অধিকার সম্পর্কিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ঐ চুক্তি বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩ খ্রী ১৭ ডিসেম্বর) নামে অভিহিত।

স্বরাজ্য দলের জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রমাণ, স্বরাজ্য দলের প্রার্থী তৎকালীন রাজনীতিতে প্রায় অজ্ঞাত তরুণ চিকিৎসক ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পরাজয়। সুরেন্দ্রনাথ ১৯১৯ খ্রী শাসন সংস্কারকে (মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার) স্বাগত জানান ও ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশের মন্ত্রি-সভায় স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরূপে যোগ দেন। সুরেন্দ্র-নাথের সিদ্ধান্তে যে দেশবাসীর সমর্থন ছিল না তা স্বরাজ্য দলের প্রার্থীর কাছে তাঁর পরাজয়ে প্রমাণিত হয়।

স্বরাজ্য দলের বিরোধিতায় সন্ত্রস্ত বৃটিশ সরকার ১৯২৪ খ্রী বেঙ্গল অর্ডি-ন্যান্স বলে স্বরাজ্য দলের সদস্য/সুভাষ-চন্দ্র বসু, সন্তোষ মিত্র প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তার করেন। কংগ্রেস স্বরাজ্য দলের নীতি গ্রহণ করায় সরাজ্য দলের প্রয়োজন শেষ হয়।

হকিন্স, ক্যাপ্টেন উইলিয়ম: ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিরূপে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরের সঙ্গে ১৬০৮ খ্রী দেখা করেন ও সুরাটে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি পান।

হয়সাল বংশ: দ্বার সমুদ্রের হয়সাল বংশ দেখুন।

হরপ্পা: বর্তমানে পশ্চিম পাকি-স্তানের মণ্টগোমারি জেলার অন্তর্গত। এখানে একটি প্রাচীন সভ্য নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। মহেঞ্জো-দরো থেকে কয়েক শ মাইল দূরে অব-স্থিত হলেও দুটি শহরের মধ্যে জলপথে যোগাযোগ ছিল। হরপ্পার ধ্বংসা-বশেষের মধ্যে একটি বিরাট শস্য-ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যায়। তার পয়ঃপ্রণালী, প্রাসাদসারি, নগর পরি-কল্পনা মহেঞ্জোদরোর মতোই ছিল। দুটি শহরের সভ্যতা পরস্পরকে প্রভাবিত করে। মহেঞ্জোদরোর মত হরপ্পা শহরটিও রোদে পোড়ানো ইটের ভিত্তির উপর নির্মিত হয় এবং প্রাসাদ-গুলি নির্মিত হয় আগুনে পোড়ানো ইটে। হরপ্পা প্রাক-লৌহযুগের সভ্যতা। তখন সর্বাধিক প্রচলিত ধাতু ছিল কাঁসা (তামা ও রাঙের সংমিশ্রণ)।

ঐতিহাসিকদের অনুমান, হরপ্পা শহরটি আটবার নির্মিত হয়। কিন্তু সর্বশেষ শহরটিও মহেঞ্জোদরোর অনেক আগে ধ্বংস হয় বলে সেখানে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন বেশি পাওয়া যায় না। মেসোপটেমিয়ায় হরপ্পার যে সিলমোহরগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি ২৩৫০ খ্রী-পূ কালের বলে মনে হয়। সুতরাং হরপ্পা সভ্যতা যে পাঁচ হাজার বছর আগের তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হরিয়ানা: ১৯৬৬ সালের ১ নভেম্বর পাঞ্জাবের হিন্দীভাষী অঞ্চল নিয়ে হরিয়ানা রাজ্য গঠিত হয়। আয়তন ৪৪,২২২ বর্গ কিমি ও লোকসংখ্যা এক কোটির কিছু বেশি। রাজধানী চণ্ডীগড়।

হরিহর : সুলতান মহম্মদ বিন তোগলকের শাসনকালে দক্ষিণ ভারতে হরিহর নামে এক প্রভাবশালী সামন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করে ১৩৩৬ খ্রী বিজয়-নগর নামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। হরিহরের বিদ্রোহে প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁর ভাই বাক্কা রায়। যিনি হরিহরের মৃত্যুর পর বিজয় নগরের সিংহাসনে বসেন। হরিহরের রাজত্ব-কাল ১৩৩৬-১৩৪৩ খ্রী। তিনি পরাক্রম-শালী রাজা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুকালে রাজ্যের সীমা ছিল উত্তরে কৃষ্ণা, দক্ষিণে কাবেরী এবং পূর্বে ও পশ্চিমে সাগর।

হরিহরের ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী বাক্কা রায়ের মৃত্যুর পর বাক্কা রায়ের পুত্র সিংহাসনে বসেন। তাঁর নামও হরিহর, সে কারণে তিনি দ্বিতীয় হরিহর নামে পরিচিত। তাঁর শাসনকাল ১৩৭৯-১৪০৪ খ্রী। তিনি শান্তিপ্রিয় রাজা ছিলেন।

হর্যঙ্ক রাজবংশ : খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে হর্যঙ্ক বংশীয় রাজা বিম্বিসার মগধের সিংহাসনে বসেন। তাঁর সিংহাসনারোহণকাল সম্ভবত ৫৪৫ খ্রী-পূ। বিম্বিসারের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র অজাতশত্রু এবং অজাতশত্রুর পর উদয়ন। তারপর হর্যঙ্ক বংশীয় রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অমাত্য শিশুনাগ সিংহাসন অধিকার করেন।

মগধ ছিল খ্রী-পূ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য-ভাগের ষোলটি ক্ষুদ্র রাজ্যের (মহাজন-পদ) একটি। সেই ক্ষুদ্র রাজ্যকে একটি বৃহৎ রাজ্যে রূপান্তরিত করার কৃতিত্ব হর্যঙ্ক বংশীয় রাজাদের। ক্রমে মগধ যে একটি বিশাল সাম্রাজ্যের রূপ ধারণ করে তার সূচনা হর্যঙ্ক রাজাদের শাসনকালেই হয়। হর্যঙ্ক বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিম্বিসার ভগবান বুদ্ধের সম-কালীন এবং তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন কিনা তা সুনিশ্চিতভাবে না জানা গেলেও তিনি যে বুদ্ধের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন তা নানা কাহিনীতে প্রচারিত আছে। তবে অজাতশত্রুর শাসনকালে পুনরায় ব্রাহ্মণ ধর্ম প্রবল হয়।

হর্ষচরিত : বাণ রচিত 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজ্যজয় ও শাসনের বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। তৎকালীন সমাজ-জীবনের নানা তথ্যও ঐ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

হর্ষবর্ধন : পঞ্চম শতাব্দীর শেষে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর সূচনায় থানেশ্বরে যে পুষ্যভূতি রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, হর্ষবর্ধন সেই বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। তাঁর পিতা প্রভাকর বর্ধন পুষ্যভূতি বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা। প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে বসেন। কিন্তু ।বৎসরকালের মধ্যেই রাজ্যবর্ধন গৌড়রাজ শশাঙ্ক কর্তৃক নিহত হওয়ায় হর্ষবর্ধন থানেশ্বর রাজ্যের রাজা হন (৬০৬ খ্রী)।

সিংহাসনারোহণের পর হর্ষবর্ধন ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ককে দমনে তৎপর হন। কিন্তু শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনের যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে সুনিশ্চিত কিছু জানা যায় না। সম্ভবত হর্ষ সে যুদ্ধে জয়ী হতে পারেন নি। সিংহাসনারোহণের সময় হর্ষের বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর

এবং রাজ্যশাসনের কোন অভিজ্ঞতাই তাঁর ছিল না। সম্ভবত সেই কারণেই হর্ষবর্ধন সিংহাসনারোহণের পর ছয়-বছর যুবরাজ 'শিলাদিত্য' নামেই পরিচিত ছিলেন। তারপর তাঁর অভিষেক হয় ও তিনি সম্রাট হর্ষবর্ধন নামে অভিহিত হন।

হর্ষবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রীর সঙ্গে কনৌজের মৌখরি বংশীয় রাজা গ্রহ-বর্মনের বিবাহ হয়। হর্ষবর্ধনের সিংহাসনারোহণের আগেই মালবরাজ দেবগুপ্ত গ্রহবর্মনকে হত্যা করেন ও রাজ্যশ্রীকে বন্দী করে নিয়ে যান। ভগ্নীকে উদ্ধার করতে গিয়ে রাজ্য-বর্ধন নিহত হন। পরে হর্ষবর্ধন যখন গৌড়রাজ শশাঙ্কর সঙ্গে যুদ্ধরত সেই সময় তিনি সংবাদ পান যে রাজ্যশ্রী মুক্তিলাভ করে বিন্ধ্য পর্বতের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। হর্ষ সে সংবাদ পাওয়া মাত্র ভগ্নীকে উদ্ধার করতে যান। রাজ্যশ্রী যখন বিন্ধ্য পর্বতের জঙ্গলে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত, সে সময় হর্ষবর্ধন সেখানে উপস্থিত হন ও ভগ্নীকে উদ্ধার করেন। ভগ্নীকে উদ্ধারের পর ভগ্নীর ইচ্ছানুসারে হর্ষবর্ধন কনৌজের শাসন দায়িত্বও গ্রহণ করেন।

কনৌজ ও থানেশ্বর যুক্ত হওয়ার পর সম্রাট হর্ষবর্ধন রাজ্য বিস্তারে তৎপর হন এবং একে একে পূর্ব পাঞ্জাব, ওড়িশা, বিহার, বঙ্গদেশ ও গুজরাতের একাংশ তাঁর অধিকারে আসে। আসাম, নেপাল ও সিন্ধু দেশের সঙ্গে র্ষ মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন। অনতি-লম্বে হর্ষের সাম্রাজ্য পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদী থেকে পশ্চিমে পূর্বপাঞ্জাব এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। সমগ্র উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বাঙলা ও ওড়িশা ঐ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাণ-ভট্টের বর্ণনানুসারে আসাম ও সিন্ধু দেশের কিছু কিছু অংশও হর্ষের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং হর্ষবর্ধনের রাজ্যশাসনের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। হর্ষ নিজে রাজ্য শাসনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের ব্যবস্থা করতেন। প্রশাসনের সুবিধার জন্য তিনি সমগ্র রাজ্যকে দুটি প্রদেশে (ভুক্তি) বিভক্ত করেন। প্রদেশগুলি আবার জেলা (বিষয়), তহশিল (পাঠক) ও গ্রামে বিভক্ত ছিল। রাজ্যে আইন ছিল অত্যন্ত কঠোর, লঘু অপরাধেও গুরুদণ্ডের বিধান ছিল। কৃষকদের ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব দিতে হত।

হর্ষ প্রথম জীবনে শিবের উপাসক ছিলেন, পরে ভগ্নী রাজ্যশ্রী ও চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং-এর প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের পর হর্ষ রাজ্যে পশুবধ নিষিদ্ধ করেন, পশুবধের জন্য প্রাণদণ্ডের বিধান হয়। প্রজাকল্যাণই ছিল রাজা হর্ষের জীবনের একমাত্র ব্রত। চীনা পরিব্রাজক ও বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ হিউ-এন-সাং-এর সম্মানে তিনি কনৌজে এক বৌদ্ধ ধর্মসভার আয়োজন করেন। ঐ সম্মেলনে ১৮ জন নৃপতি উপস্থিত ছিলেন।

কনৌজের ধর্মসভার পর হর্ষ প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে পঞ্চবার্ষিক মেলার প্রবর্তন করেন। ঐ মেলায় হিউ-এন-সাং ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের বহু রাজা যোগদান করেন। মেলায় সব ঐশ্বর্য দান করে সম্রাট হর্ষবর্ধন একটি ছিন্নবস্ত্র সম্বল করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন। হর্ষ শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নেও বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। হর্ষর রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' রচয়িতা বাণভট্ট। হর্ষ নিজেও 'প্রিয়দর্শিকা' 'রত্নাবলী' ও 'নাগনন্দ' নামে তিনটি নাটক রচনা করেন। ৬৪৬ অথবা '৪৭ খ্রী সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। তাঁর কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পরেই থানেশ্বর রাজ্য আত্মকলহে ও গৃহযুদ্ধে ছিন্নভিন্ন হয়। হর্ষবর্ধনই হিন্দু যুগে ভারতের শেষ উল্লেখযোগ্য সম্রাট।

হাজি ইলিয়াস শাহ: দিল্লীর সুলতান মহম্মদ বিন তোগলকের রাজত্বের শেষের দিকে, ১৩৪৫ খ্রী হাজি ইলিয়াস শাহ সমগ্র বঙ্গদেশকে নিজ অধিকারে আনেন এবং 'সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ' নাম নিয়ে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন শুরু করেন। তাঁর শাসনকাল ১৩৪৫-৫৪ খ্রী। ইলিয়াস শাহ সুশাসক ও শিল্প সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। ফিরোজ শাহ তোগলক তাঁকে দমন করে বাঙলাকে আবার দিল্লীর শাসনাধীনে আনার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়। ইলিয়াস শাহ শুধু বাংলাদেশেই স্বশাসন কায়েম করে বিরত হননি, তিনি ওড়িশা ও তিরহুত থেকেও রাজস্ব আদায় করতেন।

হাবসি শাসন, বাংলায়: বঙ্গদেশের সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ শাহকে হত্যা করে সিদি বদর নামে এক হাবসি ক্রীতদাস সর্দার মসনদ অধিকার করেন (১৪৮৬)। তাঁর শাসনকালে বঙ্গদেশে হাবসিদের অত্যাচার চরমে ওঠে। সিদি বদরের ঐ অত্যাচারী শাসনের অবসানকল্পে তাঁর মন্ত্রী আলাউদ্দিন হুসেন শাহর নেতৃত্বে রাজকর্মচারী ও আমিররা বিদ্রোহী হন। বিদ্রোহীদের অবরোধে সিদি বদরের মৃত্যু হলে (১৪৯৩) রাজ্যের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনুরোধে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ বাঙলার সুলতান হন। সেই সঙ্গে হাবসি শাসনের অবসান হয় ও হুসেন শাহ বঙ্গদেশ থেকে হাবসিদের বিতাড়িত করেন।

হামিদা বেগম: মোগল সম্রাট হুমায়ুনের মহিষী ও আকবরের জননী। ১৫৪০ খ্রী কনৌজের যুদ্ধে শের শাহের কাছে পরাজিত হওয়ার পর রাজ্যচ্যুত হুমায়ুন সিন্ধু প্রদেশে অবস্থানকালে, ১৫৪১ খ্রী হামিদা বেগমকে বিবাহ করেন। তারপর অমরকোট নামক স্থানে ১৫৪২ খ্রী, ১৫ অক্টোবর হামিদা বেগমের পুত্র আকবরের জন্ম হয়। এক পারসিক পণ্ডিতের কন্যা হামিদা বানু ধর্মের ব্যাপারে উদার চিন্তাধারা সম্পন্না ছিলেন এবং আকবরের শৈশব শিক্ষা মাতার চিন্তাধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

হায়দর আলি (১৭২২-৮২) : প্রথম জীবনে হায়দর আলি মহীশূর রাজ্যের একজন সামান্য সৈনিক ছিলেন। কিন্তু অবিলম্বে মহীশূরের হিন্দু রাজার প্রধান মন্ত্রী নঞ্জরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হায়দরের কর্মকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে নঞ্জরাজ তাঁকে প্রথমে মহীশূর রাজ্যের দিন্দিগুল প্রদেশের ফৌজদার নিযুক্ত করেন (১৭৫৫)। ঐ পদে বহাল থাকাকালে হায়দর শক্তি সংগ্রহ করতে থাকেন এবং পরিশেষে মহীশূরের রাজাকে উৎখাত করে নিজেকে মহীশূরের সুলতান বলে ঘোষণা করেন (১৭৬১)। শাসনক্ষমতা দখলের পর হায়দর একে একে বেদনুর, সুন্দা, সিরা প্রভৃতি স্থান দখল করে মহীশূর রাজ্যের সীমানা প্রসারিত করেন।

হায়দরের ক্ষমতালাভ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি নিজাম, মারাঠা বা ইংরেজ কারও কাম্য ছিল না। তাই অনতিবিলম্বে প্রতিবেশী শক্তিগুলির সঙ্গে হায়দরের সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৭৬৫ খ্রী মারাঠারা হায়দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং গুটি ও সাবনুর নামক স্থান দুটি ছিনিয়ে নেয়। পরের বছর ইংরেজ, মারাঠা ও নিজাম হায়দরের বিরুদ্ধে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। শক্তি দিয়ে ঐ ত্রিশক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব নয় এটা উপলব্ধি করে হায়দর অর্থ দিয়ে মারাঠাদের স্বপক্ষে টেনে আনেন। এরপর নিজামও সাময়িক ভাবে হায়দরের পক্ষে যোগ দেন, কিন্তু ইংরেজদের প্ররোচনায় আবার হায়দরের বিরুদ্ধে চলে যান। পরে ইংরেজ, নিজাম ও কর্ণাটকের নবাব একজোট হয়ে হায়দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এইভাবে প্রথম মহীশূর (ইঙ্গ) যুদ্ধ শুরু হয় (১৭৬৭)। হায়দর একক শক্তিতে ঐ মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং বোম্বাইস্থ ইংরেজ সরকারকে পরাস্ত করে মাঙ্গালোর জয় করেন। তারপর হায়দর বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মাদ্রাজ অভিমুখে অগ্রসর হন, তখন ইংরেজের সন্ধি করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। ১৭৬৯ খ্রী হায়দর আলির সঙ্গে ইংরেজ সরকারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ঐ চুক্তিতে শর্ত থাকে যে ভবিষ্যতে চুক্তিকারী কোন পক্ষ তৃতীয় কোন শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলে অপর পক্ষ তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। কিন্তু ১৭৭১ খ্রী মারাঠারা হায়দরের রাজ্য আক্রমণ করলে ইংরেজরা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে। ইংরেজদের ঐ বিশ্বাসঘাতকতায় হায়দর ক্ষুব্ধ হন ও ইংরেজদের আঘাত হানার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। ১৭৭৯ খ্রী নিজাম ও মারাঠারা ঐক্যবদ্ধ হলে হায়দর সেই ইংরেজ-বিরোধী ঐক্যে যোগ দেন। এর অল্পকাল পরে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসি বাণিজ্যকেন্দ্র মাহে দখল করলে হায়দরের সঙ্গে ইংরেজদের আবার যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধ দ্বিতীয় মহীশূর (ইঙ্গ) যুদ্ধ (১৭৮০ ৮৪)। হায়দর প্রথমদিকে অনেকগুলি যুদ্ধে জয়ী হন। কিন্তু যুদ্ধের নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই ১৭৮২ খ্রী হায়দরের মৃত্যু হয়।

হায়দর আলি যেভাবে মহীশূরের সিংহাসন দখল করেন নীতির দিক থেকে তা অসমর্থনীয়। কিন্তু পরবর্তী-

কালে তিনি যে শাসন দক্ষতা, শৌর্য ও দেশাত্মবোধের পরিচয় দেন তাতে তাঁর রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়। নিজাম ও মারাঠারা যখন ইংরেজের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ সে সময় এক মাত্র হায়দর আলিই ইংরেজদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করার কথা চিন্তা করেন ও বারবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পর্যুদস্ত করেন। সেদিন যদি হায়দরের সঙ্গে নিজাম ও মারাঠারা হাত মেলাতেন তবে হয়ত ভারতের পরবর্তীকালের ইতিহাস অন্য রকম হত। হায়দর নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু প্রখর বুদ্ধি ও অসাধারণ স্মৃতি-শক্তির জোরে তিনি ইতিহাস খ্যাত যে কোন দক্ষ শাসকের মতোই যোগ্যতা সহকারে রাজ্য শাসন করতেন। এদিক থেকে হায়দর আলি শিবজি, রণজিৎ সিং, আকবরের সঙ্গে তুলনীয়। হায়দরের চরিত্র বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক-গণ একমত নন। ঐতিহাসিক স্মিথ তাঁকে নীতিজ্ঞানহীন অত্যাচারী শাসক বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উইল-ক্সের মতে হায়দর ছিলেন ধর্মপ্রাণ, পরমতসহিষ্ণু, সাহসী ও প্রকৃতি দেশ-সেবী শাসক।

হায়দরাবাদ: আসফ জাহ নিজাম-উল-মুলক্ মোগল সম্রাট ঔরংজেব কর্তৃক দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হন। কিন্তু ঔরংজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দিলে তিনি কার্যত স্বাধীন নৃপতিরূপে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। মুহম্মদ শাহ মোগল সিংহাসনে অধিষ্ঠানকালে ১৭২২ খ্রী নিজাম-উল-মুলক্‌কে তাঁর প্রধান মন্ত্রী (ওয়াজির) নিযুক্ত করেন। কিন্তু দিল্লীর রাজনৈতিক পরিবেশ তাঁর ভাল না লাগায় তিনি অনতিবিলম্বে দাক্ষিণাত্যে ফিরে আসেন এবং মোগল সম্রাটের প্রতি নামেমাত্র অনুগত থেকে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন শুরু করেন। তাঁর রাজ্যের নাম হয় হায়দরাবাদ এবং রাজ্য-প্রধানরূপে তিনি নিজাম নামে আখ্যায়িত হন। ১৭৪৮ খ্রী নিজাম-উল-মুলক্-এর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র নাসির জং নিজাম হন, এবং তখনই হায়দরাবাদ রাজ্যে গোল-যোগের সূচনা হয়। পরলোকগত নিজামের পৌত্র মুজাফ্‌ফর জং সিংহা-সনের দাবি জানিয়ে বলেন যে, দিল্লীর বাদশাহ তাঁকেই দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করেছেন।

ডুপ্লেক্স তখন দাক্ষিণাত্যে ফরাসি প্রভাব বিস্তারের সুযোগ খুঁজছিলেন। তিনি নিজামরাজ্যে বিরোধের সুযোগ নিতে মুজাফ্‌ফর জংকে সমর্থন জানালেন এবং ফরাসী সামরিক শক্তির জোরে নাসির জংকে হত্যা করে মুজাফ্‌ফর জং দাক্ষিণাত্যের সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত হলেন। সাহায্যের পুরস্কার হিসাবে ফরাসিরা পণ্ডিচেরি, মসুলিপত্তম প্রভৃতি স্থানের অধিকার লাভ করে এবং ডুপ্লেক্স স্বয়ং কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণতীরবর্তী মোগল সাম্রাজ্যের শাসক নিযুক্ত হন।

স্বভাবতই দাক্ষিণাত্যে ফরাসিদের এই প্রভাব বিস্তারকে ইংরেজরা ভাল চোখে দেখে না এবং তার ফলে ইংরেজ-ফরাসি বিরোধ ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়।

ঐসব যুদ্ধে (কর্ণাটক যুদ্ধ-দ্র) ডুপ্লেক্স স্বদেশের যথেষ্ট সহায়তা না পাওয়ায় দাক্ষিণাত্যে ফরাসি প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। ফলে প্রতিবেশী শক্তিশালী রাজ্য মহারাষ্ট্র ও মহীশূরের আশঙ্কিত আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিজাম ইংরেজদের শরণ নেন। প্রথমে লর্ড কর্নওয়ালিসের সঙ্গে নিজামের প্রতিরক্ষা চুক্তি হয়। ১৭৯০খ্রী তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে নিজাম ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করেন। এর-পর ১৭৯৮ খ্রী ১ সেপ্টেম্বর বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি নিজামকে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করলে হায়দরাবাদ একটি করদ রাজ্যে পরিণত হয়।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর হায়-দরাবাদ রাজ্যের জনগণের ইচ্ছা উপেক্ষা করে নিজাম ভারতে যোগ দিতে না চাইলে ১৯৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ভারতের সৈন্যবাহিনী হায়দরাবাদে প্রবেশ করে এবং ১৮ সেপ্টেম্বর এক চুক্তিবলে হায়দরাবাদ ভারতের অংশে পরিণত হয়। তারপর ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ভাষার ভিত্তিতে হায়দরাবাদকে ত্রিখণ্ডিত করে মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও অন্ধ্রপ্রদেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। রাজ্য হিসাবে হায়দরা-বাদের কোন অস্তিত্ব থাকে না। আর হায়দরাবাদ শহরটি হয় অন্ধ্র-প্রদেশের রাজধানী।

হার্ডিঞ্জ, লর্ড : লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ খ্রী ভারতের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন এবং ১৮৪৮ খ্রী পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। তাঁর শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রথম শিখ (ইঙ্গ) যুদ্ধ। রানীমাতা ঝিন্দনবাঈর প্ররো-চনায় শিখ সৈন্যরা শতদ্রু নদী অতিক্রম করে পূর্বপারে অগ্রসর হলে অমৃত-সরের সন্ধি লঙ্ঘিত হয় এবং ইংরেজদের সঙ্গে শিখদের যুদ্ধ অনিবার্য হয়। (শিখ যুদ্ধ-দ্র)।

সমাজ সংস্কারে লর্ড হার্ডিঞ্জ বিশেষ উৎসাহ দেখান। সতীদাহ তখন আইনত নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। লর্ড হার্ডিঞ্জ কঠোর হাতে ঐ কুপ্রথা দমন করেন। শিশু-হত্যা, নরবলি প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রথাগুলির অবসানেও তিনি বিশেষ সচেষ্ট হন। লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে ভারতে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়।

হার্ডিঞ্জ, লর্ড : লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১০-১৫ সালে ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন। তাঁর শাসন কালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী ভারত দর্শনে আসেন ও সেই উপলক্ষে দিল্লীতে দরবার হয় (১৯১১)। ঐ দরবার থেকে বঙ্গভঙ্গ রদ ও কলকাতা থেকে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরের কথা ঘোষণা করা হয়।

হাসান ইমাম, সৈয়দ (১৮৭১-১৯৩৩) : ব্যারিস্টার, সাংবাদিক ও জাতীয়তাবাদী নেতা। লণ্ডনে অধ্যয়নকালে ১৮৯১ খ্রী পার্লামেন্টের নির্বাচনে দাদাভাই নৌরজির পক্ষে প্রচারকার্য চালান। স্বদেশে প্রত্যা-বর্তনের পর প্রথমে পাটনা হাইকোর্টে পরে কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন

এবং প্রচুর যশ ও অর্থ উপার্জন করেন। ১৯১৯ খ্রী কলকাতা হাই-কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন, পরে পদত্যাগ করে পাটনা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি পাটনার 'সার্চলাইট' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৮ খ্রী বোম্বাইয়ে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভা-পতিত্ব করেন।

হিউ-এন-সাং: বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ বিশিষ্ট চীনা পরিব্রাজক। ২৯ বছর বয়সে ৬২৯ খ্রী দেশত্যাগ করেন এবং তাসখন্দ, সমরখন্দ ঘুরে ৬৩০ খ্রী গান্ধার দিয়ে সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজ্যে প্রবেশ করেন। ১৩ বছর এদেশে অবস্থানের পর হিউ এন সাং ৬৪৩ খ্রী কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান হয়ে চীনে প্রত্যা-বর্তন করেন। ভারতে অবস্থানকালে তিনি এই উপমহাদেশের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য স্থান পরিদর্শন করেন এবং তাঁর ভ্রমণ-লিপিতে সব অভিজ্ঞ-তার কথা লিখে রাখেন। সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজ্যে তিনি আট বছর (৬৩৫-৪৩) ছিলেন এবং তাঁর ধর্ম, দর্শন ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে সম্রাটকে প্রভা-বিত করেন। হিউ-এন সাং-এর সম্মানে হর্ষবর্ধন কনৌজে এক বিশাল সমা-বেশের আয়োজন করেন এবং বহু রাজা, সামন্ত ও অভিজাত ব্যক্তি ঐ সমাবেশে যোগ দেন। শিবের উপাসক হর্ষ সেই সভায় প্রকাশ্যে ভগবান বুদ্ধের আরাধনা করেন এবং হিউ-এন-সাং সে সভায় বৌদ্ধ ধর্মের মহাযানী মত বিশ্লেষণ করেন। সম্রাট হর্ষবর্ধন প্রয়াগে যে পঞ্চবর্ষান্ত দানোৎ-সবের প্রবর্তন করেন তার ষষ্ঠ উৎসবে হিউ-এন-সাং উপস্থিত ছিলেন। হিউ-এন-সাং এর বিবরণীতে জানা যায় যে, সে উৎসবে ভগবান বুদ্ধ প্রধান উপাস্য হলেও সূর্যদেব, শিব প্রমুখ দেবতারও পূজা হত এবং বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, জৈন প্রভৃতি সকল ধর্মাবলম্বী সাধুসন্তরা সেখানে দান গ্রহণ করতেন।

হিউ-এন-সাং নালন্দা বিশ্ববিদ্যা-লয়েই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। তাঁর বিবরণীতেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়। ভারতের প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ তক্ষশিলাতেও তিনি দুবার যান। দক্ষিণ ভারতে দ্বিতীয় পুল-কেশীর রাজ্যশাসন ব্যবস্থাও হিউ-এন-সাং কর্তৃক প্রশংসিত হয়। হিউ-এন-সাংএর বিবরণী সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমকালীন ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য দলিল। ঐতিহাসিক স্মিথ বলেছেন, হিউ-এন-সাং-এর কাছে ভারত ইতি-হাসের ঋণ সম্পর্কে কোন বর্ণনাই অতিরঞ্জিত হবে না।

হিউম, এলান অক্টেভিয়ান (১৮২৯-১৯১২): ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম পরিকল্পনাকার ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রূপে স্বীকৃত। ১৮৪৩ খ্রী ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে কাজে নিযুক্ত থাকার পর ১৮৭০ খ্রী ভারত সরকারের সেক্রেটারিপদে নিযুক্ত হন। তাঁর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপলব্ধি করেন যে স্বায়ত্ত শাসন ছাড়া ভারতের কল্যাণ হওয়া সম্ভব নয়। একারণে ১৮৮২ খ্রী

কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ভারতে স্বায়ত্ত শাসন কায়েমের অনুকূলে জনমত সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। হিউমের ঐকান্তিক উদ্যোগ ও তৎপরতার ফলে ১৮৮৫ সালে বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহূত হয়। ভারতে স্বায়ত্ত শাসনের অনুকূলে জনমত সৃষ্টির জন্য হিউম ইংলণ্ডেও প্রচারকার্য চালান। বৃটিশ সরকার ও এদেশের ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ হলেও হিউম কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন না এবং সেকারণে তাঁকে সরকারি মহলে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।

হিন্দু উপনিবেশ : ভারতে হিন্দু শাসনকালে মধ্য এশিয়ায় এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কতকগুলি ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে ওঠে। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশের মত সেগুলি ভারতের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র ছিল না। মাতৃরাষ্ট্রের সঙ্গে উপনিবেশগুলির সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় সম্পর্কের অতিরিক্ত কোন সম্পর্ক ছিল না। ভারত থেকে সেদিন অগণিত বণিক, ধর্মপ্রচারক, পণ্ডিত ও দিগ্বিজয়ী নৃপতি সে সব দেশে গিয়েছিলেন মুখ্যত ভারতের সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তারের উদ্দেশ্যে। সে কারণে ভারতের সঙ্গে উপনিবেশগুলির সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ সৌহার্দ্যমূলক ও সম-মর্যাদা-ভিত্তিক। আফগানিস্তান, তিব্বত, নেপাল, বর্মা, শ্যামদেশ, ইন্দোচীন, আধুনিক মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া এবং সিংহল দেশের ভাষায়, বিভিন্ন স্থাপত্যশিল্পে ও ধর্মে আজও যে সনাতন ভারতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা প্রকৃতপক্ষে বহু শতাব্দী পূর্বের হিন্দু উপনিবেশিকতার অবিনশ্বর কীর্তি।

সুদূর অতীতে, সিন্ধু সভ্যতার যুগেও (৩২৫০--২৭৫০ খ্রী-পূ) ভারতের সঙ্গে মিশর, ফিনিসিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পর (৩২৬ খ্রী-পূ) ঐ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেন আরও বৃদ্ধি পায়। মৌর্য যুগের ভারতের সঙ্গে গ্রীসের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। মেগাস্থিনিস, ডিয়ামেকাস প্রমুখ গ্রীক রাষ্ট্রদূতরা ভারতীয় রাজসভায় আসতে থাকেন। হেরোডটাস, আরিয়ান প্রমুখ গ্রীক ঐতিহাসিকরা ভারত সম্বন্ধে ইতিহাস রচনা করেন, এবং মিনান্দার প্রমুখ বহু গ্রীক নৃপতি হিন্দু অথবা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় হয়ে যান। সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে পাওয়া যায় যে, তিনি গ্রীসে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন, তাঁর রাজ্যের পশ্চিম প্রদেশের শাসনদায়িত্ব একজন গ্রীক রাজপ্রতিনিধির উপর ন্যস্ত করেন, এবং সাম্রাজ্যের পথঘাট, খাল-সরোবর ইত্যাদি নির্মাণে গ্রীক স্থপতিদের নিয়োগ করেন।

রোমের সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্যিক লেনদেন খ্রী-পূ যুগে শুরু হয় এবং মৌর্য যুগে তা নিয়ন্ত্রিত রূপ পায়। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির রচনায় উল্লেখিত আছে যে, সে সময় ভারতের কয়েক কোটি টাকার মসলা, সুতি ও

রেশমবস্ত্র, হাতির দাঁতের সামগ্রী, চিনি, ওষুধ ও মূল্যবান পাথর রোমের বাজারে বিক্রয় হত।

মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে স্যার অরেল স্টিনসের তত্ত্বাবধানে উৎখননের ফলে ঐ অঞ্চলের সঙ্গে খ্রী-পূ যুগের ভারতের সংযোগের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। খোটান, কাশগড়, ইয়ারখন্দ, কুচি প্রভৃতি স্থানে পাওয়া বুদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধ বিহারের ভগ্নাবশেষ প্রমাণ করে যে একদা বৌদ্ধ ধর্ম ঐসব স্থানে কত ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও সমাদৃত ছিল। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং হিউ-এন-সাং তাঁদের ভ্রমণলিপিতে মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। তিব্বত, চীন, জাপান ও দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত থেকেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়। কিন্তু ভারতীয়দের দ্বারা শাসিত উপনিবেশ গড়ে ওঠে মুখ্যত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও দক্ষিণে সিংহল দ্বীপে।

বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার যবদ্বীপে (জাভা) ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। ১৩২ খ্রী সেখানে দেববর্মণ নামে এক ভারতীয় হিন্দু রাজার শাসনের উল্লেখ পাওয়া যায়; খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর সূচনায় চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যবদ্বীপ ভ্রমণকালে সেখানে হিন্দু ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করেন। তখন যবদ্বীপের উপাস্য দেবতারা ছিলেন শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতি। অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাদের শাসনকালে যবদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল হয়। সেইসময় সেখানে বরবুদর স্তূপ নির্মিত হয়। শৈলেন্দ্র বংশীয় শাসনের অবসানের পর আবার যবদ্বীপে সঞ্জয় বংশীয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে।

সুমাত্রায় খ্রীষ্ট জন্মের পূর্বে হিন্দু-সভ্যতা প্রচারিত হয়, তবে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত শ্রীবিজয় নৃপতিদের শাসনকালে হিন্দু ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সুমাত্রায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। অষ্টম শতাব্দীতে সুমাত্রা শৈলেন্দ্র বংশীয় নৃপতিদের শাসনাধীনে এলে সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার শুরু হয়। বলিদ্বীপে হিন্দু শাসনের প্রভাব আজও প্রায় অপরিবর্তিত আছে। বলিদ্বীপের অধিকাংশ মানুষ এখনও হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ইন্দোনেশিয়ার বৃহত্তম দ্বীপ বোর্ণিওয় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে হিন্দু অধিকার বিস্তৃত হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে রাজা মূলবর্মনের শাসনকালে সেখানে হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠালাভ করে।

ইন্দোচীনের কম্বোডিয়াতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হয়। সেখানে সপ্তম শতাব্দীতে কম্বুজ রাজাদের শাসনকালে হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা সর্বাধিক বিস্তার ও প্রতিষ্ঠালাভ করে। কম্বুজ রাজাদের মধ্যে দ্বিতীয় জয়বর্মন, যশোবর্মন ও সূর্যবর্মনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বাদশ শতাব্দীতে সূর্যবর্মনের শাসনকালে কম্বোডিয়ার অঙ্কোরভাটের বিষ্ণুমন্দির নির্মিত হয়; কম্বোডিয়ার সমীপবর্তী চম্পারাজ্যে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেকগুলি হিন্দু রাজবংশের শাসন

বলবৎ ছিল। ঐ রাজ্যের অধিবাসীরা শিবের উপাসক ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজ্যটি মঙ্গোলদের অধিকারে চলে যায়।

শ্যামদেশের সঙ্গে ভারতের তৃতীয় থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত নিকট সম্পর্ক ছিল। শ্যামদেশের হিন্দু রাজাদের মধ্যে ইন্দ্রাদিত্য সর্বাধিক খ্যাত। শ্যামদেশের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর আজও ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট।

ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশে সুদূর অতীতকালেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। ব্রহ্মদেশে ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচারে হরিবিক্রম, সূর্যবিক্রম, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি রাজাদের দান উল্লেখযোগ্য।

সিংহলের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক রামায়ণের কাল থেকে। সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সম্রাট অশোক তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে পাঠান। ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিজয় সিংহ (তিনি বঙ্গদেশ কি কাথিয়াওয়াড় থেকে যান তা সুনিশ্চিত জানা যায় না) সিংহল জয় করেন এবং তাঁর নামানুসারে ঐ দ্বীপের নাম হয় সিংহল। পরে চোল রাজারাও সিংহল জয় করেন।

হিন্দু মেলা: সারা ভারতের হিন্দুদের মনে জাতীয়ভাব জাগরণের উদ্দেশ্যে নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ খ্রী হিন্দু মেলার সূচনা করেন। চৈত্র সংক্রান্তির দিন ঐ মেলা বসত এবং ১৮৮০ খ্রী পর্যন্ত, মোট চোদ্দবার হিন্দু মেলার অনুষ্ঠান হয়। পরে বৃহত্তর সংগঠনের উদ্ভব হওয়ায় হিন্দু মেলার গুরুত্ব লোপ পায়। হিন্দু মেলার উদ্যোক্তাদের একটা সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এবং পাটনা, বারাণসী, লখনৌ, জয়পুর, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান থেকে বিভিন্ন শিল্প নিদর্শন ঐ মেলায় আনীত হত। এছাড়া দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, কবিতা ও ভাষণে মেলাপ্রাঙ্গণ মুখর হ'ত। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও সভায় আলোচনা হত। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় শ্রেষ্ঠ লেখকদের পুরস্কার দেওয়া হত। রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সে ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য বিশিষ্ট সন্তানদের সঙ্গে ঐ মেলায় যোগ দিতেন। ভারতবাসীর জাতীয় চেতনা উন্মেষের জন্য হিন্দু মেলার প্রবর্তন হয় ব'লে ঐ মেলা জাতীয় মেলা নামেও পরিচিত। তৎকালীন ভারতের (হিন্দুস্থান) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

হিমাচল প্রদেশ: ভারতের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত অন্যতম রাজ্য। ১৯৭১ সালের ২৫ জানুয়ারি সৃষ্ট এই রাজ্যটির আয়তন ৫৫,৬৭৩ বর্গ কি মি ও লোকসংখ্যা ৩৫ লক্ষ। রাজধানী সিমলা। পর্বতময় এই রাজ্যটির ৩৫ শতাংশ স্থান বনভূমি।

হিমু: হিমু ছিলেন একজন হিন্দু বণিক। তিনি শের শাহর পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইসলাম শাহর অনুগ্রহে দিল্লীতে রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। তারপর আদিল শাহর শাসনকালে প্রধান সেনাপতি ও মুখ্য উপদেষ্টারূপে

আদিলশাহের বহু প্রতিদ্বন্দ্বী ও সিংহাসনের দাবীদারকে উৎখাত করেন। পরিশেষে দিল্লীর মোগলশাসক তারদি-বেগ খাঁকে বিতাড়িত করে তিনি কার্যত স্বাধীন শাসকরূপে রাজ্যশাসন শুরু করেন। তবে আদিল শাহকে তিনি সিংহাসনচ্যুত করেননি। ঐতিহাসিক আবুলফজলের মতে এতে হিমুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় মেলে।

ওদিকে অভিভাবক বৈরাম খাঁর তত্ত্বাবধানে পরলোকগত মোগল সম্রাট হুমায়ুনের বালকপুত্র আকবর যখন দিল্লী উদ্ধারে অগ্রসর হন তখন পানিপথের রণক্ষেত্রে হিমুর বিশাল বাহিনীর সঙ্গে মোগল বাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। ১৫৫৬ সালের নভেম্বর মাসে সংঘটিত ঐ যুদ্ধ পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ নামে অভিহিত। যুদ্ধে মোগলের জয় হয় এবং হিমু যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ হারান।

হুন আক্রমণ, ভারতে : হুন ছিল মধ্য এশিয়ায় চীনের প্রতিবেশী এক যাযাবর জাতি। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে হুনজাতীর একটি অংশ ভারতে প্রবেশ করে। হুনরা ছিল সভ্যতা বিরোধী এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর। গ্রাম, জনপদ লুণ্ঠন, দহন ও ব্যাপক নরহত্যায় তারা ছিল অত্যন্ত তৎপর। ভারতে গুপ্তবংশীয় সম্রাট কুমারগুপ্তর শাসনকালে আনুমানিক ৪৭৮ খ্রী হুনরা ভারত আক্রমণ করে। তখন কুমারগুপ্তর পুত্র যুবরাজ স্কন্দগুপ্তর নেতৃত্বে ভারতের সৈন্যবাহিনী হুন আক্রমণ প্রতিহত করে। কয়েকবছর পরে ৪৮৪ খ্রী হুনরা আবার তোরমানের নেতৃত্বে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করে এবং পাঞ্জাব, রাজপুতানা, সিন্ধু, মালব প্রভৃতি স্থানগুলি জয় করে। হুনদের আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্যের মর্যাদা ও সীমানা দু-ই হ্রাস পায়। হুন দলপতি তোরমান 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি নিয়ে অধিকৃত স্থানগুলি শাসন করতে থাকেন। ৫১১ খ্রী তোরমানের মৃত্যু হয়।

তোরমানের মৃত্যুর পর হুনরাজ্যের রাজা হন মিহিরকুল। সাকলা, বর্তমান শিয়াল কোট, হয় মিহিরকুলের রাজ্যের রাজধানী। মিহিরকুল ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী। হিউ-এন-সাং-এর বর্ণনায় মি হি র কু ল কে বৌদ্ধ বিদ্বেষী, চৈত্য ও স্তূপ ধ্বংসকারী, লুণ্ঠনকারী ও নরহত্যাকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মিহিরকুলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ভারতবাসী শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়। মগধের রাজা বালাদিত্য ও মধ্য ভারতের রাজা যশোবর্মন ঐ ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের বিরুদ্ধে মিহিরকুল পরাজিত ও বন্দী হন। পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হলে তিনি কাশ্মীরে যান ও সেখানকার রাজার আশ্রয় লাভ করেন। কিন্তু কাশ্মীররাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তিনি কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করেন। সম্ভবত ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিহিরকুলের মৃত্যু হয়। মি হি র-কুলের মৃত্যুর সঙ্গে ভারতের হুন শাসনেরও অবসান হয়। তবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত কিছু কিছু হুন দলপতির শাসন বজায়

থাকে। ভারতে অবস্থানকারী হুনরা ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে ও ভারতীয় জনজীবনের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। একাদশ শতাব্দীতে এক কলচুরি নৃপতিকে হুন রাজকন্যা বিবাহ করতে দেখা যায়। হুনদের সঙ্গে গুর্জর প্রমুখ যে যাযাবর জাতিগুলি ভারতে প্রবেশ করে তারাও ভারতবাসীতে পরিণত হয়।

হুবিষ্ক : কণিষ্কের পর কুষাণ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। তিনি সম্ভবত শকরাজা রুদ্রদমনের কাছে পরাজিত হন ও সিন্ধু উপত্যকার নিম্নাঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব হারান। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং মথুরায় একটি সুন্দর চৈত্য নির্মাণ করান। তাঁর মুদ্রাগুলি খুব সুন্দর ছিল এবং তাতে গ্রীক, পারসিক ও ভারতীয় দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। তিনি কাশ্মীরে হুবিষ্কপুরনামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সম্ভবত ১৭ থেকে ২৫ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র বাসুদেব কুষাণ সাম্রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। বাসুদেব পিতার মত বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা না করে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনে সহায়ক হন।

হুমায়ুন : মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পুত্র হুমায়ুনের জন্ম ১৫০৮ খ্রী এবং বাবরের মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভ করেন ১৫৩০ খ্রী। বাবরের শাসনকালে পূর্বভারতের আফগান সুলতান মাহমুদ লোদি, বিবান খাঁ ও বায়োজিদকে দমনে কৃতিত্ব দেখান। কিন্তু বাবরের যোগ্যতা হুমায়ুনের ছিল না। সে কারণে বিশাল সাম্রাজ্য সুসংহত করার আগেই বাবরের মৃত্যু হয় বলে হুমায়ুনকে সিংহাসনে বসার পর খুবই বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। তারপর পিতার প্রতি বিশেষ অনুগত পুত্র পিতার আদেশ পালন করতে গিয়ে আরও বিপদ ডেকে আনেন। বাবর হুমায়ুনকে সকল ভাইয়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে যান। সেকারণে হুমায়ুন তাঁর দ্বিতীয় ভ্রাতা কামরানকে কাবুল-কান্দাহারের, তৃতীয় ভ্রাতা হিন্দালকে মেওয়াটের এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসকারিকে সম্বল নামক স্থানের শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু দ্বিতীয় ভ্রাতা কামরান তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে দিল্লীর মসনদ দখলে তৎপর হন এবং পাঞ্জাব ও তার সমীপবর্তী বহু স্থান দখল করে নেন। হুমায়ুন কিন্তু ভাইকে শাস্তি না দিয়ে তার অধিকার স্বীকার করে নেন এবং পাঞ্জাব ও হিসার কামরানের অধিকারভুক্ত হয়। এই ভাবে শাসনের শুরুতেই হুমায়ুন মোগল সাম্রাজ্যকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন।

গুজরাতের বিদ্রোহী শাসক বাহাদুর শাহকে দমনে যখন হুমায়ুন ব্যস্ত সে সময় দক্ষিণ বিহারের আফগান শাসক শের খাঁ বিদ্রোহী হন এবং বিহার ও বাঙলার বহু স্থান দখল করেন। হুমায়ুন তখন শের খাঁকে দমনের উদ্দেশ্যে বাঙলা অভিমুখে অগ্রসর হন এবং অতি সহজেই গৌড় জয় করেন। কিন্তু তারপর হুমায়ুন প্রায় নয় মাস গৌড়ে থাকেন ও প্রমোদ বিলাসে দিন কাটান,

আর সেই অবকাশে শের খাঁ নিজের শক্তি সংহত করেন এবং জৌনপুর, বারাণসী জয় করে কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হন। ফলে হুমায়ুনের দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পথ প্রায় রুদ্ধ হয়। হুমায়ুন তখন দ্রুত দিল্লী ফেরার চেষ্টা করেন। কিন্তু শের খাঁ তাঁকে পথে অতর্কিতে আক্রমণ করেন এবং ১৫৩৯ খ্রী চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে কোনরকমে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। হুমায়ুন চৌসার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পরের বছর শের শাহর বিরুদ্ধে আবার অভিযান চালান, কিন্তু বিলগ্রামের যুদ্ধে আবার পরাজিত হন এবং তখন রাজ্যত্যাগ ও পলায়ন ভিন্ন হুমায়ুনের গত্যন্তর থাকে না। (১৫৪১)

রাজ্যহারা, আশ্রয়হারা অবস্থায় হুমায়ুন প্রথমে অমরকোট রাজ্যে কিছুকাল থাকেন। সেই খানেই এক পারসিক পণ্ডিতের কন্যা হামিদা বানুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং ১৫৪২ খ্রী হামিদা বানুর গর্ভে হুমায়ুনের পুত্র আকবরের জন্ম হয়। অমরকোট থেকে হুমায়ুন প্রথমে কান্দাহার, তারপরে পারস্যে চলে যান। ১৫৪৫ খ্রী শের শাহর মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের শাসনকালে ভারতে যে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয় তার সুযোগ নিয়ে হুমায়ুন আবার সসৈন্যে ভারত আক্রমণ করেন ও ১৫৫৫ খ্রী দিল্লী ও আগ্রা জয় করে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তার পরের বছর এক উচ্চস্থান থেকে পতনের ফলে হুমায়ুনের মৃত্যু হয়।

হুমায়ুন-নামা : মোগল সম্রাট বাবরের কন্যা ও হুমায়ুনের ভগ্নী গুলবদন বেগম এই গ্রন্থের লেখিকা। সম্রাট আকবরের ইচ্ছায় গুলবদন বেগম তাঁর পিতা বাবর ও ভ্রাতা হুমায়ুনের কাহিনী লেখেন। বাবরের মৃত্যুর পাঁচ-সাত বছর মাত্র আগে গুলবদন বেগমের জন্ম হয় সেকারণে বাবর সম্বন্ধে তাঁর খুব বেশি জানা ছিল না। তাই বাবরের কথা তিনি অল্পই লেখেন। হুমায়ুনের কথাতেই গুলবদন বেগমের-গ্রন্থ পূর্ণ। হুমায়ুনের জয়-পরাজয় ও দুঃখ বরণের সব কাহিনীই তিনি লিপিবদ্ধ করেন। হুমায়ুনের সঙ্গে তাঁর ভাই কামরানের বৈরিতার দীর্ঘ কাহিনীও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। হুমায়ুনের সমকালীন সমাজ-জীবনের চিত্রও 'হুমায়ুন-নামা' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

হেনরি কটন, স্যার : ভারতের রাজনৈতিক স্বাধিকারের প্রতি সহানুভূতিশীল ও শিক্ষাব্রতী ইংরেজ সিভিলিয়ন। আসামের চীফ কমিশনার পদ থেকে অবসর গ্রহণের অল্পকাল পরে, ১৯০৪ খ্রী বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেসের বিংশতিতম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তাঁর সভাপতির ভাষণে ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্র করার প্রস্তাব থাকে।

হেস্টিংস, ওয়ারেন : ওয়ারেন হেংস্টিস দ্র।

হেস্টিংস, মার্কুইস অফ : ময়রা, লর্ড দ্র।

হোমরুল লীগ : বালগঙ্গাধর টিলকের উদ্যোগে ১৯১৬ খ্রী ২৩ এপ্রিল, মহারাষ্ট্রে হোমরুল লীগ বা 'স্বরাজ

লীগ' গঠিত হয়। তারপর কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগ যাতে একসঙ্গে ভারতের শাসনব্যবস্থার সংস্কারে তৎপর হয় তার জন্যও হোমরুল লীগ চেষ্টা করে। হোমরুল লীগের চেষ্টাতেই ১৯১৬ খ্রী লখনৌতে একই সময় কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগ সম্মেলন আহুত হয় এবং উভয় রাজনৈতিক দল মিলিতভাবে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে শাসন সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। ঐ চুক্তি লখনৌ চুক্তি নামে খ্যাত।

এনি বেসান্টও প্রথম মহাযুদ্ধকালে হোমরুল লীগ নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করেন। অন্যান্য বৃটিশ উপনিবেশের মতো ভারতও যাতে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার পায় তার জন্য আন্দোলন করা ঐ লীগের উদ্দেশ্য ছিল। এনি বেসান্টের হোমরুল লীগের মুখপত্র ছিল নিউ ইণ্ডিয়া। মহম্মদ আলি জিন্না একদা এনি বেসান্টের হোমরুল লীগের সদস্য হয়েছিলেন। স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন করার জন্য বেসান্ট, জি এস আরুনডেল, বি পি ওয়াদিয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে প্রথম মহাযুদ্ধকালে অন্তরীণ করা হয়। 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার বিশ হাজার টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঐসব দমনমূলক নীতির ফলে এনি বেসান্টের হোমরুল লীগ দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে, কিন্তু ঐ সময় জাতীয় নেতৃত্বে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব হয় ও তার ফলে হোমরুল লীগের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে।

***শিবজি :** পুণায় জুনারের নিকটবর্তী শিবনের গিরিদুর্গে ১৬৩০ খ্রী, মতান্তরে ১৬২৭ খ্রী, শিবজির জন্ম হয়। শিবজির জন্মের অল্পদিন পরে তাঁর পিতা শাহজি দ্বিতীয় পত্নীসহ অন্যত্র চলে যান এবং শিবজি তাঁর মা জিজাবাঈ ও দাদাজি কোণ্ডদেব নামে এক রণনিপুণ ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে মানুষ হতে থাকেন। শিবজির চরিত্র গঠনে তেজস্বিনী জননীর প্রভাব ছিল সীমাহীন। শিবজির সম্ভবত অক্ষরজ্ঞান হয়নি, কিন্তু জননী জিজাবাঈ ও কোণ্ডদেবের কাছে পূর্বপুরুষদের নানা বীরত্বের কাহিনী শুনে তিনি উদ্বুদ্ধ হন এবং একটি স্বাধীন রাজ্য গঠনের সঙ্কল্প নিয়ে পার্বত্য মাওলি জাতীয়দের নিয়ে একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী গঠন করেন; তারপর দাক্ষিণাত্যের সুলতানদে… দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর অভিযা… শুরু করেন। ১৬৪৬ খ্রী, অর্থাৎ ম’ ষোল কি উনিশ বছর বয়সে শি বিজাপুর রাজ্যের তোরণা দুর্গটি দ… করেন। তারপর তার পাঁচ মাইল পূর্বে তিনি নিজেই রাজগড়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। অবিলম্বে শিবজি এমনই শক্তিশালী হয়ে ওঠেন যে তাঁকে দমন করতে বিজাপুর সরকার তাঁর বাবাকে বন্দী করেন। এরপর বাবার মুক্তির শর্ত হিসাবে শিবজি কয়েক বছর (১৬৪৯-৫৫) সংযত থাকেন। সেই অবকাশে শিবজি নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং ১৬৫৬ খ্রী ক্ষুদ্র মারাঠা রাজ্য জাওলি দখল করে আবার রাজ্যবিস্তার শুরু করেন। ১৬৫৭ খ্রী

দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তারূপে ঔরংজেব যখন বিজাপুর অভিযানে রত, সেই সময় শিবজির মারাঠা বাহিনী মোগল শাসিত আহমদনগর ও জুনার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করলে শিবজির সঙ্গে মোগলদের সংঘর্ষের সূচনা হয়। ঔরংজেব দ্রুত হস্তক্ষেপ করলে শিবজি নতি স্বীকার করেন, কিন্তু পিতার সিংহাসন দখলের জন্য ঔরংজেব দিল্লী যাত্রা করলে শিবজি সেই অবকাশে আবার তৎপর হন ও অবিলম্বে উত্তর কোঙ্কন দখল করে নেন।

ঐ সময় শিবজিকে দমনের জন্য বিজাপুরের সুলতান উদ্যোগী হন এবং ১৬৫৯ খ্রী আফজল খাঁর নেতৃত্বে শিবজির বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী পাঠান। কিন্তু আফজল খাঁর শোচনীয় মৃত্যুর মধ্যে সে অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটে (আফজল খাঁ-দ্র)। তার পরেই শিবজি দক্ষিণ কোঙ্কন ও কোলাপুর তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ওদিকে দিল্লীর সিংহাসন দখলের পর ঔরংজেব শিবজিকে দমনের জন্য দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসক শায়েস্তা খাঁকে পাঠান। কিন্তু শিবজির অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত শায়েস্তা খাঁ কোন রকমে প্রাণ রক্ষা করে পলায়ন করেন। তারপর শিবজিকে দমন করতে ঔরংজেব অম্বর-রাজ জয়সিংহ ও দিলির খাঁর নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী পাঠান। সেই বিশাল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ না করে শিবজি সন্ধি করেন (১৬৬৫) এবং জয় সিংহের পরামর্শে শিবজি পুত্র শম্ভুজিকে নিয়ে দিল্লী যান এবং মোগল সম্রাট সেখানে তাঁকে বন্দী করেন। কিন্তু শিবজি কৌশলে বন্দীশালা থেকে পলায়ন করে আবার স্বরাজ্যে ফিরে আসেন। ১৬৭৪ খ্রী মহাসমারোহে শিবজির অভিষেক হয়। তারপর কয়েক বছরের মধ্যে ছত্রপতি শিবজির নেতৃত্বে এক বিশাল মারাঠা সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। কিন্তু ১৬৮০ খ্রী শিবজির অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। শিবজির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শম্ভুজি মারাঠা রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। (দ্র-মারাঠা শক্তির ইতিহাস)

একজন শাসক হিসাবে ও তদুপরি একজন মানুষ হিসাবে শিবজি ভারতের ইতিহাসে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। প্রবল পরাক্রমশালী মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে একজন সামান্য জাগিরদারের পুত্র স্বীয় প্রতিভা, সঙ্কল্প ও বীর্যবলে যেভাবে একটি শক্তি-শালী রাজ্য গড়ে তোলেন তার কোন তুলনা ভারতের ইতিহাসে নেই। নিজে একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু হলেও অন্য সকল ধর্মের প্রতি তিনি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নারী জাতির সম্মান রক্ষার ব্যাপারেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সৈন্যবাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে ও আক্রমণের পরিকল্পনা রচনায় শিবজি যে দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন তা পরবর্তীকালে দেশি বিদেশি সকল ঐতিহাসিকের মনে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

শিবজির অনুপ্রেরণায় মারাঠা শক্তি এমনই প্রবল ও দুর্নিবার হয়ে ওঠে যে তাকে দলনের উদ্দেশ্যে মোগল সম্রাট ঔরংজেব ১৬৮১ খ্রী স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আসেন। তারপর আর তিনি রাজধানীতে ফিরে যেতে পারেননি।

* গ্রন্থগার ত্রুটিতে যথাস্থানে বসেনি।

নির্দেশিকা

বিষয় নির্বাচনে, তথ্যসংগ্রহে ও তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হ'তে যেসব গ্রন্থ ও গ্রন্থাবলীর উপর নির্ভর করেছি :

The Cambridge History of India

The Oxford History of India

Encyclopaedia Britannica

The Cultural Heritage of India.

The History and Culture of the Indian people
— Gen. Ed. R. C. Majumdar

The Foundation of Muslim Rule in India —
A. B. M. Habibullah

Akbar the Great Mogal—Vincent Smith.

The History of the Congress—P. Pattabhi Sitaramaya

The Wonder that was India- A. L. Basham

ভারতকোষ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী